মাসুদ রানা

মাস্টারমাইণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

মাস্টারমাইণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

কিডন্যাপ্‌ড্‌ বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর লাবনী আলমকে ফেরত চাইলে অমূল্য স্টাডা কোডেক্স লুঠ করতে হবে ইউএন-এর দুর্গম ভল্ট থেকে! তাই করল রানা! লাবনী ভারতে বন্দি জেনে চলল ওখানেই। দর্শকভরা স্টেডিয়ামে ওকে খুন করবে ভারতীয় কোটিপতি, নাকি নিরস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দেবে ক্ষুধার্ত বাঘের অভয়ারণ্যে?

বহু কষ্টে মেয়েটিকে উদ্ধার করে পৌঁছুল রানা বরফ-ছাওয়া হিমালয়ে মহাদেবের প্রাচীন গুহায়! বুঝে গেছে, কারা ধ্বংস করবে মানব-সভ্যতা! একদিকে শিবের বেদ রক্ষাকারী সশস্ত্র সাধু, অন্যদিকে মাস্টারমাইণ্ড অনুপম মঙ্গেলকার, তার পাষাণী স্ত্রী মাধুরী ও নিষ্ঠুর মার্সেনারিরা।

বড় বিপদে আছে রানা বেচারা!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না

বাংলাপিডিএফ এ আপলোডকৃত বইসমূহ আপনার নিজের ওয়েবসাইট/ব্লগ/সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সময় দয়া করে অরিজিনাল আপলোডারদের ক্রেডিট দিন। দিনে দিনে পিডিএফ বইয়ের সংখ্যা যে কমে আসছে তার অন্যতম প্রধাণ কারন অবাধে এক ওয়েবসাইটের বই অন্য ওয়েবসাইটে কোন প্রকার মেনশন করা ছাড়াই শেয়ার করা। এর মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আরেকজনের আপলোড করা বই ওয়াটারমার্ক লাগিয়ে নিজের বলেও চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাপিডিএফ থেকেও অনেক আপলোডার হারিয়ে গেছেন শুধুমাত্র এইসব পিডিএফ চুরির কারনে। অল্প গুটিকয়েক যেসব আপলোডার আছেন, তাদেরও অনেকে নিয়মিত পিডিএফ আপলোডে উৎসাহ পান না। কাজেই তাদের ধরে রাখার দায়িত্বটা আপনাদের পাঠকদের নিতে হবে। আমাদের বই শেয়ার করেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দয়া করে ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করে করুন। এতে আপনাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর কিন্তু কমে যাবে না, উলটো সবাই আপনাদের সততার প্রশংসাই করবে। পিডিএফ কমিউনিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না।

বাংলাপিডিএফ এ ডোনেট করতে চাইলে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে পেপালের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর বিকাশ নাম্বার প্রয়োজন হলে মেইল করুনঃ banglapdf@yahoo.com এই ঠিকানায়!

ধন্যবাদ সবাইকে।

Banglapdf.net

মাসুদ রানা ৪৫০

মাস্টারমাইণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7450-5

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৭

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-450
MASTERMIND
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

একশ' বাহাত্তর টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের'
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆ কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত

যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ◆ মাস্টারমাইণ্ড।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

মধ্য নভেম্বর।

থরথর করে গা কাঁপিয়ে দেয়া কনকনে, হিমশীতল শেষ বিকেল। সফেদ-শুভ্র তুষারে ছাওয়া ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা, সরু পথ। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চলেছে ক্যাসি স্যাণ্ড্রা। খুশি, মাত্র ক'দিন পরেই ক্রিসমাস। তার চেয়েও বেশি ভাল লাগছে, আত্মীয়-স্বজনরা সবাই আসবে এবার ওর অ্যাপার্টমেণ্টে। সত্যিই দারুণ ব্যাপার! সবমিলে সাতাশজন! ওর বোনের বাচ্চাটা আগেই ভূমিষ্ঠ হলে...

হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় বাঁক দেখে ট্যাঙ্কার-ট্রাকের গতি কমাল ক্যাসি। চট্ করে দেখল হাতঘড়ি— সময়ের আগেই পৌঁছুবে গন্তব্যে। শেষ পেট্রল স্টেশনে তেল পৌঁছুবার পর সোজা ফিরবে ডিপোতে— ব্যস, তার পরই ছুটি! সন্ধে সাতটার আগেই হাজির হবে ফ্লোরেন্সে ওর অ্যাপার্টমেণ্টে। সেক্ষেত্রে কি উচিত নয় সোফিয়াকে ব্যস্ত করে তোলা? ওদেরও তো বাচ্চা চাই, তাই না?

বাঁক ঘুরেই চমকে গিয়ে ব্রেক কষল ক্যাসি। সামনের রাস্তা জুড়ে খয়েরি এক মার্সিডিয। পেছনের চাকা পড়েছে পাশের নালার ভেতর। গাড়ির পাশে কালো সুট পরা এক মেয়ে, হাত নেড়ে ইশারা করছে থামতে।

ধ্যাত্তারি! ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাসি। বাড়ি ফিরতে একটু দেরিই হবে। কিন্তু যা করা উচিত, সেটা তো করতেই হবে!

ভবিষ্যতের ছোট্ট স্যাট্টার সামনে নিজেকে আদর্শ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইলে বিপদগ্রস্ত, অসহায় মেয়েটাকে সাহায্য না করে উপায় নেই ওর!

ট্যাঙ্কার-ট্রাক থামিয়ে ফেলল ক্যাসি, চট্ করে দেখে নিল মেয়েটাকে। মাথাভরা রেশমি কালো চুল হাঁটু তক। ত্বক বাদামি। বয়স ত্রিশের মত। আকর্ষণীয়া। আবছা আলোয় মনে হলো ভারতীয়। বিযনেস লেডিসের মত সুট। সোফিয়ার কথা মনে পড়ল স্যাট্টার। স্বামী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অচেনা এক মেয়েকে দেখছে জানলে হিংসায় বোম হতো ওর বউ। কিন্তু এসব পাত্তা দেয়ার লোকই নয় ক্যাসি। স্রষ্টা মানুষকে চোখ দিয়েছেন যেখানে যত রূপ প্রাণভরে উপভোগ করার জন্যেই!

ট্রাকের দিকে পা বাড়াল মেয়েটা।

ক্যাব থেকে নেমে নরম সুরে বলল ক্যাসি, 'হাই!'

চারপাশের জঙ্গল থেকে ঘুরে এল মেয়েটার চোখ, আবার দেখল ক্যাসিকে। ধীর পায়ে হাঁটছে।

ক্যাসি খেয়াল করল, সুন্দরীর বাম চোখটা একদম স্থির।

পাথরের নাকি?

কপালে সাদা, গভীর কাটা চিহ্ন, নষ্ট চোখ পেরিয়ে নেমেছে গালে।

হুম, কাঁচের চোখ!

অস্বস্তি নিয়ে মার্সিডিযটা দেখল ক্যাসি। 'চাকা গর্তে পড়েছে তো, কিচ্ছু ভাববেন না, ট্রাক দিয়ে টেনে তুলে দেব।'

ঠিক তখনই হোলস্টার থেকে সাইলেন্সারসহ পিস্তল টেনে নিয়ে ক্যাসির কপালে পর পর দুইবার গুলি করল মেয়েটা।

তুষার ভরা পথের ওপর ধুপ্ করে পড়ল মৃতদেহ।

আঁধার জঙ্গল ছেড়ে বেরোল এক লোক— দীর্ঘদেহী, পেশিবহুল। পরনে কুচকুচে কালো পোশাক। টিটকারির চোখে

লাশটা দেখল ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত জর্জ মাইকেল। 'সামান্য লোক, ঠেকাতে পারত না।' থামল ক্যাসির মৃতদেহের পাশে। ততক্ষণে হোলস্টারে পিস্তল রেখে দিয়েছে মেয়েটা।

'সময় নষ্ট হলো,' শীতল কণ্ঠে বলল মায়া খোইল। ঠিকই ধরেছিল ক্যাসি স্যাট্রা, মহিলা ভারতীয়। কিছু দিন আগে শিখে নিয়েছে বাবু-ইংলিশ। বলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। 'লাশটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসুন।'

ঠাট্টার ভঙ্গিতে খটাস্ করে স্যালিউট দিল মাইকেল। 'ইয়েস, ম্যাম!' প্যান্টের পকেট থেকে কালো এক জোড়া গ্লাভ বের করে পরে নিল। একবার মুচড়ে নিল পেন্সিল গোঁফের প্রান্ত, তারপর মৃতদেহ টেনে নিয়ে ফেলল ঝোপের ভেতর। 'আপনি কষ্ট করে না এলেও পারতেন। আমাকেও দরকার ছিল না। সব ঠিকভাবেই চলছে।'

ভুরু কুঁচকে বক্তব্য শুনেছে মায়া। পুরোটা বুঝেছে, তা-ও নয়। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'আগের সব অপারেশনের চেয়ে এবার অনেক বেশি খরচ হচ্ছে। আমার বস্ চান, তাঁর কষ্টের টাকা ঠিকভাবে ব্যয় করা হোক।'

'এক ডলারও নষ্ট হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন,' বলল মাইকেল। গভীর জঙ্গলে লাশ রাখতে হবে না, কিছুক্ষণ পর পৌঁছবে অন্তত কয়েক শ' লোক। দ্বিতীয়বার লাশের দিকে না চেয়ে ট্যাঙ্কারের পাশে এসে থামল সে। 'ঠিক আছে, এবার রওনা হোন। সামনের রাস্তায় দেখা হবে।'

নীরবে মার্সিডিযের ড্রাইভিং সিটে গিয়ে উঠল মায়া।

পেছন থেকে চেয়ে আছে মাইকেল। ভাবছে, শালীর দুর্দান্ত শরীরটা গ্রিক দেবী ভেনাসের মতই! কিন্তু বেটির মনটা স্রেফ বরফ দিয়ে তৈরি!

সময় নষ্ট না করে কাজে নেমে পড়ল মাইকেল। হুইল ঘুরিয়ে

খুলল ট্যাঙ্কারের পাশের ভাল্‌ভ্। দিন শেষে ট্যাঙ্কার-ট্রাকের বেশিরভাগ তেল বিক্রি হয়ে গেলেও, পেটের ভেতর রয়ে গেছে কমপক্ষে পাঁচ শ' গ্যালন পেট্রল। গলগল করে তেল পড়তে লাগল তুষারাবৃত পথে।

ওই একই সময়ে নালা থেকে উঠে এল মার্সিডিযের চাকা।

কড়া গন্ধে নাক কুঁচকে ফেলল মাইকেল। তেল সরবরাহের হুইল আরও খুলল। পেট্রল গিয়ে পড়ছে গাছের গায়ে। একলাফে ক্যাবে উঠল দুর্বৃত্ত। এখনও চালু আছে ইঞ্জিন। হ্যাণ্ড ব্রেক সরিয়ে ক্লাচ টিপে গিয়ার ফেলে রওনা হলো দ্রুতগামী মার্সিডিযের পেছনে।

ঝোপের ভেতর ক্যাসি স্যাট্রার লাশকে গোসল করিয়ে দিচ্ছে পেট্রল। ট্যাঙ্কার-ট্রাক ছুটে চলেছে নতুন ড্রাইভারের নির্দেশে।

সিকি মাইল যাওয়ার পর থামল মার্সিডিয, জ্বলজ্বল করছে হেডলাইট। অন্তত আরও দশ গজ পেরিয়ে ট্রাক রাখল মাইকেল। ক্যাব থেকে নেমে গাড়ির পাশে চলে এল।

ড্রাইভিং সিট থেকে শীতল চোখে তাকে দেখল মায়া খোইল। পাত্তা দিল না মাইকেল। আজ রাতের পর রয়ে যাবে মাত্র একটি কাজ, সেটার পর ধমক বা তাড়া দেবে না কেউ। টাকা বুঝে পেলে সোজা ফিরবে লণ্ডন। এরপর আর যোগাযোগ রাখবে না মার্সেনারি দলের কারও সঙ্গে।

গাড়িতে উঠে সিটবেল্ট আটকে নিল মাইকেল। ছিটকে রওনা হলো মার্সিডিয, পেরোল ট্যাঙ্কার-ট্রাক। তৈরি ছিল মাইকেল, যিপো লাইটার জ্বেলে দক্ষ হাতে ছুঁড়ল পেছনের পথে।

পেট্রলের অগভীর ডোবা থেকে উঠছে দাহ্য বাষ্প, জ্বলন্ত লাইটার পেতেই জোরালো দুপ্‌ শব্দে জ্বলে উঠল নীলচে শিখা—লকলক করে চাটতে লাগল চারপাশের গাছ। রাস্তা ধরে পেছনে শোঁ-শোঁ আওয়াজে চলেছে তেলের আগুন। গাছের মতই পুড়ে

কয়লা হবে হতভাগ্য ক্যাসি স্যাট্টার লাশ।

চোখে-মুখে গনগনে তাপ লাগতেই গ্লাভ্‌স্ পরা হাতে চোখ ঢাকল মাইকেল। 'আরও জলদি যান!'

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, ঝড়ের বেগে মার্সিডিয চালাল মায়া খোইল।

সামনের বাঁক পেরোবার আগেই পেছনে তাকাল মাইকেল। তখনই বিস্ফোরিত হলো ট্যাঙ্কার-ট্রাক। কমলা-হলুদ রঙা শিখার মস্তবড় এক ছাতি উঠল আকাশে। নানাদিকে ছিটিয়ে গেল জ্বলন্ত তেল। কানে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ। পরের সেকেণ্ডে প্রেমে ব্যর্থ এক দৈত্যের হুতাশের মত এল আগুনে দমকা হাওয়া।

'গুড,' বলল মাইকেল, 'এবার আজকের দ্বিতীয় কাজ।'

জঙ্গুলে পথে ফ্লোরেন্স শহর লক্ষ্য করে তুমুল বেগে মার্সিডিয উড়িয়ে নিচ্ছে মায়া খোইল। পেছনে পড়ে রইল জ্বলন্ত জঙ্গলের বিশাল আগুনের রক্তিম প্রাচীর।

ভারী চেয়ারের সামনের দুই পায়া ওপরে তুলে আবারও মেঝেতে খটাস্ করে নামিয়ে আনল বন্দি তরুণী। বাজে লোকগুলো চেয়ারে বেঁধে রেখেছে বলে হাত-পা নড়াবার উপায় নেই ওর। আবারও খটাস-খটাস শব্দ তুলতেই ওদিকের ঘর থেকে এসে তার কপালে পিস্তল ধরল জ্যাক রিচি। ইতালিয়ান ভাষায় সাবলীল সুরে বলল, 'বদমায়েসি বন্ধ করো! আগেই বলেছি, কথামত চললে বাঁচবে।' গুঁজে রাখা রুমালের কারণে সামান্য আওয়াজ বেরোল মেয়েটার মুখ থেকে। চেয়ার টেনে তাকে সরিয়ে দেয়া হলো দেয়াল থেকে। আবারও ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের লিভিংরুমে ফিরল মার্সেনারি জ্যাক রিচি।

সে ছাড়াও লিভিংরুমে আছে আরও ছয়জন। প্রত্যেকের

পরনে কালো পোশাক। অপরিসর মেঝে ও আরামদায়ক সোফায় নানান ইকুইপমেণ্ট। সতর্ক পা ফেলে সব পাশ কাটিয়ে জানালার কাছে গেল রিচি। রূঢ় আবহাওয়ার অত্যাচারে জীর্ণ চেহারার ওপর থেকে খুলে ফেলল কালো ব্যালাক্লাভা। কিছু দিন আগে ন্যাড়া হয়েছিল, গত কয়েক দিনে গজিয়ে গেছে সিকি ইঞ্চি চুল। গালে খোঁচা-খোঁচা আধপাকা, ধূসর দাড়ি। কপালে গভীর ক'টা ভাঁজ। সারাজীবনে বহু কিছু ভাবতে হয়েছে তাকে। বয়স মাত্র চৌত্রিশ, কিন্তু পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে বেশি অত্যাচার সহ্য করেছে সে।

আজ বিকেলে এই অ্যাপার্টমেণ্ট দখল করে নিয়েছে ওরা সাত মার্সেনারি। ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় নব্য শিল্পী মেয়েটাকে বলেছিল রিচি, সে এনেছে মিলানের একটা পার্সেল। আসলে তারা যে ধরনের অপারেশন চালাবে, সেজন্যে অবশ্যই চাই ভিয়া দেগলি অ্যালফানির সরু রাস্তার এই দালানের ওপরতলার অ্যাপার্টমেণ্ট। ব্যাচেলার আর্টিস্টরা বাস করে এখানে, চোখে রঙিন স্বপ্ন—একদিন মস্তবড় শিল্পী হবে! খ্যাতি ও অর্থের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যাবে অন্য সবাইকে! কিন্তু বরাবরের মতই বাস্তবে বেশিরভাগের করুণ মৃত্যু হয় দারিদ্র্যের ভেতর পর্ণ কুটিরে, বেদম কষ্ট সয়ে।

গলির ওপাশে আঠারো শতকের বিশাল দালানঃ গ্যালেরিয়া দেল'অ্যাকাদেমিয়া। টুরিস্টরা ফ্লোরেন্স-এ এলে ওই জাদুঘর ঘুরে দেখবে না, তা হওয়ার নয়। দুনিয়া-সেরা সব শিল্প রয়েছে মস্ত দালানের ভেতর।

ওটাই মার্সেনারি বা দস্যুদের নতুন টার্গেট।

বেজে উঠল জ্যাক রিচির মোবাইল ফোন।

কল করেছে জর্জ মাইকেল।

'হ্যাঁ, বলছি।'

'আমরা পৌঁছে গেছি। ঢুকতে দাও।'

ঘাড় ঝুঁকিয়ে নিচের রাস্তা দেখল রিচি। ল্যাম্প পোস্টের হলদে বাতির তলা দিয়ে হনহন করে হেঁটে গেল দু'জন। জর্জ মাইকেল আর ইণ্ডিয়ান ওই মেয়েটা। আরও কয়েকটা গভীর ভাঁজ পড়ল রিচির কপালে। মাইকেলের এই আপত্তিকর উপস্থিতি রীতিমত অপমানজনক। এ থেকে বুঝে নিতে হবে, লোকটা পুরো ভরসা করছে না ওর ওপর। নিজে এসে সব তদারক করবে। অথচ প্রায় প্রতিটি কাজে সফল হয়েছে সে। সিয়ানের জাদুঘর থেকে এক সেট চাইনিজ টেরা-কোটা ওঅরিয়র পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছে। শুধু সমস্যা হয়েছিল মক্কায় কাবাঘরের কালো পাথরটার বেলায়। সেটাও ওর দোষে নয়। দলের একজন ঠিক সময়ে খুন করেনি শেষ গার্ডকে, নইলে হাওয়া হয়ে যেত ভারী, কালো পাথরটা।

আট মাস ধরে নানান দেশের মূল্যবান সব শিল্প ও সম্পদ সরিয়ে ফেলছে তারা। কিন্তু তাদের দিকে এক পা-ও এগোতে পারেনি ইণ্টারপোল। এর কারণ, সে ভাল করেই জানে কীভাবে কাজ করে পুলিশ, সেজন্যেই তাদের তিন ধাপ সামনে থাকছে।

বিরক্তি চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিচি। ওই মেয়েলোকটাকে সহ্য করা খুবই কঠিন। যে-লোক কাজ দিচ্ছে ওদেরকে, তার হয়ে মাতবরি করে বেটি। কলিং বেল বেজে উঠতেই আবারও মুখে ব্যালাক্লাভা পরে নিয়ে লিভিংরুম ছেড়ে সদর দরজার কাছে গেল রিচি। এলিভেটর পেয়েছে বলে চট্ করে এত দ্রুত উঠে এসেছে ওরা দু'জন। বাড়িতে ঢোকা বা এলিভেটরে করে ওঠার সময় কারও সঙ্গে দেখা হলে খুন করতে হতো। এর কোনও মানে আছে? কোনওভাবে কেউ চিনলে ওদেরকে?

যাক গে, সমস্যা হয়নি কোনও।

দরজার ওদিকে মৃদু শব্দ তুলল এক পাটি বুট।

লক খুলে কবাট সরিয়ে নিল জ্যাক রিচি।

নীরবে ভেতরে এসে ঢুকল জর্জ মাইকেল ও মায়া খোইল।

রিচি দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল দলনেতা জর্জ মাইকেল। 'কোথাও কোনও সমস্যা নেই তো?'

'শেষ বিকেলের নিউয তোমরা,' বলল রিচি। 'ছড়িয়ে পড়ছে দাবানল। আশপাশের শহর থেকে চাওয়া হয়েছে ফায়ার ট্রাক। আরেকটা কথা...' ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'ওরা হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে।'

'গুড!' মোবাইল ফোন বের করে নির্দিষ্ট নম্বর তুলে কল দিল মাইকেল। 'স্ট্যাটাস?'

'এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে ফ্লাইট প্ল্যান জমা দিয়েছি,' জানাল ওদিকের লোকটা। 'আমরা তৈরি।'

'তা হলে কাজে নামো,' ফোন রেখে দিল মাইকেল। 'ছাত দিয়ে নামার কী ব্যবস্থা?' হাত তুলে স্কাইলাইট দেখাল রিচি। 'তা হলে পযিশনে যাও।' দলের অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে লিভিং রুমের দিকে পা বাড়াল দুই ইংরেজ দুর্বৃত্ত।

মাইকেলের পেছনে হাঁটছে মায়া খোইল, তার চোখ পড়ল বেডরুমে। বন্দিনী মেয়েটাকে ওখানে দেখেই ফুঁসে উঠল: 'এর মানেটা কী?'

'ওই মেয়ে কোনও ঝামেলা করবে না,' সহজ সুরে বলল রিচি। 'আমাদের চেহারা দেখেনি।'

নকল চোখের মতই পাথুরে হলো মায়া খোইলের চেহারা। বেডরুমে পা রেখে বলল, 'কোনও সাক্ষী রাখা চলবে না।'

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে চেয়ারে বসে আছে ইতালিয়ান মেয়েটা। প্রাণপণ চেষ্টা করছে হাত-পায়ের দড়ি খুলতে। এমন নয় যে মায়ার ইংরেজি বুঝেছে, আসলে তার গলার ধার শুনে ভীষণ ভয় লাগছে ওর।

'আপনি গুলি করলে আশপাশের সবাই আওয়াজ শুনবে,'

সাবধান করল জর্জ মাইকেল।

'আমার আগ্নেয়াস্ত্র লাগে না,' তরুণীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল মায়া। ভয়ে আর্তচিৎকার করতে চাইছে মেয়েটা। মুখে রুমাল গুঁজে রাখা, তাই গলা থেকে বেরোল চাপা গোঙানি।

এইমাত্র ঘরে ঢুকেছে রিচি। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মেয়েটা থাকুক। সমস্যা হবে না। আমি কথা দিয়েছি, কোনও গোলমাল না করলে ওকে বাঁচতে দেব।'

কথাটা পাত্তা দিল না মায়া। আঙুল রেখে মৃদু চাপ দিল বাম অক্ষিকোটরের ওপর। ছোট্ট, ভেজা কিছু খোলার মৃদু আওয়াজ হলো। টুপ করে কী যেন পড়েছে তার হাতের তালুতে।

চকচকে তরলে সিক্ত কাঁচের চোখ!

জীবনে অনেক বিশ্রী দৃশ্য দেখেছে জ্যাক রিচি, কিন্তু মহিলা যেভাবে নকল চোখ খুলে নিয়েছে, তা ভীতিকর মনে হয়েছে ওর। কেন যেন বমি এল। ক'সেকেণ্ড পর ওই ঘৃণা পরিণত হলো নিখাদ বিস্ময়ে।

কাঁচের চোখ দু'হাতে ধরে মাঝের প্যাঁচ খুলছে মায়া। সামান্য ক্লিক শব্দে দু'ভাগ হয়ে গেল চোখের দুই অংশ।

রিচি ভাবছে, করছে কী ভারতীয় মেয়েলোকটা?

মায়া তার হাত সরাতেই দেখা গেল, নকল ওই চোখের এক অংশে গুটিয়ে রাখা হয়েছে মসৃণ, স্টিলের সরু, চকচকে তার। রিচি কিছু বুঝবার আগেই দেখল, অসহায় ইতালিয়ান তরুণীর গলায় তারের ফাঁস পরিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে রাক্ষুসী!

'না!' বাধা দিতে চাইল রিচি। কিন্তু কাঁধ চেপে ধরে তাকে পিছিয়ে নিল মাইকেল।

আর্তচিৎকারের সুযোগ নেই তরুণীর। ক্ষুরের মত ধারালো স্টিলের তার কেটে বসল শ্বাসনালীর ওপর। হাত-পা বাঁধা বলে ঝটকা দিতে পারল না বেচারি। বার কয়েক আগুপিছু করে

মেঝেতে সামান্য আওয়াজ তুলল ভারী চেয়ার। আগের চেয়েও জোরে টান দিল মায়া। তরুণীর ঘাড়-গলার ত্বক ও মাংস চিরে দিচ্ছে মৃত্যু-ফাঁস। ক্ষত থেকে চঞ্চলা ঝর্নার স্রোতের মত নামল তাজা লাল রক্ত।

ভীষণ যন্ত্রণায় দু'হাত মুঠি করল মেয়েটা, ক'সেকেণ্ড পর শেষ একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হলো দেহ ও চেয়ার।

সরু, গভীর রক্তাক্ত নালা থেকে তার বের করে নিল মায়া, ঘুরে দাঁড়াল। প্রথমবারের মত রিচি দেখল, ভারতীয় পিশাচীর সত্যিকারের ভয়াবহ কুৎসিত রূপ। বাম চোখের জায়গায় কালো আঁধার গর্ত। যেন পাপড়ি ঘেরা খুব ছোট হাঁ করা কোনও মুখ। অজান্তেই শিউরে উঠল রিচি। রেগে গেল কয়েক সেকেণ্ড পর। কর্কশ সুরে বলল, 'খুনটা না করলেও পারতেন!'

'সাক্ষী চাই না,' আবারও বলল মায়া খোইল। লাশের শার্টে ভালভাবে মুছল রক্তে ভেজা স্টিলের তার, সন্তুষ্ট হয়ে আবারও পেঁচিয়ে রাখল নকল চোখের অর্ধেক অংশে। ক্লিক আওয়াজে আটকে গেল চোখের দু'অংশ। প্র্যাকটিস করা হাতে চোখ বসাল অক্ষিকোটরে। চেপে রাখা বমি গিলে ফেলার মত বিশ্রী, নিচু 'স্লুৎ!' শব্দ হলো। নির্বিকার চোখে মাইকেল আর রিচির দিকে তাকাল মায়া। 'ঠিক আছে, এবার যে-যার কাজ শেষ করুন।'

'ভাববেন না,' রিচি মুখ খোলার আগেই জানাল দলনেতা মাইকেল। তার ডানহাতকে বলল, 'রিচি, বাচ্চা হওয়ার পর নরম হয়ে গেছ। এটাই যদি হয় তোমার মূল সমস্যা, দেরি না করেই উচিত এসব থেকে...'

'আমার কোনও সমস্যা নেই,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল রিচি। 'কিন্তু ওই মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম...'

'কাউকে এমন কথা দিয়ো না, যা রাখতে পারবে না,' বলল মাইকেল। দু'হাতে তুড়ি বাজাল।

ঘুরে তাকাল লিভিংরুমের সবাই। কাজে নামতে তৈরি তারা।

সব ইকুইপমেন্ট গুছিয়ে নিয়ে স্কাইলাইট দিয়ে বেরিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের ঢালু ছাতে উঠতে সবার লাগল মাত্র দশ মিনিট।

কিনারা থেকে গলা বের করে নিচে তাকাল জর্জ মাইকেল। এইমাত্র দালান ছেড়ে বেরিয়ে গেল মায়াদয়াহীন মায়া খোইল। মেয়েলোকটা বিদায় হতে একটু স্বস্তি ফিরেছে তার মনে। ঘাড় ফিরিয়ে দলের সবাইকে দেখল। 'তৈরি?'

মাথা দোলাল ক'জন, অন্যরা মুখে বলল, 'হুঁ' বা 'হ্যাঁ'। প্রত্যেকে সশস্ত্র, পিঠে কমপ্যাক্ট এমপিফাইভকে সাবমেশিন গান। অস্ত্রের নলের ওপর লেসার সাইট। কাঁধের পাশেই ঝুলছে সাপ্রেসর। এ ছাড়া, দরকারী সবই আটকে নেয়া হয়েছে হার্নেসে। শুধু যে ইকুইপমেন্টের জন্য ওয়েবিং আছে, তা নয়, ওটা স্থির রাখছে প্যারাশুটের মত স্ট্র্যাপ। ওটার কারণে ঠিকভাবে সব কিছুর ওজন নেবে দেহ। পরে অন্য কাজেও আসবে স্ট্র্যাপ।

একবার হাতঘড়ি দেখল ইংরেজ দলনেতা। আগামী পাঁচ মিনিটে নামতে হবে গ্যালেরিয়া দেল'অ্যাকাদেমিয়ার চওড়া ছাতে। এরপর পাঁচ মিনিটে গার্ডদেরকে খতম করে পৌঁছুতে হবে নির্দিষ্ট কামরায়। শেষ পাঁচ মিনিটে সব প্রস্তুতি সেরে আবারও বেরিয়ে যেতে হবে।

সবমিলে মাত্র পনেরো মিনিট ব্যয় হবে ইতিহাসের সেরা দুর্ধর্ষ ডাকাতির জন্যে।

দলের একজন জনসন, তার দিকে তাকাল মাইকেল। সে এরই ভেতর স্কাইলাইটের ওদিকের ঘরে ভারী আসবাবপত্রের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে কেইব্‌ল, আরেক প্রান্তে ধাতব কাঁটাওয়ালা বর্শা। আপাতত আছে ওটা গ্যাস-পাওয়ার্ড লঞ্চারের চেম্বারে, ট্রিগার টিপলেই নল দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশে।

গ্যালেরিয়ার ছাতে পেরিস্কোপের মত নাক তুলেছে ইঁটের চৌকো এক ভেন্টিলেশন ব্লকহাউস। ওটাকে টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়েছে জনসন। দু'হাতে লঞ্চার বাগিয়ে ধরল সে। মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখছে মাইকেল। আরেকবার দেখে নিল ব্লকহাউস।

এই অপারেশনে সবচেয়ে দুর্বল অংশ ওটা। ব্লকহাউসের ইঁটের দেয়াল কমজোরি হলে উপড়ে আসবে কাঁটাওয়ালা বর্শা, অথবা লঞ্চার ছোঁড়ার সময় জোরালো ব্লং আওয়াজ শুনে তাকাতে পারে যে-কেউ। আবার ব্লকহাউসে লেগে বর্শাটা বেশি আওয়াজ তুলতে পারে। কী হবে এখনও নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।

অবশ্য, লঞ্চার ফায়ার করা বা ব্লকহাউসে বর্শা গাঁথার আওয়াজ হ্রাস করতে ব্যবস্থা নেবে তারা। আরেক লোকের দিকে ঘুরে বুড়ো আঙুল তুলল মাইকেল। এই লোকের নাম যিন্দাল। মালার মত বেঁধে রাখা পটকা তুলে নিয়ে ফিউজে আগুন দিল সে। এক সেকেণ্ড পর ছুঁড়ে ফেলল নিচের গলি লক্ষ্য করে।

গ্যালেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোট স্কয়্যারের কিনারায় গিয়ে পড়ল পটকা। টাশ্-টাশ্ আওয়াজে ফাটতে শুরু করতেই মস্তসব্র লাফে চারদিকে ছিটকে গেল পথচারী সবাই। কয়েক সেকেণ্ড পর সামলে নিয়ে তাকাল জ্বলন্ত বাজির দিকে। কেউ হাসছে, কেউ বিরক্ত। সবার চোখ মাটির দিকে।

'এখনই,' চাপা নির্দেশ দিল মাইকেল।

তাক ঠিক করে সাবধানে লঞ্চারের ট্রিগারে চাপ দিল জনসন। ভুশ্ শব্দ তুলে নল দিয়ে বেরোল সঙ্কুচিত নাইট্রোজেন গ্যাস। ওটার চাপ খেয়ে তীরের মত গলি পেরিয়ে ইঁটের ব্লকহাউসের বুকে গিয়ে বিঁধল কাঁটাওয়ালা বর্শা। তাতে তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো: ঠং!

সবার চোখ এখনও জ্বলন্ত পটকার ওপর।

লঞ্চার নামিয়ে কেইবল টেনে নিতে লাগল জনসন। কয়েক

সেকেণ্ড পর লঞ্চারের পাশের লিভার ব্যবহার করে চালু করল উইঞ্চ মেকানিযম। দ্রুত টেনে নেয়া হলো কেইবল।

তৃতীয় এক লোকের দিকে ইশারা করল মাইকেল।

ওই খর্বাকৃতি লোকের নাম পিতর। দলে সবচেয়ে হালকা। কেইবল ধরে গায়ের জোরে টান দিল রাশান। বুঝে নিতে চাইল ওর ওজন নিতে পারবে কি না তারটা। নিশ্চিন্ত হয়ে হার্নেসে আটকে নিল ক্লিপ। সাবধানে নেমে পড়ল ছাত ছেড়ে।

শ্বাস আটকে ফেলেছে দলের অন্যরা।

ইঁটের দেয়াল থেকে বর্শা বেরিয়ে গেলে পিতর সোজা গিয়ে পড়বে বহু নিচের গলির ভেতর... সেক্ষেত্রে সব খেলা খতম!

কেইবলের নিচে ঝুলতে ঝুলতে গলি পেরিয়ে যাচ্ছে পিতর। থরথর করে কাঁপছে কেইবল, কিন্তু ব্লকহাউসের দেয়াল থেকে ছুটে এল না বর্শা। ওটার দিকে চুপ করে চেয়ে আছে মাইকেল। এদিকে থেমে গেছে পটকার বিস্ফোরণ। পরিষ্কার শুনল কুড়মুড় আওয়াজ তুলছে ব্লকহাউসের ভাঙা ইঁটের কয়েকটা অংশ...

গ্যালেরিয়ার ছাতে পৌঁছে গেছে পিতর।

একই সঙ্গে চাপা শ্বাস ফেলল দলের সবাই।

মাইকেল টের পেল, শীতের মধ্যেও দরদর করে ঘামছে সে।

নিজেকে খুলে নিয়ে ব্লকহাউসকে পুরো দুই চক্কর কেটে কেইবলে গিঁঠ দিল পিতর। মুখ তুলে ডানহাতে কাঁচকলা দেখিয়ে দিল।

কেইবলের সঙ্গে হুক দিয়ে নিজেকে আটকে সরসর করে নেমে এসে জাদুঘরের ছাতে পৌঁছুল মাইকেল। এরপর একে একে পৌঁছুল অন্যরা। হাতঘড়ি দেখে নিল মাইকেল। চল্লিশ সেকেণ্ড আগেই গন্তব্যে পৌঁছেছে ওরা।

এবার পরের কাজ।

মোবাইল ফোন বের করে মুখস্থ এক নম্বরে ডায়াল করল

মাইকেল। কানে ঠেকাল না ফোন। অথচ কী যেন শুনতে চাইছে।

ফ্লোরেন্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে শহরতলীর দুই মাইল দূরে পার্ক করা হয়েছে দুটো গাড়ি। নির্জন রাস্তার একমাথায় একটা, অন্যটা আরেক মাথায়। ওই দুই গাড়ির ভেতর রয়েছে এক পাউণ্ড করে সি-ফোর বিস্ফোরক। বোমার সঙ্গে তার দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে একটি করে ডেটোনেটর এবং একটি করে সেল ফোন। একই নম্বর থেকে একই সময়ে কল নেবে দুই ফোন।

সহজ ইলেকট্রিকাল ইমপাল্স্ কাজ করবে ডেটোনেটরের মধ্যে।

গাড়িবোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পুরো আট সেকেণ্ড পর গম্ভীর, চাপা আওয়াজ পেল তারা গ্যালেরিয়া দেল'অ্যাকাদেমিয়ার ছাত থেকে। ততক্ষণে ছুটছে ওরা গন্তব্য লক্ষ্য করে। চারটে দলে ভাগ হয়েছে তারা, একেক দলে দু'জন করে লোক। এক নম্বর টিমে জ্যাক রিচি ও হেনরি জনসন। অন্যদের তুলনায় লক্ষ্যে পৌঁছে গেল ওরা আগে।

জাদুঘরের অভ্যন্তরের তাপ ঠিক রাখার জন্যে, ঢালু ছাতের সমতল অংশে গুঞ্জন তুলছে বিশাল এক এয়ার-কণ্ডিশনার। পাশেই দালানের সামান্য ওপরে ওঠা একাংশে ছোট জানালা। পেনলাইট ব্যবহার করে ওদিকে আলো ফেলল রিচি। যা ভেবেছিল তা-ই, ওটা ছোট অফিস। জানালার ফ্রেমের নিচে, সরু ইলেকট্রিকাল কেইবল। জোর করে জানালা খুলতে গেলেই বেজে উঠবে অ্যালার্ম।

হার্নেস থেকে কালো একটা বাক্স নিয়ে ওটার সঙ্গে গুটিয়ে রাখা দুই তার খুলল রিচি। শেষমাথায় কুমিরের মত দাঁতওয়ালা দুটো ক্লিপ। একটা নিয়ে সরু কেইবলের তামার তারে আটকে দিল। অন্য ক্লিপ বসিয়ে দিল জানালার ফ্রেমে। অন করল বাক্সের নির্দিষ্ট সুইচ। কয়েক সেকেণ্ড পর জ্বলে উঠল সবুজ বাতি।

এবার ওয়্যার-কাটার নিয়ে কুট করে কেটে দিল দুই ক্লিপের মাঝে রাখা সরু কেইবল। বাক্সের বাতি সবুজই থাকল।

থ্রোট মাইক স্পর্শ করে নিচু স্বরে বলল রিচি, 'আমরা এবার নেমে যেতে পারব।'

জাদুঘরের করিডোর ও গ্যালারিতে জ্বলছে মৃদু বাতি। অমূল্য সব শিল্পকর্ম ঝাপসা হয়ে যাওয়া ঠেকাতে সব বাতি নিভিয়ে দিতেন কিউরেটর, কিন্তু যখন-তখন ডাকাতি হতে পারে, তাই সেটা ঠেকাতে সিকিউরিটি গার্ডদের জন্যে বাধ্য হয়ে ব্যবস্থা রেখেছেন আলোর।

মস্তবড় কোনও জাদুঘর নয় গ্যালেরিয়া দেল'অ্যাকাদেমিয়া, কাজেই রাতে সর্বক্ষণ পাহারার জন্যে রয়েছে মাত্র ছয়জন গার্ড। এসব শিল্প প্রাণের চেয়েও ভালবাসে ইতালিয়ানরা, কিন্তু ধরে নেয়া হয়েছে, রাতে জাদুঘর পাহারা দিতে ওই ক'জন গার্ডই যথেষ্ট। তা ছাড়া, নানান ধরনের অ্যালার্ম রয়েছে প্রতিটি কামরায়। তার একটাও বেজে উঠলে ঝড়ের বেগে হাজির হবে কাছের থানার একদল সশস্ত্র পুলিশ।

কিন্তু আজ রাতে জরুরি কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত পুলিশবাহিনী।

ওপরতলার একটি গ্যালারিতে পা রাখল দু'জন গার্ড। প্রতি দিন বারবার দেখে বলে তাদের কাছে অমূল্য শিল্পের দাম নেই। এসব যেন সাধারণ আসবাবপত্র। নিয়ম মত গ্যালারি ঘুরে দেখে তারা, তারপর বেরিয়ে আসার সময় সিকিউরিটি অফিসে যোগাযোগ করে জানিয়ে দেয়, কোথাও কোনও সমস্যা নেই। বিশ মিনিট পর আবারও শুরু হয় এক এক করে গ্যালারি ঘুরে দেখা। এই দু'জন গার্ডের একজনের ওয়াকিটকি কড়কড় আওয়াজ করতেই অন্যজন জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?'

'বোধহয় কিছুই না,' বলল তার সঙ্গী।

তখনই স্ট্যাটিকের সঙ্গে এল সিকিউরিটি অফিসের গার্ডের কথা, 'মনে করি না সমস্যা হয়েছে, কিন্তু তিন নম্বর হলের বাতি নিভে গেছে। একটু দেখে আসবে নাকি?'

'যাচ্ছি,' ক্লান্ত চোখে সঙ্গীকে দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল গার্ড। যখন চাকরি পেল জাদুঘরে, ওদের মনে হয়েছিল দারুণ কাজ পেয়েছে। কিন্তু একই কাজ করতে করতে এখন বিরক্ত হয়ে গেছে। নতুন করে গিয়ে দেখতে হবে, কেন নষ্ট হয়েছে বাতি।

ছোট একটা সিঁড়ি ধরে কয়েক ধাপ গিয়েই ওরা বুঝে গেল, তৃতীয় হল-এ গোলমাল আছে। জ্বলছে না একটা বাতিও। আবছা আলো আসছে দরজা দিয়ে। বেল্ট থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিল এক গার্ড, বাতি জ্বেলে নিয়ে পা বাড়াল গ্যালারির দিকে।

লেড বাতির আলোয় মনে হলো না সরানো হয়েছে কিছু।

কাঁধ ঝাঁকাল দ্বিতীয় গার্ড, ঘুরে রওনা হতে চাইল বাতির সুইচের দিকে। কিন্তু তার কপালে এসে পড়ল লাল একটা আলোর বিন্দু।

টুঁ শব্দ করতে পারল না গার্ড, জ্যাক রিচির এমপিফাইভকে-র দুটো বুলেট ফুটো করল তার মগজ। চাপা কাশির মত আওয়াজ তুলেছে সাপ্রেসর। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল গার্ডের সঙ্গী, কিন্তু তখনই পেছন থেকে তার মুখ চেপে ধরল কে যেন। জনসনের কালো ব্লেডের কমব্যাট ছোরা কেটে দিল গার্ডের কণ্ঠনালী।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ছায়াময় এক জায়গায় সরিয়ে রাখা হলো লাশ দুটো। ব্যালাক্লাভা কপালে তুলল জ্যাক রিচি। কুড়িয়ে নিল গার্ডদের ওয়াকিটকি। বিরক্ত হয়ে বলল, 'যোগাযোগ করছে কেউ।' আশা করছে, রেডিয়োর কড়মড় আওয়াজের কারণে লোকটা টের পাবে না পাল্টে গেছে গলার আওয়াজ। সুইচ অন করে ইতালিয়ান ভাষায় বলল, 'বোধহয় ক্যামেরা শর্টসার্কিট। সিস্টেম চেক করে দেখবে?'

'দেখছি। একটু অপেক্ষা করো।'

ওয়াকিটকি মেঝেতে ফেলল জ্যাক রিচি। পরের আধ মিনিট ধরে নানান ক্যামেরা এবং অ্যালার্ম পরীক্ষা করবে কমপিউটার। কাজটা শেষ করলে জানিয়ে দেবে, তিন নম্বর হলের ক্যামেরা ম্যালফাংশান করছে। এটা স্বাভাবিক। একটু আগে গুলি করে ক্যামেরার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে রিচি।

ওর উদ্দেশ্য: কমপিউটার যখন ব্যস্ত থাকবে, সিকিউরিটি সিস্টেমের দিকে নজর দেবে না কেউ।

থ্রোট মাইকে বলল জ্যাক রিচি, 'দু'জন অচল। কাজে নামো।'

জাদুঘরের দক্ষিণ কোর্টহাউসের ছাত থেকে কেইবল নিচে ফেলে শূন্যে ঝুলছে জর্জ মাইকেল এবং যিন্দাল, অপেক্ষা করছে জ্যাক রিচির সঙ্কেতের জন্যে। কয়েক সেকেণ্ড পর রিচির কথা শুনেই কেইবলে দুলতে শুরু করে ওপরের এক কাঁচের জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল মাইকেল, লাফিয়ে নামল মেঝেতে। তার আগেই হাতে উঠে এসেছে সাবমেশিন গান। পাশে নামল আমেরিকান মার্সেনারি জনসন।

গত বেশ কয়েক দিনে অন্তত দশবার গ্যালেরিয়া ঘুরে দেখেছে তারা। ভাল করেই জানে, কোথায় আছে কী ধরনের শিল্প। ওপরতলায় উঠেছে প্রধান সিঁড়ি। ছাত থেকে দালানে ঢুকেই নামতে হবে ওটা বেয়ে। ঠিক একই সময়ে প্রথমতলায় ঢুকবে দলের আরও দু'জন— কাজ করতে হবে সংক্ষিপ্ত সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অ্যালার্ম বাজিয়ে দেয়ার আগেই গার্ডদেরকে খুন করা জরুরি।

মাইকেল ভাল করেই জানে, এখন সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুমে আছে নিচের দুই গার্ড। যিন্দালকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের গতি

তুলে নেমে চলেছে সে। অন্য দুই গার্ড এখন কোথায়, নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। এই ঝুঁকিটা নিতেই হতো। সব বিবেচনা করেই মাইকেল নিজের দলের লোককে ছড়িয়ে দিয়েছে দালানের ভেতর। গতি ও চমক দেখিয়ে জয় করতে হবে এই লড়াই। একবার গার্ডরা অ্যালার্ম বাটন টিপে দিলেই সব খেলা শেষ!

পনেরো সেকেণ্ড পর আবারও সিঁড়ির দিকে ফিরবে ক্যামেরা, কিন্তু তার আগেই নিচতলায় নেমে এল তারা। মাইকেলের ইশারায় ঝড়ের গতিতে মেইন হলে ঢুকল যিন্দাল। একই সময়ে প্রাইভেটো লেখা এক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মাইকেল। সামনেই সরু করিডোর। একপাশে একের পর এক স্টল।

সামনেই আরেকটা দরজা। সময় শেষ হতে মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড। লাথি মেরে দরজা খুলল মাইকেল, বাগিয়ে ধরেছে অস্ত্র।

সিকিউরিটি মনিটরের সামনে বসে আছে এক গার্ড, ধুম করে দরজা খুলে যেতেই চমকে গিয়ে চেয়ারে চরকির মত ঘুরে গেল।

ধুপ-ধুপ-ধুপ!

মাথার তালুতে গুলি নিয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ল গার্ড। দু'বার হাত আছড়াল আফসোস করার ভঙ্গিতে। পড়ে যাওয়ার সময় কালো মনিটরে লেগেছে এক রাশ রক্ত।

ভয় পেয়ে গেল মাইকেল। সর্বনাশ! আরেক গার্ড কোথায়?

ডায়াগনোস্টিক শেষ করেছে কমপিউটার। নতুন করে দৃশ্য ফুটল মনিটরে। সেল বাইযেনটাইনের কাছে নিজের এক লোককে দেখল মাইকেল। অন্যজন সেল ফিয়োরেনটাইন-এ। অন্যান্য গার্ড কোথায়?

ওই যে! স্যালোন দেল কোলোসোতে! তাদের কাছেই থাকবে যিন্দাল...

প্রায় নিঃশব্দ এক পশলা গুলির আঘাতে মুখ বিকৃত হলো দুই গার্ডের। ধুপ করে পড়ল মেঝেতে। ইয়ার পিসে শুনল মাইকেল:

'আরও দু'জন গেল।'

রয়ে গেছে মাত্র একজন গার্ড। কিন্তু কোথায় সে?

মাত্র একটা জায়গায় থাকতে পারে। কন্ট্রোল রুম থেকে ছিটকে বেরোল মাইকেল, ফিরে চলেছে করিডোর ধরে। দেখছে এক এক করে আধ খোলা দরজা। তৃতীয় স্টলের দরজা বন্ধ।

ধুপ-ধুপ-ধুপ! আওয়াজ তুলল মাইকেলের সাইলেন্সারওয়ালা অস্ত্র। করিডোরে একটু জোরালো হলো গুলির আওয়াজ। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে স্টলের দরজা। ভেতর থেকে এল হাঁফিয়ে ওঠার মত আওয়াজ। এক সেকেণ্ড পর ঠাস করে কী যেন পড়ল মেঝেতে। পানির সঙ্গে মিশে গেল লাল রক্ত, ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমেই।

ছয় নম্বর গার্ড শেষ!

দ্রুত আবারও মূল জাদুঘরে এসে ঢুকল মাইকেল। বামে বাঁক নিয়ে এণ্ট্র্যান্স পেরিয়ে একের পর এক গ্যালেরি দেখতে দেখতে চলল শেষমাথা লক্ষ্য করে।

মাইকেলেঞ্জেলোর ডেভিড মূর্তিটা চাই দস্যু মাইকেলের।

পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা মূর্তি ওটা, মাস্টার পিস। পেডেস্টাল বাদ দিলেও দৈর্ঘ্যে ষোলো ফুটেরও বেশি। দিনে কাঁচের গম্বুজের মত ছাতের মাধ্যমে আসে রোদ, আলোকিত করে। মার্বেলের মূর্তি, গায়ের রং অফ-হোয়াইট। অর্ধবৃত্তাকার চেম্বারের সঙ্গে খুবই মানানসই। কিন্তু রাতে উদ্ভাসিত করা হয় পাশ থেকে আলো ফেলে। চারপাশে ছায়া, মাঝে জ্বলজ্বল করে অদ্ভুত সুন্দর, উলঙ্গ মূর্তি। তরুণ রাজার ঠোঁটে মৃদু টিটকারি, তৈরি গোলিয়াথকে যুদ্ধে আহ্বানের জন্যে।

নিজেকে ডেভিড বলে মনে হলো মাইকেলের। দুনিয়ার তাবৎ ল' এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি যেন গোলিয়াথ, আর তাদেরকে হারিয়ে দিচ্ছে সে হাসতে হাসতে।

এখনও জিতে যাসনি, মনে মনে নিজেকে বলল মাইকেল।

মাইকেলেঞ্জেলোর অন্যান্য মূর্তি পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে চলেছে ডেভিডের মূর্তির দিকে। এরই মধ্যে তরুণ রাজার পায়ের কাছে জড় হয়েছে ওর দলের তিনজন। পেছনে পায়ের আওয়াজ পেল মাইকেল। পৌঁছে গেছে জ্যাক রিচি আর জনসন।

গম্বুজের দিকে তাকাল মাইকেল। বাইরে কাজে ব্যস্ত দলের দু'জন। ঠিকঠাকভাবেই চলছে সব। আশা করা যায়, সময়ের আগেই জাদুঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে তারা।

মূর্তির সামনে পৌঁছে বলল মাইকেল, 'তোমরা জানো কী করতে হবে। এবার ইতিহাস তৈরি করব আমরা।'

'অথবা, ইতিহাস গায়েব করে দেব,' বলল রিচি।

হেসে ফেলল দলনেতা এবং সহদলনেতা।

কাজে নেমে পড়ল সবাই। তাদের একজন দৌড়ে গেল এক দিকের দেয়ালের কাছে। ওখানে কন্ট্রোল প্যানেল, ঢাকা পড়েছে ভারী স্টিলের কাভার-এ। মাঝ বরাবর ঝুলছে ভারী তালা। কিন্তু ক্রোবারের কয়েক গুঁতো পড়তেই চুরমার হলো ওটা। অন্যরা পৌঁছে গেছে মূর্তির কাছে। বেদির ওপর উঠল পিটার ও জনসন। ওদের মাথা উঠল মূর্তির ঊরুর মাঝ পর্যন্ত। কয়েল করে রাখা স্ট্র্যাপ খুলছে তারা। এসব হার্নেস তাদেরগুলোর চেয়ে অনেক চওড়া ও ভারী। সাবধানে বেঁধে নিচ্ছে মূর্তির পা।

কাজটা শেষ হতেই আরেক কয়েল স্ট্র্যাপ নিল পিটার, এক মাথার বাকল খুলে ওটা ফেলল মূর্তির কাঁধের ওপর দিয়ে ওদিকে। সরসর করে নেমে এল বাকল। মূর্তির দুই ঊরুর মাঝে স্ট্র্যাপ রেখে ওটা জনসনের হাতে দিল আরেক সদস্য।

বাকল আটকে শক্ত করে স্ট্র্যাপ আটকে নিল জনসন। মূর্তির অন্য কাঁধের ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপ ঘুরিয়ে এনে একই কাজ করা হলো।

এদিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে মূর্তির বুক বেঁধে ফেলেছে পিটার।

একজন এগিয়ে দেয়ায় অন্যান্য স্ট্র্যাপ বাঁধতে লাগল সে।

নিজ চোখে মাইকেল দেখছে, দ্রুত হাতে কাজ করছে দলের সবাই। মনে মনে হাসল সে, ওরা মূর্তি সরাবে জানলে কবরের ভেতর নড়েচড়ে উঠে বসে হায়-হায় করত মাইকেলেঞ্জেলো!

মাকড়সার জালের মত করে হার্নেস দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে মস্ত মূর্তি। এমনভাবে ওজন নেয়া হবে, যেন কোনও দিকেই বাড়তি চাপ থাকবে না।

ডেভিডের ওজন কমবেশি ছয় টন, আরও আছে পেডেস্টাল। কিন্তু ওটার জন্যে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাজ চলছে পরিকল্পনা মাফিক।

কন্ট্রোল প্যানেলের লোকটাকে ইশারা করল মাইকেল।

লোকটা টিপে দিল ঠিক বাটন।

মেঝের নিচে গুড়গুড় আওয়াজে চালু হলো হাইড্রলিক।

খুব ধীরে মেঝে ছেড়ে ওপরে উঠতে লাগল মূর্তি।

দর্শকের পায়ের কম্পন, শহরে চলাচলকারী গাড়ির তৈরি কম্পন, অন্যান্য সাধারণ কম্পন এবং ভূমিকম্প থেকে তরুণ রাজা ডেভিডকে রক্ষা করতে গিয়ে কিছু দিন আগে বিপুল টাকা খরচ করেছে গ্যালেরিয়া জাদুঘর। পেডেস্টালের নিচে এখন শক্তিশালী শক অ্যাব্সর্বার আছে, জরুরি কোনও কারণে মূর্তি সরাতে হলেও ওটা কাজে লাগবে। মেঝে থেকে সামান্য ওপরে উঠবে পেডেস্টাল, তখন সাবধানে বেসের নিচে বসিয়ে দেয়া যাবে ফোর্কলিফটের ব্লেড।

মাইকেলেঞ্জেলোর মূর্তি সরাতে আর কিছু দরকার ছিল না জর্জ মাইকেলের।

আরও বেশ কিছু স্ট্র্যাপ দিয়ে মূর্তি বেঁধে নিচ্ছে জ্যাক রিচি এবং দলের কয়েকজন। ব্যবহার করা হচ্ছে হেভি-ডিউটি ধাতব ডি রিং। কাজটা শেষ হলে পেডেস্টাল বেঁধে নিল তারা। একটু

পর হার্নেসের সঙ্গে আটকে নেবে নিজেদেরকেও।

আবারও মোবাইল ফোন বের করে আগের সেই প্রথম নম্বরে যোগাযোগ করল মাইকেল।

জবাব এল, কিন্তু কথা শোনা কঠিন হলো।

ভারী আওয়াজের কী যেন আসছে।

'দু' মিনিটের ভেতর পৌঁছে যাচ্ছি। কিন্তু এটিসি জানতে চাইছে, হঠাৎ কী কারণে কোর্স থেকে সরে গেছি।'

'অসুবিধে নেই,' বলল মাইকেল, 'আমাদের কাজও শেষ। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করো।' ফোন রেখে দিল সে। মুখ তুলে তাকাল গম্বুজের দিকে। ওখানে জোরে টোকা দিয়ে মনোযোগ কাড়তে চাইছে তার এক লোক। তাকে তাকাতে দেখে দু'হাত তুলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল সে।

ডেভিডের মূর্তি এক চক্কর ঘুরে দেখল জ্যাক রিচি। 'সবই ঠিক আছে। হার্নেস এখন ওজন নিলেই হয়।'

'ভেবো না, ছিঁড়বে না,' ভরসা দিল মাইকেল। এবার গলা উঁচু করে নির্দেশ দিল, 'সবাই পিছিয়ে যাও!'

গম্বুজের তলা থেকে সরে গেল সবাই। একই কাজ করেছে ছাতের লোকটাও। তার সঙ্গী কণ্ট্রোল বক্সের সুইচ টিপে দিল।

একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো গম্বুজের চারপাশে বসিয়ে দেয়া ছোট সব বোমা। মুহূর্তে কোটি টুকরো হলো কাঁচের প্যানেল। ঝরঝর করে নেমে এল জাদুঘরের মেঝেতে। সেগুলোর সঙ্গে নামছে ভারী স্টিলের ফ্রেমওঅর্ক। মার্বেলের মেঝেতে পড়ে বিকট আওয়াজ তুলল কাঁচ ও ভারী স্টিলের ফ্রেম। এক সেকেণ্ড পর জাদুঘরের অসংখ্য করিডোর থেকে এল প্রতিধ্বনি। একই সময়ে চালু হলো কান ফাটিয়ে দেয়া অ্যালার্মের সাইরেন। দালানের প্রায় প্রতিটি অ্যালার্ম চালু হয়েছে।

দেরি না করে জাদুঘর লক্ষ্য করে রওনা হবে পুলিশবাহিনী।

কিন্তু কয়েক ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়েছে তাদেরকে। পুবের জঙ্গলে চলছে দাবানল। এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্ফোরিত হয়েছে দুই গাড়িবোমা। কাজেই জাদুঘরের ডাকাতি ঠেকাতে গিয়ে লোকবলের সঙ্কটে পড়বে তারা।

তারা আসার আগেই দলবল নিয়ে উধাও হবে মাইকেল।

ছাতে যে দু'জন বোমা বসিয়ে দিয়েছে, তারা র‍্যাপেল করে নেমে এল মেঝেতে। ডেভিডের মূর্তির আশপাশের সব আবর্জনা সরিয়ে ফেলছে দলের অন্যরা। বেজে চলেছে অ্যালার্ম, কিন্তু সেসবের ওপর দিয়ে মাইকেল শুনল ভারী একটা আওয়াজ। ক্রমেই বাড়ছে সে শব্দ।

গম্বুজ নেই বলে ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া ঢুকছে গ্যালারিতে। কিন্তু হঠাৎ করেই ওই ফাঁকা জায়গা দিয়ে এল ঝোড়ো হাওয়া। মাথার ওপর হাজির হয়েছে প্রকাণ্ড এক হেলিকপ্টার। রোটরের ধাক্কা খেয়ে থরথর করে কাঁপছে বাতাস। ওই হেলিকপ্টার সিকোরস্কি এস-৬৪ স্কাইক্রেন— অত্যন্ত ভারী জিনিস সরাতে তুলনা নেই বলেই ওই নাম দেয়া হয়েছে ওটাকে।

যেমন এখন সরিয়ে নিতে হবে মাইকেলেঞ্জেলোর ডেভিড!

হেলিকপ্টার থেকে ফেলা হলো কয়েকটা কেইবল। প্রতিটির শেষমাথায় হুক। অনেক ওপর থেকে ঠং করে পড়ে ফাটল ধরিয়ে দিল মার্বেলের মেঝেতে। মাইকেল ও তার দলের সবাই একটা করে কেইবল কুড়িয়ে নিয়ে আটকে দিল মূর্তির হার্নেসে। বেস বা পেডেস্টালে ব্যবহার করা হলো ছয়টি কেইবলের ডি রিং। একই সময়ে পেডেস্টালে উঠল পিটার ও জনসন, মস্ত মূর্তির ওয়েবিঙের সঙ্গে আটকে নিল নিজেদের লাইন।

গর্তের মত ছাতের ফাঁকা অংশের নিচে গিয়ে ওপরে তাকাল মাইকেল। ইতালিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার এস-৬৪ হেলিকপ্টারের মতই গাঢ় সবুজ রং প্রকাণ্ড এই হেলিকপ্টারের।

হ্যাক করা হয়েছে রেডিয়ো ট্র্যান্সিভার, আইডেনটিফিকেশন নম্বরের কারণে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ধরে নেবে, ওটা সরকারী হেলিকপ্টার।

সত্যিকারের ইতালিয়ান এয়ারক্রাফটের ফিউজেলাজের নিচে থাকে দানবীয় পানির ট্যাঙ্ক। কিন্তু এটার রয়েছে শক্তিশালী উইঞ্চ লুকিয়ে রাখার জন্যে পাতলা অ্যালিউমিনিয়ামের নকল পেট।

মাইকেলের ইশারায় কাজ শুরু করল উইঞ্চ অপারেটর। টেনে তুলছে কেইবলগুলো।

মূর্তির দু'পাশে পেডেস্টালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল দু'জন দু'জন করে চারজন। টানটান হয়ে উঠতেই ওজন নিল কেইবল, দাঁত কিড়মিড় করার মত কড়-কড় আওয়াজ তুলল। খুব কাছ থেকে মূর্তিটা দেখল মাইকেল। মনে মনে প্রার্থনা করল, ওর হিসেবে যেন কোনও ভুল না থাকে। মূর্তিটা তুলে নেয়ার সময় ঠিকভাবে হার্নেস ওজন না নিলে মট্ করে ভাঙবে ডেভিডের দেহের যে-কোনও অংশ। সেক্ষেত্রে সর্বনাশ!

শক অ্যাবসর্বার থেকে পিছলে সরল পেডেস্টাল, ঘষার আওয়াজ তুলে পিছলে যাচ্ছে মেঝেতে। প্রতিটি লাইন টানটান হতেই সেগুলো ঠিক রাখল পাদানিতে অপেক্ষারত চারজন। নিজেরা বেরিয়ে যাওয়ার আগে ছাতের গর্তের মাঝে রাখতে হবে রাজার মূর্তি। ভাঙা গম্বুজের কিনারায় ঘষা লেগে ক্রিচক্রিচ আওয়াজ তুলছে কেইবল। ওপর থেকে বৃষ্টির মত ঝরঝর করে ঝরছে ভাঙা কাঁচ ও সিমেন্টের টুকরো।

ওপরে উঠছে স্কাইক্রেন, ওটার টান খেয়ে চরকির মত ঘুরতে লাগল মূর্তি। পেডেস্টালের এক অংশ গুঁতো দিল মেঝেতে। ঠং করে ভেঙে গেল মার্বেলের ভিত্তির ওই অংশ। রেগে গিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উইঞ্চ অপারেটরের দিকে তাকাল মাইকেল। সত্যিকারের মাইকেলেঞ্জেলো বুঝি এতটা খেপত না! আত্মা খাঁচা

ছাড়া হওয়ার অবস্থা হয়েছে এই যুগের মাইকেলের। মূর্তির ক্ষতি হলে কমিয়ে দেয়া হবে ওদের পারিশ্রমিক।

আরও সতর্ক হলো উইঞ্চ অপারেটর। আগের চেয়েও অনেক সাবধানে সরাতে লাগল মূর্তি। আরও দু'ফুট যাওয়ার পর ঠিক পযিশনে আসবে ডেভিড। পাশ থেকে ঠেলে ঠিক দিকে নিয়ে আসছে মাইকেলের দলের লোক। আর দেড় ফুট সরালেই...

কিন্তু মেঝের ভাঙা এক অংশে পড়েছে পেডেস্টালের সামনের দিক। প্রচণ্ড চাপে মিহি হয়ে গুঁড়ো হলো মেঝের কাঁচ। মাইকেল দেখল, আগে যেখানে গম্বুজ ছিল, সেই গর্তের মাঝে পৌঁছে গেছে ডেভিড। চিৎকার করে বলল সে, 'এবার তুলে নাও!'

ডি রিঙের সঙ্গে হার্নেস আটকে নিল সবাই। প্রত্যেকে নিরাপদে আছে দেখে নিয়ে উইঞ্চ অপারেটরকে ইশারা করল মাইকেল।

আরও তীক্ষ্ণ হলো হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন। উচ্চতা বাড়ছে যান্ত্রিক ঘাসফড়িঙের।

আরেকটা ঝাঁকি খেয়ে মেঝে ছাড়ল ডেভিডের প্রকাণ্ড মূর্তি। ওটার সঙ্গে উঠে চলেছে মাইকেল ও অন্যরা। মাথার ওপরের হেলিকপ্টারের রোটর তৈরি করেছে ভয়ঙ্কর ঝড়। কিন্তু চিন্তা নেই, মাইকেলের পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঘটছে সব। একবার মূর্তিটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলেই...

আরও উঠছে হেলিকপ্টার। উচ্চতার সঙ্গে বাড়ছে হাওয়ার বেগ, ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল দানবীয় মূর্তি। এমন হবে, আগেই ভেবেছে মাইকেল। চাইলেও ঠেকাতে পারবে না তারা। বড়জোর আশা করতে পারে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে না পরিস্থিতি।

মেঝে ছেড়ে ডেভিডের মূর্তি উঠেছে চার গজ ওপরে। উঠল পাঁচ গজ ওপরে। ঊর্ধ্বগতি বাড়ছে। ওদের নিচে চরকির মত ঘুরছে গ্যালেরিয়া। হঠাৎ করেই ছাত পেরিয়ে গেল তারা। বেরিয়ে

এসেছে বাইরের জগতে!

শহরের দিকে তাকাল মাইকেল। অলস ভঙ্গিতে উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে রওনা হলো স্কাইক্রেন। জাদুঘরের রাস্তায় জ্বলছে স্ট্রোব বাতি। পুলিশ! পৌঁছে গেছে! মৃদু হাসল মাইকেল। শালারা, দেরি করে ফেলেছিস!

যদিও বিশেষ একটি পুলিশের বাতির দিকে মনোযোগ গেল তার। ওটা চলেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। ওদিকের আকাশে জ্বলছে দপ-দপ করা কয়েকটা বাতি। ওটা কোনও হেলিকপ্টারের।

তাদের দিকেই আসছে!

এমন হবে, আগেই ভেবেছে মাইকেল।

গাড়িবোমা বিস্ফোরণের পর অপরাধীদেরকে ধরতে এরিয়াল সাপোর্ট চাইবে পুলিশ। কিন্তু স্কাইক্রেন ওটার কোর্স ছেড়ে গ্যালেরিয়া দেল'অ্যাকাদেমিয়ার দিকে যেতেই দুই-এ-দুই যোগ করে বুদ্ধিমান কেউ বুঝে গেছে, ওদিকে কেন চলেছে ওই হেলিকপ্টার। তার জানা হয়ে গেছে, কেন বিস্ফোরিত হয়েছে গাড়িবোমা আর কেন হঠাৎ জঙ্গলে দাবানল।

গতি বাড়ল স্কাইক্রেনের। অনেক নিচে পিছিয়ে পড়ছে রঙিন আলোর ঝলমলে ফ্লোরেন্স শহর। ভারী সিকোরস্কিকে ধরতে বেশিক্ষণ লাগবে না পুলিশের হেলিকপ্টারের। আর এ কথা ভেবেই প্ল্যান সফল করতে অন্য ব্যবস্থা নিয়েছে মাইকেল। কোথাও রাখা হবে না কোনও সাক্ষী!

ঝোড়ো হাওয়ার ভেতর চোখ সরু করে সামনে চেয়ে রইল মাইকেল। একটু পর শহরের উত্তর দিক পেছনে ফেলবে তারা। নিচে এখন ঝলমল করছে না বৈদ্যুতিক বাতি, টিমটিম করে জ্বলছে এখানে ওখানে। আরও সামনে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার— ঘন জঙ্গল ও মাঝে মাঝে ফাঁকা পড়ে থাকা মাঠ উঠে গেছে পাহাড়ি এলাকায়। বলতে গেলে কোথাও কোনও রাস্তা

নেই। গাড়ি নিয়ে ধাওয়া করতে পারবে না কেউ অবশ্য, অনুসরণ করতে পারবে যে-কোনও এয়ারক্রাফট।

এ কারণেই ব্যবস্থা নিয়েছে মাইকেল। তার দলের এক লোক বসে আছে শহরের শেষ দিকে ছোট এক বাড়ির ছাতে। তার ঠিক ওপরের আকাশ দিয়ে ছুটে যাবে স্কাইক্রেন।

ভারী কার্গো বহন করে শহর পেরিয়ে গেল সিকোরস্কি। দ্রুত ছুটে আসছে পুলিশ হেলিকপ্টার। পেছন থেকে স্কাইক্রেনের ওপর ফেলা হলো নীল-সাদা আলো। পরিষ্কার দেখা গেল গাঢ় সবুজ ফিউজেলাজের নিচে ঝুলন্ত সাদা মূর্তি।

অনেক বেশি উৎসাহ নিয়ে ছুটে এল পুলিশের হেলিকপ্টার...

কিন্তু তখনই হঠাৎ করে নিচ থেকে লাল একটা রেখার মত কী যেন ছিটকে লাগল ওটার পেটে। আগুনের ফুটবল তৈরি হলো আকাশে। শহর পেছনে ফেলে ঘুরতে ঘুরতে দূরের জঙ্গলে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো জ্বলন্ত হেলিকপ্টার।

মাইকেলের লোকের কাছে ছিল রাশান এসএ-১৮ অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল। লঞ্চার কাঁধে তুলে ট্রিগার টিপে দিয়েছে হেলিকপ্টারের একযস্ট লক্ষ্য করে। গন্তব্যে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়েছে দুই পাউণ্ডেরও বেশি হাই-এক্সপ্লোসিভ।

মৃদু হাসল মাইকেল। এবার তাদের হেলিকপ্টারকে ধরতে বা আকাশ থেকে ফেলতে ডাকা হবে ইতালিয়ান এয়ার ফোর্সকে। এসবই হবে, জানে সে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর স্কাইক্রেন ছেড়ে অনেক দূরে সরে যাবে তারা।

পেছনে পড়ছে কালো আঁধার জঙ্গল। গতি কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নামছে সিকোরস্কি। গন্তব্যের খুব কাছে পৌঁছে গেছে তারা। নিচের ওই পাহাড়ি রাস্তা বড় নির্জন। গাছগুলোর ডালপালার মাঝ দিয়ে এল ঝিলিক দেয়া লাল আলো। মাইকেলের দলের শেষজন ওখানে অপেক্ষা করছে ট্রাক নিয়ে।

গাছের মগডালের পঞ্চাশ ফুট ওপরে হেলিকপ্টার থামতেই চারপাশে বয়ে গেল তুমুল ঝোড়ো হাওয়া। পেণ্ডুলামের মত দুলছে কিংবদন্তীর রাজা। কিছুক্ষণ সময় দেয়ায় কমল ওটার ঘূর্ণন। মূর্তির ঠিক নিচে রাখা হয়েছে ট্রাকের ট্রেইলার। ভেতরে রয়েছে বারো মিটারের এক কন্টেইনার। ছাত নেই ওটার। ট্রাকের মেঝের সঙ্গে সঠিক জায়গায় ওয়েল্ডিং করা হয়েছে ধাতব ফ্রেম। কন্টেইনারের মেঝে এবং দু'পাশের দেয়ালে ফোমের পুরু প্যাডিং। ট্রেইলারের পাশে রাস্তায় রাখা হয়েছে তারপুলিন দিয়ে ঢাকা বড়সড় কী যেন।

'ঠিক আছে, নামাও!' মাইকে চিৎকার করল মাইকেল। হার্নেস থেকে ক্লিপ খুলে সড়াৎ করে রওনা হয়ে গেল নিচে। দেরি না করে র‍্যাপেল করে ট্রাকের পিঠে নামল সে। অন্যরাও অনুসরণ করেছে। সবার বুট মেঝে স্পর্শ করতেই যার যার লাইন খুলে নিল তারা। দু' ভাগে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করছে। এবার উইঞ্চের মাধ্যমে নামিয়ে দেয়া হবে মূর্তি। কন্টেইনারের পাশে রাখা লণ্ঠন জ্বেলে দিল মাইকেল। এবার পরিষ্কার দেখতে পাবে উইঞ্চম্যান।

কন্টেইনার থেকে প্রায় তিন গজ ওপরে ঝুলছে মূর্তির ভিত্তি। ওটা নামাতে ইশারা করল মাইকেল। তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়ল উইঞ্চ, থরথর করে কেইবল কাঁপিয়ে নামাতে লাগল মূর্তিটাকে। ট্রাকের পিঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। নামতে শুরু করে লোহার কন্টেইনারের কোনা লেগে ভেঙে গেল পেডেস্টালের ছোট এক অংশ। ওজনের কারণে মুচড়ে গেছে কন্টেইনারের স্টিলের কোনা। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল সবার। পরের সেকেণ্ডে পিছলে কন্টেইনারে নেমে এল পেডেস্টাল।

দলে আটজন তারা, শক্ত করে ধরল মস্তবড় মূর্তির ভিত্তি। ভারী ওজন নিতে গিয়ে বেঁকে যেতে চাইল কোমর। মূর্তিটা নেমে আসছে, আর নির্দিষ্ট দিকে ওটাকে সরিয়ে নিচ্ছে তারা। গতি

কমাতে উইঞ্চম্যানকে ইশারা করল মাইকেল। তারা ঠেলে নিচ্ছে মূর্তিটাকে একদিকে। কিন্তু ওটা এমন এক অ্যাংগেলে রয়ে গেছে, এখন নেমে এলে সর্বনাশ হবে। উইঞ্চম্যান ধীরে ধীরে আরও দু'ফুট নামাল মূর্তি। ঠেলে সঠিক জায়গায় ওটাকে সরিয়ে নিতে চাইল সবাই।

কণ্টেইনারের ওপর অংশে, মাঝে রয়েছে ঝালাই করা লোহার একটা পুরু পাত, ওটার সামনেই দাঁড় করানো হবে মূর্তি। হাতের ইশারা করছে মাইকেল। আবারও কাজে নামল উইঞ্চম্যান। কয়েক সেকেণ্ড পর ধুম্ আওয়াজ তুলে নামল রাজকীয় মূর্তি। ওই ওজনে থরথর করে কাঁপল কণ্টেইনার।

কিন্তু কাজ শেষ হয়নি স্কাইক্রেনের। ট্রাকের কণ্টেইনারের উচ্চতা বড়জোর নয় ফুট। দাঁড় করিয়ে রাখলে পরিষ্কার দেখা যাবে মূর্তিটাকে। কাজেই ফ্রেমওঅর্কের দু'পাশে পৌঁছল দলের কয়েকজন। এবার খুব ধীর গতি তুলে সামনে বাড়ল সিকোরস্কি। আবারও টানটান হলো সব কেইবল। এয়ারক্রাফট টেনে নিয়ে চলেছে ডেভিডকে। কিন্তু কণ্টেইনারের ওপরে মাঝের লোহার পাত ঠেকিয়ে দিল রাজার এগোবার পথ।

ফুটবল খেলোয়াড়রা যেভাবে স্লাইডিং ট্যাকল করে, সেভাবে পিছলে পড়তে লাগল ডেভিড।

অবশ্য এই পতন অত্যন্ত ধীর গতির। ওজন নিচ্ছে নির্দিষ্ট কেইবল ও হার্নেস, তিল তিল করে ফ্রেমের দিকে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে মূর্তি। ফ্রেমের প্রতিটি প্রয়োজনীয় অংশে রয়েছে পুরু প্যাড। আস্তে করে শুইয়ে দেয়া হচ্ছে তরুণ ডেভিডকে। দম আটকে ভাবল মাইকেল, সরাসরি চেয়ে টিটকারির হাসি হাসছে রাজা। যখন-তখন হেসে বলবে: দূর, ব্যাটা, অঙ্কে ভুল আছে তোর!

কিন্তু না, ভুল করেনি মাইকেল। আস্তে করে আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে পড়ল রাজা। চাপ খেয়ে চেপ্টে গেল ফোম। ওজন

রাখতে গিয়ে ভাঙল না ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তোলা স্টিলের ফ্রেম।

'বেঁধে নাও!' নির্দেশ দিল মাইকেল।

ভাল করে মূর্তিটাকে বাঁধল তিনজন মিলে।

কন্টেইনারের পেছনের খোলা দরজার কাছে চলে গেল মাইকেল। লাফিয়ে নেমে পড়ল ট্রাক ছেড়ে। সামান্য ওপরে উঠল স্কাইক্রেন, সরে গেল একপাশে। ওটার সব হুক ঠোক্কর খেল করাগেটেড ধাতুর সঙ্গে। কন্টেইনারে রয়ে যাওয়া সব দড়ি ও হুক ট্রাক থেকে ফেলে দিল অন্যরা।

রাস্তার ওপর রাখা হয়েছে নীল তারপুলিন দিয়ে ঢাকা ভারী কিছু। সরিয়ে ফেলা হলো তারপুলিন। ওটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ডেভিডের মূর্তি।

তারপুলিন সরে যেতেই হেসে ফেলেছে মাইকেল। ভাগ্যিস বুদ্ধিটা এসেছিল!

ট্রাকের পাশেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ডেভিডের মূর্তির জঘন্য এক নকল। ওটা মূল মূর্তির দশভাগের নয়ভাগ আকারের। জায়গায় জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে ফাইবার গ্লাস। এ ছাড়া, কাজে এসেছে সরু তার, কার্ডবোর্ড ও প্রচুর আঠা। সামনে থেকে দেখলে যে-কেউ বলবে, ডেভিডের মূর্তি নিয়ে ঠাট্টা করেছে কেউ। কিন্তু খুব কাছাকাছি না হয়ে ওটাকে চিনবে না কেউ। এয়ার ফোর্সের পাইলটদেরকে বলা হবে, সবুজ একটা হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে দেশের অমূল্য সম্পদ।

নকল ডেভিডের চারপাশের হার্নেসে হুক আটকে দিল ট্রাক ড্রাইভার ও মাইকেল মিলে। ওপরের দিকে হাত তুলে ইশারা করতেই পাল্টে গেল হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন। নকল মূর্তি নিয়ে উঠতে লাগল যান্ত্রিক ঘাসফড়িং। ঘুরে গিয়ে নতুন কার্গো সহ সরে গেল ট্রাকের কাছ থেকে।

কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল হেলিকপ্টার। ওটাই ছিল

মাইকেলের পরিকল্পনার শেষ অংশ। ব্যবহার করেছে ডিকয়। দশ হাজার ফুট ওপরে সিকোরস্কি হেলিকপ্টারকে নেয়ার পর রওনা হবে উত্তর-পুব দিকে। এমনভাবে লক করবে কণ্ট্রোল, যাতে খুব ধীরে নিচে নামে হেলিকপ্টার। প্যারাশুট ব্যবহার করবে উইঞ্চম্যান ও পাইলট। পরে এয়ার ফোর্সের বিমান বা হেলিকপ্টার পরিত্যক্ত সিকোরস্কির কাছে গেলেও কিছুই করতে পারবে না— নইলে সর্বনাশ হবে ডেভিডের মূর্তির! উপায় কী, বাধ্য হয়ে পিছু নেবে তারা হেলিকপ্টারের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্রিশ মাইল দূরের পাহাড়ে আছড়ে পড়বে ওটা। ততক্ষণে সত্যিকারের মূর্তি নিরাপদে পৌঁছবে নতুন মালিকের কাছে।

খুশিতে হো-হো করে হেসে ফেলল মাইকেল। ওদের কাজ শেষ! সত্যি, একসময় ইতিহাসের সেরা লুটেরা হিসেবে লোকে বলবে তার নাম! বাকি রয়ে গেছে মাত্র আরেকটা কাজ, তারপর এই দলের প্রত্যেকে পাবে দশ মিলিয়ন ডলার করে।

আর তার জন্যে?

পুরো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার!

শেষ ডাকাতি স্যান ফ্রান্সিসকোতে। আজ যা করল ওরা, সেই তুলনায় ওই কাজটা হবে পানির মত সহজ।

ট্রেইলারের ওপরে তারপুলিন বেঁধে নেয়ার পর বন্ধ করে দেয়া হলো ট্রাকের পেছনের দরজা। হাসতে হাসতে ক্যাবে উঠল মাইকেল। তার ইশারায় আঁধার জঙ্গুলে পথে চলল ড্রাইভার।

দুই

স্যান ফ্রান্সিসকোর সিভিক সেন্টার ডিসট্রিক্ট-এ মস্ত এলাকা নিয়ে কাঁচ-মোড়া দ্য গ্রেট বক্সার আলি এক্সিবিশন হল— জ্বলজ্বলে আলোয় মনে হবে, এইমাত্র আকাশ থেকে নেমে এসেছে প্রকাণ্ড কোনও ইউএফও। আপাতত বিশাল এলাকা ডুবে গেছে ধূসর কুয়াশায়। বরাবরের মতই যখন-তখন বদলে যায় সাগরতীরের এ শহরের আবহাওয়া— এ মুহূর্তে হয়তো নীল আকাশ, বিশ মিনিট পর সব ঢেকে দেবে কুয়াশার ভারী চাদর।

আজ দ্য গ্রেট বক্সার আলি এক্সিবিশন হল-এ আটলান্টিস থেকে সংগৃহীত আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে শুরু হচ্ছে প্রদর্শনী। যার কারণে এটা সম্ভব হলো, তাকে ভোলেনি আর্কিওলজিস্ট ডক্টর লাবনী আলম।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ, কঠোর-কোমল হৃদয়ের বেপরোয়া এজেন্ট মাসুদ রানা। দেশের বিরুদ্ধে কোথাও ষড়যন্ত্র হলে ওর কাজ তা নস্যাৎ করে দেয়া। প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর মুখে। কাছে টানে অমোঘ আকর্ষণে, অথচ অদ্ভুত, একাকী ওর জীবন। চিরকালের জন্যে ওই মানুষটার কাছে কৃতজ্ঞ লাবনী। তাই প্রতিমাসে অন্তত একবার হলেও রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখায় ফোন করে।

বেশিরভাগ সময় শাখা প্রধান জানিয়ে দেয়, আপাতত মাসুদ ভাই এ দেশে আসছেন না।

কিন্তু তিন সপ্তাহ আগে নিউ ইয়র্কের রানা এজেন্সিতে ফোন করতেই ওখান থেকে বলা হলো, দু'সপ্তাহ পর ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছেন ওদের বস। ওই অঙ্গরাজ্যের প্রতিটি রানা এজেন্সির শাখা ঘুরে দেখবেন।

মন নেচে উঠেছিল লাবনীর। ওকেও তো জরুরি কাজে যেতে হবে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ফ্রান্সিসকো শহরে! তখন হয়তো দেখা হবে রানার সঙ্গে!

এরপর গত দু'দিন আগে এ শহরে আসার পর দেরি না করে যোগাযোগ করেছে রানার মোবাইল ফোনে।

কথা হয়েছে সংক্ষেপে।

রানা জানিয়ে দিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের শাখা দেখা শেষ হলে আগামী কালকেই পৌঁছবে স্যান ফ্রান্সিসকোয়।

আর গতকাল বিকেলে ফোন করে রানা এজেন্সির শাখা অফিসে লাবনী হাজির হতেই, সত্যিই দেখা পেয়ে গেল মাসুদ রানার। কুচকুচে কালো দুই মণিতে চোখ রেখে মনে হলো, চিরকালের জন্যে মানুষটাকে কাছে পেলে সার্থক হতো জীবন।

রানা এজেন্সি থেকে বেরিয়ে লাবনীকে ছোট্ট এক পুরনো রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়েছিল রানা, ওখানেই ডিনার করে ওরা। নানান কথার পর লাবনী বলেছিল, আগামীকাল ওর প্রদর্শনী দেখতে আসছেন প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট লেডি, স্যান ফ্রান্সিসকোর মেয়র ও নামকরা অনেকে। রানা এলে খুবই খুশি হবে। দিয়েছিল নিজের সই করা আমন্ত্রণ-পত্র।

আজ সন্ধ্যায় পুরু কুয়াশা ভেদ করে এক্সিবিশন হলের সামনে পৌঁছে লাবনীকে হতাশ করেনি রানা। কিন্তু তখনই বেধে গেল গোলমাল।

বিশ্রী পরিস্থিতির ভেতর পড়ে বোকা বনে গিয়েছিল লাবনী, দাঁড়িয়ে ছিল হলের গেটের কাছেই।

গাড়িপথে স্টিলের বার রেখে পথরুদ্ধ করেছে সিকিউরিটির একদল লোক। তাদের সামনে থামল লাল এক টয়োটা প্রিমিয়ো। ওটা চেনে লাবনী, কিন্তু রানার গাড়িকে ঢুকতেই দিল না সিক্রেট সার্ভিসের লোক। ধমকের সুরে বলা হলো, 'পৌঁছুতে দেরি করেছেন। এখন কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। গাড়ি সরিয়ে নিন! এখন যে-কোনও সময়ে আসবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট!'

রানা বোঝাতে চাইল, ওর কাছে আমন্ত্রণ-পত্র আছে, কিন্তু শুনল না কেউ। মারমুখী চেহারা করে রানাকে গাড়ি থেকে নামতে ইশারা করল কয়েকজন এজেন্ট।

মেইন গেট ছেড়ে ওদিকে পা বাড়াল লাবনী, কিন্তু তখনই এল ভারী কয়েকটা মোটরসাইকেল, পেছনে প্রেসিডেন্টের কালো লিমাযিন এবং শেষে আরও কয়েকটা মোটরসাইকেল। ওগুলোর লেজ ধরে এল একের পর এক সরকারী গাড়ি।

ততক্ষণে গাড়ির সিট থেকে টেনেহিঁচড়ে বাঙালি যুবককে নামিয়ে ফেলেছে সিক্রেট সার্ভিসের কয়েকজন। এবার বুঝি শুরু হবে বেধড়ক মারপিট!

পুরুষ সিংহের মত রুখে ওঠা রানাকে উজ্জ্বল আলোয় দেখল লাবনী। দেখেছেন আরও একজন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। লিমাযিন থেকে নেমে দৃঢ় পায়ে হেঁটে গিয়ে থামলেন রানার সামনে। ধমকে উঠলেন, 'অ্যাই, ওঁকে বিরক্ত করছ কেন!'

থতমত খেয়ে সরে গেল কয়েকজন এজেন্ট। মুখ হাঁ হয়ে গেল পরের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে। রানাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন প্রেসিডেন্ট। 'মিস্টার রানা!' দরাজ গলায় বললেন তিনি, 'অনেক দিন পর দেখা! বলুন তো, এখানে কী হয়েছে?'

'তেমন কিছুই না, আপনার সিক্রেট সার্ভিসের ছেলেরা বলছে, ঢুকতে দেবে না এক্সিবিশন হলে,' বলল রানা।

'স্ট্রেঞ্জ!' চোর-চোর চেহারা করা এজেন্টদের দিকে তাকালেন

প্রেসিডেন্ট। 'তোমরা চেনো না এঁকে। বেশ ক'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন এই দুঃসাহসী মানুষটা!' আবারও ফিরলেন রানার দিকে। 'ওদের কারণে আমি লজ্জিত, সরি, মিস্টার রানা! চলুন, এবার দেখি কে বাধা দেয় আপনাকে!'

ততক্ষণে স্বামীর পাশে পৌঁছে গেছেন ফার্স্ট লেডি। চট্ করে হ্যাণ্ডশেক করলেন রানার সঙ্গে, ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

এদিকে পথ খুলে দিতে লোহার পুরু ডাণ্ডা ঝট্ করে তুলে দিয়েছে গার্ডরা।

অবাক হয়ে সব দেখল লাবনী। ফিরল হল-এর গেটে।

এতক্ষণ চুপচাপ নাটক দেখছিলেন স্যান ফ্রান্সিসকোর নতুন মেয়র। বুঝে গেছেন, একটু আগে আসা ওই যুবক প্রেসিডেন্টের খুবই প্রিয় কেউ। প্রায় নাচতে নাচতে প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে স্বাগত জানালেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে করমর্দনের পর রানার হাত চেপে ধরে গলে যাওয়া সুরে বললেন, 'আসুন! ওয়েলকাম! ওয়েলকাম টু আওয়ার গ্রেট সিটি!'

এক ভ্যালে সরিয়ে নিয়ে গেল রানার গাড়ি।

হল-এ সবাই পা রাখতেই প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডির সঙ্গে লাবনীর পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়র।

এবার রানাকে দেখিয়ে লাবনীকে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'ডক্টর আলম, পরিচয় করিয়ে দিই, দিস ইয মাই গ্রেট কারেজিয়াস, এভারগ্রিন হিরো, মিস্টার মাসুদ রানা, ফ্রম দ্য কাণ্ট্রি অভ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। ইনি...'

আরও গোটা দশেক বিশেষণ না দিয়ে থামতেন না, কিন্তু লাজুক হাসল লাবনী। 'ওঁকে চিনি, আটলাণ্টিস আবিষ্কার করার সময় ওঁর সহায়তা না পেলে কিছুই সম্ভব ছিল না।'

'তাই?' অবাক হলেন প্রেসিডেন্ট। মুচকি হেসে বললেন, 'ভাবতাম শুধু আমার মত কুৎসিত পুরুষগুলোকেই সাহায্য করেন

তিনি! এখন দেখছি, অপূর্ব সুন্দরী... মানে, সুরুচিও আছে মিস্টার রানার!'

লজ্জায় লাল হলো লাবনীর গাল। মনে মনে বলল, কই, সে তো তেমন চোখে দেখে না আমাকে?

মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেলেন সবাই।

ওর দলের সবার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট লেডি ও রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল লাবনী। ভাবছে, আহা, আজ যদি কুয়াশার কারণে এয়ারপোর্টে না নামত এয়ার ফোর্স ওয়ান? বা যদি না-ই আসত! অথবা স্কেজুয়াল পাল্টে যেত প্রেসিডেন্টের? আজকের অনুষ্ঠান চট্ করে শেষ হলে রানার সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাতে পারত ও!

এদিকে রানা ভাবছে, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেয়া হচ্ছে এক্সিবিশন, আটলান্টিস থেকে পাওয়া সব নিদর্শন আগামীকাল থেকে দেখবে সাধারণ দর্শক। কিন্তু এসবের তেমন কোনও মূল্য নেই প্রেসিডেন্টের কাছে। অনেক কাজ পড়ে আছে তাঁর। কয়েক দিন পর ভারতে অনুষ্ঠিত হবে জি-২০ সামিট, সেজন্যে চাই প্রস্তুতি। মঞ্চের কাছে পৌঁছেই জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যয় করতে পারবেন বড়জোর আধঘণ্টা, তারপর যেতে হবে রাজনৈতিক এক ডিনারে। তাঁর সঙ্গে এসেছে একদল রাজনৈতিক পা-চাটা, অন্তত বিশজন অনুগত সাংবাদিক ও শতখানেক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। শেষের দলের কাজ মস্তবড় ঘরটা প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডির জন্যে নিরাপদ রাখা।

তাদের তৎপরতা লক্ষ্য করে হঠাৎই ভাবল রানা: আমেরিকার সাধারণ মানুষ বিনা দোষে যখন-তখন গুলিতে খুন হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই এদের, পাকিস্তানের মত জঙ্গি ও সন্ত্রাসী দেশকে কোলে বসিয়ে চুমু দিচ্ছে সকাল-বিকেল; অথচ জন্মলগ্ন থেকেই সাধ্যমত বাধা দিয়ে চলেছে বাংলাদেশের উন্নয়নে।

সেলুকাস, সত্যিই, বড় অদ্ভুত এই দেশ!

মনের কথা মনেই রাখল রানা।

মঞ্চে উঠে মাত্র পাঁচ মিনিটে নিজ বক্তব্য শেষ করল লাবনী। ও মঞ্চ থেকে নেমে যেতেই উঠলেন মেয়র। তাঁর পেটে অনেক কথা, কিন্তু দশ মিনিট সহ্য করবার পর সরকারী এক বেরসিক আমলা কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করলেন, আপনার বাকোয়াজ শেষ করুন, মিস্টার মেয়র, প্রেসিডেন্ট বলবেন এবার!

এরপর আর উপায় থাকল না মেয়রের।

প্রেসিডেন্ট নিজেও সংক্ষেপে সারলেন: এখানে আসতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত, লাবনীর সাফল্যে গর্বিত ইত্যাদি।

প্রথা অনুযায়ী তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে কাঁচ ঢাকা নিদর্শনগুলো দেখতে আমন্ত্রণ জানাল লাবনী। ওর পাশেই থাকল রানা।

প্রথম কেসের সামনে প্রেসিডেন্ট থেমে যেতে বলল লাবনী, 'এখানে আপনারা দেখছেন টেম্পল অভ পসেইডন থেকে সংগ্রহ করা আর্টিফ্যাক্ট— ওটা সোনালি ত্রিশূল।'

প্রশংসা নিয়ে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'সোনার অস্ত্র। বুঝতে পারছি, সে আমলেও আটলান্টিয়ান ডিফেন্স ঠিকাদাররা আমাদেরগুলোর মতই বাড়তি টাকা আদায় করত!'

তাঁর দলের লোক হো-হো করে হেসে উৎসাহিত করল।

'এটা কিন্তু সত্যিই সোনার নয়,' বলল লাবনী। 'অস্ত্রের মতই ব্যবহার করা যাবে। ভেতরের অংশ খুব শক্ত লোহার তৈরি। যদিও ব্যবহার করা হতো আনুষ্ঠানিকতার জন্যে।'

'বুঝলাম,' বললেন প্রেসিডেন্ট। পাশের কেসের সামনে থেমে বললেন, 'আর এটা?' কেসের ভেতর বড় একটা বই। দৈর্ঘ্যে আঠারো ইঞ্চি, চওড়ায় প্রায় এক ফুট। খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে। পাতা কাগজের নয়, সোনার মত লালচে কোনও ধাতুর। ঘন করে লেখা হয়েছে কিছু প্রাচীন আটলান্টিয়ান ভাষায়।

'আমরা ওটার নাম দিয়েছি স্টাডা কোডেক্স,' বলল লাবনী। 'আইএইচএ, অর্থাৎ, ইউএন গঠিত আর্কিওলজিকাল সংস্থার আটলান্টিস থেকে পাওয়া সেরা সম্পদ ওটা। কোটি কোটি ডলার দিয়েও কেনা যাবে না, তৈরি অরিচালকাম দিয়ে। সোনার অ্যালয়। অবশ্য, আসল মূল্য অন্য জায়গায়। ওটার ভেতর রয়েছে হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাস।'

'স্টাডা ছিলেন আটলান্টিসের বড় এক অভিযাত্রী,' লাবনীর পেছন থেকে বললেন বিখ্যাত আর্কিওলজিস্ট জন কিগান। বাবা-মা মারা যাওয়ায় লাবনী ঠিক করেছিল, আর লেখাপড়া করবে না। তখন বড় ভাইয়ের মত ওকে আগলে রেখেছিলেন এই ভদ্রলোক। তাঁর সহায়তা পেয়েই শেষপর্যন্ত মাস্টার্স কমপ্লিট করে লাবনী। পরে পিএইচডি। কিন্তু ততদিনে ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছেন কিগান। একা মানুষ, আত্মীয়-স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। নিজের মতই একাকী মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেন। বিয়ের কথা তুললে মানা করে দেয় লাবনী। বলেছিল, আপনাকে নিজের বড় ভাইয়ের মত দেখি, এর বাইরে আর কিছু কখনও ভাবিনি। এক বছর আগে আটলান্টিস আবিষ্কারের পর কিগানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল লাবনী, ইউএন-এর আর্কিওলজিকাল সংস্থা আইএইচএ-তে ওর সঙ্গে কাজ করতে অনুরোধ জানায়। দেরি না করে রাজি হন কিগান। লাবনী বিয়ে করতে চায়নি, কিন্তু সেজন্যে কোনও ক্ষোভ নেই তাঁর। প্রেসিডেন্ট আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছেন দেখে বললেন, 'একটি অভিযাত্রায় স্টাডা যান দক্ষিণ আমেরিকা, আরেক যাত্রায় আফ্রিকা ঘুরে অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলায়। আমরা জানি, পৌঁছান ভারতীয় উপমহাদেশে। এই কোডেক্স আসলে তাঁর রোজনামচা। বর্ণনা করেছেন কোথায় গেছেন এবং কেমন ছিল সেসব এলাকার মানুষ।'

'আমাদের রিসার্চাররা পুরো বই অনুবাদের কাজ করছেন,'

বলল লাবনী।

'গুড!' ওই কেস ঘিরে পুরো এক চক্কর কাটলেন প্রেসিডেন্ট। খেয়াল করলেন ধাতব প্রচ্ছদ। মাঝখানে ডেবে গেছে বৃত্তের মত ছয় ইঞ্চি জায়গা। 'সন্দেহ নেই, খুবই দামি জিনিস।'

মাথা দোলাল লাবনী। 'এই প্রদর্শনীর সেরা জিনিস এটাই।'

'দেখতে খুব সুন্দর,' বললেন ফার্স্ট লেডি, 'দাম কীরকম হতে পারে?'

'আন্দাজ করা কঠিন,' বলল লাবনী। বুলেটপ্রুফ কাঁচের ভেতর দিয়ে কোডেক্সের দিকে চেয়ে আছে সবাই।

ক'সেকেণ্ড পর পরের কেসের সামনে থামলেন প্রেসিডেন্ট। এবারের কেসের ভেতর কারুকাজ করা মুকুট। ওটা তৈরি সোনা ও অরিচালকামে। জায়গায় জায়গায় রূপা দিয়ে নকশা করা। জায়গায় জায়গায় আলো লেগে ঝিকমিক করছে দামি সব পাথর। 'শুধু ধাতু আর পাথরের জন্যে এই মুকুট সহজেই বিক্রি হবে তিন মিলিয়ন ডলারে,' বলল লাবনী, 'কিন্তু হারিয়ে যাওয়া এক রাজ্যের প্রাচীন সম্রাটের ব্যবহৃত আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে এর মূল্য হাজার হাজার কোটি ডলার।'

'আশা করি আপনাদের সিকিউরিটি গার্ডরা কাজে দক্ষ,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'সত্যি, অবিশ্বাস্য প্রদর্শনী। ভাল লাগছে যে আমেরিকান সরকার এইচআইএ-র জন্যে যে টাকা বিনিয়োগ করেছে, সেটা পানিতে যায়নি। কাজ করছে একদল উপযুক্ত স্কলার।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'মিস্টার রানা, এবার আমাদের পার্টির ডিনারে যেতে হবে, ওখানে প্রতি প্লেটের জন্যে খরচ করেছে ওরা এক হাজার ডলার। প্লিয, চলুন আমার সঙ্গে। আশা করি খারাপ লাগবে না আপনার।'

মৃদু হাসল রানা। 'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু দশজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি বরং এক শ' ডলারের ডিনার সেরে

নেব।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। স্ত্রীর বাহুতে হাত রেখে বললেন, 'ঠিক আছে, মিস্টার রানা, আমরা তা হলে রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

'গুড নাইট, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা।

প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডি দরজার দিকে পা বাড়াতেই চার পাশ থেকে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল সিক্রেট সার্ভিসের লোক। দরজার কাছ থেকে কে যেন ঘোষণা দিল: 'এবার বিদায় নিচ্ছেন মিস্টার প্রেসিডেন্ট!'

সিক্রেট সার্ভিসের লোকদের পিছু নিল সরকারী দলের লোক, সাংবাদিক ও অন্যান্যরা। কমে গেল ভিড়। দুই মিনিট পেরোবার আগেই সাইরেন বাজিয়ে রওনা দিল প্রেসিডেন্টের শোভাযাত্রা।

অবশ্য, মেয়রের দলবল রয়ে গেছে প্রদর্শনী কক্ষে।

লাবনীর পাশে এসে থামলেন মেয়র। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, হঠাৎ করেই রাজনৈতিক মঞ্চে উদয় হলেও এখনও কেউ কাদা ছুঁড়তে পারেনি তাঁর দিকে।

'ডক্টর আলম,' বললেন মেয়র কালাহান, 'চমৎকারভাবে সব গুছিয়ে নিয়েছেন। আমার ধারণা, আগামীকাল সাধারণের জন্যে প্রদর্শনী খুলে দিলে অঢেল প্রশংসা পাবেন। কিন্তু খারাপ লাগছে, মাত্র কয়েক দিনের জন্যে স্যান ফ্রান্সিসকোতে এল এই দুর্লভ এক্সিবিশন।'

'আরও পনেরোটা শহরে প্রদর্শনী হবে, উপায় ছিল না আপনাদের জন্যে সময় বাড়িয়ে দেয়ার,' বললেন আর্কিওলজিস্ট কিগান। 'আশা করি আর্টিফ্যাক্টগুলো আপনাদের ভাল লাগবে।'

'তা তো বটেই,' বললেন মেয়র, 'যাক, ঘুরে দেখেছেন আমাদের শহর? দেখার মত অনেক কিছুই আছে এখানে।'

মাথা দোলালেন কিগান।

লাবনী বলল, 'সময় পাইনি।'

চুপ করে থাকল রানা। এই শহর চষে খেয়েছে ও।

'আপনাদের আপত্তি না থাকলে বিশেষ ক'জন অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই,' বললেন মেয়র।

লাবনী মৃদু হেসে বলল, 'আপত্তি থাকবে কেন?'

'প্লিয, সবাই দয়া করে মনোযোগ দিন,' হাতের ইশারা করলেন মেয়র। লাবনী ও কিগানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান একদল ভিআইপির। তাঁদের ভেতর আছেন সিলিকন ভ্যালির মস্তসব জিনিয়াস। এঁরাই তৈরি করেন দুর্দান্ত সব কমপিউটার সফটওয়্যার প্রোগ্রাম। টাকার অভাব নেই কারও। এ ছাড়া, রয়েছেন ভিন দেশের কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী। তাঁদেরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, যেন ক্যালিফোর্নিয়ায়, বিশেষ করে স্যান ফ্রান্সিসকো শহরে গড়ে তোলেন নতুন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে লাবনী, কিগান ও রানার পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর এক দম্পতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন মেয়র। গলায় প্রশংসা নিয়ে বললেন, 'লেডিয অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, আমাদের বিশেষ সম্মানিত অতিথি এঁরা— অনুপম মঙ্গেলকার ও তাঁর স্ত্রী মাধুরী মঙ্গেলকার। ইণ্ডিয়ায় সবচেয়ে বাড়ন্ত সব টেকনোলজি ও কয়েকটি টেলিকম কোম্পানির মালিক মিস্টার মঙ্গেলকার। এবং শুধু তাই নয়, দুনিয়া জুড়ে বিখ্যাত *দ্য কোয়েশ্চেন সার্চ ইঞ্জিন*-এর উদ্ভাবক তিনিই।'

'দ্য কোয়েশ্চেন সার্চ ইঞ্জিন... প্লিয জাস্ট আস্ক?' টিভির বিজ্ঞাপন নকল করল লাবনী। ভদ্রলোক এগিয়ে আসতেই করমর্দন করল। অবাক হয়ে দেখল, মানবিক কোনও ভাব ফুটে ওঠে না মানুষটার চেহারায়। চাঁদের মত গোল মুখ, মসৃণ ত্বক হাতির দাঁতের মত। চোখে ছোট ওয়ায়্যার-রিম্‌ড্ চশমা। মোটা শরীরটা ঢাকতে চেয়েছেন নেহেরু কোট পরে। ভদ্রলোকের

উচ্চতা বড়জোর ওর সমানই। বয়স চল্লিশ মত। 'আপনিই আবিষ্কার করেছেন দ্য কোয়েশ্চেন সার্চ ইঞ্জিন? আমার এক বান্ধবীর কথা শুনে ব্যবহার করতে শুরু করি। আর এখন তো কমপিউটারের সামনে বসলেই ওটার সাহায্য না নিয়ে উপায় থাকে না।'

'আগামী দু'বছর পর ওটা হবে দুনিয়ার সেরা সার্চ ইঞ্জিন,' নির্বিকার কণ্ঠে বললেন মিস্টার মঙ্গেলকার। গুনে গুনে বলেন ইংরেজি শব্দ, মনে হলো যেন কথা বলছে রোবট। কণ্ঠে নেই কোনও উত্থান বা পতন। 'আমি খুবই খুশি যে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি, ডক্টর আলম।'

মাধুরী মঙ্গেলকার স্বামীর মত নন, দেখতেও অত্যন্ত সুন্দরী। দারুণ মানিয়ে গেছেন ভারতীয় দামি সিল্ক শাড়িতে। নায়িকাদের মত গাদা গাদা গহনা নেই, কানে ঝুলছে শুধু বড় দুটো সোনার রিং। লাবনী ধারণা করল, বয়সে স্বামীর সমানই হবেন মহিলা। কিন্তু ঈগলের চঞ্চুর মত বাঁকা নাকের কারণে ওর মনে হলো, মহিলা বাজ জাতীয় কোনও হিংস্র পাখি। কথা বলেন সুরেলা কণ্ঠে: 'ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে নিদর্শন নিয়ে আলাপ করা যাবে কি না।'

'অবশ্যই যাবে,' বলল লাবনী, 'যে-কোনও প্রশ্নের জবাব দেবেন ডক্টর কিগান। আমিও আছি সে কারণেই।' অন্যদের ওপর চোখ বোলাল। 'আপনারা আর্কিওলজিকাল যে-কোনও ব্যাপারে জানতে চাইতে পারেন।'

যা ভেবেছিল, তাই হলো— হুড়মুড় করে একগাদা প্রশ্ন এল আটলান্টিয়ান মুকুটের ব্যাপারে। একে একে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিল লাবনী ও কিগান।

কিন্তু ভিআইপি দর্শকদের উচ্ছ্বাস শেষ হলে মঙ্গেলকাররা জানতে চাইলেন অন্য এক আর্টিফ্যাক্টের বিষয়ে। দু'জনের ভেতর

প্রথমে মুখ খুললেন মিস্টার মঙ্গেলকার, 'স্টাডা কোডেক্স,' ঝুঁকে ওটাকে দেখলেন, 'ওটার কতটুকু অনুবাদ করা হয়েছে?'

'এখন পর্যন্ত প্রায় নব্বুইভাগ,' বলল লাবনী, 'ওটার দায়িত্বে আছেন ডক্টর কিগান। শেষ দশ ভাগ অনুবাদ করা কঠিন। কিন্তু ঘাবড়ে যাচ্ছি না আমরা। প্রতিদিনই জ্ঞান বাড়ছে আটলাণ্টিয়ান ভাষার ওপর।'

'অনেকের সঙ্গে শেয়ার করলে ভাল হতো না? গতি বাড়ত কাজের।' লাবনীর দিকে চেয়ে আছেন মিস্টার মঙ্গেলকার।

'তাতে কাজ হবে বলে মনে হয়নি,' বলল লাবনী, 'আমাদের কাজ অন্য ধরনের।'

হুতুমপেঁচার মত বড় বড় চোখে ওকে দেখলেন মিস্টার মঙ্গেলকার। 'মাত্র কয়েকজনের বদলে যে-কোনও সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের জ্ঞান কাজে লাগালে, সেটাই ভাল ছিল না? অনেক ধরনের জবাব পেতেন চট্ করে। আবার কোনও বিশেষজ্ঞের ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কমত। আপনারা চাইলে সামান্য ফি-র বদলে অত্যন্ত উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে এক হাজার একটা জবাব জানিয়ে দেবে আমার কোম্পানি।'

'মিস্টার মঙ্গেলকার, আসলে আর্কিওলজি ঠিক কমপিউটার সায়েন্সের মত নয়,' বলল লাবনী, 'তা ছাড়া, সিকিউরিটির কারণে আমরা চাই না অনুবাদ হওয়ার পর সেসব তথ্য চট্ করে প্রকাশ হোক। স্টাডা কোডেক্সে আছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর্কিওলজিকাল সাইটের কথা। এখন আমাদের দোষে সেগুলোর ওপর একদল লুঠেরা হামলে পড়লে, তা হবে দুঃখজনক। স্টাডা কোডেক্সের জরুরি তথ্য ফাঁস হলে রক্ষা করার আগেই নষ্ট হবে সেসব সাইট, ফলে মস্ত ক্ষতির মুখে পড়বে গোটা আর্কিওলজিকাল সোসাইটি।'

'এরই ভেতর কিছু পাতা অন-লাইনে দিয়েছে ইণ্টারন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েশন।'

'ওটা করেছেন সাবেক আইএইচএ চিফ, আমি করিনি,' তিক্ত সুরে বলল লাবনী, 'আমি ডিরেক্টর হয়েই ওই নির্দেশ বাতিল করতে দেরি করিনি। প্রচারের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বেশি মূল্য দিই আমি।'

মাথা দোলালেন মঙ্গেলকার। 'বিজ্ঞানের দুই শাখা আলাদা, স্থানও অন্য জায়গায়। কিন্তু আপনি নিজেও ভাল করেই জানেন কতটা কাজে আসে প্রচার।'

'শখ করে কখনও গোপন কিছু প্রচার করতে গেছি, তা কিন্তু নয়,' বলল লাবনী, 'আর এ কারণেই অন-লাইন থেকে সরানো হয়েছে কোডেক্সের সেসব পাতা।' ধাতব প্রচ্ছদের লেখাগুলো দেখাল। 'কিন্তু এই অংশের ছবি আগেই প্রকাশ করে দেয়া হয়।'

'আমি আগ্রহী হয়েছি পরের কয়েকটি পাতা পড়ে,' বললেন অনুপম মঙ্গেলকার। প্রথমবারের মত কণ্ঠে প্রকাশ পেল সামান্য আবেগ। দ্বিতীয় পাতার শেষ অংশ দেখালেন তিনি। 'ওই অংশের লিখিত ভাষা আটলান্টিয়ান নয়, বৈদিক সংস্কৃত।' লাবনীর চোখে তাকালেন। 'ভারতের প্রাচীন কালের ভাষা ওটা।'

'জানি। খ্রিস্টের ছয় শ' বছর আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তারপর ওটাকে বাতিল করে এল ক্লাসিকাল সংস্কৃত। অবশ্য তার আগে কত কাল ধরে বৈদিক সংস্কৃত চালু ছিল, কেউ জানে না। খ্রিস্টের জন্মের নয় হাজার বছর আগে তলিয়ে যায় আটলান্টিস। কাজেই ধরে নিতে পারি, পরিব্রাজক স্টাডার আমলের আগে থেকেই চলছিল ওই ভাষা।'

'অর্থাৎ তারও আগে থেকেই ছিল ভারতীয় সভ্যতা,' ডিসপ্লে কেস এক চক্কর কাটলেন মঙ্গেলকার। মনোযোগ দিয়ে দেখছেন বইটার পুরু প্রচ্ছদ। 'ওই সভ্যতার ভিত্তি বলতে ছিল বেদের শিক্ষা। আজও সেই বেদ অনুযায়ী চলছে আমাদের হিন্দু সমাজ। নিশ্চয়ই জানেন, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ধর্ম এই হিন্দুইযম।'

নিস্পৃহ চেহারায় এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতেই অদ্ভুত দেখাল মিস্টার মঙ্গেলকারকে। 'স্বীকার করুন বা না করুন, সত্যিকারের ধর্ম বলতে গেলে আমাদের হিন্দুইযমকেই বোঝায়।'

'আপনার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে কোনও বিতর্কে যেতে চাই না,' বলল গম্ভীর লাবনী। 'এটা তার উপযুক্ত স্থান নয়। যার যার উপলব্ধি থেকে আসে ধর্মের চেতনা। সেটা ব্যক্তিবিশেষে আলাদাও হতে পারে।'

কাঁচের কেসের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে দিলেন মঙ্গেলকার। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন কোডেক্স। পাশেই আছেন মিসেস মঙ্গেলকার।

রানা টের পেল, অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙা দরকার।

'মিসেস মঙ্গেলকার,' মুখ খুললেন আর্কিওলজিস্ট কিগান। 'বলুন তো, মিস্টার মঙ্গেলকারের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হলো আপনার?'

অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে বিরক্ত চোখে তাঁকে দেখলেন মিসেস মঙ্গেলকার।

তাতে দমে গেলেন না কিগান। 'আসলে কী দেখে আপনি বিলিয়নেয়ার অনুপম মঙ্গেলকারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন?'

কড়া চোখে তাঁকে দেখে আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন মহিলা, 'মিস্টার কিগান, আপনি কি ভাবছেন, বেশিরভাগ মেয়ের মত টাকার লোভে আমি ওর পেছনে ঘুরতে শুরু করি?'

'না-না, তা ভাবব কেন,' বিব্রত চেহারা করলেন কিগান, 'আমি আসলে জানতে চাইছিলাম...'

'অনুপম তার কোম্পানি চালু করার অনেক আগেই সাইকোলজির ওপর ডক্টরেট করেছি! আপনি কি ভাবছেন স্বামীর পেছন পেছন ঘুরবে আর ধমক সহ্য করবে, এমন মেয়ে আমি?'

'না, তা ভাবিনি।' মুখ লালচে হয়ে গেল কিগানের। 'এমনিই জানতে চাইছিলাম।'

তাঁর দিকে চেয়ে আছেন মেয়র, চোখে আতঙ্ক। এই বুঝি হারিয়ে গেল এই শহরের বড় কোনও ব্যবসা!

'আসলে আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি,' বললেন কিগান।

একবার কিগানকে দেখে নিয়ে মিসেস মঙ্গেলকারের দিকে ফিরল লাবনী। 'দুঃখিত, আমরা জেনেবুঝে কারও মনে কষ্ট দিতে চাইনি।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ থাকলেন মাধুরী মঙ্গেলকার।

মুখ খুললেন তাঁর স্বামী, 'মাধুরী বুঝেছে, অন্তর থেকেই ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন আপনারা। যাক গে, আগের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। স্টাডা কোডেক্স। আপনারা আইএইচএ-র কর্মকর্ত্রী বা কর্মকর্তারা সত্যিই চান না অনুবাদের কাজটা করে দিক আমার কোম্পানির সফটওয়্যার?'

এই লোক যে শুধু প্রোগ্রামার তাই নয়, দৃঢ়সঙ্কল্প বিক্রেতাও, ভাবল লাবনী। 'প্রস্তাব দেয়ায় ধন্যবাদ, কিন্তু কাজটা আমরা ওভাবে করব না। কঠোর সিকিউরিটির কারণেই মাত্র কয়েকজন দেখতে পাবে স্টাডা কোডেক্স।'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। বোঝাতে পারিনি আপনাকে। বলছি না যে অচেনা কাউকে ইনভল্‌ভ্‌ করতে হবে। আমি দিতে চাইছি দ্য কোয়েশ্চেন-এর সুলভ সার্ভিস।'

একটু দ্বিধা নিয়ে বললেন কিগান, 'ঠিক বুঝি না কমপিউটার। একগাদা তথ্য দিলে কী হবে? সেটা অনুবাদ করবে কোনও সার্চ ইঞ্জিন?'

'দ্য কোয়েশ্চেন সাধারণ সার্চ টুল নয়। এমন এক সিস্টেম, যেটার মাধ্যমে পাবেন অ্যানালিটিক অ্যালগোরিদম। প্রতিটি মুহূর্তে ডিডাকশন করবে কমপিউটার।' আবারও নিস্পৃহ হলো মিস্টার মঙ্গেলকারের চেহারা। 'আপনি যখন দ্য কোয়েশ্চেনকে ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে চান, সে কোনও প্রশ্ন করবে না,

তার বদলে ব্যবহার করবে ইন্টারলিঙ্কড্ ক্লাউড। খুঁজে দেবে রেযাল্ট। এটা তো বুঝলেন? অনুন্নত অন্য সব সার্চ ইঞ্জিনের মত সাধারণ লিস্ট তৈরি না করে চারপাশের সব ওয়েবপেজ থেকে তথ্য নিয়ে রেযাল্ট তৈরি করবে। বলতে গেলে, আরও বেশি কিছু করবে।' সিলিকন ভ্যালির এক প্রোগ্রামারের দিকে চট্ করে দেখে নিলেন তিনি। 'দ্য কোয়েশ্চেন প্রতিটি পেজ অ্যানালাইয করবে, ইউযারের ইচ্ছে বা অভ্যেসের দিকে খেয়াল রেখে ব্যবহার করবে ডিডাকশন লজিক। ওই একই লজিক কাজ করবে অনুবাদের সময়। যত বেশি ডেটা দেয়া হবে, ততই ভাল হবে রেযাল্ট। আটলান্টিয়ান ভাষার ওপর সব তথ্য দিন দ্য কোয়েশ্চেনকে, নিশ্চিতভাবেই আপনাকে ও দেবে নিখুঁত অনুবাদ।'

'কমপিউটারের অনুবাদ দেখেছি, কোনও কাজের নয়,' বললেন কিগান।

তাঁর টেকনোলজির বদনাম হচ্ছে ধরে নিয়ে রেগে গেলেন মিস্টার মঙ্গেলকার। 'ওসব প্রোগ্রামের চেয়ে অনেক উন্নত প্রোগ্রাম দ্য কোয়েশ্চেন।' লাবনীর দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনাদের পেশার বেশিরভাগ কাজ একাই করতে পারবে দ্য কোয়েশ্চেন। আর্কিওলজিকাল সাইট ঘেঁটে মাসের পর মাস টুকরো টুকরো ডেটা সংগ্রহ করতে হবে না। যেমন আপনার আটলান্টিস...' নির্দেশনগুলো দেখালেন তিনি। 'লোকেশন খুঁজতে গিয়ে আপনার লেগেছে বহু দিন। হয়তো বছরের পর বছর। কিন্তু দরকারী ডেটা দিন দ্য কোয়েশ্চেনকে, মাত্র এক বা দুই দিনের ভেতর আপনি পাবেন নির্ভরযোগ্য জবাব। কাজটা শেষ হবে হয়তো মাত্র এক ঘণ্টায়। সেক্ষেত্রে বাকি থাকবে শুধু খোঁড়াখুঁড়ির কাজ।'

নিজেও রেগে গেছে লাবনী। কড়া সুরে বলল, 'শুধু ডেটা দিলেই হয় না, মিস্টার মঙ্গেলকার, আরও বহু কিছু আছে, যেগুলো আর্কিওলজির অংশ। নির্দিষ্ট এলাকায় এমন সব তথ্য

থাকে, যেগুলো প্রথমে মনে হবে অপ্রাসঙ্গিক। আমি যখন আটলান্টিস খুঁজলাম, কোথাও ছিল না জরুরি তথ্য। জানা ছিল না অনেক ডেটা। এক এক করে ফিলআপ দ্য গ্যাপের মত করে অনেক কিছু আঁচ করে নিতে হয়েছে। ওটা পেরেছি, কারণ ওই কাজে আমি অভিজ্ঞ। মগজে ছিল যৌক্তিক অনুমান। এসব চাইলেও বুঝবে না কোনও কমপিউটার।'

'আমরা আপনার সঙ্গে একমত নই,' বললেন মাধুরী মঙ্গেলকার। স্বামীর পক্ষ নিয়েছেন। 'ভাল করেই জানি অনুপমের সফটওয়্যার কতটা শক্তিশালী। ওটার জন্যে পাল্টে যাবে গোটা পৃথিবী।'

'তার মানে, আপনি আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন, ডক্টর আলম?' জানতে চাইলেন মিস্টার মঙ্গেলকার।

'এ ছাড়া উপায় নেই,' বলল লাবনী, 'সত্যি যদি সার্চ ইঞ্জিন দিয়ে কাজ হতো, আমাদের মত আর্কিওলজিস্টরা হাত গুটিয়ে নিয়ে বেকার হয়ে যেত।'

কাঁধ ঝাঁকালেন অনুপম মঙ্গেলকার। 'আপনার যা খুশি। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, মাত্র কয়েক দিনের ভেতর ওই কোডেক্স...' চুপ হয়ে গেলেন তিনি। দামি একটা সেল ফোন হাতে তাঁর দিকে আসছে এক ভারতীয় মেয়ে। পরনে একটু মলিন বিযনেস সুট। কপাল থেকে নেমে বাম চোখ পেরিয়ে গালে এসে থেমেছে একটা গভীর কাটা চিহ্ন। 'হ্যাঁ, মায়া? কিছু বলবে?'

'আপনি এই কলের জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যর,' বলল মহিলা। ফোনটা বাড়িয়ে দিল।

ওটা নিলেন মিস্টার মঙ্গেলকার, 'দুঃখিত, ক্ষমা করবেন,' লাবনীকে বলে সরে গেলেন একটু দূরে। পিছু নিয়েছে তাঁর স্ত্রী এবং মায়া খোইল। কানে ফোন দিয়ে জানতে চাইলেন বিলিয়নেয়ার, 'হ্যাঁ, বলুন? না-না, পাল্টে নেয়া হবে না প্ল্যান। সব

আগের মতই হবে।’

এদিকে আটলান্টিস সম্পর্কে লাবনীর কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন আরেক বিলিয়নেয়ার। ওই একই সময়ে ফোন ছেড়ে স্ত্রীসহ আবারও ফিরলেন অনুপম মঙ্গেলকার। ভিড়ের ভেতর দিয়ে দূরে চলে গেল তাঁদের সহকারিণী। ওদিকে তাকাল রানা। প্রেসিডেন্ট, তাঁর স্ত্রী, দলের লোক ও সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা বিদায় নেয়ায় অনেক কমে গেছে ভিড়। মানুষগুলোর ভেতর তৈরি হয়েছে শ্রেণী-ভেদ। মস্তবড় ঘরের এক কিনারায় জড় হয়েছে মেয়রের বডিগার্ড ও দালানের সিকিউরিটি গার্ড। মাঝে রয়েছে পিএ এবং সেক্রেটারিরা। তারা উপগ্রহের মত ঘুরছে বিলিয়নেয়ারদের চারপাশে। ঘরের এক কোণে তিনজন ভারতীয় লোকের পাশে গিয়ে থামল মিস্টার মঙ্গেলকারের সেক্রেটারি। ডানদিকের লোকটা দানবের মত বিশালদেহী, দাড়ি নেমে এসেছে প্রায় পেট পর্যন্ত। ঘরের অন্য যে-কারও চেয়ে অন্তত এক ফুট ওপরে আছে তার মাথা।

কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করছে লাবনী। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে উঁচু জানালার দিকে তাকাল রানা। কুয়াশাভরা রাস্তার ওদিকে বাজার, ওটা পাশ কাটিয়ে আসছে কয়েকটা হেডলাইট।

হঠাৎ সতর্ক হলো রানা। শিরশির করছে ঘাড়ের রোম। কোথাও কী যেন গোলমাল আছে! এক সেকেণ্ড পর বুঝল, হেডলাইট সরাসরি আসছে এই ঘরের জানালা লক্ষ্য করে!

রাস্তা গেছে এক্সিবিশন হলের পাশ দিয়ে। ওদিকে না গিয়ে দালানের দিকেই ছুটে আসছে উজ্জ্বল আলো!

একটু ঘুরে গেল হেডলাইট।

এখন সরাসরি নাক তাক করেছে জানালার দিকে।

‘মিস্টার মেয়র,’ সতর্ক করে দেয়ার সুরে বলল রানা, ‘সিকিউরিটি গার্ডদের বলুন, হামলা আসছে আপনাদের...’

তখনই কয়েক পশলা গুলির আঘাতে বিস্ফোরিত হলো কাঁচের জানালা!

তিন

'সবাই শুয়ে পড়ুন!' চিৎকার করে কথাটা বলেই লাবনীকে জাপটে ধরে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। পলিশ করা মেঝেতে ঝরঝর করে ঝরল একরাশ ভাঙা কাঁচ। হলঘর ভরে গেল আতঙ্কিত চিৎকারে। কিন্তু তা মাত্র ক'সেকেণ্ডের জন্যে, ঘড়ঘড় গর্জন করা শক্তিশালী ইঞ্জিনের শব্দের নিচে চাপা পড়ল মহিলাদের আর্তচিৎকার।

ভাঙা জানালা পেরিয়ে ঘরে ঢুকেছে কয়েকটা মোটরসাইকেল। আরোহীদের পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট। মুখ ঢেকে রেখেছে প্লাস্টিকের ভাইযর দিয়ে। মোটরসাইকেল আরোহীরা ঘরের নানান দিকে ছড়িয়ে যেতেই কয়েক পশলা গুলির আওয়াজ হলো। ব্যবহার করা হচ্ছে এমপিফাইভকে সাবমেশিন গান। অতিথিদের মাথার ওপর দিয়ে গেল বুলেট। কারও সাধ্য নেই যে মেঝে থেকে মাথা তুলবে। কয়েক সেকেণ্ড নির্দিষ্ট টার্গেটে গেল গুলি। ছিটিয়ে পড়ল তাজা রক্ত। মেরে ফেলা হচ্ছে হলের গার্ডদেরকে।

জানালা ও দেয়াল ভেঙে সগর্জনে ঘরে ঢুকল ভারী ইঞ্জিনের একটা গাড়ি। কর্কশ আওয়াজ তুলছে। আরও বিশ ফুট যাওয়ার পর এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরল ওটা। চিঁড়ে-চ্যাপটা হলো কয়েকজন অতিথি। গাড়ির পেছন দিকের গুঁতো খেয়ে চুরচুর হয়ে

ভাঙল একটা আর্টিফ্যাক্টের কেস। গাড়ির সামনে-পেছন দিক বাল্ব্ সদৃশ, অনেকটা রেঞ্জ রোভারের মত দেখতে। অতিরিক্ত বড় চাকা ওজন রাখছে হেভি-ডিউটি সাসপেনশনের। চোখের কোণে ওটাকে দেখল রানা। চিনেও গেল। বোওলার নেমেসিস। শক্তিশালী অফ-রোড রেসিং ভেহিকেল, এবড়োখেবড়ো জমিতে হাসতে হাসতে বেশিরভাগ স্পোর্টস্ কারকে অনেক পেছনে ফেলতে পারবে ওটা।

মোটরসাইকেলও অফ-রোডার, আরোহীরা ধাওয়া খেলে শহর ছেড়ে পালাতে পারবে পাহাড়ি এলাকায়। তাদেরকে চাইলেও ধরতে পারবে না পুলিশ, কোনও কাজে আসবে না গাড়ি।

ব্যাক গিয়ার দিয়ে হলের আরও ভেতরে ঢুকল নেমেসিস। ভারী গাড়ি গায়ে চেপে আসছে দেখে দুড়দাড় করে সরে গেল ক'জন বিলিয়নেয়ার ও তাদের সেক্রেটারিরা। নেমে পড়েছে মোটরসাইকেলের আরোহীদের কয়েকজন। হাতের অস্ত্র তাক করেছে মেঝেতে পড়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে। কিন্তু রানা ও লাবনীর দিকে ছুটে এল তিন মোটরসাইকেল আরোহী।

রানার তলা থেকে লাবনী দেখছে আটলান্টিয়ান মুকুট। অকল্পনীয় দামি জিনিস ওটা। মাত্র কিছুক্ষণ আগে ওটার কথাই বলেছিল প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে। এখন কেউ কেড়ে নিতে চাইছে ওই মুকুট!

রানা ও লাবনীর কাছ থেকে কয়েক ফুট দূরে মোটরসাইকেল রেখে নেমে পড়ল আরোহীরা। শক্ত হাতে ধরেছে অস্ত্র। কেউ বাড়াবাড়ি করলেই খতম করে দেবে। কাউকে কোনও ধমক দেয়া হলো না, চাওয়া হলো না কিছু, কোনও হুমকিও নেই। কী করবে আগে থেকেই জানে। এমপিফাইভকে-র আরেক পশলা গুলির আঘাতে খুন হলো এক সিকিউরিটি গার্ড। গোপনে অস্ত্র বের করছিল সে।

'আমরা কী করব, রানা?' ফিসফিস করল লাবনী। 'ওরা তো চুরি করে নিয়ে যাবে রাজার মুকুট!'

পাশে শুয়ে আছেন মেয়র। চাপা স্বরে বললেন, 'যা খুশি করুক! শুধু বাঁচতে দিক!' একটু ওপরে মাথা তুলে দেখলেন। তাঁর দিকেই আসছে তিন মৃত্যুদূত! ভাঙা গলায় বললেন, 'আমি স্যান ফ্রান্সিসকোর মেয়র! প্লিয, আপনারা যা খুশি নিন, আমাদেরকে মারবেন না! কাউকে গুলি করবেন না দয়া করে!'

ভুরু কুঁচকে তাঁকে দেখল লাবনী। কিছুই করার নেই ওর।

নিজের ওপর ভীষণ বিরক্ত রানা ভাবছে, উচিত ছিল এ দেশে এসেই রানা এজেন্সি থেকে পিস্তল সংগ্রহ করে নেয়া।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছে নেমেসিস। বাল্‌বের মত পিছন দিয়ে জোর এক গুঁতো দিল আরেকটা কেসের গায়ে। কাত হয়ে কেস পড়ল মেঝেতে। ঝনঝন করে ভাঙল কাঁচ। মেঝেতে ঠং করে নামল সোনালি ত্রিশূল, গাড়ির চাকার ঠেলা খেয়ে চলে গেল তিন দুর্বৃত্তের পায়ের কাছে।

উদ্ভাস চোখে মুকুট দেখল দুর্বৃত্তরা। তিন সেকেণ্ড পর লম্বু নেতার ইশারায় চলে গেল পরের কেসের সামনে। ওই কেসের ভেতর রয়ে গেছে স্টাডা কোডেক্স।

কী হচ্ছে বুঝতে পেরে বিদ্যুতের প্রবাহের মত ঝাঁকি খেল লাবনী। হায়, আল্লা! এরা ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছে কোডেক্স! তবুও মনের ভেতর থেকে কেউ বলল: না, চুরি হবে না কোডেক্স! যেমন করে হোক রানা ওদেরকে ঠেকাবে!

তখনই তিন গুলিতে কেসের কাঁচ চুরচুর করে দিল দলনেতা।

লাবনীর চেয়েও বেশি চমকে গেলেন আর্কিওলজিস্ট কিগান। নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠলেন: 'অ্যাই! তোমরা ওটা নিতে পারবে না!'

'পারি কি পারি না নিজ চোখেই দ্যাখ্‌!' বলল দলনেতা। অস্ত্র

তুলেই গুলি করল সে।

কিগানের বুকে লাগল বুলেট। ছিটকে পিছিয়ে গেলেন মানুষটা। বুক থেকে ফোয়ারার মত বেরোচ্ছে রক্ত। কাত হয়ে পড়ার সময় ঠাশ শব্দে ওঁর মাথা লাগল মেঝেতে।

'কিগান!' ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল লাবনী, কিন্তু নিজের ওজন দিয়ে ওকে চেপে রেখেছে রানা। এখনও বেঁচে আছেন আর্কিওলজিস্ট। থরথর করে কাঁপছে হাত-পা। মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

অস্ত্র রেখে দুই হাতে কোডেক্স তুলে নিল হামলাকারী দলের নেতা। সে নেমেসিসের দিকে পা বাড়াতেই, গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে দিল আরেক লোক। ভেতরে রয়েছে বড় একটা ধাতব বাক্স। ওটা খুলতেই দেখা গেল ফোম রাবারের লাইনিং। দলনেতা খুব সম্মানের সঙ্গে কোডেক্স নামিয়ে রাখল ভেতরে। ধুপ করে বন্ধ হলো বাক্স। গর্জে উঠল অফ-রোড মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন। সরে যাওয়ার জন্যে তৈরি আরোহীরা।

মোটরসাইকেল আরোহীদের দলের প্রথম লোকটা এখনও রয়ে গেছে হলের ভাঙা দেয়ালের কাছে। সে গিয়ার ফেলে বেরিয়ে গেল ঘন কুয়াশার ভেতর। নানান আবর্জনা মাড়িয়ে সব অতিথিকে ভীত করে মোটরসাইকেলের পিছু নিল নেমেসিস।

যার যার বাহনে চেপে বসেছে তিন মোটরসাইকেল আরোহী। তাদের দু'জন গতি তুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। লাবনীর দিকে তাকাল দলনেতা। হয়তো ভাবছে, এবার এদের মেরে ফেলাই ভাল।

তখনই লাফিয়ে উঠে সোনালি ত্রিশূল তুলে নিল রানা, লড়তে তৈরি। ওই একই সময়ে কিগানের পাশে চলে গেল লাবনী। করুণ সুরে বলল, 'আপনারা কেউ সাহায্য করুন!' শক্ত করে চেপে রেখেছে ভাইয়ের মত মানুষটার বুকের ক্ষত। তবুও

তিরতির করে পড়ছে রক্ত। মৃদু গুঙিয়ে উঠছেন কিগান।

কুড়মুড় শব্দ তুলে ভাঙা জানালার কাঁচ গুঁড়ো করে হলরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল নেমেসিস ও দুই মোটরসাইকেল। বাইকে চেপে দলের পেছনে ছুটল দলনেতা, পৌঁছে গেল দেয়ালের ভাঙা অংশের কাছে।

একই সময়ে সোনালি ত্রিশূল ছুঁড়ল রানা। চকচকে বর্শার মত উড়ে চলেছে ওটা। ঠিকই লাগল টার্গেটে।

আরোহী সমেত হোঁচট খেল বাইক।

ওটার পেছন চাকার স্পোকে ঢুকে গেছে ত্রিশূল। হোঁচট খেল বাইক, ছিটকে সামনে উড়ে গেল আরোহী। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল মোটরসাইকেল।

দলনেতার দিকে ঝড়ের বেগে ছুট দিয়েছে রানা। তাকে আটকে ফেলতে পারলে...

কিন্তু মেঝেতে গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই ঝট্ করে কোমর থেকে পিস্তল বের করল লোকটা।

অস্ত্র দেখেই পাশের ডিসপ্লের ওদিকে ঝাঁপ দিয়েছে রানা, মাথার ওপর দিয়ে গেল একরাশ গুলি। ঠুন-ঠুন শব্দে ভাঙল কাঁচ। ঝরঝর করে ওর পিঠে পড়ল ধারালো কাঁচের টুকরো। অস্ত্র নামিয়ে নিল দলনেতা, গুলি শেষ তার।

কর্কশ গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন, গুলির আওয়াজ পেয়ে আবারও ঘরে ঢুকেছে নেমেসিস। এক দৌড়ে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজায় পৌঁছে গেল দলনেতা। লাফ দিয়ে উঠল গাড়িতে।

বাইরে থেকে এগিয়ে আসছে পুলিশের সাইরেন।

রাস্তার কেউ যোগাযোগ করেছে নাইন-ওয়ান-ওয়ানে। এই দিকে মেয়রের অনুষ্ঠান হচ্ছে, রওনা হতে দেরি করেনি পুলিশ।

বাইরে মোটরসাইকেল আরোহীরা গুলি ছুঁড়ল পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে। সামনের কাঁচ ভাঙতেই বাজারের কোণে কংক্রিটের

পিলারে ধাক্কা খেয়ে থামল গাড়িটা। বন্ধ হয়েছে সাইরেন। দপ-দপ করে জ্বলছে কুয়াশার ভেতর সাদা-নীল বাতি।

হলরুম ত্যাগ করে ভি-এইট ইঞ্জিনের গর্জন ছেড়ে তুমুল বেগে চলেছে নেমেসিস।

এক ছুটে কাত হয়ে শুয়ে থাকা মোটরসাইকেলের পাশে পৌঁছল রানা, টান দিয়ে স্পোক থেকে বের করে নিল ত্রিশূল। মোটরসাইকেল তুলে দাঁড় করিয়ে চেপে বসল ওটার পিঠে। বন্ধ হয়ে গেছে ইঞ্জিন। স্টার্টারপেডালে দু'লাথি খেয়ে জীবন ফিরল ওটার। পরের সেকেণ্ডে থ্রটল মুচড়ে রাস্তা লক্ষ্য করে ছুটল রানা।

'রানা! না!' পেছন থেকে চিৎকার করল লাবনী, 'কোথায় চলেছ?'

'ধরতে হবে না ওদেরকে?'

'একমিনিট! রানা! প্লিয! না!'

ততক্ষণে তীরের মত বেরিয়ে গেছে রানা। ধাওয়া করে ধরবে নেমেসিসকে। কুয়াশাভরা পথে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল ওর মোটরসাইকেলের টেইল লাইট।

অতিথিদের ভেতর টাকপড়া মধ্যবয়স্ক এক লোক ছুটে এলেন লাবনী ও আহত কিগানের দিকে। পরিচয় দিলেন নিজের। 'আমি ডাক্তার। হাত সরিয়ে নিন, ডক্টর আলম! দেখতে হবে ক্ষত!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডক্টর কিগানের বুক থেকে হাত সরাল লাবনী। গোল গর্ত থেকে ভলকে বেরোচ্ছে তাজা রক্ত। 'কিগান ঠিক হয়ে যাবে তো, ডাক্তার?'

'জানি না,' বললেন ডাক্তার। ক্ষত দেখছেন। কয়েক সেকেণ্ড পর হাত দিয়ে চেপে ধরলেন বুকের আহত অংশ। 'আরেকটু হলে ফুটো হতো হৃৎপিণ্ড। ফুসফুসও ছিঁড়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

'আমি অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছি,' বললেন ডাক্তারের এক সঙ্গী। হাত তুলে সেল ফোন দেখিয়ে দিলেন।

রাগী চোখে ভাঙা জানালা দেখে নিয়ে আবারও কিগানকে দেখল লাবনী। বুঝতে পারছে কী সর্বনাশ হয়েছে। উপায় থাকলে আটকে রাখত মাসুদ রানাকে, কিন্তু সে সুযোগ হয়নি।

ওকে দেখছেন কিগান। ব্যথায় হাঁফাতে শুরু করে বললেন, 'লাবনী, গিয়ে সাহায্য করো রানাকে! ফিরিয়ে আনো কোডেক্স।'

'কিন্তু তোমার কী হবে?'

'ভালই থাকব,' ব্যথা সহ্য করেও হাসলেন কিগান। 'যাও, লাবনী! হাসপাতালে দেখা করবে চকলেট নিয়ে। গাঢ় কালো বেলজিয়ান চকলেট কিন্তু!'

'জানতাম তুমি এমনই,' কান্না চেপে হাসল লাবনী। শক্ত করে ধরল সিনিয়র বন্ধুর হাত। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে চারপাশ দেখল। ওর দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন কিগান।

দালানের ভাঙা অংশ দিয়ে বেরিয়ে এল লাবনী।

একটু দূরে দপদপ করে জ্বলছে পুলিশের গাড়ির বাতি। ডাক দিল লাবনী, 'মিস্টার মেয়র?'

হলরুমের মেঝে ছেড়ে ওর পেছনে চললেন মেয়র কালাহান। ভীষণ ভয় তাঁর। মেয়েটার কাছে পৌঁছে বললেন, 'কী করতে বলেন, ডক্টর আলম?'

তাঁর বাহু ধরে কুয়াশাভরা বাজারের কোণে পৌঁছে গেল লাবনী। 'পুলিশের গাড়ি। ওয়্যারলেস ব্যবহার করে পুলিশদেরকে জানিয়ে দেবেন, তারা যেন রোড ব্লক তৈরি করে। আসুন! দেরি করার সময় নেই!'

গোলাগুলির কারণে এখনও মাথা খেলছে না মেয়রের। 'কিন্তু ওদেরকে নির্দেশ দেব কী করে?'

'আরে, কচু, আপনিই তো শহরের মাথা!' ধমক দিল লাবনী।

পৌঁছে গেছে ওরা পুলিশের গাড়ির পাশে।

ওটা ডজ চার্জার। চার দরজাওয়ালা সেডান। সাদা-কালো।

গাড়ির সামনের দুই সিটে অজ্ঞান বা খুন হয়ে পড়ে আছে দুই অফিসার।

'হায়, আল্লা! মুশকিল!' বিড়বিড় করল লাবনী।

'হায়, ঈশ্বর!' রক্ত দেখে আঁৎকে উঠলেন মেয়র। 'আমরা এখন কী করব?'

রানা যে পথে গেছে, সেদিকে তাকাল লাবনী। মনের ভেতর তৈরি হয়েছে সিদ্ধান্ত। 'ওদের পিছু নেব। আপনি দেখবেন, যাতে ডাকাতগুলোকে ঠেকাতে চেষ্টা করে পুলিশ।' ড্রাইভারের দরজা খুলল লাবনী। বুকে কয়েকটা গুলি খেয়ে খুন হয়ে গেছে পুলিশ অফিসার। রক্ত দেখে বমি এল ওর। কিন্তু সিট বেল্ট খুলে লাশটা টেনে ফেলল রাস্তায়।

হতবাক হয়ে ওকে দেখলেন মেয়র। 'আপনি এটা করতে পারেন না! ক্রাইম সিন! পরে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে এখান থেকে!'

'জলদি, গাড়িতে উঠুন!' ধমক দিল লাবনী। মেয়র পেছনের সিটে বসবে বুঝে আরও কড়া হলো ওর কণ্ঠ: 'আরে, পেছনে না, সামনের সিটে বসুন! আমি গাড়ি চালাব, আপনাকে ব্যবহার করতে হবে রেডিয়ো!'

অন্য পুলিশ অফিসারও শেষ। মাথার চামড়া ছিলে ঝুলছে গালের পাশে। মৃতদেহের সিট বেল্ট লাবনী খুলে দিতেই গাড়ির ওদিকে গেলেন মেয়র।

'মুখ দেখার দরকার নেই, শুধু কাঁধ ধরে বাইরে ফেলুন লাশ,' বলল লাবনী।

উপদেশ মানবেন ভাবলেন মেয়র কালাহান, কিন্তু অবাধ্য চোখ গেল মৃত পুলিশের ক্ষতের ওপর। 'ম্‌ম্‌ম-রে গেছে!' চমকে গিয়ে বললেন। টেনে রাস্তায় ফেললেন পুলিশ অফিসারের লাশ। গাড়িতে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বললেন, 'তোমরা কেউ লাশ

পাহারা দাও!'

'চলুন, সময় নেই,' অধৈর্য হয়ে বলল লাবনী। এখনও চালু আছে গাড়ির ইঞ্জিন। রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে গেল ও। সিমেন্টের কলামে বেধে ঠনাং করে রাস্তায় ভেঙে পড়ল সামনের বাম্পার। ঘুরে গিয়ে কুয়াশার ভেতর রওনা হলো লাবনী। কড়া সুরে বলল, 'পুলিশের সঙ্গে রেডিয়োতে যোগাযোগ করুন!'

নেমেসিস জিপ চালাতে চালাতে মুখের ওপর থেকে ভাইযর সরাল জ্যাক রিচি, উদ্বিগ্ন চোখে দেখল জর্জ মাইকেলকে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

ব্যথা পাওয়া কাঁধ ডলছে ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত। 'তাই তো মনে হয়। ফিরে এসে তুলে নিয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ।'

'উপায় কী?' হাসল জ্যাক রিচি। 'তুমি তো এখন পর্যন্ত চার আনা পয়সাও দাওনি!'

গম্ভীর চেহারা করে চুপ থাকল মাইকেল।

জানতে চাইল রিচি, 'ওই লোক কে, সিকিউরিটি গার্ড?'

'না, পাক্কা হারামজাদা কোনও অতিথি! আবার দেখা হলে খুন করে ফেলব ওকে।'

সাইড মিররে চোখ যেতেই রিচি দেখল, পেছন থেকে দ্রুত আসছে কে যেন! শুকনো গলায় বলল সে, 'লোকটাকে খুন করার সুযোগ পেয়ে গেছ। মোটরসাইকেলে করে আসছে সে!'

'তাই?' সাইড মিররে দেখল মাইকেল। এক চোখ জ্বেলে আসছে যেন কোনও কানা দৈত্য। আসলে ওটা ওরই দলের শক্তিশালী মোটরসাইকেল হোণ্ডা এক্সআর৬৫০আর ডার্ট বাইক। অবাক হয়ে বলল মাইকেল, 'ব্যাটা দেখি ধাওয়া করে!'

'আমাদের কী করা উচিত?'

'প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করব। সোজা টেইলর স্ট্রিটে পৌঁছে

উঠবে পাহাড়ে। ...রেডিয়ো কই?' ওয়াকিটকি খুঁজছে মাইকেল। 'গতি বাড়াও, রিচি!'

ধূসর কুয়াশায় ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে রাস্তা। পাগলা ঘোড়ার মত ছিটকে উঠেই পিছলে যেতে চাইছে শক্তিশালী অফ-রোডার হোণ্ডা। এই জিনিস নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন, তবে সিটে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইছে রানা।

হঠাৎ করেই গতি তুলল নেমেসিস, কর্কশ গর্জন ছাড়ছে সুপারচার্জড্ ইঞ্জিন। দু'পাশে বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে পড়ছে একের পর এক দালান। ওদিক থেকে বড় এক গাড়ি আসতেই কড়া ব্রেক কষল নেমেসিসের ড্রাইভার, জমে গেল চার চাকা।

সতর্ক হয়ে গেছে রানাও। সামনে গাড়ি দেখে কাত হয়ে সরে বিড়বিড় করে দোষ দিল কপালকে। ভাবছে, ফোর-হুইল-ড্রাইভ জিপগাড়ির সঙ্গে পারবে ওর বাইক?

জানার একমাত্র উপায় মোটরসাইকেলের থ্রটল মুচড়ে ধরা, তাই করল রানা।

'হ্যাঁ, আমি মেয়র! সত্যিকারের মেয়র!' রেডিয়ো হ্যাণ্ডসেটে ধমকে উঠলেন কালাহান। অসংখ্য নাইন-ওয়ান-ওয়ান কল রিসিভ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ওদিকের মেয়েপুলিশ। তার চেয়েও খারাপ কথা, কোথাকার এক পাগল এসে জুটেছে পুলিশ ফ্রিকোয়েন্সিতে, ব্যাটা আবার বলছে সে স্যান ফ্রান্সিসকোর মেয়র! 'অ্যাই, মেয়ে! দেরি না করে দ্য গ্রেট বক্সার আলি এক্সিবিশন হল-এ অ্যাম্বুলেন্স পাঠাও! রোডব্লক করতে বলো সামনে! একদল ডাকাত মোটরসাইকেলে করে এসে সব আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে গেছে! তাদের সঙ্গে একটা বড় এসইউভিও আছে! ডাকাতির সময় খুন করেছে কয়েকজনকে! মৃতদের ভেতর দু'জন পুলিশও আছে!'

এবার আগের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিল মহিলা পুলিশ। 'খুন করে ফেলেছে পুলিশকে?'

'তো আর কী বলছি! দু'জন শেষ! তাদের গাড়ি নিয়েই পিছু নিয়েছি ডাকাতের!' ল্যাণ্ডমার্ক পাওয়ার জন্যে চট্ করে চারপাশ দেখলেন মেয়র। 'জানি না কোন্ রাস্তায় আছি। এত কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না!'

'আপনারা কোন্ গাড়িতে আছেন? নম্বর কত?'

আইডেণ্টিফিকেশনের জন্যে ড্যাশ বোর্ডে চোখ বোলালেন মেয়র। একটা কার্ড পেয়ে গলা ছাড়লেন, 'কার ফিফটি ফাইভ!'

'একমিনিট। লোজ্যাকের ট্র্যাকার দেখছি। কার ফিফটি ফাইভ পুবে চলেছে এডি স্ট্রিট ধরে, সামনেই লিভেনওঅর্থ।'

'হ্যাঁ, আমরাই,' বললেন মেয়র, 'ডাকাত দলের কয়েক ব্লক পেছনে। পথ দেখিয়ে দেব, ওদিকে রোডব্লক করো!'

'ঠিক আছে, দেখা যাক কী করতে পারি... ইয়ে... মেয়র! সাড়া দিতে শুরু করেছে ইউনিটগুলো। আপনাদের উচিত হবে না কোনও ঝুঁকি নেয়া।'

'পরামর্শ দিতে দেরি করে ফেলেছ, বোন,' বিড়বিড় করল লাবনী। তখনই কুয়াশাভরা রাস্তায় উদয় হলো একটা গাড়ি। ব্রেক কষে স্টিয়ারিং বনবন করে ঘুরিয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল লাবনী। বিড়বিড় করে বলল, 'হায়, আল্লা, এ দেখি অবস্ট্যাকল কোর্সে পড়েছি! ঘাটকচুর সাইরেনটা গেল কোথায়? ওটা বাজিয়ে দেয়া দরকার!'

রানার নিচে খেপা ষাঁড়ের মত বারবার ছিটকে উঠছে ক্ষিপ্র মোটরসাইকেল। ধুলো-মাটিতে চলতে তৈরি চাকা, উঁচু-নিচু থ্রেড ঠিকভাবে বসছে না ভেজা, মসৃণ পথে। যে-কোনও সময়ে ঘটবে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। আধ সেকেণ্ডের জন্যে চট্ করে স্পিডোমিটার

দেখল রানা। তিন লেনের রাস্তায় ছুটে চলেছে ষাট মাইল বেগে, তবুও বাড়ছে নেমেসিসের সঙ্গে দূরত্ব।

সামনে থেকে এল চাকা ঘষ্টে যাওয়ার কর্কশ আওয়াজ।

প্যাঁ-পোঁ হর্ন বাজিয়ে বামে বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেল নেমেসিসের টেইল লাইট। উত্তর দিকে চলেছে গাড়িটা।

গতি হ্রাস না করেই বাঁক নিয়ে চমকে গেল রানা। সামনেই ব্যস্ত ইণ্টারসেকশন! স্কিড করে থামছে কিছু গাড়ি। এঁকেবেঁকে সেগুলোর মধ্য দিয়ে তুমুল বেগে ছুটছে বোওলার নেমেসিস!

তুবড়ে যাওয়া দু'গাড়ির মাঝে সামান্য ফাঁকা জায়গায় তীরের মত ঢুকল রানা। বুঝে গেছে, পঞ্চাশ মাইল বেগে পিছলে পড়লে স্রেফ খুন হবে। কোমরের জোরে মোটরসাইকেল সিধে করে স্টাণ্টম্যানের মতই ব্রেক কষল। নাটকীয়ভাবে বাম পা নামাতেই খর-খর শব্দে ওর জুতোর সোল খেয়ে ফেলল পিচঢালা পথ। পরক্ষণে দুই গাড়ি পেছনে ফেলল রানা। জিপের পিছু নিয়ে চোখের কোণে দেখল সাইনবোর্ড: টেইলর স্ট্রিট।

দু'পাশের জ্বলন্ত ল্যাম্পপোস্টের আলোয় বুঝল, ক্রমেই ওপরে উঠছে খাড়া পাহাড়ি পথ।

তাতে গতি কমছে না নেমেসিসের শক্তিশালী ইঞ্জিনের। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্ত-চক্ষুর মত টেইল লাইট দুটো।

'জানি না সে কে,' রেডিয়োতে বলল মাইকেল। টেইলর স্ট্রিট ধরে ঝোড়ো গতি তুলে চলেছে নেমেসিস। ওভারটেক করতে গিয়ে প্রয়োজনে ব্যবহার করছে পুরো তিন লেন। 'জানতেও চাই না। গুলি করে ফেলে দাও তাকে!'

সামনে ক'জন মোটরসাইকেল আরোহী, তাদের পেছনে টিপ্‌টিপ করে জ্বলছে লাল জোনাকীর মত বাতি। অন্যান্য গাড়ি চট্ করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে তারা। কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে উঠল

দলের দু'জনের ব্রেক লাইট। কুয়াশার ভেতর পিছিয়ে পড়ছে বলে পরিষ্কার দেখা গেল তাদেরকে।

দ্রুতগামী নেমেসিস ধরে ফেলল দুই মোটরসাইকেল আরোহীকে। তাদের কাজ হবে অনুসরণকারীকে ঠেকিয়ে দেয়া।

পাশের পার্কিং এরিয়া থেকে একটি গাড়ি বেরোতেই তুমুল বেগে ওটাকে পেরোল সতর্ক রানা। চট্ করে একবার দেখল পেছনের দিক। আবার মুখ ফিরিয়ে কাছেই পার্ক করা গাড়ি দেখে আঁৎকে উঠল। আরেকটু হলে খুন হতো, বিপজ্জনক গাড়িটাকে এড়িয়ে আবারও মনোযোগ দিল সামনের রাস্তায়। ধূসর কুয়াশার ভেতর কোথায় গেল নেমেসিস?

ওই তো!

লাল দুটো বাতি।

বেশি দূরেও নেই!

কিন্তু দুই বাতি সরে গেল দু'পাশে।

দুটো মোটরসাইকেল!

গতি কমিয়ে এনেছে লোক দু'জন। অপেক্ষা করছে রানাকে ফাঁদে ফেলতে। একজন সরে গেছে রাস্তার ধারে। একবার বাগে পেলেই সাঁড়াশি হামলা চালাবে।

ঝড়ের বেগে পেরোল রানা আরেকটা ইন্টারসেকশন। পেছনে পড়ল রাগী এক লোকের গালি ও হর্নের শব্দ।

রানার মোটরসাইকেলের কাছে চলে এসেছে ডান দিকের আরোহী। প্রায় পাশাপাশি হলো ওরা দু'জন। কালো মুখোশ পরা লোকটাকে ওর দিকে তাকাতে দেখল রানা।

বামহাতে কী যেন খুঁজছে লোকটা!

কাত হয়ে দূরে সরে গেল রানা। ওই একই সময়ে হোলস্টার থেকে এমপিফাইভকে সাবমেশিন গান নিল দুর্বৃত্ত। অস্ত্রের নলের

ডগায় কমলা আগুন ঝলসে উঠতেই সিটে শরীর মিশিয়ে দিল রানা। পাশের এক বাড়ির জানালার কাঁচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল ফুটপাথের ওপর।

বিপদ কাটছে না। পিছাতে পারবে না রানা। ওদিকে পার্ক করা কয়েকটা গাড়ি, এদিকে সামনে অন্য মোটরসাইকেল আরোহী। পথ আটকে দিতে চাইছে লোকটা। তার সঙ্গী এবার আরাম করে খতম করবে ওকে।

আরেকটা ইন্টারসেকশন আসতেই তুমুল বেগে বামে বাঁক নিল রানা। কিন্তু পাশাপাশি দুই গাড়ি আসতে দেখে ঝড়ের বেগে উঠে পড়ল টেইলর স্ট্রিটের ফুটপাথে। একটু দূরেই এক পথচারী! ঝাঁকি দিয়ে হ্যাণ্ডেলবার সরিয়ে মেয়েটাকে রকেটের গতি তুলে পেরোল রানা। ইচ্ছে করলে স্পর্শ করতে পারত বাহু।

নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছে দ্বিতীয় আরোহী। মাথা নিচু করে মিসাইলের বেগে হতভম্ব এক পথযাত্রীকে পাশ কাটাল রানা। সামনের কুয়াশায় আবছা সবুজ আভা। ক্রসরোডে ট্রাফিক বাতি। জায়গাটা পেরোবার সময় সহজেই ওকে গুলি করে ফেলে দেবে পেছনের মোটরসাইকেল আরোহী।

কুয়াশার ভেতর মাথায় ছাতা ধরে হেঁটে চলেছে এক লোক। ছোঁ দেয়া চিলের মত পৌঁছে খপ্ করে তার ছাতা কেড়ে নিল রানা। পেটে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকতেই মট্ করে উল্টে গেল শখের ছাতা। রানার পেছনে ভাঙা জিনিসটা চলেছে ডানা ভাঙা বাদুড়ের মত।

ইন্টারসেকশনে পৌঁছে মোড় পেরিয়ে সোজা টেইলর স্ট্রিটের আরও গভীরে সেঁধিয়ে গেল ও। এদিকে পরিস্থিতি বুঝতে পিছিয়ে এসেছে সামনের মোটরসাইকেল আরোহী। একপাশ থেকে তার মুখে ছাতা গুঁজতে চাইল রানা। লোকটার মুখে হেলমেট, হাতে

পুরু চামড়ার গ্লাভ্‌স্, কাজেই পলকা স্পোক ক্ষতি করবে না তার। কিন্তু...

ছাতা ঢেকে দিয়েছে তার দুই চোখ!

অস্ত্র ধরা হাত তুলে মুখ থেকে ভাঙা ছাতা সরাতে চাইল সে।

কিন্তু ওই এক মুহূর্তই দরকার ছিল রানার। ব্রেক কষে গতি কমিয়ে সরে যাওয়ার আগে ডান হাতে ধাক্কা দিল শত্রুর কাঁধে। প্রচণ্ড বেগে সামনে পার্ক করা এক গাড়ির পেছনে গিয়ে লাগল লোকটার মোটরসাইকেল।

দড়াম!

হঠাৎ করেই বাধা পেয়ে থমকে গেছে হোণ্ডা। হ্যাণ্ডেলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ভ্যানের চ্যাপটা পেছন দিকে আছড়ে পড়েছে আরোহী। পুরো দু'সেকেণ্ড বোর্ডে পিন দিয়ে আটকে রাখা প্রজাপতির মত সেঁটে থাকল লোকটা, তারপর তার ভাঙাচোরা মৃতদেহ পড়ল বিধ্বস্ত মোটরসাইকেলের জঞ্জালের ভেতর।

দ্বিতীয়বার দেখতে গেল না রানা।

ওই আওয়াজই যথেষ্ট!

বাঁচার উপায় ছিল না লোকটার!

কিন্তু মৃত আরোহীর সশস্ত্র সঙ্গী ছাড়বে কেন?

মোটরসাইকেলে চেপে উড়ে আসছে সে!

'টেইলর স্ট্রিট ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছে!' শ্বাস আটকে বললেন মেয়র কালাহান। জোর গতি ধরে পাহাড়ি রাস্তায় উঠছে লাবনী। মাথার ওপর ওঁয়াও-ওঁয়াও শব্দ তুলছে সাইরেন। সতর্ক করছে সামনে থেকে আসা সব গাড়ির ড্রাইভারকে। চট্‌ করে সরে গিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে তারা।

'বুঝেছি, মিস্টার মেয়র,' জানাল ডেসপ্যাচার মেয়েটা, 'ইন্টারসেপ্ট করতে ওদিকে চলেছে আমাদের কয়েকটা ইউনিট।'

'জিজ্ঞেস করুন এই রাস্তা কোথায় গেছে,' বলল লাবনী।

'মস্তবড় এক টিলায় উঠে... আবারও নেমেছে,' বললেন কালাহান। মনে মনে দেখে নিলেন মানচিত্র। 'কিন্তু এখান থেকে যে-কোনও দিকেই যেতে পারবে।'

চুপচাপ ভাবছে লাবনী, এদিকে আসার বিশেষ কোনও কারণ আছে ডাকাত দলের। স্যান ফ্রান্সিসকোর জিয়োগ্রাফি জানলে কাজে আসত, কিন্তু আপাতত উপায় নেই। বড়জোর অনুসরণ করতে পারবে ডাকাত দলকে। দেখা যাক কী হয়। হয়তো এরই ভেতর এসএফপিডি ধরে ফেলবে লোকগুলোকে।

বোওলার নেমেসিসের হুঙ্কার ছাপিয়ে এল সাইরেনের আওয়াজ। এখনও দূরে আছে পুলিশের গাড়ি। কিন্তু গতি তুলে আসছে। 'ওরা যদি আমাদের আগেই চূড়ায় ওঠে?' জানতে চাইল জ্যাক রিচি।

'ওদের আগেই পৌঁছবে, সেটা নিশ্চিত করো,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল জর্জ মাইকেল।

যা বলার বলে দেয়া হয়েছে, অ্যাক্সেলারেটর দাবিয়ে দিল রিচি। মন্থর গতির এক ফোক্সভাগেন বিটলকে পেছনে ফেলল নেমেসিস, ঝড়ের গতি তুলে উঠছে পাহাড়ি পথে। একটু দূরেই বিদ্যুদ্বেগে এগিয়ে আসছে একটা ইন্টারসেকশন।

কুয়াশার মাঝে ডান থেকে এল ভারী চেহারার কেইবল কার। নেমেসিসও একই সময়ে পৌঁছুবে ইন্টারসেকশনে। সেক্ষেত্রে দুটোর সংঘর্ষ প্রায় নিশ্চিত।

'গতি আরও বাড়াও!' চিৎকার করে বলল মাইকেল।

পথের সবচেয়ে উঁচু অংশে পৌঁছে তুমুল গতির কারণে মাটি ছাড়ল নেমেসিসের চার চাকা। ওদিকে কয়েক সেকেণ্ড আগে জিপের হেডলাইট দেখেছে কেইবল কারের ড্রাইভার। কড়া ব্রেক

কষেছে লিভার টেনে। লোহার চাকা ছিটকে দিচ্ছে লাল-কমলা ফুলকি। মস্ত এক লাফ দিয়ে কেইবল কারের নাক ছুঁয়ে প্রাচীন ট্রামের লাইন পেরিয়ে গেল নেমেসিস। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্জ মাইকেল।

পেছনে কর্কশ কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলে ক্রসরোডের মাঝখানে থামল কেইবল কার। প্রায় আটকে দিয়েছে চারপাশের পথ।

•

ঝড়ের বেগে চলেছে রানা। এসে হামলে পড়তে চাইছে সশস্ত্র মোটরসাইকেল আরোহী। এঁকেবেঁকে নানা দিকে সরছে রানা। আশপাশ দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে এমপিফাইভকে-র গুলি। আগুনের কমলা ঝিলিক দেখল রানা। পরিষ্কার শুনল আগ্নেয়াস্ত্রের হুঙ্কার। রাস্তা খুবলে তুলল একরাশ বুলেট।

একপাশ থেকে এসে রানাকে ফাঁদে ফেলতে চাইল শত্রু। কিন্তু ব্রেক কষে আরেক পাশে সরল রানা। কোনওভাবেই আসতে দেবে না ওর সরাসরি সামনে বা পেছনে, নইলে এক গুলিতে ওকে খতম করবে সে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, গতি বেশি কমিয়ে ফেললেও খুন হতে হবে।

হঠাৎ করেই আরও খাড়া, এবড়োখেবড়ো হয়ে উঠল পথ। হুপ-হুপ শব্দ তুলছে রানার মোটরসাইকেলের সামনের ফোর্ক। ওকে কোণঠাসা করতে গিয়ে আবারও গতি তুলছে শত্রু। কিন্তু সামনের রুক্ষ পথের জন্যে তৈরি ছিল না সে, কাত হয়ে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল।

সুযোগটা নিল রানা, ঝড়ের বেগে সাঁই-সাঁই করে উঠে যেতে লাগল টিলায়। সরু লেনে চূড়ার কাছে পৌঁছে গেছে নাকবোঁচা এক ফোক্সভাগেন বিটল। শত্রুর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে হলে ওটাকে অতিক্রম করতে হবে।

আরও সামনে কোথাও আছে নেমেসিস। একবার ওটার কাছে

গেলে দলের লোকের গায়ে গুলি লাগবে ভেবে সতর্ক হবে পেছনের মোটরসাইকেল আরোহী।

সামনেই ইণ্টারসেকশন...

কিন্তু রাস্তা জুড়ে রেলগাড়ির মত বসে আছে এক কেইবল কার!

চার

এত গতি চট্ করে সামলাতে পারবে না রানা। এখন আর সম্ভব নয় ট্রাম এড়ানো। যদি সম্ভব হতো থেমে যাওয়া, পেছন থেকে এসে খুন করত সশস্ত্র লোকটা।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে থ্রটল মুচড়ে ধরে তুমুল বেগে ট্রামের দিকে চলল রানা। ফোক্সভাগেনের ঢালু পিঠের দিকে তাক করেছে মোটরসাইকেলের সামনের চাকা। বুঝে গেছে, আকাশচারী হতে হবে ওকে। প্রচণ্ড গতি তুলে ধুম্ আওয়াজে ফোক্সভাগেনের পেছনে গুঁতো দিল হোণ্ডার চাকা, পরক্ষণে মস্ত এক লাফে উঠে পড়ল বাঁকা পিঠে। পেছনে জানালার কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ পেল রানা। ভারী মোটরসাইকেলের ওজন তুবড়ে দিল গাড়ির ধাতব দেহ। কিন্তু ততক্ষণে গুবরে পোকা পেরিয়ে উড়ে চলেছে রানার মোটরসাইকেল!

ঝড়ের গতি তুলে আকাশপথে কেইবল কার পেরোল রানা।

কিন্তু সশস্ত্র অনুসরণকারীর কপাল অত ভাল নয়। কুয়াশার

ভেতর অনেক পরে দেখেছে সে থমকে থাকা ট্রাম! কমপক্ষে ষাট মাইল বেগে লোহার মজবুত গাড়ির গায়ে আছড়ে পড়ল সে। মাত্র এক সেকেণ্ডে জঞ্জাল হলো এক্সআর৬৫০আর মোটরসাইকেল। রকেটের গতি তুলে প্রাচীন কাঠ ও কাঁচের প্যানেল ভেদ করে ঢুকে পড়ল আরোহী। মাঝের জায়গা উড়ে গিয়ে ওদিকের প্যানেল ভেঙে ছিটকে পড়ল টেইলর ও ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিটের ইণ্টারসেকশনে। কিন্তু ততক্ষণে ছিঁড়ে পড়েছে তার একটা হাত। রাস্তার ওপর ঘুরতে ঘুরতে বহু দূরে চলে গেল ওটা।

ওদিকে উড়ে ধুপ্ করে রাস্তায় চাকা নামতেই রানার মনে হলো, ভেঙে চুর-চুর হয়েছে ওর মেরুদণ্ড। মোটরসাইকেল কাত করে এড়িয়ে গেল রাস্তায় পড়ে থাকা কাটা হাত। ওর চারপাশের ছায়া উধাও হলো হেডলাইটের আলোয়। টেইলর স্ট্রিটের এদিকে দুটি লেনে চলছে নানান গাড়ি। যে-কোনও সময়ে হবে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ডানের লেনে সরে এল রানা। নতুন উদ্যমে ধাওয়া করল দূরের লাল বাতি। অনেকটা এগিয়ে গেছে নেমেসিস।

'কার ফিফটি ফাইভ, ফিফটি ফাইভ,' ডাকল ডেসপ্যাচার, 'দেখছি আপনারা টেইলর পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন পাইন-এ। এই তথ্য নিশ্চিত করুন।'

'মেয়র বলছি,' বললেন কালাহান। 'ঠিকই ধরেছেন।'

'জানিয়ে রাখি, ক্যালিফোর্নিয়া আর টেইলর ইণ্টারসেকশনে দুর্ঘটনা হয়েছে, সতর্ক থাকুন। আপনাদের সামনে রোড়ব্লকের ব্যবস্থা করছে ওদিকের সব ইউনিট। অন্যান্য ইউনিট ডাকাতদের দিকে চলেছে ওয়াশিংটনের দু'দিক থেকে।'

'গুড ওঅর্ক, ডেসপ্যাচ, থ্যাঙ্ক ইউ,' বললেন কালাহান। ভীত যাত্রী থেকে মুহূর্তে হয়ে গেছেন পাকা রাজনীতিবিদ।

'যা বলল, তার মানে কী?' জানতে চাইল লাবনী।

‘সহজ কথা,’ খুশি-খুশি গলায় বললেন মেয়র, ‘বাক্সে আটকা পড়েছে ডাকাতরা। আমরা বাগে পেয়ে গেছি তাদেরকে!’

টেইলর ও ওয়াশিংটন স্ট্রিটের ইন্টারসেকশন পেরোল নেমেসিস। চট্ করে ডানে দেখে নিল জ্যাক রিচি। ওদিক থেকে কুয়াশার ভেতর দিয়ে হাজির হচ্ছে লাল ও নীল সব স্ট্রোব বাতি। বামের টিলা থেকে নেমে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে আরেকটা এসএফপিডি ক্রুযার।

‘ওদের আগে থাকো,’ উত্তেজিত কিন্তু আত্মবিশ্বাসী মাইকেল বলল, ‘যেতে হবে বড়জোর চারটে ব্লক। তারপর...’

সামনে বেশ কয়েকটা সাইরেনের আওয়াজ পেল রানা। এগিয়ে আসছে ওগুলো। হয়তো পথরোধ করবে নেমেসিসের।

কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওর কপাল তত ভাল নয়। এক পাশের একটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে দপ-দপ করা বাতি। বড় রাস্তায় উঠে নেমেসিসের পিছু নিল পুলিশের ওই গাড়ি।

গতি সামান্য কমিয়ে ভাবছে রানা, ঝুঁকি নেবে কি না। হয়তো ঠিকই নেমেসিসকে থামিয়ে দেবে পুলিশ। সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে না। কিন্তু দস্যুদের ক'জনের সঙ্গে মোটরসাইকেল। এই তথ্য পুলিশকে পৌঁছে দেয়া উচিত। নিশ্চয়ই দস্যুরা চাইবে দলনেতাকে উদ্ধার করতে। যদি ঘুরে হামলা করে, সেক্ষেত্রে বন্যা বয়ে যাবে রক্তের।

আবারও গতি বাড়াল রানা। নতুন করে পিছু নিল পুলিশের গাড়ির। পেরোতে লাগল ইন্টারসেকশন... কিন্তু এইমাত্র বামের রাস্তা থেকে ছিটকে এসেছে আরেক পুলিশের ক্রুযার। আরেকটু হলে নাকে তুলে নিত মোটরসাইকেল সহ রানাকে। প্রায় খুন হয়ে যেতে গিয়েও আরেক পাশে সরে গেল রানা।

ক্রুযারের লাউডস্পিকার থেকে এল মোটা কণ্ঠ, 'অ্যাই, মোটরসাইকেল আরোহী! দেরি না করে থামো!'

'আরে, আমি ডাকাত না, ওরা সামনে!' মনে মনে বলল রানা। একহাতে দূরের গাড়ি দেখাল। 'ওদেরকে ধরো! আমি তো লক্ষ্মী ছেলে!'

ঝোড়ো হাওয়ার কারণে চাইলেও কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। সতর্ক হয়ে গেল রানা। হাত দিয়ে কিছু দেখিয়ে দেয়া নিরাপদ নয়। যখন-তখন পুলিশের লোক ধরে নেবে, ওর হাতে পিস্তল আছে, সেক্ষেত্রে গুলি করে ফেলে দেবে ওকে।

ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে ধমক দিল পুলিশ অফিসার, 'অ্যাই, ব্যাটা! থাম্! থাম্ বলছি!'

'শালা, তুই কিছুই শুনবি না,' বিড়বিড় করল রানা, 'মাঝখান থেকে ঝামেলা করবি!' থ্রটলে মোচড় মেরে গতি বাড়াল ও। উড়ে চলেছে বাজপাখির মত।

থমকে যাওয়া কেইবল কার পাশ কাটিয়ে সামনের রাস্তায় পড়ল লাবনী। ঐতিহাসিক ট্রামের পেটে এবড়োখেবড়ো গর্ত দেখে বিরক্ত হয়েছেন মেয়র। রাস্তার পাশে ছোট জটলা। ওদিকেই চলেছে পুলিশের একটা গাড়ি। একটু সামনেই দেখা গেল রাস্তায় পড়ে আছে কেউ, গায়ে চামড়ার পোশাক। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে লাশ এড়িয়ে গেল লাবনী। একেবারে শেষ সময়ে কুয়াশার ভেতর দেখল, সামনে পড়ে আছে ছোট কী যেন। চেপ্টে গেল ওটা গাড়ির নিচে।

'হায়, আল্লা!' বিড়বিড় করল লাবনী।

'ওটা কী ছিল?' জানতে চাইলেন মেয়র কালাহান।

'ইয়ে... আমার মনে হয় ওই ডাকাত ওর একটা হাত উপহার দিয়েছে স্যান ফ্রান্সিসকো শহরকে,' একবার শিউরে উঠল লাবনী।

কঠোর চোখে ওকে দেখলেন মেয়র।

জেগে উঠল ড্যাশবোর্ডের রেডিয়ো: 'প্রচণ্ড গতি তুলে ধাওয়া চলছে টেইলর স্ট্রিটে। একদল ডাকাত চলেছে ব্রডওয়ের দিকে। রোডব্লক করা হয়েছে দরকারী সব জায়গায়।'

সামনে চেয়ে আছেন কালাহান। 'ডাকাতরা যদি টেইলর ধরে এগিয়ে যায়, পালাবার কোনও পথ থাকবে না তাদের।'

'কোনও না কোনও প্ল্যান আছে,' গতি বাড়িয়ে বলল লাবনী। 'নইলে ডার্ট বাইক বা নেমেসিস ব্যবহার করবে কেন? আসলে রাস্তা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় তারা।'

'টেইলর স্ট্রিটে তাদের কোনও সুযোগ নেই,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন মেয়র কালাহান। পরক্ষণে লালচে হলো মুখ। 'কিন্তু সত্যি যদি কুলব্রিদ পার্কে...'

ডাকাত দলের মোটরসাইকেল আরোহীরা গতি কমিয়ে উঠে এল টিলার চূড়ায়। কয়েক সেকেণ্ড পর তাদেরকে ধরে ফেলল নেমেসিস। টেইলর স্ট্রিট প্রায় খাড়া হয়ে পাহাড় থেকে নেমে মিশে গেছে গ্রিন স্ট্রিটের এক ইণ্টারসেকশনে। ওখানে অপেক্ষা করছে রোডব্লক। পুরো দুই ব্লক আটকে দেয়া হয়েছে, বেরোতে পারবে না কেউ।

অন্তত গাড়ি নিয়ে কোথাও যাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু রোডব্লকের আগে পুবে ছোট এক পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়ার প্রথম কবি লরেটের নামে রাখা হয়েছে ওটার নাম। বেশ কয়েক ধাপে তৈরি টিলাময় ছোট্ট স্বর্গভূমি। চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। তার মাঝে সাবধানে তৈরি করা হয়েছে বেশ কিছু ফ্ল্যাট বাড়ি। ওগুলোকে ঘিরে রেখেছে ফুলের গাছ ও ঝোপঝাড়।

কিন্তু নীরব সুন্দর পরিবেশ খানখান হলো মোটরসাইকেলের গর্জনে। তাদের দলের কয়েকজনের বাইক ঝাঁকি খেয়ে উঠতে

লাগল পার্কের রাস্তা ধরে। অন্যরা কিছুই পাত্তা না দিয়ে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে উঠে গেল টিলার গা বেয়ে। চাকার এবড়োখেবড়ো থ্রেড খুবলে তুলল ঘাস ও ছোট আগাছা।

মোটরসাইকেলের পিছু নিয়ে নেমেসিসের গতি একটু কমিয়ে আনল জ্যাক রিচি, বামে গিয়ে চলল পার্কের সদর গেট লক্ষ্য করে। লো-রেঞ্জ গিয়ার ফেলে উঠছে খাড়া বাঁকে, ছিঁড়েখুঁড়ে দিল ফুলের চওড়া ব্লেড। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও নামতে লাগল ঢাল বেয়ে, ব্যবহার করছে ফোর-হুইল-ড্রাইভ, মাটি খামচে ধরছে পুরু ও চওড়া চারটে উঁচু চাকা।

এদিকে টিলার চূড়ায় উঠে থামল পুলিশের প্রথম ক্রুযার— কোনও উপায় নেই যে আবারও ধাওয়া করবে ডাকাতের গাড়ি বা মোটরসাইকেল। ক্ষোভের কারণে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল এক অফিসার, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেই গুলি করতে চাইল। কিন্তু তখনই ঢালু জমির আড়ালে চলে গেল নেমেসিস।

'হুঁশিয়ার, সামনের পথ ছাড়ুন!' চেঁচিয়ে উঠেই তুমুল বেগে মোটরসাইকেল নিয়ে পার্কে ঢুকে পড়ল রানা, তার আগে চাপড় মেরে অফিসারের হাত থেকে ফেলে দিয়েছে পিস্তল। ওর মনে হয়নি বুদ্ধিমানের কাজ হবে পিঠে গুলি খাওয়া।

নানান দিকের গাছ এড়িয়ে লাফ দিতে দিতে পার্কের একের পর এক ধাপ বেয়ে নেমে চলেছে ও। আরও নিচে ঝোপ ভেঙে পথ করে নিচ্ছে নেমেসিস। কিন্তু তখনই জোরালো ধুম আওয়াজ পেল রানা। পরক্ষণে নতুন করে গর্জে উঠল শক্তিশালী জিপের ইঞ্জিন, চলে যাচ্ছে দূরে। আরেক রাস্তায় পৌঁছে গেছে ডাকাতের দল।

কিন্তু সামনে কী আছে, জানা নেই রানার। শক্ত হাতে ধরল হ্যাণ্ডেলবার। ঝোপ ভেঙে নেমে চলেছে প্রচণ্ড গতি তুলে।

পরক্ষণে টের পেল, সাঁই করে খসে পড়ছে বর্তমান ধাপের কিনারা থেকে মস্ত গর্তে! কয়েক সেকেণ্ড পর নড়ে গেল ওর বত্রিশ দাঁত। ভীষণ এক ঝাঁকি খেয়ে নেমে পড়েছে ভ্যালেযো স্ট্রিটে।

এখনও পেছনে শুনছে সাইরেনের ওঁয়াও-ওঁয়াও।

পুলিশবাহিনীকে কাঁচকলা দেখিয়ে দিয়েছে ডাকাতদল, আপাতত তাদেরকে ধরতে পারবে না কেউ।

কিন্তু সব অনুসরণকারীকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি তারা।

থ্রটল মুচড়ে ইঞ্জিনের গর্জন তুলল রানা, পরক্ষণে ঢালু পথে ছিটকে রওনা হলো নেমেসিসের পেছনে। বিড়বিড় করে বলল, 'এত সোজা নয় পালিয়ে যাওয়া!'

মেয়র কালাহানের দুশ্চিন্তা বাস্তবে রূপ নিল, রেডিয়োতে ডেসপ্যাচার জানাল, কুলব্রিদ পার্কের মাঝ দিয়ে চলে গেছে ডাকাতের দল। ধরতে হলে ঘুরপথে যেতে হবে পুলিশকে।

হাল ছাড়ার মেয়ে লাবনী নয়, মেয়রের কাছে জানতে চাইল, 'কোন্ দিক দিয়ে গেলে মাঝপথে তাদেরকে ঠেকাতে পারব?'

'তারা যাচ্ছে পুবে, কাজেই আপনাকে যেতে হবে ডানদিকে,' বললেন মেয়র। সামনেই ইন্টারসেকশন। গতি না কমিয়েই বাঁক নিল লাবনী। কিন্তু হায়-হায় করে উঠলেন কালাহান, 'আরে আরে, এই বাঁকে নয়! এই পথে গেলে...'

পথ জুড়ে আসছে বড় একটা হেডলাইট!

'সর্বনাশ, হায়, আল্লা!' আঁৎকে উঠল লাবনী।

'মাই গড! খুন হয়ে গেলাম!' প্রায় কেঁদে ফেললেন মেয়র।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ফুটপাথে ক্রুযার চাপিয়ে দিল লাবনী। টুং-টুং শব্দ তুলে জ্যাকসন স্ট্রিট ধরে আসছে কেইবল কার।

পুলিশের গাড়ি ঘষটে তুলল পাশের বাড়ির দেয়ালের রং ও প্লাস্টার। নানান দিকে ছিটকে গেল লালচে ফুলকি। গাড়ির উইং

মিরর ভেঙে দিয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে পেরিয়ে গেল ট্রাম।

'ঠিক আছে,' গাড়ির ভেতর সোজা হয়ে বসল লাবনী, 'এরপর থেকে আগেই বলবেন কোন্ দিকে যেতে হবে।' টিলার দিকে উঠে আসছে এক গাড়ি। লাবনী নতুন করে রওনা হতেই পুলিশের ঝলমলে বাতি দেখে পথ ছেড়ে দিল ওই গাড়ির ড্রাইভার। 'আপনি এই শহরের লোক, আপনারই জানার কথা এরপর কোন্ দিকে যাবে ডাকাতরা।'

আবারও প্রচণ্ড গতি তুলে ছুটছে পুলিশ ক্রুযার। বসা থেকে কাত হয়ে পড়ে যাওয়া ঠেকাতে শটগান র‍্যাক আঁকড়ে ধরলেন কালাহান। শুকনো গলায় বললেন, 'আমি... ঠিক জানি না। যদি শহর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তাদেরকে যেতে হবে বে ব্রিজ বা গোল্ডেন ব্রিজ ধরে। কিন্তু ও-দুটোর দিকে যাচ্ছে না তারা।'

'তারা যে পথে চলেছে, সেদিকে কী আছে?'

'শুধু মেরিনা। মাত্র এক মাইল দূরেই উপসাগর।'

'নিশ্চয়ই তাদের জন্যে বোট অপেক্ষা করছে,' চট্ করে বুঝে গেল লাবনী। রেডিয়ো দেখাল মেয়রকে। 'পুলিশে যোগাযোগ করুন। জানিয়ে দিন, তারা যেন সাগরতীরের দিকে চোখ রাখে।'

আঁকাবাঁকা সব পথে শহরের মাঝ দিয়ে গেছে দস্যুদের কনভয়। এখন চলেছে পুব তীরের দিকে। একটু পর পেরোবে ইউনিয়ন স্ট্রিট। ওই পথ সোজা উঠেছে পশ্চিমের টেলিগ্রাফ হিলে। চূড়ায় ওই পার্কের ওপরের অংশে রয়েছে সাদা পিলার, কইট টাওয়ার।

একবার আয়নায় পেছন দিক দেখে নিল জর্জ মাইকেল। এখনও কুয়াশার ভেতর তাদের পিছু নিয়ে আসছে একটা হোণ্ডা। কেন যেন উৎকণ্ঠায় পেটে গিঁঠ পাকিয়ে গেল তার। এত কিছু করেও হয়তো নরকের পিশাচটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না! প্রতিটি পদক্ষেপে সব ভেবেচিন্তে পথ তৈরি করেছে সে। চুপ

করে কয়েক সেকেণ্ড ভাবল মাইকেল, তারপর রেডিয়ো তুলে নতুন নির্দেশ দিল দলের অন্যদেরকে।

সামনের পথ এতই খাড়া, হাপরের মত হাঁফিয়ে উঠছে শক্তিশালী এক্সআর৬৫০আর মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন। ওপরে টিলার চূড়া দেখল রানা, ওই জায়গায় পৌঁছে আবারও নেমে গেল নেমেসিস। গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ওটা। গতি একটু কমিয়ে নিল রানা, অচেনা পথের কিছুই না জেনে শূন্যে ছিটকে উঠতে চায় না।

টিলার পুবে অনেকটা হালকা কুয়াশা। দূরে আবছা দেখা গেল বে ব্রিজের বাতি। দু'দিকে চলে গেছে সামনের পথ। নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে ডান দিকেরটা, বামেরটা কিছুক্ষণ নেমে একই কাজ করেছে।

আশপাশে কোথাও নেই নেমেসিস।

গেল কোথায় ওটা?

নিচে কোথাও থেকে এল ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ। বামের পথ বেছে নেবে, ঠিক করল রানা। সামনে টিপটিপ করছে বাতি। ওদিকে চলছে নির্মাণ কাজ। খাড়া টিলার ওপর কোনও বাড়ি। গতি তুলে বাঁক নিয়েই একপশলা গুলির মুখে পড়ল ও।

এসব বুলেট এমপিফাইভকে সাবমেশিন গানের। পথের শেষে প্রায় ধসে পড়া একটা বেড়ার ওখানে মোটরসাইকেলে বসে গুলি করছে এক দস্যু। রানা দেখল, ঢালু জঙ্গুলে পথে হারিয়ে যাচ্ছে নেমেসিস। কিন্তু এসব দেখার সময় এখন নেই, আগে জানে বাঁচতে হবে। ঘুরে গিয়ে ভেগে যাবে, সেই সুযোগও নেই ওর।

থ্রটল পুরো খুলে নিচু একটা ব্যারিয়ার চুরমার করে দিল রানা, প্লাস্টিকের পাতলা কাভার বা দেয়াল উড়িয়ে ঢুকে পড়ল সামনের বাড়ির ভেতর। নানান দিকে ছিটকে গেল নির্মাণ কাজের জন্যে

ব্যবহৃত বাতি।

রানার পিঠে অস্ত্র তাক করেছে শত্রু, চিন্তা নেই তার। প্লাস্টার বা যে-কোনও কিছু ভেদ করবে নাইন এমএম সাবমেশিন গানের গুলি।

গতি তুলছে রানা, মুখ ও হাতে ছিটকে লাগছে আবর্জনা ও জঞ্জাল। বাইকের চাকার তলে ফুটফাট শব্দে ফাটছে রঙের কৌটা।

কাছ দিয়ে গেল একরাশ গুলি। এদিকে ঝড়ের বেগে পৌঁছে গেছে বাড়ির পেছনের দেয়াল।

থামল না রানা, প্লাস্টিকের আরেকটা কাভার উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল খোলা আকাশের তলায়। সামলে নিয়ে হোণ্ডা থামাবার আগেই দেখল, অন্তত বিশ ফুট নিচে টিলার ঢাল।

ওখানে পড়েই পরক্ষণে নেমে গেল আরও পাঁচ ফুট নিচের এক বাড়ির ছাতে। ওখান থেকে একটু দূরে সিঁড়ির ধাপের মত নেমেছে টেরেস। প্রাণপণে ব্রেক কষেও টের পেল, যে গতি তুলে চলেছে, সোজা কিনারা থেকে খসে পড়বে অনেক নিচে।

ধুপ-ধুপ কয়েকটা আওয়াজ তুলে আরও নিচের এক বাড়ির ছাতে নামল রানা। ছাত কামড়ে ধরতে চাইছে মোটরসাইকেলের চাকা, স্কিড করছে, কিন্তু থামছে না!

'সর্বনাশ!' ফিসফিস করল রানা, পরক্ষণে নামল শেষ বাড়ির ছাতে। দাঁতে-দাঁত চেপে ব্রেক কষছে। ওর কপাল ভাল, ছাতের কিনারা থেকে এক ফুট দূরে শেষ পর্যন্ত থামল মোটরসাইকেল।

চেয়ে দেখল রানা, বেশ নিচে গাছের চূড়া! ভয় ও উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে ওর দু'হাত। ডানে গাছ ভরা ঢালু পথে নেমে চলেছে আলো। দূরে টিলার পায়ের কাছে রাস্তা। চূড়ায় পৌঁছে থমকে গেছে পুলিশবাহিনী।

শোনা গেল সাইরেনের মত তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের অপার্থিব এক

হাহাকারের চিৎকার: 'স্টিইইভ! ওহ্, স্টিইইইভ ওয়ার্নার!'

চট্ করে ছাতের চারপাশ দেখল রানা, কোথা থেকে এল ওই ভুতুড়ে আওয়াজ? সময় নষ্ট না করে জরুরি কাজে মন দিল, যেভাবে হোক মোটরসাইকেল নিয়ে নামতে হবে ছাত থেকে।

ডানে, নিচেই বেরিয়ে থাকা ঝুল বারান্দা। ওখান থেকে দিনে পরিষ্কার চোখে পড়বে নীল উপসাগরের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। হ্যাণ্ডেলবার ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবল রানা, মোটরসাইকেলের ওজন নেবে তো বারান্দা?

তখনই শুনল ভয়াবহ এক প্রলম্বিত করুণ আর্তচিৎকার!

বুঝি তীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে ভয়ঙ্করভাবে খুন হয়ে গেল কেউ!

ওদিকে মন না দিয়ে, ভারী পাথরের মত মোটরসাইকেল নিয়ে ধুপ করে দুর্বল ঝুল বারান্দায় নামল ও।

থরথর করে কেঁপে উঠলেও রয়ে গেল মেঝে।

বামে জানালার পর্দা সরিয়ে রাখা, মৃদু হলদে বাতি জ্বলছে ঘরে।

ওখানে অদ্ভুত দৃশ্য!

দামি সোফায় উলঙ্গ এক সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে অতিব্যস্ত ছিল উদোম যুবক, মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে ঝট্ করে চাদর দিয়ে প্রেয়সীকে ঢেকে অবিশ্বাস্য গতিতে পরল আণ্ডারওয়্যার!

বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখছে তারা দু'জন।

স্যালিউট, দ্রুত আণ্ডারপ্যান্ট পরায় চ্যাম্পিয়ন যুবক, আমি তোমার কাছে স্রেফ শিশু, মনে মনে স্বীকার করল রানা। একটু এগিয়ে কাঁচের দরজায় ঠক-ঠক করে টোকা দিল।

পরস্পরকে দেখল যুবক-যুবতী, তারপর এসে স্লাইডিং ডোর খুলল যুবক। 'আপনি?'

'এই এলাম আর কী,' শুকনো হাসল অপ্রস্তুত রানা। 'খুবই সুন্দর সন্ধ্যা! আসতে পারি ঘরে? বিরক্ত করব না। এখনই চলে

যাব।'

ক'সেকেণ্ড কী ভেবে সরে গেল যুবক। মৃদু গতি তুলে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘরে ঢুকল রানা। চওড়া হাসি দিল যুবকের দিকে। আগেই দেখে নিয়েছে, চাকার প্যাচপেচে কাদা লেপ্টে গেছে দামি কার্পেটে। 'ভাববেন না, পরিষ্কারের সব খরচা দেবে দ্য ইণ্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সি। তাদেরকে শুধু বলবেন এই জঘন্য ময়লা করেছে মাসুদ রানা।'

'ঠি-ঠিকাছে,' মাথা দোলাল যুবক। চাদর ভাল করে গায়ে মুড়িয়ে নিয়ে ঘরের ওদিকের দরজা খুলল মেয়েটা।

যুবকের পিছু নিয়ে সংক্ষিপ্ত করিডোরে মোটরসাইকেল নিয়ে এল রানা। সামনেই পড়ল সিঁড়ি। নেমে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল যুবক।

সাবধানে সিঁড়ি ভেঙে নিচের দরজা পেরিয়ে থামল রানা। সামনে সরু পথ সোজা উঠেছে বড় রাস্তায়। টিলা ঘুরে যেতে হবে না ওকে, সরাসরি পিছু নিতে পারবে দস্যুদের। একবার যুবককে দেখল রানা, তারপর 'আসি, আবার দেখা হবে,' বলে রওনা হয়ে গেল। টিলার ওপর থেকে মনে হচ্ছে, সামান্য দূরেই নেমেসিস। নতুন উদ্যমে গতি তুলল এক্সআর৬৫০আর মোটরসাইকেল।

ঢালু পথের নিচের অংশে পৌঁছে গেছে আর্টিফ্যাক্ট লুটেরাদের মোটরসাইকেল। সামনেই দীর্ঘ চেন লিঙ্ক ফেন্স। ওটা পেরিয়ে গেলে তারা পড়বে স্যানসম স্ট্রিটে। আগেই লোহার শেকল কেটে রেখেছে জর্জ মাইকেল। মোটরসাইকেলের চাকার স্পর্শ লাগতেই খসে পড়ল শেকলের নির্দিষ্ট অংশ। পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল পেছনের মোটরসাইকেল আরোহী। তিন সারি শেকল ধাক্কা মেরে ছিঁড়ে দিল নেমেসিস, উপড়ে পড়ল বেশ কয়েকটা খুঁটি।

একবার পেছনের টিলা দেখল জর্জ মাইকেল। ছারপোকার

মত ওই বিরক্তিকর লোকটা আর জ্বালাতে আসছে না। মৃদু হাসল সে। সামনেই উত্তর দিকে যাওয়ার পথ। দেরি হবে না মেরিনায় পৌঁছুতে। অনেক রোডব্লক সরিয়ে এদিকে আসতে হবে পুলিশের লোকদের। তাদের দুই দলের মাঝে আকাশে মাথা তুলেছে টেলিগ্রাফ হিল। কাজেই চিন্তা নেই।

'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি,' মোটরসাইকেল আরোহীদের পেছনে যেতে যেতে খুশি হয়ে বলল জর্জ মাইকেল। 'শেষ কাজটা খুব সহজেই সেরে ফেললাম, কী বলো?'

'এখনও সব কাজ শেষ হয়নি,' বলল রিচি।

মুখ বিকৃত করল মাইকেল। 'তুমি সত্যিকারের নিরাশাবাদী। আরে, হাসো! কয়েক দিন পর বউ-বাচ্চার সঙ্গে দেখা হবে। বড়লোক হয়ে গেছ!' ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে এল সাইরেনের বিলাপ। ওটা অনেক পেছনে। 'এবার কে ঠেকাবে আমাদেরকে!'

উত্তর দিকে বাঁক নিল লাবনী, হালকা হয়ে উঠেছে কুয়াশা। অনায়াসেই গতি তুলছে ওরা। আশপাশের গাড়ির ড্রাইভার পথ ছেড়ে দিচ্ছে ওদের সাইরেন শুনে।

আবারও রেডিয়ো নিয়ে পড়লেন মেয়র। 'আমি মেয়র, আমরা আছি স্যানসমে। এদিকের অফিসাররা কোথায়?'

'ইউনিটগুলো ক্যালহুন টেরেসে পৌঁছে ডাকাতদেরকে হারিয়ে ফেলেছে,' রিপোর্ট দিল ডেসপ্যাচার।

'জায়গাটা কোথায়?' জানতে চাইল লাবনী।

বামের খাড়া রাস্তা দেখালেন মেয়র। 'টিলার চূড়ায় আছে ওরা। সামনে একের পর এক ছয়টা রোডব্লক, আশপাশে কোনও রাস্তা নেই।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে তারা ব্যবহার করছে অফ-রোডার। আর কতটা সামনে মেরিনা?'

'নয় বা দশ ব্লক দূরে।'

জানার উপায় নেই কতটা সামনে ডাকাত দল, কিন্তু অন্তর থেকে তাড়া অনুভব করছে লাবনী। গতি আরও বাড়াতে দাবিয়ে দিল অ্যাক্সেলারেটর।

টিলার ঢালু শেষ অংশে পিছলে নামল এক্সআর৬৫০আর হোণ্ডা, চাকার নিচে পিষে গেল খুদে সব গুল্ম। শেকল ও দুমড়ে যাওয়া খুঁটির ওপর পড়ল হেডলাইট। ছেঁড়া শেকল পেরিয়ে চারপাশ দেখল রানা। দক্ষিণে সাইরেনের আওয়াজ। উত্তর দিকে পরিচিত ভি-এইট ইঞ্জিনের কর্কশ গর্জন।

ইঞ্জিন রেভ করে আবার দস্যু দলের পিছু নিয়েছে রানা।

স্যান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের পাশ দিয়ে গেছে এমবারক্যাডেরোর দীর্ঘ, চওড়া পথ। মাত্র কয়েক শ' গজ দূরেই মেরিনা। নেমেসিস পৌঁছবার আগেই ফুটপাথে উঠেছে মোটরসাইকেল আরোহীরা। জ্যাক রিচিকে ওখানে গিয়ে থামতে বলল জর্জ মাইকেল।

জেটিতে তাদের জন্যে আছে শক্তিশালী দুটো স্পিডবোট। এবার শুধু কোডেক্স তুলতে হবে একটায়, তারপর উপসাগর পেরিয়ে উধাও হয়ে যাবে তারা। একটা বোট যাবে পুবে অকল্যাণ্ডের দিকে, অন্যটা উত্তরদিকে মেরিন কাউণ্টি লক্ষ্য করে। কপাল ভাল যে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করছে ঘন কুয়াশা। চাইলেও কেউ চট্ করে বোট নিয়ে অনুসরণ করতে পারবে না। পরিবেশ এতই খারাপ, আকাশে উঠবে না কোনও হেলিকপ্টার। আজ রাতে দামি কোনও মিসাইল ব্যবহার করতে হবে না।

ফুটপাথে নেমেসিস চাপিয়ে দিয়ে কড়া ব্রেক কষল রিচি। গাড়ি থেমে যেতেই লাফিয়ে প্যাসেঞ্জার সিট থেকে নামল মাইকেল। এরইমধ্যে দু'বোটের একটায় উঠেছে দলের

বেশিরভাগ লোক। এখনও তীর থেকে সরেনি ওই বোট। অন্যটার ড্রাইভার অপেক্ষা করছে মাইকেল, রিচি ও অন্য মোটরসাইকেল আরোহীর জন্যে।

'রিচি আর আমি আর্টিফ্যাক্টের কেস নামিয়ে নিচ্ছি,' মুখের ওপর থেকে ভাইযর সরাল মাইকেল। এমপিফাইভকে হাতে দাঁড়িয়ে আছে শেষ মোটরসাইকেল আরোহী, তাকে বলল সে, 'চারপাশে নজর রাখো, কেউ যেন ঝামেলা করতে না পারে। রিচি, এসো!'

এক দৌড়ে নেমেসিসের পেছনে পৌঁছল দুই ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত, খুলে ফেলল বাল্‌বের মত ফোলা দরজা। পাহাড়ি পথে এত ঝাঁকি খেয়েও গ্যাঁট মেরে বসে আছে ভারী কেস, ভেতরে রয়েছে অমূল্য কোডেক্স। দু'জন মিলে স্টিলের কেস তুলে নিয়েই চমকে গেল।

ঝড়ের গতি তুলে আসছে কর্কশ আওয়াজের একটি ইঞ্জিন! ওই গর্জন তৈরি করে শুধুমাত্র হোণ্ডা এক্সআর৬৫০আর!

'শালার হারামজাদা জ্বালিয়ে মারল তো!' তিক্ত কণ্ঠে বলল মাইকেল। সোজা তাদের দিকে ছুটে আসছে জ্বলজ্বলে একটি হেডলাইট! জ্যাক রিচির সাহায্য নিয়ে জেটির দিকে চলেছে দলনেতা, শেষ মোটরসাইকেল আরোহীর উদ্দেশে চিৎকার করল, 'খুন করো কুকুরটাকে!'

নেমেসিস ও মোটরসাইকেলের মাঝে এসে থামল দস্যু, হাতে উদ্যত সাবমেশিন গান!

সাগরের তীরে নেমেসিসের স্থির আলো দেখছে রানা। গাড়িটা নড়ছে না। পেছনে কে যেন অস্ত্র হাতে তৈরি গুলি করতে!

একরাশ বুলেট এল ওকে লক্ষ্য করে!

সিটে প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। জোরালো ঠং-ঠং শব্দে মোটরসাইকেলের সামনের অংশে লাগল কয়েকটা গুলি।

অন্ধ হয়ে গেল এক্সআর৬৫০আর। বেশ কয়েকটা কাঁচের কুচি লাগল রানার গাল ও কপালে। একটা গুলি লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো সামনের চাকা। স্টিলের রিম থেকে ছিঁড়ে নানান দিকে গেল রাবার। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে হ্যাণ্ডেলবার থেকে ছুটে গেল রানার দু'হাত। রাস্তায় কাত হয়ে তুমুল বেগে ছেঁচড়ে চলল মোটরসাইকেল।

পা সরিয়ে নিয়ে একপাশে ছিটকে পড়েছে রানা। ফুটপাথে ধাক্কা খেয়ে প্রায় পাগল হয়ে গেল ব্যথায়। সরসর করে পিছলে চলেছে ভেজা কাঠের ওপর, টান খেয়ে ছিঁড়ল ওর পোশাক। হড়কে গিয়ে সরাসরি নেমেসিস লক্ষ্য করে চলেছে হোণ্ডা!

সরাসরি পথ থেকে লাফিয়ে সরতে চাইল আততায়ী লোকটা, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে অনেক!

তাকে উড়িয়ে নিয়ে জিপের পেছনে গুঁতো দিল ভারী মোটরসাইকেল, তাতে বিশ্রী ধুম-থ্যাচ্! আওয়াজ হলো।

নেমেসিসের পেছনের বুলবার-এ মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জ্বলে উঠেছে আগুন। পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো হোণ্ডার ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। ওই শক ওয়েভের ধাক্কা অন্তত ছয় ইঞ্চি ওপরে তুলল ভারী নেমেসিসের পেছন অংশ। একই সময়ে বিস্ফোরিত হলো অফ-রোডারের বিশাল ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। ফুটপাথ লক্ষ্য করে ছুটল আগুনের মস্তবড় এক কমলা বল! পিছু নিয়ে কয়েক ডিগবাজি দিয়ে ফুটপাথের রেলিং ভেঙে পানিতে ভাসমান স্পিডবোটে নামল নেমেসিস! স্রেফ চিঁড়ে-চ্যাপটা হলো বোটের সবাই। বুকে ভারী জিপ নিয়ে কালো সাগরের ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে গেল লাশবাহী বোট।

বিস্ফোরণের ধাক্কা জর্জ মাইকেলের গায়ে ফেলল রিচিকে, হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন। দলনেতার হাত থেকে ছুটে গেল স্টিলের কেস, গিয়ে থামল জেটির শেষ প্রান্তে। টলমল করছে!

ভারসাম্য হারিয়ে সাগরে পড়বে! ধড়মড় করে উঠে বসেই কেস ধরতে সামনে ঝাঁপ দিল জর্জ মাইকেল।

ওই একই সময়ে কিনারা থেকে টুপ করে খসে পড়ল স্টিলের কেস সাগরে! ছলাৎ আওয়াজ তুলল ওটা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ভাসল, তারপর ওটাকে গিলে নিল নিষ্ঠুর সাগর।

বুদ্বুদগুলোর দিকে আতঙ্ক নিয়ে চেয়ে রইল জর্জ মাইকেল। সাফল্যের কত কাছে পৌঁছে গিয়েছিল সে! এক শ' মিলিয়ন ডলার পেত! আর এখন? চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে অমূল্য ওই সম্পদ! রাগে চোয়াল ফুলে গেল মাইকেলের। লাফ দিয়ে উঠেই ঘুরল, খালিহাতে খুন করবে ওই বদমাস লোকটাকে! সব শেষ হয়ে গেল ওই কুত্তার বাচ্চার জন্যে!

ষাঁড়ের মত রানার দিকে তেড়ে গেল মাইকেল।

ততক্ষণে তৈরি রানা, ঠাণ্ডা মাথায় ল্যাং মেরে ডকের ওপর ফেলে দিল দুর্বৃত্তকে।

দ্রুতগামী মোটরসাইকেল থেকে পড়েছে, দামি কোট এখন ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছড়ে গেছে সারাশরীরের ত্বক, পিঠ পুড়েছে গনগনে আগুনের তাপে— মোট কথা, ভয়ঙ্কর খেপে গেছে বিসিআই এজেণ্ট। ওর শত্রুর মাথায় এখনও ক্র্যাশ হেলমেট। কিন্তু দেহের অন্য অংশ ঢেকে রাখা হয়নি! রানার প্রচণ্ড সব ঘুষি নামল জর্জ মাইকেলের বুক, তলপেট ও ঘাড়ে।

হামলার গতি দেখে ভীষণ চমকে গেছে ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত।

সামলে নেয়ার আগেই ঘাড় চেপে ধরে ডকের পাটাতনে তাকে আছড়ে ফেলল রানা। ওর দু'হাত চলছে পিস্টনের মত। মনে মনে বলছে, 'শালা বেজন্মা! গুলি করিস? এবার দ্যাখ...'

পাশ থেকে পাঁজরে লাথি মেরে রানাকে ছিটকে দূরে ফেলে দিল জ্যাক রিচি। তাল হারিয়ে পিছিয়ে গিয়ে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল রানা। বুকের ব্যথায় অন্ধকার দেখছে চোখে। এগিয়ে এসে

ওর পাঁজরে আবারও লাথি দিল রিচি। ঘুরেই টেনে তুলল দলনেতা মাইকেলকে।

তখনই রাস্তা থেকে এল শটগানের গুলির বিকট আওয়াজ!

জর্জ মাইকেলের পিঠের দিকে ঝাঁঝরা হলো চামড়ার জ্যাকেট। করুণ এক চিৎকার ছেড়ে আবারও ডকে পড়ে গেল সে। দলনেতা বর্মের মত আগলে রেখেছিল বলে মাত্র কয়েকটা ছররা লেগেছে রিচির হাতে। ব্যথা পেয়ে টলতে শুরু করে পিছিয়ে গেল সে। আরেক হাতে শক্ত করে ধরেছে ক্ষত।

তখনই গুঁতো মেরে ফুটপাথে চেপে বসল লাবনীর পুলিশ ক্রুযার। প্যাসেঞ্জার জানালা দিয়ে শটগান বের করে আবারও গুলি করতে চাইলেন মেয়র। 'শালারা! দ্যাখ কেমন লাগে গুলি খেতে!'

'আরও ওপরে!' চেঁচাল লাবনী, 'গুলি যেন মিস্টার রানার গায়ে না লাগে!' আবারও ট্রিগার টিপলেন মেয়র। কানফাটা আওয়াজের পর পর শোনা গেল লাবনীর ধমক: 'ওপরে! গুলি ওপরে! আরে, গাধা!'

দ্বিধায় পড়ে গেছে জ্যাক রিচি। চট্ করে দেখল পড়ে থাকা জর্জ মাইকেলকে। পরক্ষণে মস্ত এক ডাইভ দিয়ে গিয়ে পড়ল অবশিষ্ট স্পিডবোটের আরামদায়ক সিটের কোলে। কুয়াশার ভেতর তার মাথার ওপর দিয়ে গেল আগুনের মত লালচে একরাশ বাকশট। 'পালাও!' বোটের কন্ট্রোলে থাকা লোকটাকে কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল রিচি, 'আরেহ্, জলদি!'

'কিন্তু মাইকেল...'

'আর কিছুই করার নেই! গুলি করছে ওই বদ্ধ-উন্মাদ শালা! মাইকেলের জন্যে বসে থাকলে স্রেফ খুন হব সবাই!'

দুলে উঠেই বাঁক নিয়ে রওনা হলো স্পিডবোট। সময় লাগল না গতি তুলতে। পেছনে রইল সাদা, দীর্ঘ স্রোত। গর্জন ছাড়ছে দুই আউটবোর্ড মোটর।

'দাঁড়া, শালারা! দাঁড়া!' আবারও গুলি করলেন কালাহান। 'আরে! যাস কোথায়? আর আসবি না আমার শহরে?'

'সিটি কাউন্সিলের মিটিঙে এই ভাষায় কথা বলেন?' কড়া ব্রেক কষে থামল লাবনী, নইলে জেটির শেষ প্রান্ত পেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ত পুলিশের ক্রুযার। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে রানার পাশে চলে গেল লাবনী। 'রানা! তুমি ঠিক আছ তো?'

'একদম ঠিক!' দুঃখের হাসি হাসল রানা।

ওই একই সময়ে গাড়ি থেকে নেমে স্পিডবোট লক্ষ্য করে আরও কয়েকবার গুলি করলেন মেয়র। থামলেন বন্দুক খালি হয়ে যেতে।

মাথা তুলে লাবনীকে দেখল রানা, 'ঠিকই আছি। কিন্তু তোমার নারকীয় কোডেক্স নিয়ে ডুব দিয়েছে স্টিলের বাক্স!'

জেটি থেকে সাগরে চোখ রাখল লাবনী। 'ওটা কোথায়?'

কালো পানি দেখাল রানা। 'মরচে ধরবে না তো?'

এগিয়ে এসে ওদের পাশে থামলেন মেয়র, মুখে চওড়া হাসি। 'দারুণ! বুঝলেন, জীবনে এই প্রথম গুলি করলাম!'

'খুব ভাল লাগল, তাই না?' জানতে চাইল রানা।

'তা তো বটেই... না... কক্ষণও না! অস্ত্র আমাদের সভ্য সমাজের বুকে ভয়ঙ্কর এক দগদগে ক্ষত! কক্ষণও আমরা...' চুপ হয়ে গেলেন মেয়র। চোর-চোর চেহারা করে দেখলেন দূরের স্পিডবোট।

এগিয়ে আসছে পুলিশের কয়েকটা সাইরেন।

একটু পর এসে থামল গাড়িগুলো। ফুটপাথে উঠে দৌড়ে এল একদল অফিসার, হাতে অস্ত্র। তাদের একজন বলল, 'মিস্টার মেয়র! আপনি ঠিক আছেন তো?'

'খুবই ভাল আছি,' বললেন মেয়র। আঙুল তাক করে দেখালেন আহত জর্জ মাইকেলকে। 'একে গ্রেফতার করুন!

আটলান্টিস থেকে সংগ্রহ করা আর্টিফ্যাক্ট ডাকাতি করেছে যে দল, সেই দলের একজন সে। বেশ ক'জন নিরীহ মানুষকে খুন করেছে! তাদের ভেতর রয়েছে দু'জন পুলিশ! এইমাত্র তার দলের কয়েকজন পালিয়ে গেছে স্পিডবোটে করে! দেরি না করে তাদের পেছনে পাঠান কয়েকটা পুলিশ স্পিডবোট।' রানাকে দেখালেন। 'এই ভদ্রলোকের চিকিৎসা প্রয়োজন। না-না, এঁকে গ্রেফতার করতে হবে না!'

উৎসাহিত ভঙ্গিতে রানার দিকে এগোচ্ছিল, হতাশ হয়ে কোমরে আবারও হ্যাণ্ডকাফ ঝুলিয়ে নিল অফিসার।

'চেহারা দেখে চেনেন না, কে বা কারা ভালমানুষ?' একটু রেগে গিয়েই বলল লাবনী।

'মিস্টার মেয়র, দেরি না করে ডুবুরি আনতে হবে,' কাজের কথায় এল রানা। 'চোরাই আর্টিফ্যাক্ট এখন পানির নিচে।'

মাথা দোলালেন কালাহান। 'অফিসার্স, শুনলেনই তো।'

'ইয়েস, স্যর!' রেডিয়ো নিয়ে কথা বলতে গিয়েও প্রশ্নবোধক চোখে মেয়রকে দেখল অফিসার। 'ইয়ে... মিস্টার মেয়র?'

'আবার কী হলো?'

'শটগানটা ফেরত দেবেন, স্যর?'

'ও!' অফিসারের হাতে গুলিহীন অস্ত্র ধরিয়ে দিলেন মেয়র।

একহাতে অস্ত্র, অন্যহাতে রেডিয়ো মুখে তুলে বলতে লাগল অফিসার। পাশেই গুঙিয়ে উঠল জর্জ মাইকেল। এইমাত্র কর্কশ হাতে তাকে টেনে দাঁড় করিয়েছে দুই পুলিশ। বন্দির দু'হাত পিঠে নিয়ে আটকে দেয়া হলো হ্যাণ্ডকাফ। উন্নত বিশ্বেও পুলিশ-হত্যাকারীকে খুব কঠোরভাবে পদে পদে শায়েস্তা করা হয়।

দূর থেকে আসছে আরেকটা সাইরেন, কিন্তু সুর অন্যরকম।

অ্যাম্বুলেন্স।

'রানা, তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে,' বলল লাবনী।

'ওখানে পৌঁছে জানব কী হয়েছে কিগানের।'

'তুমি যখন এলে, কী অবস্থা ছিল তাঁর?' জানতে চাইল রানা।

'ওখানে এক ডাক্তার ছিলেন,' বলল লাবনী, 'তাঁর ধারণা, কিগানের ফুসফুসে গুলি লেগে থাকতে পারে, কিন্তু সুস্থ হয়ে যাবে।'

'গুড।'

কয়েক সেকেণ্ড পর মাথায় দপদপে বাতি নিয়ে পৌঁছুল অ্যাম্বুলেন্স।

'চলো, ওটাতে উঠে পড়ি,' বলল লাবনী।

অ্যাম্বুলেন্সের দিকে পা বাড়িয়ে তিক্ত মনে ভাবল রানা, কোন্ এক অদৃশ্য বদমাস রাঁদা মেরে চেঁছে তুলে নিয়েছে ওর নিতম্বের অর্ধেকটা! আরামদায়ক সিটে বসেও হতাশ, বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেচারা। না, একেবারেই শেষ, কিছুই নেই ওর পেছনে!

দেহের নানান দিকে কেটে বা ছড়ে গেছে, কয়েক জায়গায় ছেঁচা খেয়েছে পেশি, কিন্তু আগাপাশতলা দেখে নিয়ে একটু পর রানাকে ছেড়ে দেবেন, আশ্বাস দিলেন হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমের ডাক্তার। লাবনীকে বললেন, 'সামান্য ওষুধ ও মলম ব্যবহারেই মাত্র তিন দিনে ফিট হয়ে উঠবেন মিস্টার রানা।'

কাজেই রানাকে ইমার্জেন্সি রুমে রেখে গুলিবিদ্ধ জন কিগানের খোঁজে চলল লাবনী। অপারেশন থিয়েটারের বাইরে পৌঁছে জানল, এক্সিবিশন হল থেকে এনে এক্স-রের পর সরাসরি অপারেশন করা হচ্ছে জন কিগানের বুকে।

খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে লাবনীর। কিন্তু নার্সরা ভরসা দিল, রোগীর অবস্থা আগের চেয়ে ভাল, একটু পর তাকে কেবিনে দেয়া হবে।

সার্জিকাল ওয়েটিং এরিয়ার দিকে চলল লাবনী। তখনই দেখল হাসপাতালের প্রধান প্রবেশ পথের পাশেই গিফ্‌ট্ শপ।

কিগানের বলা কথা মনে পড়তেই ওখান থেকে সবচেয়ে দামি বেলজিয়ান কালো চকলেট কিনল।

সার্জিকাল ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দেখল পরিচিত একটা মুখ। মাঝবয়সী এই ডাক্তারই এক্সিবিশন হলে ফার্স্ট-এইড দিয়েছিলেন কিগানকে। সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করল লাবনী, 'রোগীর অবস্থা এখন কেমন, ডক্টর? কতক্ষণ ধরে অপারেশন থিয়েটারে?'

'আন্দাজ ত্রিশ মিনিট,' বললেন ডাক্তার। 'ঝামেলা না করেই বেরিয়ে গেছে বুলেট। কপাল ভাল। সামান্য ঘষা দিয়ে গেছে ফুসফুসকে। আর এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে গেলে...'

ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল লাবনী। 'সুস্থ হয়ে উঠবে তো?'

'তা-ই তো মনে হয়। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পেশি, কাজেই ব্যথা থাকবে কিছুদিন।' আরও কী সমস্যা হতে পারে, ধীরে-সুস্থে বলছেন ডাক্তার। ওদিকে তেমন মনোযোগ দিল না লাবনী। বড় কথা, বড় ভাইয়ের মত মানুষটা সুস্থ হয়ে যাবে।

বিশ মিনিট অপেক্ষার পর খুলে গেল অপারেশন থিয়েটারের দরজা, চাকাওয়ালা গার্নিতে শুইয়ে বের করে আনা হলো জন কিগানকে। লাবনী প্রথমে ভেবেছিল তিনি অজ্ঞান, কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় পিটপিট করে ওকে দেখলেন কিগান। একবার চোখ টিপলেন।

'ধন্যবাদ, আল্লা!' বিড়বিড় করল লাবনী।

দশ মিনিট পর এক নার্স এসে ওকে খুঁজে নিল। 'ডক্টর আলম? ডক্টর কিগান আপনাকে যেতে বলেছেন।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল লাবনী, নার্সের পিছু নিয়ে চলে এল রিকভারি রুমে। বেডে শুয়ে আছেন কিগান, ফ্যাকাসে মুখ, সারা দেহের নানান দিকে কেইবল ও টিউব। বেডের পাশেই মনিটর, নীরবে রেকর্ড হচ্ছে দেহের দরকারী সব তথ্য। 'জন? এখন

কেমন লাগছে?' গুলি খেলে আবার ভাল লাগবে কী করে—বোকার মত প্রশ্ন করেছে বলে নিজেকে মনে মনে বকল লাবনী।

অক্সিজেন মাস্ক নাক-মুখ ঢেকে রেখেছে, অস্ফুট স্বরে বললেন কিগান, 'ভালই আছি।'

'খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল,' বলল লাবনী।

'আমারও,' হাসতে গিয়ে কেশে উঠলেন কিগান। কড়া চোখে রোগী ও লাবনীকে দেখে নিল নার্স। চট্ করে দেখল মনিটর, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'কোডেক্স কি ফিরে পেলে?' জানতে চাইলেন কিগান।

'সরাতে পারেনি,' বলল লাবনী। গোপন করছে তথ্য, কোডেক্স এখন সাগরের তলে। 'মিস্টার রানা তাদেরকে ঠেকিয়ে দিয়েছেন।'

'গুড! আমার মনে হয় উনি খুব দায়িত্বশীল মানুষ। তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হলে চমৎকার মানাবে। সেরা লোক নয়, তুমি তো জানোই, কিন্তু দ্বিতীয় সেরা হিসেবে তাকে...'

'দুষ্টুমি বন্ধ করুন তো, জন!'

হাসলেন কিগান। ঘাড় কাত করে দেখলেন লাবনীর গলা। দুর্বল হাত তুললেন আটলাণ্টিয়ান লকেটের দিকে। 'কে জানে, সত্যিই হয়তো ওই জিনিস কপাল ভাল করে দেয়।'

'তাই তো মনে হয়। অনেক সৌভাগ্য দরকার আমার।'

'তোমার ওই পচা সৌভাগ্যের একটুকরো আজ সন্ধ্যায় ফুটো করেছে আমার বুক।' লাবনীর হাতের দিকে তাকালেন কিগান। 'সঙ্গে কী? এই বান্দার জন্যে?'

ছোট এক ব্যাগ ভরা চকলেট ওপরে তুলল লাবনী। 'কালো চকলেট। আসার সময় মনে পড়ল, এই জিনিস না আনলে চলবে না।'

'যাক্, আর চিন্তা নেই, এবার সুস্থ হয়ে যাব!' হাসলেন

কিগান। মাথার পাশে রাখলেন প্রিয় চকলেটের প্যাকেট। পরক্ষণে কুঁচকে গেল ভুরু।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল লাবনী। 'নার্স ডেকে আনব?'

'না, ঠিক আছি। কিন্তু... মাথা ধরেছে। হঠাৎ। পড়ে যাওয়ার সময় মেঝেতে ঠুকে গিয়েছিল মাথা। গুলির সময়।' আবারও কুঁচকে গেল ভুরু। এবার আরও বেশি। 'ও, গড! কেমন ঘুরছে সব! কী যেন হচ্ছে!'

হৃৎস্পন্দনের মনিটরে ঘন হয়ে উঁচু হচ্ছে প্রতিটি আলোর কাঁটা। চিন্তায় পড়ে গিয়ে বলল লাবনী, 'আমি এক্ষুণি ডেকে আনছি নার্স।'

'না, দরকার নেই। আমি ঠিক... আমি ঠ্!' প্রচণ্ড ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল জন কিগানের মুখ। শিউরে উঠল দেহ। মনিটর থেকে এল তীক্ষ্ণ অ্যালার্মের শব্দ। এখন আর নীরবে হৃৎস্পন্দন মাপছে না মনিটর, চিৎকার করে জানিয়ে দিচ্ছে, বিপজ্জনক কিছু ঘটছে রোগীর দেহে।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে এক দৌড়ে দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠল লাবনী: 'অ্যাই, কে আছেন! সাহায্য করুন! রোগীর কী যেন হয়েছে!'

কয়েক সেকেণ্ড পর দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন এক ডাক্তার ও নার্স।

মনিটরের রিডিং ইকুইপমেন্ট দেখছে নার্স।

ওদিকে পরীক্ষা করছেন ডাক্তার রোগীকে।

'শ্বাসে সমস্যা নেই,' রিপোর্ট দিল নার্স।

'চোখের তারা বিস্ফারিত, বাম চোখের পাতা বুজে আসছে...' বিড়বিড় করলেন ডাক্তার। কিগানের চোখে পেনলাইট ফেললেন। 'সর্বনাশ! এক্ষুণি অপারেশন রুমে নিতে হবে! নার্স, ডেকে আনো ডক্টর ম্যাককার্টিকে!'

ঘরের আরেক পাশে ছিটকে গিয়ে নার্স ফোন তুলতেই লাবনী

জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ডক্টর? এই তো একটু আগে ঠিক ছিল!'

'হ্যাঁ, ছিল। আমরা গুলির ক্ষত মেরামত করেছি। কিন্তু এখন যা হচ্ছে, তা অন্য কিছু। সম্ভবত সেরেব্রাল অ্যানিউরিযম। মগজে ফেটে গেছে ধমনী।'

'হায়, আল্লা! কী করে?'

ঠাস্ করে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখল নার্স। 'ডক্টর ম্যাককার্ট আসছেন!'

ছুটে এসে ঘরে ঢুকল আরেক নার্স, রোগীকে সরাতে সাহায্য করবে।

অসহায় চোখে লাবনী দেখছে, ভীষণ কষ্টে বিকৃত হয়েছে জন কিগানের মুখ। রোগীকে ঝড়ের বেগে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 'ওকে সাহায্য করুন, ডাক্তার,' নিচু স্বরে বলল লাবনী।

'সাধ্যমত করব আমরা,' রোগীর পাশে করিডোরে ছুটতে শুরু করে জবাব দিলেন ডাক্তার। কিন্তু ভীষণ গম্ভীর তাঁর মুখ।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল লাবনীর।

ডাক্তারের নির্দয় অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, প্রায় প্রাচীন মিশরীয় মামির মত সারাদেহে ব্যাণ্ডেজ মুড়ে, বাম পা সামান্য নেঙচে ইমার্জেন্সি রুম থেকে বেরিয়ে এল তিতবিরক্ত মাসুদ রানা। সবাই অবাক হয়ে দেখছে ওকে। সেদিকে নজর দিচ্ছে না বিসিআই স্টার। বুঝে গেছে, ডক্টর জন কিগানের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়, নইলে এতক্ষণে ওর কাছে ফিরত লাবনী।

এদিক-ওদিক খোঁজ নিয়ে ছোট্ট ওয়েটিং এরিয়ায় এসে লাবনীকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখল রানা।

দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে মেয়েটা।

'কী হয়েছে, লাবনী?' পাশে পৌঁছে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল

রানা। জানে, লাবনীকে ভালবাসে কিগান, আর আর্কিওলজিস্টকে বড় ভাইয়ের মত দেখে মেয়েটা। জটিল এই সম্পর্ক এখন আরও জটিলতর হয়ে উঠেছে মানুষটার অসুস্থতার কারণে।

হাত সরিয়ে মুখ তুলে তাকাল লাবনী। কাঁদতে কাঁদতে ফুলে গেছে চোখ। ফর্সা গালে লোনা জলের দাগ। ওর পাশের চেয়ারে বসল রানা, আস্তে করে ধরল লাবনীর হাত। 'ঠিক আছ? কিগান...'

ঢোক গিলল লাবনী। ফিসফিস করে বলল, 'বাঁচল না! একটু আগেও ঠিক ছিল, বুলেটের ক্ষতের চিকিৎসা করল ডাক্তাররা, কিন্তু...' মিলিয়ে গেল কণ্ঠ। কয়েক সেকেণ্ড পর কাঁপা গলায় বলল, 'ফেটে গিয়েছিল ব্রেনের শিরা।' ডুকরে কেঁদে ফেলল লাবনী। ফুলে ফুলে উঠছে পিঠ।

একহাতে ওকে আগলে রাখল রানা। ওর চেয়ে ভাল কে বুঝবে, প্রিয় বন্ধুকে হারালে কেমন কষ্ট বাজে বুকে!

নীরবে কাঁদছে লাবনী। মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার।

পাঁচ

লাবনীর অফিসের ডেস্কে আছে উপসাগরের তলা থেকে উদ্ধার করা স্টাডা কোডেক্স, ওটার চারপাশে আইএইচএ-র সংগ্রহ করা প্রাচীন ডকুমেন্টের রেফারেন্স ইমেজের অনুবাদ করা কমপিউটার প্রিন্টআউট এবং কয়েক ডজন ফোটোগ্রাফ।

কিন্তু এসব কোনও কাজেই আসছে না। সকালে এসেই পর পর দু'বার অনুবাদ করা সব লেখা পড়েছে লাবনী। এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃতীয়বার পড়বার জন্যে। ওর মন বলছে, এসব পড়ে কোনও লাভ হবে না। যাত্রার প্রথম থেকে এক এক করে প্রতিটি অভিযানের কথা লিখে গেছেন স্টাডা, তার ভেতর রয়েছে কয়েক হাজার তথ্য। লাবনী জানবে কী করে, আসলে কী খুঁজতে হবে? লোকটি অভিযানে গেছেন কমপক্ষে তিনটে মহাদেশে!

প্রাচীন ওই লেখা যতবারই পড়ুক, দরকারী তথ্য খুঁজে নেয়া প্রায় অসম্ভব! অপরাধ বোধ গ্রাস করতে চাইছে লাবনীকে, খচ-খচ করছে বুক। বারবার মনে পড়ছে কী ঘটেছে স্যান ফ্রান্সিসকোয়। অন্তর বলছে, আটলান্টিস থেকে সংগ্রহ করা আর্টিফ্যাক্টের সঙ্গে জন কিগানকে জড়িয়ে নিয়েছিল বলেই খুন হলো মানুষটা!

লোভী কেউ স্টাডা কোডেক্স লুঠ করতে চেয়েছে বলেই খুন হয়েছে কিগান, বারবার নিজেকে বলছে লাবনী। কিন্তু তাতে মন থেকে দূর হচ্ছে না পাপবোধ। নিউ ইয়র্কে ফিরে কিগানের দরকারী জিনিসপত্রের বাক্স খোলার পর থেকেই মন দমে যেতে চাইছে ওর, চোখের সামনে ভাসছে মানুষটার মৃত মুখ।

আটলান্টিসের রহস্যোন্মোচন করতে গিয়েই বেঘোরে খুন হন বাবা-মা, এবার চলে গেলেন শ্রদ্ধাভাজন আর্কিওলজিস্ট জন কিগান। লাবনীর চোখ থেকে নামল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। মাথা নিচু করে নিয়েছে বলেই দেখল না, গত কয়েক দিন ওকে আগলে রেখেছে যে সুদর্শন বাঙালি যুবক, নিঃশব্দে দরজায় এসে থমকে গেছে সে।

'কিগান খুন হলেন সেই দায় এড়াতে পারব না!' বিড়বিড় করল লাবনী। চিবুক বেয়ে টপটপ করে টেবিলে পড়ছে অশ্রু। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ওর কাঁধে হাত রেখেছে কেউ। মুখ তুলে চাইল লাবনী।

'এক তিল দোষ নেই তোমার,' দৃঢ় সুরে বলল মাসুদ রানা। বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে বলে ক'দিনের জন্যে ছুটি নিয়েছে। লাবনীর সঙ্গেই চলে এসেছে নিউ ইয়র্কে, তারপর থেকে বলতে গেলে সর্বক্ষণ আছে স্বজনহীন মেয়েটার পাশে।

'কিন্তু এই কাজে যোগ দিতে না বললে, বা এক্সিবিশনের দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে না দিলে, তিনি মরতেন না।' কষ্ট ও লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢাকল লাবনী।

আলতো করে ওর হাত সরিয়ে নিয়ে নরম সুরে বলল রানা, 'আমার চোখে তাকাও, লাবনী। সত্যিই কিগান খুব ভাল মানুষ ছিলেন। তুমি তাঁকে খুন করোনি। করেছে অন্য কেউ, তোমার কারণে খুন হননি কিগান।'

'কিন্তু... আমি ডেকে না নিলে...' রানার চোখে তাকাল অসহায় লাবনী।

'যে খুন করেছে, সে ধরাও পড়েছে। কাজেই যে অপরাধ তোমার নয়, সেজন্যে নিজেকে দায়ী কোরো না। প্রথম দু'একটা মিশনে প্রিয় কেউ খুন হলে আমিও দোষী ভেবেছি নিজেকে, পরে বুঝলাম, অযথা অপরাধ-বোধ বুকে পুষে রাখা বোকার কাজ।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু মন তো মানছে না...'

'তুমি চাইলে দূরে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে পারি,' প্রস্তাব দিল রানা। 'তাতে হয়তো শান্ত হবে মন।'

অবাক চোখে রানাকে দেখল লাবনী। দুর্ধর্ষ মানুষটার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার ভীষণ লোভ হলো, কিন্তু মনে মনে ধমক দিল নিজেকে। 'না, ঠিক আছে, আসলে কাজে মন দেয়াই উচিত।'

'ভেবেছি ইন্টারপোল এজেন্টকে পরে যোগাযোগ করতে বলব, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সব সামলে উঠছ,' বলল রানা।

'পারতেই হবে,' বলল লাবনী। 'উনি আসার আগেই জানতে

চাই, কী কারণে ডাকাতি হলো কোডেক্স। ইন্টারপোল হয়তো জানে, কেন এরা নানান দেশ থেকে এ ধরনের আর্টিফ্যাক্ট সরাচ্ছে।'

'গুড, তো এসো কাজে মন দেয়া যাক,' সরে এসে ডেস্কের সামনে চেয়ার টেনে বসল রানা। 'এখন পর্যন্ত কী কী জানলে?'

'কিছুই না,' চাপা শ্বাস ফেলল লাবনী। 'মনে হচ্ছে অনুপম মঙ্গেলকারকে অনুবাদের কাজটা দিলেই ভাল করতাম।'

'এসো, মন দিই স্টাডা কোডেক্সে,' লাবনীকে ব্যস্ত রাখতে চাইছে রানা। 'কে আসলে এই স্টাডা?'

'মস্ত এক অভিযাত্রী। কলাম্বাস, কুক বা মার্কো পোলোর সঙ্গে তুলনা চলে তাঁর। মাত্র একটা অভিযানে গিয়ে এই কোডেক্স লেখেন। জানি, আরেক অভিযানে যান দক্ষিণ আমেরিকায়, সেখানে আমরা দেখেছি তাঁর আটলান্টিয়ান সেটলমেন্ট। অন্যসব অভিযানেও হয়তো এমন কোডেক্স লিখেছেন। যদিও আমাদের হাতে তেমন কিছু পড়েনি।'

ইংরেজি লেখা একটা কাগজ তুলে নিয়ে পড়ল রানা। একটু বিস্ময় নিয়ে বলল, 'কোডেক্সের অনুবাদের অংশ?'

'হ্যাঁ। অস্বাভাবিক কিছু দেখলে?'

'হুঁ,' বলল রানা।

'সেটা কী?' সামনে ঝুঁকল লাবনী।

'লেখা হয়েছে মিলিটারি রিপোর্টের ধারায়। বলতে পারো ট্যাকটিকাল অ্যাসেসমেন্ট। যেখানে গেছেন, জেনে নিয়েছেন কতজন লোক, তাদের ভেতর লড়াই করবে ক'জন। এলাকার বর্ণনা নিখুঁত। উঁচু কোন্ অংশ থেকে লড়লে সুবিধে হবে, সেদিকে নজর ছিল। এ ধরনের তথ্য গুরুত্ব পেয়েছে। অভিযাত্রী ছিলেন না স্টাডা, কাজ ছিল স্কাউটের মত চারপাশ দেখে আসা।'

'আটলান্টিয়ানরা লড়াকু জাতি,' বলল লাবনী, 'অন্য জাতের

মানুষের সংস্কৃতি নিয়ে মাথা-ব্যথা থাকার কথা নয়। তাদের কাজ ছিল সব দখল করে নেয়া।' কী যেন মনে পড়েছে, কাগজগুলোর ভেতর খুঁজতে লাগল। ক'সেকেণ্ড পর বলল, 'মনে হয় এটাই... হ্যাঁ। বিশেষ একদল লোকের প্রতি বেশি মনোযোগ দেন স্টাডা।'

'তারা কারা ছিল?'

'একদল হিন্দু সাধু। গঙ্গা নদীর উজানে হিমালয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় স্টাডার। এরপর তিনি যান এক শ' মাইল উত্তর-পুবের তিব্বতে। ওখানে আবিষ্কার করেন সোনালি চূড়া। পরে ওখানেই গড়ে তোলা হয় পর্বতের অভ্যন্তরে মস্ত এক শহর।'

'খুবই মজা হয়েছিল ওখানে,' শুকনো হাসল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল, 'সাধুরা ওখানে কী করছিলেন?'

'অন্ত আগেও ছিলেন তাঁরা,' বলল লাবনী, 'হাজার বছর ধরে বিকশিত হয়েছে হিন্দুইযম। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যসব ধর্মের চেয়ে বহু পুরনো। এই কোডেক্স পাওয়ার অনেক আগেই আমরা জানি...' স্যান ফ্রান্সিসকোর এক্সিবিশন হলে কোডেক্সের যে পাতা খুলে রাখা হয়েছিল, খুঁজে নিয়ে সে অংশে হাত রাখল লাবনী। 'এখানে আছে বৈদিক সংস্কৃত, প্রমাণ করছে আটলাণ্টিয়ানদের অন্তত সমসাময়িক ছিল হিন্দু ধর্ম। অন্য যেসব সংস্কৃত লেখা পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা গেছে, আরও অনেক আগে থেকেই ছিল হিন্দুদের সভ্যতা।'

'সাধুদের সম্পর্কে কী লিখেছেন স্টাডা?' জানতে চাইল রানা।

অনুবাদ করা কাগজে চোখ নামাল লাবনী। '"নদীর ল্যাটিচ্যুড ওয়ান নর্থ থেকে সরে যাই।" আটলাণ্টিয়ান স্কেল ব্যবহার করেছেন। "পরে হাজির হলাম প্রকাণ্ড এক মন্দিরে। ওখানে যাঁরা ছিলেন, কেউ তাঁরা হিংস্র নন। কিন্তু প্রয়োজনে প্রস্তুত ছিলেন তাঁদের পবিত্র পর্বত রক্ষা করতে।" বর্ণনা দিয়েছেন, রুক্ষ পাহাড়ি এলাকায় হামলা করলে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে হবে। ঠিকই

বলেছ, রানা, এই কোডেক্স ট্যাকটিকাল রিপোর্ট। যাই হোক, স্টাডা লিখেছেন: "সম্মানের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন সাধুরা। প্রধান সাধু দেখালেন তাঁদের কাছে রয়ে যাওয়া দেবতার চিত্র। বুঝে গেলাম, ওই দেবতা আসলে ত্রিশূল হাতে প্রকাণ্ড এক পসেইডন। যদিও সাধুরা অন্য নামে তাঁকে ডাকেন।" স্টাডা ভাবতে শুরু করেন, আটলান্টিয়ান জাতির কাযিন এসব সাধু। দু'জাতির মিথোলজিও এক। থিয়োরিটা ইণ্টারেস্টিং। ভাল করে বুঝতে হবে...' ভাবতে গিয়ে মিলিয়ে গেল লাবনীর কণ্ঠ।

কোডেক্সের বুকে টোকা দিল রানা। 'এক এক করে কাজ, লাবনী।'

'হুঁ? ও, হ্যাঁ, কোথায় ছিলাম? হুম, সাধুর কথা ভাবতে গিয়ে অন্যদিকে সরে গেছি! পড়ছি: "প্রধান সাধু বললেন, পসেইডনের দেয়া জ্ঞান থেকে হয়তো বেরোবে জরুরি কিছু জবাব। কিন্তু লিখিত তথ্য নিরাপদে রাখা হয়েছে বহু দূরে। সেসব দেখতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। যখন জিজ্ঞেস করলাম, কতদিন লাগবে। প্রধান সাধু বললেন, তাঁর অনুগতরা চব্বিশ ঘণ্টায় পৌঁছুবে পবিত্র ওই গুহায়, কিন্তু ফিরবে মাত্র একঘণ্টায়। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী করে সম্ভব? প্রধান সাধু হেসে বললেন, পসেইডন দেবতার জানা ছিল অনেক গোপন কৌশল।"'

'টেলিপোর্ট করত নাকি?' মৃদু হাসল রানা।

'কে জানে!' অনুবাদের নতুন পাতা থেকে পড়ল লাবনী, 'হ্যাঁ, অপেক্ষা করলেন স্টাডা। পরদিন কিছু পাথরের ট্যাবলেট নিয়ে এল প্রধান সাধুর অনুগতরা। সেসব ট্যাবলেট ছিল বৈদিক সংস্কৃতে লেখা।' কোডেক্সের অরিচালকাম পাতায় টেক্সট্ দেখাল লাবনী। 'এ অংশটা কপি করা হয়েছিল পসেইডনের জ্ঞান থেকে... একমিনিট!' তুড়ি বাজাল ও। 'আমি আস্ত একটা গাধা!'

'ভুল বললে,' শুধরে দিল রানা, 'তুমি গাধা নও, গাধী।'

ঠাট্টা পাত্তা দিল না লাবনী, 'আরে, ওই দেবতা পসেইডনই নয়— প্রলয়দাতা শিব! বহু সময়ে তাঁকে আঁকা হয়েছে ত্রিশূল হাতে। ওটা তাঁর প্রিয় অস্ত্র।'

'শিব, পৃথিবী ধ্বংসলীলার স্রষ্টা,' বিড়বিড় করল রানা।

'চক্রের ভেতর চলে হিন্দুইযম। চলতেই থাকে। জন্ম, জীবন, মৃত্যু, আবারও পুনর্জন্ম— এমন কী গোটা মহাকাশ এ থেকে মুক্ত নয়। প্রতিবারের মত সঠিক সময়ে সব ধ্বংস করে দেয়ার দায়িত্ব দেবতা শিবের। অর্থাৎ, তিনিই সৃষ্টি করেন পরের চক্র। হিন্দু মিথোলজির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা তিনি। আমরা পসেইডন বলে ধরে নিয়েছি, কারণ স্টাডা তাঁদের সমাজের বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েছিলেন অন্য এক সভ্যতার ওপর। একে বলতে পারো আটলাণ্টিয়ান হ্যাঁকড়ামি। তার মানে, স্টাডা যখন প্রধান সাধুর সঙ্গে আলাপ করে তথ্য নিলেন, সেটা আসলে দেবতা শিব বিষয়ক জ্ঞান। লেখা হয়েছে বৈদিক সংস্কৃত ভাষায়। "জ্ঞান" মানেই ওই ভাষায় বেদ। কিন্তু আবার অন্য অর্থ আছে ওই বেদ-এর। বেদ হিন্দুদের সবচেয়ে পুরনো পবিত্র লিখিত বক্তব্য। যিশু জন্মের অন্তত পনেরো শ' বছর আগে চালু ছিল। কিন্তু শিব দেবতার এসব বেদ আরও বহু বহু আগের। ভাবতে পারো, কোনও এক পাহাড়ি গুহায় রয়ে গেছে ওগুলো? আর সেই গুহা আসলে দেবতা শিবের!'

কোডেক্সের পরের পাতা খুলল রানা। ওখানেও বৈদিক সংস্কৃত লেখা। মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে আটলাণ্টিয়ান ভাষা। 'অনুবাদের শেষ অংশে কী লেখা, লাবনী?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে রানার আর্কিওলজিস্ট মন।

আরেকটা পাতা নিয়ে চোখ বোলাল লাবনী। 'জীবনের চক্র নিয়ে লিখেছে— ধ্বংস ও সৃষ্টি। এসব শুনে খুব ভাল লেগেছিল স্টাডার।' আটলাণ্টিয়ান লেখার অনুবাদ পড়ল লাবনী, 'শিবের

গুহার চাবি স্টাডাকে দেখান প্রধান সাধু। ওই চাবিই এখানে খোদাই করা।' কোডেক্স বন্ধ করে অরিচালকামের প্রচ্ছদ দেখাল।

গভীর খোদাই করা বৃত্তাকার জায়গাটা মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। ওটা হাতের পাঞ্জার সমান হবে। মাঝে সোনা-রুপার কারুকাজ ও পাথরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এক দেবতার মুখ। ঠোঁটে হেঁয়ালিপূর্ণ হাসি। ওই মুখ ঘিরে ছোট পাঁচটা মুখ। সবাই দেবী। 'প্রধান সাধু স্টাডাকে বিশ্বাস করেছিলেন, নইলে শিবের গুহার চাবি কপি করতে দিতেন না। স্টাডা যদি লুটপাট করতে চাইতেন?'

'বৈদিক সংস্কৃততে লেখা অনুযায়ী, ওই গুহা খুঁজে পেলেও ওখানে ঢুকতে পারতেন না স্টাডা। ওই চাবি ব্যবহার করে গুহায় ঢুকবে কেবল সে, যে বুঝবে শিবের সত্যিকারের ভালবাসা।' রানাকে দেখল লাবনী। 'প্রধান সাধু নিশ্চিন্ত ছিলেন।'

'ভাগ্যিস সে সময়ে ডিনামাইট ছিল না!'

'প্রচ্ছদে শিবকে ঘিরে রেখেছেন তাঁর পাঁচ স্ত্রী,' বলল লাবনী। 'একেক সময়ে এক একজন ছিলেন শিবের জীবনে।' দুটো মুখ দেখাল। 'চিনি না সবাইকে, কিন্তু ইনি শক্তি, নারীত্বের দেবী; আর ইনি কালী, মৃত্যুর দেবী। কিন্তু কালীকে অশুভ বা ভুল ভাবার উপায় নেই। আমেরিকানরা মনে করে কালীকে সন্তুষ্ট করতে মানুষ বলি হতো বা হয়, তা কিন্তু মোটেও ঠিক নয়।' বেজে উঠল ডেস্কের টেলিফোন।

লাবনীর সেক্রেটারি লিপি গোমেজ। 'ডক্টর আলম? আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছেন ইন্টারপোল অফিসার।'

'গুড়। প্লিয, পাঠিয়ে দাও।'

ক'সেকেণ্ড পর অফিসে ঢুকল লিপি গোমেজ, পেছনে লম্বা এক ভদ্রলোক। পরনে ফ্যাকাসে নীল সুট। 'ডক্টর আলম? ইনি মিস্টার অঙ্কুর রায়।'

'আসুন,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লাবনী। নাম শুনে বুঝে গেছে, ইণ্টারপোলের এজেণ্ট সম্ভবত ভারতীয়। ত্রিশ মত হবে তাঁর বয়স। লম্বাটে চেহারা, কিন্তু সুদর্শন। কালো চুল টেরি কাটা। 'আমি লাবনী আলম, আর ইনি মিস্টার মাসুদ রানা।'

'অঙ্কুর রায়, ইণ্টারপোল সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর,' বললেন ভদ্রলোক। হেসে করমর্দন্ন করলেন লাবনী ও রানার সঙ্গে। 'খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে।' রোবটের মত অনুপম মঙ্গেলকার এবং তাঁর ঝগড়াটে পাখির মত স্ত্রী মাধুরী মঙ্গেলকারের কথা মনে পড়ে গেল লাবনী ও রানার।

অঙ্কুর রায় হাসিখুশি মানুষ। ইংরেজিতে সামান্য ভারতীয় টান। উষ্ণ ও নির্বিকার। লাবনীর ডেস্কে রাখা আর্টিফ্যাক্ট দেখলেন মিস্টার রায়। 'স্টাডা কোডেক্স?'

'জী,' বলল লাবনী।

প্রশংসা নিয়ে মাথা দোলালেন ইণ্টারপোল এজেণ্ট। 'আমি খুশি যে ক্ষতি হয়নি ওটার। বেশ কিছু দিন ধরে লুঠ হয়ে যাওয়া নানান দেশের আর্টিফ্যাক্টের বিষয়ে একই কথা বলতে পারব না। আমাদের কালচারাল প্রপার্টি ক্রাইম ইউনিট তেমন কিছুই উদ্ধার করতে পারছে না।'

সবাই বসার পর বলল লাবনী, 'বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কিছু ভাল সংবাদ দেব। লুঠেরাদের দলের নেতাকে আমরা সনাক্ত করেছি। ব্রিটিশ লোক। নাম জর্জ মাইকেল। আগে ছিল মার্সেনারি। তার আগে ছিল লণ্ডন পুলিশের একজন অফিসার।'

'পুরনো পেশা বদলে নিয়েছে জাদুর মত,' বলল রানা।

'তাকে ধরা গেল আপনার কল্যাণেই, ধন্যবাদ।'

'তার কী ধরনের শাস্তি হবে?' কঠোর হয়ে উঠল লাবনীর

কণ্ঠ, 'হত্যাকারী সে।'

'আমরা চাই ইউএস সরকারের কাছ থেকে ইন্টারপোলের হেডকোয়ার্টারে তাকে নিতে,' বললেন অঙ্কুর রায়, 'জাতীয় সম্পদ লুঠ করেছে বলে তাকে খুঁজছে অন্তত বারোটা দেশ। তা ছাড়া, লুঠের সময় প্রতিটা জায়গায় খুন করেছে বেশ কয়েকজনকে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা, 'এ-ই সরিয়ে নিয়েছে মাইকেলেঞ্জেলোর ডেভিড আর টেরা-কোটা ওঅরিয়র। তাকে হাতে পাওয়ার জন্যে ড্যাগার হাতে মুখোমুখি হবে ইতালিয়ান আর চিনা কর্তৃপক্ষ।'

চট্ করে একবার রানা ও লাবনীকে দেখে নিলেন অঙ্কুর রায়। 'আরও কিছু জাতীয় সম্পদ চুরি হয়েছে। কিন্তু সেসব দেশের সরকার চাপে পড়বে বলে সব গোপন করছে। নিশ্চয়ই জানেন, কাবা ঘরে নিজ হাতে কালো পবিত্র পাথর বসিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের নবী। আরেকটু হলে ওটা সরিয়ে ফেলত। এরপর থেকে খুব সতর্ক সৌদি কর্তৃপক্ষ। এসব প্রকাশ পেলে তাদের বাদশাহী খতম হয়ে যাবে।'

চুপ হয়ে যাওয়ার পর কী যেন ভাবছেন অঙ্কুর রায়। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'আমরা জর্জ মাইকেলের পেট থেকে তথ্য বের করতে চাই। তাকে দিয়ে প্রাচীন এসব সম্পদ চুরি করাচ্ছে কেউ। আমরা ইন্টারোগেট করলেও এখনও মুখ খোলেনি।' রানার দিকে তাকালেন। 'আসলে এ কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। আপনি হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'আমি?' একটু অবাক হলো রানা। 'কীভাবে?'

ডেস্কে ব্রিফকেস রেখে ওটার ভেতর থেকে বেশ কিছু কাগজ ও ছবি নিলেন ইন্টারপোল এজেন্ট। 'এখানে স্যান ফ্রান্সিসকোয় মারা পড়া লুঠেরাদের ছবি আছে। এরা নানান দেশের মানুষ। নিকারাগুয়ান, ব্রিটিশ, পর্তুগিজ— কিন্তু একসময় এরা প্রত্যেকে ছিল মার্সেনারি।'

কয়েকটা ছবি দেখল রানা। কাউকে চিনল না। অঙ্কুর রায়কে পাশ থেকে দেখে বলল, 'ভালই খোঁজ-খবর নিয়েছেন আমার।'

মৃদু হেসে বললেন ইণ্টারপোল এজেন্ট, 'আশা করি খুব রাগ করেননি?'

'না, তা করিনি।'

'আগেও ঠিক মার্সেনারি ছিলেন না, এখনও আমি বলব, আপনি ট্রাবলশুটার।'

'কারা এরা?' ছবি দেখাল রানা।

দুটো ছবির ওপর টোকা দিলেন মিস্টার রায়। 'চপ যিন্দাল; হেনরি জনসন...'

'চপ যিন্দাল?' বাধা দিল রানা।

'চেনেন?'

'কখনও দেখা হয়নি, কিন্তু নামটা চেনা। আফ্রিকায় কাজ করত। হারারে। ছয় বছর আগের কথা। যারা ওই পেশায় রয়ে যায়, ঠিকই জেনে নেয় কারা এখনও জীবিত। যিন্দাল সেরাদের কেউ নয়। মধ্যস্থতাকারী ধরলে যোগাযোগ করতে পারবেন তার সঙ্গে।'

'মনে হয় না ইণ্টারপোলের সঙ্গে এরা কথা বলবে,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'কিন্তু আপনি হয়তো কথা বলাতে পারবেন। অনেক তথ্য দরকার, তাও নয়। আপনি শুধু জেনে নিলেই হবে, কার কাছ থেকে পয়সা পাচ্ছে সে।'

'বলবে কেন?' মাথা নাড়ল রানা। 'অন্য কিছু ভাবুন। ওদের কেউ মুখ খুলেছে জানালে ঘাবড়ে যেতে পারে জর্জ মাইকেল।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন অঙ্কুর রায়, 'আমরা চুক্তি করতে চাই তার সঙ্গে। এখনও টুঁ শব্দ করছে না, কিন্তু নাকের কাছে মুলো ধরলে কাজ হতে পারে।' আবারও কী যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বললেন, 'মিস্টার রানা, আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন

লিয়ন-এ? আপনার সাহায্য পেলে উপকৃত হব। জর্জ মাইকেলের অন্যান্য মার্সেনারি কানেকশন সম্পর্কে জানতে পারলে, তখন চুক্তির বদলে কড়া হুমকিই হয়তো দিতে পারব।'

'রানা, তুমি লিয়ন-এ গেলে আমিও খুশি হব,' বলল লাবনী, 'সেক্ষেত্রে বুঝব, নিষ্ঠুর খুনিদেরকে যে লেলিয়ে দিয়েছে, হয়তো ধরা পড়বে সেই সত্যিকারের কালপ্রিট।'

ওকে কয়েক মুহূর্ত দেখে নিয়ে বলল রানা, 'একা একা খারাপ লাগবে না তোমার?'

'না।' মাথা নাড়ল লাবনী, চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

নিউ ইয়র্ক ছাড়ার আগেই মেয়েটার নিরাপত্তার দায়িত্ব রানা এজেন্সির কাউকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত, ভাবল রানা। নইলে অস্বস্তি বোধ করবে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ঠিক আছে, মিস্টার রায়, আপনার সঙ্গে যেতে আপত্তি নেই আমার।'

'এক্সেলেন্ট,' বললেন ইন্টারপোল এজেন্ট, 'তো বিমানের টিকেটের ব্যবস্থা করছি, মিস্টার রানা।' প্রাচীন বইটা দেখলেন। 'এবার আসা যাক কোডেক্সের বিষয়ে। ডক্টর আলম, আপনি কি জানতে পেরেছেন কেন এই বই ডাকাতি করতে চাইল জর্জ মাইকেল? বা কেন তাকে কাজে লাগাতে চাইল অন্য কেউ?'

'তার কারণ বোধহয় আঁচ করতে পারছি,' বলল লাবনী। খুলে জানাল, কী কারণে আটলাণ্টিয়ান পসেইডন ও হিন্দু দেবতা শিবের মধ্যে আশ্চর্য মিল। কোডেক্সের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা বের করে দেখাল। 'সত্যি যদি শিবের ওই গুহা আজও রয়ে গিয়ে থাকে, বা ওখানে যদি থাকে প্রাচীন সেসব আর্টিফ্যাক্ট, তো সেসব হবে পৃথিবীর সেরা আর্কিওলজিকাল সম্পদ।'

চিন্তিত মুখে বিদঘুটে অক্ষর দেখলেন মিস্টার রায়। 'বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে রয়েছে প্রাচীন ভারতের গভীর সম্পর্ক। আসলে এ কারণেই প্রায় জোর করে ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছ থেকে আদায়

করেছি এই অ্যাসাইনমেন্ট। হিন্দু আর্টিফ্যাক্ট বিক্রির জন্যে বিশাল কালো বাজার আছে গোটা দুনিয়া জুড়ে। এসব পেতে খুন করতেও দ্বিধা করে না অনেকে। এখন সত্যি যদি ডক্টর আলমের কথা ঠিক হয়, শিবের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া গেলে তা বিক্রি হবে কালো বাজারে হাজার কোটি ডলারে। আগে কখনও এত বড় কাজে হাত দিইনি। সতর্ক থাকতে হবে প্রতিটি মুহূর্ত, নইলে খুন হব বেঘোরে।'

'মিস্টার রায়, কত দিন ধরে ইন্টারপোলের সঙ্গে আছেন?' জানতে চাইল রানা।

'তিন বছর। আগে ছিলাম দিল্লি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে। কাজ ছিল শিল্প লুঠেরাদের খুঁজে বের করা। কিন্তু যেহেতু ভারতীয় প্রচুর শিল্প চলে যায় নানান দেশে, তাই ঠিক করি আমার উচিত ইন্টারপোলে কাজ করা। প্রথম সুযোগেই ট্র্যান্সফার হয়েছি।'

'দারুণ কাজ,' বলল লাবনী, 'নানান দেশ ঘুরে পাকড়াও করেন খারাপ একদল লোককে, চোরাই সব সম্পদ তুলে দেন সত্যিকারের মালিকের হাতে...'

'আপনার কাজের মত অত উত্তেজনা নেই আমার কাজে,' হাসলেন মিস্টার রায়। পাশের একটি ডিসপ্লের ওপর চোখ পড়েছে। 'ওটা কি ইজিপশিয়ান আর্টিফ্যাক্ট?'

ছোট্ট ফিগারিন রক্তের মত লাল। একটু অবাক হয়ে জানতে চাইল লাবনী, 'আপনি চিনতে পেরেছেন?'

'অবশ্যই, মিশরীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিল এই জিনিস পাওয়া গেছে কি না। ডেটাবেস দেখি আমরা। কিন্তু তেমন কিছুই ছিল না। তখন এই ফিগারিন আইএইচএ-তে পাঠিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ, আপনারা যদি বোঝেন জিনিসটা আসলে কী।'

'এখন পর্যন্ত আমরাও বুঝতে পারিনি,' স্বীকার করল লাবনী,

'তাতে হাল ছাড়ব না, তবে শেষে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে ফেরত চাইলে তখন কায়রোয় পাঠিয়ে দেব।'

মৃদু হেসে ফেলল ওরা তিনজন।

দরকারী সব ডকুমেন্ট ব্রিফকেসে গুছিয়ে নিলেন মিস্টার রায়। 'ঠিক আছে, ড. আলম, সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। আর, মিস্টার রানা, ফোন করে আপনাকে জানিয়ে দেব কখন আমাদের ফ্লাইট।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা ও লাবনী। ওদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন মিস্টার রায়, তারপর বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

রানার কাছে জানতে চাইল লাবনী, 'তোমার কি মনে হয় সত্যিই জর্জ মাইকেলের মুখ খোলাতে পারবে?'

মৃদু হাসল রানা। 'বলা মুশকিল, ইণ্টারপোল আমাকে ধারাল কিছু হাতে ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিট একা রাখলে...'

'যাহ্, ইণ্টারপোল তো সেটা করবে না... কিন্তু আমি হলে তোমার হাতে আলপিন দিতাম।' প্যাড দেয়া স্টিলের মস্তবড় এক বাক্সে খুব যত্ন করে কোডেক্স রাখল লাবনী। ভারী ডালা বন্ধ করে বলল, 'আসলে কে চাইছে তা না জানা পর্যন্ত খুব সাবধানে রাখতে হবে কোডেক্স। ...ওরে, বাবা!' হাতির মত ওজনের স্টিলের বাক্স একটু তুলতে গিয়েই নাক-মুখ কুঁচকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। 'পাশের অফিসের ওই নির্লজ্জ-বেয়াদব ব্যাটাকে দেখছি আবারও ডাকতে...'

'আমাকে দাও, ভারপ্রাপ্ত হই!' দু'হাত বাড়িয়ে স্টিলের বাক্স তুলে নিল বীর পালোয়ান রানা, পরক্ষণে ভাবল: 'এহ্-হে, বাপ্‌স্! শালার ওজন তো যে-কারও মোটা বউয়ের চেয়েও বেশি!'

আবছা মট-মট শুনে জানতে চাইল লাবনী, 'তোমার কোমর লচকে গেল না তো?'

'না-না, কিছুই না,' বত্রিশটা দাঁত দেখাল রানা।

'আমার ডেস্কে কিন্তু পেইন-কিলার..'

'আরে, খুন হয়ে যাচ্ছি, পেইন-কিলার দিয়ে কী হবে?' ভাবল রানা: 'এদিকে ছেমড়ি দেখি বলে না কোথায় নিয়ে এই ভয়ানক মাল নামিয়ে বাঁচব!' আরেকবার ধবধবে দাঁত দেখিয়ে জানতে চাইল, 'কই, বলছ না যে, কোথায় নিতে হবে তোমার প্রিয় কোডেক্স?'

'এসো, সোজা গিয়ে ওটা রেখে দেব ভল্টে।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল লাবনী।

'আমি কি আর ততক্ষণ বাঁচব?' বিড়বিড় করল রানা। বিমর্ষ মনে পেছন পেছন হেঁটে চলেছে। কসরত করে গলা স্বাভাবিক রেখে বলল, 'সত্যি, যখন ধাতুর বই তৈরি বন্ধ হলো, নিশ্চয়ই খুবই খুশি হয়েছিল দুনিয়ার সব লাইব্রেরিয়ান!'

এলিভেটরে চেপে মস্ত সেক্রেটারিয়াল দালানের বেসমেন্টে নেমে এল লাবনী ও পর্বতবাহী রানা। চেহারা হাসি-হাসি রাখতে প্রাণপাত করছে। বারবার ভাবছে, দেব নাকি শালার জঘন্য জিনিসটা ফেলে! আবার মনে মনে বলছে, প্রেস্টিজটা ফুটো করে দিস্ নে, লক্ষ্মী-সোনা ভাই, রানা!

এই ফ্লোরের মাঝে বিশাল এলাকা নিয়ে ডেটা সেন্টার। বেশ কয়েকটা কমপিউটার সার্ভার তাদের পেটের ভেতর রাখছে প্রতি দিন ইউএন-এর টেরাবাইট ইনফর্মেশন। কিন্তু লাবনী পথ দেখিয়ে রানাকে নিয়ে চলেছে বিশেষ একটি ভল্টে কোডেক্স রাখতে।

ওই ঘরের সামনে পৌঁছে অতি পরিচিত এক মেয়েকে দেখে বলল লাবনী, 'লিপি!'

ওর সেক্রেটারি ধরা পড়ে লাল হলো লজ্জায়। সিকিউরিটি স্টেশনে বার্টন ক্যাসপার নামের লম্বা এক গার্ডের সঙ্গে গল্প করছিল। দু'জন ভালবাসে একে অপরকে।

ক’সেকেণ্ড পর নিজেকে সামলে নিল লিপি। ‘ডক্টর আলম, হাই!’ পাশে রাখা ছোট্ট কার্ট দেখাল। ওটার ভেতর বেশ কিছু ফোল্ডার। ‘আপনার জন্যে এগুলো নিতে এসেছি।’

‘অনেক ধন্যবাদ,’ মুচকি হাসল লাবনী, ‘কোনও তাড়াহুড়ো কোরো না।’

‘না... আসলে... ওপরে যাচ্ছি,’ বলল লিপি গোমেজ। ভীষণ হতাশ চেহারা হলো যুবক গার্ডের। ওকে ছোট্ট করে গুড বাই বলে কার্ট ঠেলে রওনা হয়ে গেল মেয়েটা।

মৃদু হেসে দ্বিতীয় গার্ডের দিকে ফিরল লাবনী। ভারী দেহের ওই লোকের নাম ল্যারি জ্যাকসন। ‘ভল্টে স্টাডা কোডেক্স রাখতে এলাম।’

‘জী, ডক্টর আলম,’ ব্যস্ত হয়ে কমপিউটারে ডিটেইল দিল সে। তার ফাঁকে বলল, ‘হাই, মিস্টার রানা, কেমন আছেন? শুনেছি স্যান ফ্রান্সিসকোয় খুব বিপদ হয়েছিল।’ নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের প্রাক্তন ভাল পুলিশ অফিসার হিসেবে আগে থেকেই চেনে দুর্ধর্ষ ওই বাঙালি যুবককে, শ্রদ্ধাও করে।

ভারী ওজন রাখতে গিয়ে চাপা গলায় বলল রানা, ‘ভাল আছি, মিস্টার জ্যাকসন, আপনি ভাল তো?’

‘জী। আমার পেছনে আসুন।’

আসলে সিকিয়োর আর্কাইভের মাত্র একটি অংশ হাই সিকিউরিটি ভল্ট। ওটার বেশিরভাগ জায়গা গোলকধাঁধার মত, সারি সারি গুরুত্বপূর্ণ সব ফাইল ভরা লকার। এখান থেকে গোপন কিছু বের না করেও ক্লাসিফায়েড তথ্য বা ডেটা পড়ার জন্যে এক কোণে রয়েছে রিসার্চারদের বেশ কিছু টেবিল ও চেয়ার। পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরের ছাত থেকে প্রতিটি অংশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে নিখুঁত ও নির্ভুল ভিডিয়ো ক্যামেরা। ভল্টে ঢুকতে চাইলে ব্যবহার করতে হবে স্টিলের বিশাল এক দরজা। সিকিউরিটি স্টেশন

থেকে সরাসরি দেখা যায় ওটা। দরজার পাশের স্লটে কি-কার্ড ভরল জ্যাকসন, তারপর তাকাল সিকিউরিটি স্টেশনে গার্ড ক্যাসপারের দিকে। নিজের কার্ড আরেকটা রিডার-এ ভরল যুবক, কমপিউটারে তুলে দিল নির্ধারিত কমাণ্ড।

পাখির কূজনের মত অ্যালার্ম জানাল ভারী স্টিলের দরজা খুলবার সময় সরে থাকতে হবে। খুব ধীরে খুলল দরজা। অপেক্ষা করল লাবনী, তারপর জ্যাকসন মৃদু মাথা দোলাতেই পা রাখল ভেতরে। ধীর পায়ে পিছু নিয়ে বৃত্তাকার, বদ্ধ এক ঘরে নিজেকে দেখল রানা। দেয়ালে দেয়ালে স্টিলের দরজাওয়ালা নানান আকারের সব লকার। ঘরের শুরুতেই ছোট্ট ডেস্কে কমপিউটার টার্মিনাল। যারা ভেতরে ঢোকে তাদের এবং কী নিয়ে এসেছে, তার সম্পূর্ণ ওজন মাপে ওটা। এই সিকিউরিটি সিস্টেম রাখা হয়েছে বাইরে কিছু নেয়া ঠেকাবার জন্যে।

ভীষণ শীত লাগছে, চট্ করে ছাতের ভেন্টিলেশন গ্রিল দেখল রানা। মন্তব্য করল লাবনী, 'গ্রীষ্মের সময় এখানে খারাপ লাগে না।' ডেস্কে কমপিউটারকে নিজের সিকিউরিটি কোড দিল। ডেস্কটপে জ্বলে উঠল প্যানেল। ওটার ওপর ডান হাতের তালু মেলে দিল লাবনী। প্যানেলের ভেতরে নড়ছে উজ্জ্বল সব রেখা। পামপ্রিন্ট স্ক্যানার। একটু দূরে সবচেয়ে বড় লকারগুলোর একটার হ্যাণ্ডেলে লাল লেড বাতি সবুজ হতে দেখল রানা।

খুলে গেছে লকারের ডালা!

ওটার ভেতরেই রাখতে হবে নারকীয় বাক্স! দেরি না করে এগিয়ে গিয়ে স্টিলের বাক্স ওটার ভেতর রাখল রানা। টনটনে ব্যথাভরা কোমর সিধে করে ভীষণ গোপনে হাঁফিয়ে নিল ক'সেকেণ্ড। এবার লকারের ডালা বন্ধ করতেই নতুন করে লাল বাতি জ্বলে উঠল হ্যাণ্ডেলে।

'আপনার কাজ শেষ?' দরজার বাইরে থেকে জানতে চাইল

জ্যাকসন। মাথা দোলাল লাবনী। রানা আর ও ভল্ট থেকে বেরোতেই নিজের কার্ড খুলে নিল প্রাক্তন পুলিশ। আবারও কূজন ডাকল অ্যালার্ম, ধীরে ধীরে বন্ধ হলো ভারী স্টিলের মস্ত দরজা।

'এই দরজা ভাঙবে কে,' বিড়বিড় করল রানা।

'আশা করি কেউ চেষ্টা করবে না,' ওকে বলল লাবনী।

ওরা ফিরল সিকিউরিটি স্টেশনে, সই করে দেয়ায় শেষ হলো লাবনীর কর্তব্য। রানাকে বলল, 'ভাবছি বিকেলে বাসায় কিছু কাজ নেব। ওসব অনুবাদ থেকে নতুন কিছু পেলে কাজ এগোবে।'

আবারও এলিভেটরে চাপল ওরা। আইএইচএ ফ্লোরে যেতে বাটন টিপতে গিয়ে কাঁধে খচ্ করে ব্যথা পেল রানা।

ওর মুখ বিকৃত হতে দেখেছে লাবনী, চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'মনে তো হচ্ছে না তুমি সুস্থ!'

'না, তা নয়,' জোর করে হাসল রানা। 'আমি ফুললি ফিট।'

তাতে আরও উদ্বিগ্ন হলো লাবনী। 'তুমি শিয়োর তো, পেইন-কিলার লাগবে না?'

'না, লাগবে না,' বলল রানা। পরক্ষণে স্বীকার করল, 'তবে প্লেনের সিটে বসলে কাঁধের নিচে আর পেছনে দুটো বাড়তি কুশন চাই।'

ছয়

'এখনও কিছুই বলেনি?' জানতে চাইল লাবনী।

'না,' বলল রানা। ওরা দু'জন আছে আটলান্টিক মহাসাগরের দু'তীরে। লাবনী নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশন্স হেডকোয়ার্টারে, এদিকে লিয়ন-এ ইন্টারপোলের হেডকোয়ার্টারে অঙ্কুর রায়ের অফিসে রানা। সারাদিন ধরে জেট ল্যাগ সহ্য করে, তারপর ইন্টারপোল অফিসারদের তদন্তে নানান তথ্য সরবরাহ করে প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে ওর শরীর। কিন্তু এখানে আসার ভাল একটা দিক হচ্ছে, ও জানতে পেরেছে, জর্জ মাইকেলকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাগিয়ে রেখে অস্বাভাবিক দুর্বল করা হয়েছে। এখন সম্ভাবনা আছে, মুখ ফস্কে জরুরি তথ্য জানিয়ে দেবে সে রানাকে।

'কয়েক মিনিট পর নতুন ইন্টারোগেশন দেখতে আমাকে ডাকবেন অঙ্কুর,' বলল রানা।

'অঙ্কুর?' বিস্মিত হলো লাবনী। 'এত জলদি দোস্তি?'

'ভুলে গেলে, আট ঘণ্টা বিমানে ছিলাম? ওঁর জীবনের প্রায় সব কাহিনিই এখন আমার মুখস্থ।'

'যেমন?'

'যেমন: রোজ ভোর সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়ে সোজা টয়লেটে গিয়ে...'

'আহ্, থাক্-থাক্!'

'মাইকেলের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইবে, তখন ঘোলা কাঁচের ওদিকে থাকব। দেখা যাক, জানা যায় কি না, কে ভাড়া করেছে তাকে।'

রেগে গেল লাবনী, 'হায়, আল্লা! চুক্তি কীসের? লোকটা তো ভয়ঙ্কর খুনি!'

'আমিও চাই না চুক্তির কারণে ও মুক্তিলাভ করুক,' বলল রানা। 'দেখা যাক কী হয়। তার কাছ থেকে নানান দেশের আর্টিফ্যাক্ট আদায় করতে চাইলে হয়তো একমাত্র উপায় ওই চুক্তি।'

'তা অবশ্য ঠিক,' আপত্তি নিয়ে বলল লাবনী।

'ভেবো না, চাইলেও আর কোডেক্স চুরি করতে পারবে না,' বলল রানা। এইমাত্র ঘরে ঢুকেছেন অঙ্কুর রায়, হাতের ইশারায় পিছু নিতে বলছেন। 'পরে কথা হবে, লাবনী,' জানাল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল লাবনী। 'ভাল থেকো।'

'তুমিও ভাল থেকো,' ফোন রেখে দিল রানা। ইন্টারপোল এজেন্টের পিছু নিয়ে বলল, 'এখনও ভাঙা যায়নি?'

মাথা নাড়লেন রায়। 'না, বরং আরও বেশি জোরে টিপে রেখেছে দু'ঠোঁট। আমাদের উকিল লোভনীয় প্রস্তাব দিলেও পাত্তা দেয়নি।' এলিভেটরের সামনে পৌঁছল ওরা, লোহার বাক্সে চেপে উঠে এল ইন্টারপোল দালানের আটতলায়। এলিভেটরের দরজা খুলতেই একটু সামনে পড়ল স্টিলের শিক দিয়ে তৈরি সিকিউরিটি গেট। গম্ভীর গার্ডকে পরিচয়-পত্র দেখিয়ে ঢুকে পড়ল ওরা ইন্টারোগেশন এরিয়ায়।

আবছা আঁধার এক ঘরে রানাকে নিয়ে এলেন মিস্টার রায়। মনিটরের সামনে দেখা গেল বয়স্কা এক মহিলাকে। মনোযোগ দিয়ে দেখছেন ভিডিয়ো ক্যামেরার ফিড।

'রানা, ইনি রিনা বাম্পক্যাট,' রানা ও মহিলার পরিচয় করিয়ে দিলেন অঙ্কুর রায়। 'ইন্টারোগেশনের সময় আমার সঙ্গে থাকছেন রিনা।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'একজন খারাপ পুলিশ, আরেকজন ভাল পুলিশ— পুরনো সেই খেলা?'

'নতুন খেলা,' হাসলেন রিনা, 'আমরা দু'জনই ভাল।' অঙ্কুর রায়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন ভারী এক ফোল্ডার। 'এই যে, আমাদের উকিলের এগ্রিমেন্ট। জর্জ মাইকেল সই করে দিলেই আমাদের কাজ শেষ।'

'কী ধরনের সুবিধা দেয়া হবে লেখা হয়েছে?' জানতে চাইল

রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন রিনা বাম্পক্যাট। 'যে ধনী ক্রিমিনালের হয়ে একের পর এক ডাকাতি করছে, সেই লোকের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেবে, ফিরিয়ে দেবে সব চোরাই আর্টিফ্যাক্ট, আর তার বদলে অপেক্ষাকৃত হালকা অভিযোগ তুলব আমরা আদালতে। নইলে সর্বনাশ হবে জর্জ মাইকেলের। এরই ভেতর চাইনিজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, টেরা-কোটা ওঅরিয়র চুরির দায়ে তাদের আইন অনুযায়ী তারা মৃত্যুদণ্ড দেবে। এদিকে মক্কার পবিত্র কালো পাথর লুঠ করতে গিয়েছিল বলে ওর গর্দান চাইছে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ। আসলে মস্ত বিপদে আছে সে। অথচ, ইন্টারপোল সুযোগ দেবে যে-কোনও দেশের আদালতে আত্মসমর্পণ করতে। সুতরাং আশা করি, ভুল করবে না চুক্তি করতে।'

টু-ওয়ে মিররের ওদিকে ইন্টারোগেশন রুম দেখল রানা। ওর হাতে বেদম মার খেয়ে এখনও বেলুনের মত ফুলে আছে জর্জ মাইকেলের চেহারা। ছড়ে যাওয়া চিবুক-গাল-কপালে ভিখারির ছেঁড়া কাঁথার পট্টির মত হরেক রং। চেয়ারে বসিয়ে হাত পেছনে নিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে হ্যাণ্ডকাফে। কিন্তু চিন্তিত মনে হচ্ছে না তাকে। যেন ভরপেট মাছ খেয়ে ঝিম আসছে বিড়াল বাবাজির।

'একটু পরেই বোঝা যাবে কী করবে,' বললেন অঙ্কুর রায়।

রানা চেয়ারে বসার পর দরজা খুলে ইন্টারোগেশন রুমে গিয়ে ঢুকলেন অঙ্কুর রায় ও রিনা বাম্পক্যাট। পেছনে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা। মাইকেলের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দিলেন অঙ্কুর রায়। তাঁর হাতের ইশারায় লম্বা এক টেবিলের ওদিকে বসল মাইকেল। দু'পক্ষ মুখোমুখি বসার পর মুখ খুললেন মহিলা পুলিশ, ব্যাখ্যা করে জানালেন কী ধরনের চুক্তি করতে চান তাঁরা।

নীরবে সব শুনল জর্জ মাইকেল, তারপর ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি নিয়ে বলল, 'প্রস্তাবের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। এবার আমার

প্রস্তাবটা শুনুন। যেসব দেশের কর্তৃপক্ষ নানান অপরাধের জন্যে দায়ী করছে, তারা লিখিত চুক্তি করুক আমার সঙ্গে—কোনওভাবেই যেন কোনও আদালত বা আইন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। শুধু তাই নয়, নতুন পরিচয়ে যেন হারিয়ে যেতে পারি পছন্দমত যে-কোনও দেশে। সেক্ষেত্রে জানিয়ে দেব, কে আসলে ক্রিমিনালদের গুরু। হারিয়ে যাওয়া আর্টিফ্যাক্ট বা সম্পদ তার কাছ থেকে কীভাবে আদায় করবেন, তা আপনাদের বিষয়। এর বেশি আর কিছুই বলার নেই আমার।'

'মাত্র একটা নাম দেবেন, বদলে আপনি চান সাতখুন মাফ?' বিস্ময় নিয়ে বললেন মিস্টার রায়।

'আগেই তো বলেছি, এর বেশি আর কিছু বলার নেই,' সিধে জানিয়ে দিল জর্জ মাইকেল।

এবার একের পর এক প্রশ্ন তুললেন অঙ্কুর রায় ও রিনা বাম্পক্যাট, কিন্তু জবাবে চুপ থাকল মাইকেল। আরও কয়েক মিনিট চেষ্টা করে হতাশ হলেন দুই পুলিশ অফিসার।

মাইকেলের হাতে হ্যাণ্ডকাফ আটকে অবযার্ভেশন রুমে ফিরে এলেন মিস্টার রায় ও মিসেস বাম্পক্যাট।

'ভুল ভেবেছি, আসলে ওই লোক পাকা হারামি,' মন্তব্য করলেন রিনা। 'জানে, বাঁচার উপায় নেই, কিন্তু হাল ছাড়বে না।'

কাঁচের ওদিকে চোখ রেখে বললেন অঙ্কুর রায়, 'যার হয়ে ডাকাতি করেছে, তাকে ভীষণ ভয় তার, নইলে নিজের জন্যে এ ধরনের নিরাপত্তা চাইত না।'

'অথচ ইণ্টারপোল ওই ধরনের নিরাপত্তা দেয়ার অধিকার রাখে না,' মন্তব্য করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন অঙ্কুর রায়। 'তা-ই আসলে। যেসব দেশের সম্পদ লুঠ হয়েছে, সেসব কর্তৃপক্ষ ওগুলো ফেরত পাওয়ার জন্যে ওর ঘাড়ের ওপর থেকে খাঁড়া সরাবে কিনা সেটা তাদের

ব্যাপার।'

জর্জ মাইকেলের দিকে চেয়ে আছে রানা। বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ সরিয়ে বলল, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই। তবে সেক্ষেত্রে আমাকে ওই ঘরে ওর সঙ্গে একা রাখতে হবে।'

'কাজটা উচিত হবে কি না বুঝছি না,' সন্দেহ নিয়ে বললেন রিনা বাম্পক্যাট।

'ভাবছেন পিটিয়ে মেরে ফেলব?' মৃদু হাসল রানা। 'টোকাও দেব না ওর গায়ে। অন্য অ্যাংগেলে ভাবছি। চুক্তি করতে রাজি হয়ে যেতে পারে।'

মনে হলো না রাজি হবেন রিনা, বেশ আপত্তি নিয়ে বললেন, 'আসলে এটা ঠিক স্ট্যাণ্ডার্ড প্রসিজ্যুর...'

'আপনাদের এই কেসও তো সাধারণ কেস নয়,' বলল রানা, 'সেজন্যেই আমাকে এতদূর টেনে আনা। চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী?'

পরস্পরকে দেখলেন দুই পুলিশ অফিসার।

কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা দোলালেন অঙ্কুর রায়। 'ঠিক আছে। আমরা দেখব এখান থেকে।'

ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকে পেছনে দরজা আটকে দিল রানা। ওকে দেখেই চমকে উঠেছে জর্জ মাইকেল। স্যান ফ্রান্সিসকো শহরে মাত্র কয়েক মিনিটে বাদামি ওই বদমাস লোককে ভাল করেই চিনে নিয়েছে সে। কঠোর হয়ে গেল তার চোখ।

'হ্যাঁ, আবারও এলাম,' শীতল এক টুকরো হাসি দিল রানা। 'মনে হলো একটু গল্প না করে চলে যাওয়া অনুচিত। তা ছাড়া, স্যান ফ্রান্সিসকোর বাকি কাজটুকু শেষ করতেই বা দোষ কী!' বাম তালুর ওপর মাঝারি এক ঘুষি বসাল, চেয়ার টেনে বসল ইংরেজ দুর্বৃত্তের সামনে।

চট্ করে একটু দূরের আয়না দেখল জর্জ মাইকেল। 'এটা

তো স্ট্যাণ্ডার্ড প্রসিজ্যুর নয়!’

‘আমি ইণ্টারপোলের হয়ে কাজ করি না।’

‘তা হলে কার হয়ে কাজ করো?’

‘তাতে কিছু যায় আসে না। মূল কথা হচ্ছে, আমি জানতে চাই, তুমি আসলে কার হয়ে কাজ করো। কেউ আমাকে বা আমার প্রিয় কাউকে খুন করতে চাইলে, সেটাকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করি। জানি, এটা পেশাদার মনোভাব হতে পারে না। আমি খুবই আবেগপ্রবণ লোক, তাই তোমার হাড়গোড় ভাঙলেও দয়া করে অবাক হয়ো না।’

‘পুলিশ বা ইন্টেলিজেন্সের কেউ মনে হয় না, তা হলে...’ চুপ হয়ে গেল জর্জ মাইকেল। কয়েক সেকেণ্ড পর কপালে উঠল ভুরু। ‘তার মানে... তুমি মার্সেনারি?’

‘ছিলাম এক সময়ে। অবসর নিয়েছি।’

আবছা হাসি খেলল মাইকেলের ঠোঁটে। ‘অবসর নাওনি। সত্যিকারের যোদ্ধা, সুযোগ পেলেই জড়ায় ঝামেলায়। দক্ষ লড়াকু দেখলেই চিনতে পারি আমি। বলো তো, নাম কী তোমার? যে হুমকি দিচ্ছে, তার নাম জেনে রাখা ভাল।’

‘আমার নাম মাসুদ রানা।’

ভুরু উঁচু করে রানাকে দেখল মাইকেল। ‘রানা... কঙ্গো... ঠিক? কয়েক বছর আগে। বোমা দিয়ে উড়িয়ে দাও ওই দেশের কয়েকটা ওয়্যারহাউস ভরা অস্ত্র।’

‘হতে পারে, কে জানে!’

‘নামকরা কয়েকজন মার্সেনারি খুন হয়। দুর্নীতিপরায়ণ ক’জন মন্ত্রী ও জেনারেল যে যার বেডরুমে উড়ে যায় বোমার আঘাতে। তারপর...’

বাধা দিয়ে কড়া সুরে বলল রানা, ‘আমার নামে চালু একগাদা মিথ্যা শুনতে এখানে আসিনি। আমরা আলাপ করব তোমার মৃত

সঙ্গী আর তোমার বিষয়ে। বিশেষ করে শুনব চপ যিন্দালের গল্প। যিম্বাবুইয়ে থেকে অপারেশন চালাত লোকটা, তাই না?'

রানা খেয়াল করেছে, বার কয়েক কেঁপে উঠেছে মাইকেলের চোখের পাতা। কারও সঙ্গে তাকে জড়িয়ে নেয়া হবে, পছন্দ হচ্ছে না। উদাস ভঙ্গি নিয়ে বলল সে, 'ও তো নানান জায়গায় কাজ করত। ওর কাজই ছিল এমন।'

'ঠিক। তার প্রিয় ওস্তাদ ইতালির ভিটেলা রেমারিক। ভাল করেই আমাকে চেনে। সম্পর্ক রেখেছে সবার সঙ্গে, খোঁজখবর নিলেই বেরোবে, কে কী কাজ করছে বা কার হয়ে কাজ করছে।'

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে দেয়ালে চোখ রাখল জর্জ মাইকেল।

'সবাইকে চেনে রেমারিক,' আবারও বলল রানা। 'ওর কাছ থেকে এমন খবর পাব, যেটা চাইলেও পাবে না পুলিশ। আজ আর মার্সেনারির কাজ করি না, কিন্তু পৃথিবী ত্যাগ করিনি। ছোট্ট দুনিয়া। চারপাশে অনেক তথ্য। শুধু জড় করে গুছিয়ে নিলেই হবে। আগামীকাল আশা করি জেনে যাব, কার হয়ে কাজ করছ।'

'কেউ কিছু বলবে না,' জোর দিয়ে বলল মাইকেল। সরু গোঁফে জমছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'রেমারিকের কাছে না গিয়ে সিম কর্নেলিসের কাছেও যেতে পারি, নতুন সবাইকে চেনে,' কঠোর চোখে মাইকেলকে দেখল রানা। 'কার হয়ে কাজ করছ জেনে গেলে তখন আর তোমাকে বাড়তি সুবিধে দেবে না ইণ্টারপোল। তোমাকে প্রয়োজনই পড়বে না ওদের। এর অর্থ তুমি শেষ! চিনের আদালতে যাবে, না সৌদি আদালতে? এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ায় খুন করেছ দু'জন পুলিশকে। ওই রাজ্যে এখনও চালু আছে মৃত্যুদণ্ড।' চেয়ার ছাড়ল রানা। 'তোমার জায়গায় আমি হলে মগজ খাটাতাম। সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি করতাম না। যাক গে, একটু পর বিমানে উঠব। আগেই ঠিক করে নেব কার কাছে যাব।'

অবযার্ভেশন রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ওর জন্যে অপেক্ষা করছে দুই ইন্টারপোল এজেন্ট, চোখে-মুখে প্রশংসা।

'সত্যিই বের করতে পারবেন জর্জ মাইকেল কার হয়ে কাজ করছে?' জানতে চাইলেন রিনা বাম্পক্যাট।

'হয়তো, তবে তাতে সময় লাগতে পারে।'

'বুঝলাম,' মাথা দোলালেন অঙ্কুর রায়। আয়নার ওদিকে জর্জ মাইকেলকে দেখালেন। 'আপনাকে বোধহয় নতুন করে কিছু করতে হবে না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে চুক্তি নিয়ে গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে।'

'এবার ওকে ভাল করে ঘামতে দিন,' রানাকে দেখে নিয়ে বললেন রিনা বাম্পক্যাট। 'ভেরি গুড ওঅর্ক, মিস্টার রানা।' অঙ্কুর রায়ের উদ্দেশে বললেন, 'এবার আমি গিয়ে ব্রিফ করে আসি ডিরেক্টরকে। খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাদেরকে, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন।'

'অনেক লম্বা দিন পার করলাম,' বললেন অঙ্কুর রায়।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি। রাত নয়টা। বারবার হাই আসছে।

'চলুন, অফিস থেকে বেরোনো যাক, হোটেলে পৌঁছে দেব আপনাকে,' বললেন অঙ্কুর রায়।

অবযার্ভেশন রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন।

মহিলা পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলিভেটরের দিকে চললেন অঙ্কুর রায়, সঙ্গে ক্লান্ত রানা।

সিকিউরিটি গেটের ওদিকের করিডোরে এক যুবতী পুলিশ। মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও তাকে ভারতীয় মনে হলো রানার। পরনে ইউনিফর্ম, মাথায় চুড়ো করা চুল। বিপদে পড়েছে আইডি-কার্ড নিয়ে, দু'বারের চেষ্টায় ওটা চিনল আইডেন্টিফিকেশন

সিস্টেম। গেট খুলে দিল গার্ড। রানা বা অঙ্কুর রায়ের দিকে না চেয়েই হাই-হিলের গটমট শব্দ তুলে করিডোর ধরে এগিয়ে গেল যুবতী।

এলিভেটরে উঠে গ্রাউণ্ড লেভেলের বাটন টিপে উদাস হয়ে বললেন অঙ্কুর রায়, 'বডি দেখেছেন? ক্যাটরিনা কাইফ একদম ফেল!'

'খেয়াল করিনি,' বলল রানা।

'তা হলে আপনার বেঁচে লাভ কী?'

দু'মিনিট পর নেমে এসে গেট পেরোবে, এমন সময় থমকে গেলেন ইণ্টারপোল এজেন্ট, 'যাহ্, অফিসে ফেলে এসেছি জ্যাকেট!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ, চলুন নিয়ে আসি।'

আবারও এলিভেটরে চাপল দু'জন।

দরজা খুলে কে ঢুকেছে দেখে অবাক হলো জর্জ মাইকেল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।'

একমাত্র চোখে ওকে দেখল মায়া খোইল, কাঁচের চকচকে চোখ শীতল। 'ওদের কিছু বলেছেন?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ তুলল মাইকেল। 'অবশ্যই না! এমন কিছু বলেনি যে জবাব দিতে হবে। বারবার সেই একই প্রশ্ন। সামান্য সব প্রস্তাব। বদলে চেয়েছে আমার সহায়তা।'

'কাজেই হতাশ করেছেন।'

'স্বাভাবিক। নইলে কি আর চেয়ারে বেঁধে রাখত? যাই হোক, এবার আমাকে বের করার ব্যবস্থা করুন।'

মাথা দুলিয়ে মাইকেলের পেছনে চলে গিয়ে নরম সুরে বলল মায়া খোইল, 'ভাল কথা, এখানে আসার আগে দেখে এলাম পাশের ঘরে কেউ নেই। কিন্তু চালু ছিল ভিডিয়ো ক্যামেরা।'

অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল মাইকেল, 'নিশ্চয়ই ওটার সুইচ অফ করে দিয়েছেন?'

'অবশ্যই!' ছোট্ট, ভেজা কিছু খোলার আবছা, মৃদু আওয়াজ মাইকেলের পেছনে। 'তারপর... দেখলাম ওই রেকর্ডিং।'

হঠাৎ মাইকেলের মনে পড়ল, ভেজা ওই আওয়াজ শুনেছিল ফ্লোরেন্সের সেই ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে। 'একমিনিট, আমি শুধু...'

মাইকেলের গলায় এঁটে বসল চিকন, ধারালো স্টিলের তার।

জ্যাকেট তুলে নিয়ে বললেন ইন্টারপোল এজেন্ট, 'এবার চলুন, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিই।'

'কোন্ হোটেলে বুকিং দিয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

'দে ভিলে, নদীর ওদিকে। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখবেন ফেস্টিভাল অভ লাইট্স্। এ সময়ে শহরের সেরা আকর্ষণ ওটা। হোটেল থেকে সামান্য হাঁটলেই প্লেস দেস টেরোক্স। ওখানে হবে বিশাল শো। চোখ ধাঁধিয়ে দেবে আপনার।'

'পারবে না, একবার হোটেলে পৌঁছুলে ঘরে গিয়ে টেনে ঘুম দেব।' কাঁধ, কোমর ও নিতম্বের মাংসপেশিতে টনটনে ব্যথা। বামহাতে ডান কাঁধ টিপল রানা।

'আপনি অসুস্থ নন তো?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'না। তবে কয়েকদিন সাবধানে চলতে হবে।'

হাসলেন অঙ্কুর রায়। 'মুখে নতুন কাটাছেঁড়া পেয়ে গেছেন। আপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে মেয়েরা।'

'কাটাছেঁড়া দেখে?' হাসতে গিয়েও চমকে গেল রানা। মনে পড়ে গেছে পুরনো একটা ক্ষত...

'কী হলো, মিস্টার রানা?'

'ওই মেয়ে, যাকে দেখলাম ইন্টারোগেশন রুম থেকে

বেরিয়ে? ওর কপালে একটা কাটা দাগ আছে!'

'দেখিনি। তাতে কী?' বিস্ময় বাড়ছে অঙ্কুর রায়ের।

হঠাৎ সরু হলো রানার চোখ। 'স্যান ফ্রান্সিসকো! এক্সিবিশন হলে হামলার আগে ওই মেয়ে ছিল ওখানে! অনুপম মঙ্গেলকারের সেক্রেটারি!'

'অনুপম মঙ্গেলকার?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়, 'দ্য কোয়েশ্চেনের মালিক?'

'চেনেন তাকে?'

'ভারতের সবাই চেনে, ভারতের বিল গেট্স্ সে। তাতে কী?'

'সে, তার সেক্রেটারি ওই মেয়ে আর জর্জ মাইকেল... একই সময়ে একই জায়গায় কেন?'

'আপনি শিয়োর ওটা সেই মেয়ে?'

'পযিটিভ! মাইকেলকে ছুটিয়ে নেবে বলে এসেছে! আসুন!' ছিটকে অফিস থেকে বেরোল রানা। পিছু নিয়েছেন অঙ্কুর রায়। এলিভেটরের জন্যে বাটন টিপে রানা বুঝে গেল, ওটা আসতে দেরি হবে। ধৈর্য হারিয়ে সিঁড়ি বেয়ে একেকবারে পেরোতে লাগল তিনটে করে ধাপ।

ঝড়ের বেগে আটতলায় উঠে বিস্মিত করল ইণ্টারপোল পারসোনেলদেরকে। সিকিউরিটি গেটের সামনে থামল দু'জন। আইডি দেখাতে গিয়ে পেরোল অন্তত একমিনিট। লোহার দরজা খুলতেই দৌড়ে গিয়ে ইণ্টারোগেশন রুমে ঢুকল রানা ও অঙ্কুর রায়। দরজা পেরিয়েই থমকে গেল ওরা।

ভারতীয় মেয়েটা একটু আগেও ছিল। কিন্তু জর্জ মাইকেলকে ছুটিয়ে নিতে আসেনি সে। এখনও ব্রিটিশ দুর্বৃত্তের দু'হাত চেয়ারে হ্যাণ্ডকাফে আটকানো। কাঁধের কাছে কাত হয়ে ঝুলছে মাথা। ঠোঁটে এখন বাঁকা হাসি নেই। ঝাপসা চোখে কীসের এক ভীষণ ভয়। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ফাঁক করে দেয়া হয়েছে

গলা। গভীর ক্ষত থেকে এখনও দরদর করে পড়ছে কালচে রক্ত।

'ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করুন!' তাড়া দিল রানা। ঘুরেই গেটের দিকে ছুট দিলেন অঙ্কুর রায়। 'কালো চুলের মেয়ে! কপাল থেকে গালে নেমেছে কাটাচিহ্ন!'

প্রায় একই সময়ে স্টিলের গেটে পৌঁছুল রানা ও অঙ্কুর রায়। গার্ডের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ইণ্টারপোল এজেন্ট, 'এইমাত্র ইণ্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে গেছে এক মেয়ে, সে কোথায়?'

'এই তো, আপনারা ফেরার একমিনিট আগে বেরিয়ে গেল,' বিভ্রান্তির ভেতর পড়ে গেছে গার্ড। 'কেন, কী হয়েছে?'

'আমাদের বন্দির গলা ফাঁক করে দিয়েছে!' বললেন অঙ্কুর রায়, 'দেরি না করে ফুল সিকিউরিটি অ্যালার্ট চালু করতে বলুন! বন্ধ করতে হবে দালানের প্রতিটি পথ! ওই মেয়েলোককে না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে বেরোবে না কেউ! আমাদের বেরোতে দিন!'

'ইঁয়েস, স্যর!' তাড়াহুড়ো করে গেট খুলল গার্ড। অ্যালার্ম বাজানোর দায়িত্ব যার, তার অফিসে ইণ্টারকম করল।

করিডোর ধরে দৌড়াতে শুরু করে জানতে চাইল রানা, 'এই দালান থেকে বেরোবার কয়টা পথ?'

'পুবে ও পশ্চিমে মেইন এণ্ট্র্যান্স, এ ছাড়া রয়েছে ফায়ার এস্কেপ, মাটির নিচে গাড়ি পার্কিং...'

'পায়ে হেঁটে বেরোবে না,' বলল রানা।

রোন নদীর দক্ষিণ তীরে ইণ্টারপোল হেডকোয়ার্টার, কাছেই এক লেক। চট্ করে এই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া কঠিন। এলিভেটরের সামনে পৌঁছুল ওরা। বেছে নিতে হবে বেসমেন্টে যাওয়ার এলিভেটর। কিন্তু একটাও নেই এই ফ্লোরে। নতুন করে প্রায় লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল রানা।

থার্ড ফ্লোরে নেমে শুনল বাজতে শুরু করেছে সাইরেন। সেই

সঙ্গে পিএ সিস্টেমে এল: 'লকডাউন! লকডাউন! সিকিউরিটি পারসোনেল, সিল অফ ডেযিগনেটেড এগযিট। অল আদার পারসোনেল, রিমেইন হোয়্যার ইউ আর!' একই মেসেজ প্রচারিত হলো অন্য ভাষায়। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামছে রানা ও অঙ্কুর রায়।

বেসমেণ্ট লেভেলে নেমে লাথি দিয়ে দরজা খুলে এক সেকেণ্ডের জন্যে থমকে গেল রানা। সামনেই এলিভেটরের কাছে রক্তের পুকুরে পড়ে আছে ইউনিফর্ম্‌ড্ এক গার্ড। তার হোলস্টার খালি।

'ওরই পিস্তল কেড়ে নিয়ে খুন করেছে,' বললেন অঙ্কুর রায়। সরে গেলেন পার্ক করা একটা গাড়ির আড়ালে।

একই কাজ করেছে রানা। চাপা স্বরে বলল, 'এগযিট কোন্ দিকে?'

আঙুল তুলে নির্দিষ্ট দিক দেখিয়ে দিলেন মিস্টার রায়।

'আরও লোক ডাকুন, আমি দেখছি ওকে খুঁজে পাই কি না,' বলল রানা।

এলিভেটরের পাশে ইমার্জেন্সি টেলিফোনের কাছে গেলেন অঙ্কুর রায়। বললেন, 'খুব সাবধান, রানা, নইলে খুন হবেন!'

'আপনার মনে হচ্ছে আমি অসতর্ক?' কুঁজো হয়ে এগযিটের দিকে ছুটল রানা। দুম করে বন্ধ হলো একটা দরজা। কার পার্কিঙে প্রতিধ্বনি এমনই, বোঝা গেল না কোথা থেকে এল আওয়াজটা। সারি সারি গাড়ির মাঝ দিয়ে চলেছে রানা। ওদিকের কংক্রিটের র‍্যাম্প গেছে গ্রাউণ্ড লেভেলে, এগযিট লেনের শুরুতেই পথরুদ্ধ করেছে হলদে-কালো স্ট্রিপ আঁকা এক ব্যারিয়ার।

কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই।

রানাকে হয়তো বোকা বানিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। গাড়ি ব্যবহার না করে, হেঁটে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

'রানা!' ডাকলেন অঙ্কুর রায়। 'গার্ডরা আসছে!'

কিন্তু ওই চিৎকারের কারণে ব্যস্ত হয়ে উঠল ভারতীয় ডাইনী। হঠাৎ জীবন ফিরে পেল একটু দূরের এক সিট্রোঁ সি সিক্স-এর ইঞ্জিন। গতি তুলছে গাড়িটা। সোজা আসছে এগযিট লক্ষ্য করে। একেবারে শেষ সময়ে চাপা দিতে এল রানাকে।

চমকে গিয়ে জান বাঁচাতে একটু দূরের এক রেনও ক্লিয়ো-র হুডে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। অপেক্ষাকৃত ছোট গাড়িটার বাম্পার উপড়ে নিয়ে সিকিউরিটি ব্যারিয়ারে গুঁতো দিল সিট্রোঁ। ওটার হুডে উঠে এল ভাঙা ব্যারিয়ার, ফাটিয়ে দিল উইণ্ডশিল্ড। আগেই যথেষ্ট গতি পেয়েছে সি সিক্স, যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত ভাঙা ব্যারিয়ার উড়িয়ে দিয়ে উঠে যেতে লাগল কংক্রিট র‍্যাম্প ধরে।

অঙ্কুর রায়ের দিকে ছুট দিল রানা।

একই সময়ে এলিভেটরের দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে এল অস্ত্র হাতে তিনজন গার্ড।

'আমার গাড়ি দরকার!' জরুরি সুরে জানাল রানা। 'কারও গাড়ি আছে এখানে? চাবিটা দিন!'

প্যান্টের পকেট থেকে কী যেন বের করছে গার্ডদের একজন। সে হাতটা বের করতেই চিলের মত ছোঁ দিয়ে রিমোট-চাবি নিয়ে বাটন টিপল রানা। কয়েক সারি দূরে জ্বলে উঠল একটা বাতি। দৌড়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে মনটা দমে গেল রানার। পুরনো, মার খাওয়া, খুদে এক ফোক্সভাগেন পোলো।

গাড়িতে চেপে ইঞ্জিন চালু করে রওনা হলো ও, ওদিকে একের পর এক নির্দেশ গার্ডদেরকে দিচ্ছেন অঙ্কুর রায়।

সবাই ছুট দিল মেইন লেনের দিকে। স্কিড করে হ্যাচব্যাক থামাল রানা। 'মিস্টার রায়, উঠে পড়ুন!'

'কিন্তু পিস্তল নেই!' আপত্তি তুললেন ইণ্টারপোল এজেন্ট।

'লাগবে না! উঠুন!' অঙ্কুর রায় গাড়িতে উঠতেই আবারও রওনা হলো রানা। 'আপনার সঙ্গে তো ফোন আছে, নাকি সেটাও

নেই? থাকলে লিয়নের পুলিশে ফোন করে বলুন, ওরা যেন রোডব্লক করে!'

র‍্যাম্প বেয়ে উঠে সমতল এলাকায় পৌঁছল রানার খুদে গাড়ি। ইন্টারপোল বিল্ডিঙের তলা থেকে বাঁকা পথ গিয়ে মিশেছে দক্ষিণের রাস্তায়। মোড়ের কাছে পৌঁছে কড়া ব্রেক কষল রানা। বুঝে নিতে হবে কোন্ দিকে গেছে ওই মেয়ে! ডানে দেখল এঁকেবেঁকে চলেছে কিছু গাড়ির বাতি। পালাতে গিয়ে আরেকটা গাড়ির গায়ে গুঁতো দিয়েছে সিত্রোঁ। রওনা হয়ে গেল রানা, থেমে যাওয়া কয়েকটা গাড়ি এড়িয়ে ছুটে চলল দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে। একটু দূরেই নদীর তীর। একটা সেতু পেরিয়ে গেল ও। সামনে আরও কয়েকটা গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছে সি সিক্স, এখন চলেছে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে।

ফোনে ফ্রেঞ্চ ভাষায় চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছেন অঙ্কুর রায়। ফোন থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমাদের সামনে একটা ইউনিট আছে। ওরা থামিয়ে দেবে ওই মেয়েকে।'

মাত্র এক শ' গজ দূরের জ্যামে সি সিক্স-এর উল্লম্ব টেইল-লাইট দেখল রানা। একটা গাড়িকে একপাশ থেকে ঘষে বেরিয়ে গেল সিত্রোঁ। পেছনের গাড়িটা পুরো এক চক্কর কাটল। ওটাকে এড়াতে গিয়ে রং সাইড ধরে ছুটে চলল রানা। সংঘর্ষের ভয়ে স্কিড করে থামছে সামনের গাড়িগুলো।

মাথার ওপর জ্বলজ্বলে বাতি নিয়ে পাশের এক রাস্তা থেকে বুলেভার্ডে উঠে এল পুলিশের এক গাড়ি। কড়া ব্রেক কষল মায়া খোইল, সরসর করে পিছলে গেল গাড়ির চাকা, কিন্তু ঢুকে পড়তে পারল ডানদিকের এক রাস্তায়। সিত্রোঁর পিছু নিল পুলিশের গাড়ি, তার পেছনে চলেছে রানা। প্রতিবার পিছিয়ে পড়ছে বলে বারবার নতুন করে গিয়ার ফেলে গতি তুলছে। সামনে সিত্রোঁর খুব কাছে পৌঁছে গেছে পুলিশের গাড়ি।

দপ্ করে জ্বলে উঠল উল্লম্ব ব্রেক লাইট।

সি সিক্স-এর পেছনে গিয়ে হুমড়ি খেল পুলিশের গাড়ি। চুর-চুর হলো উইণ্ডশিল্ড। গুঁতো মেরে খুলে ফেলেছে বড় গাড়িটার হ্যাচব্যাক দরজা। ধাওয়া করতে গিয়ে সর্বনাশ হয়েছে পুলিশ ক্রুযারের, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তুমুল বেগে গিয়ে মাথা গুঁজল সামনের এক ল্যাম্প পোস্টে। বিশাল কোনও রাইফেলের গুলির মত আওয়াজ তুলে মুচড়ে দু'ভাগ হয়ে গেল বাতির থাম।

বিড়বিড় করে জঘন্য বাঙালি একটা গালি দিলেন অঙ্কুর রায়।

'স্কুলে মাস্টারমশায় বুঝি এ-ই শিখিয়েছেন?' গতি তুলতে শুরু করে অভিভাবকের সুরে জানতে চাইল রানা।

'না,' মাথা নাড়লেন অঙ্কুর রায়। 'স্বদেশি পুলিশ শিখিয়েছে।'

'অঙ্কুরেই যদি এত নোংরামি, ধেড়েগুলো তো স্রেফ গালি-পিশাচ!' সি সিক্স-এর পেছনে এখনও আস্ত আছে একটা বাতি। বিড়ালের মণির মত লাল খাড়া আলোর রেখা সরে যাচ্ছে দূরে। প্রাণপণে তাল রাখতে চাইছে রানা। প্যাঁ-পোঁ আওয়াজে বাজিয়ে চলেছে হর্ন। সরু এক চৌরাস্তায় বড় এক ভ্যান এড়াতে গিয়ে পাগলের মত স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা। কাত হয়ে গেল পোলো। চার চাকা আবারও রাস্তায় নামতেই নতুন উদ্যমে পিছু নিল। দু'পাশে পিছিয়ে পড়ছে একের পর এক অ্যাপার্টমেণ্ট ভবন। জানালার ওদিকে জ্বলছে মোমবাতি। পিছনে পড়ে গেল সব বাড়ি, আবারও একপাশে নদী। আকাশে উঠছে-নামছে-সরছে নানান রঙের সার্চলাইট। নদীর তীরের দালান হয়ে উঠেছে রামধনুর মত রঙিন।

চমৎকার ওই দৃশ্য দেখার সময় রানার নেই। সেতুর দিকে ছুটে চলেছে মায়া খোইল। রানা বুঝে গেছে এরপর কী করবে ডাইনী। ফেস্টিভাল অভ লাইট্স্ দেখার জন্যে হাজির হয়েছে হাজার হাজার টুরিস্ট, একবার গাড়ি থেকে নেমে পড়লে আর

খুঁজে পাওয়া যাবে না তাকে।

সেতুর ওপর আড়াআড়ি করে পুলিশের গাড়ি রেখেছে দুই পুলিশ সদস্য, ভাবছে ঠেকিয়ে দেবে শত্রুর গাড়ি। কিন্তু বিন্দুমাত্র গতি হ্রাস না করেই ক্রুযারের পেছনে গুঁতো দিল মায়া খোইল। ধুম্ করে সামনের গাড়ি সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল তুমুল বেগে। চরকির মত ঘুরল পুলিশের ক্রুযার, ফুটপাথে উঠে পিষে দিল কয়েকজন দর্শককে।

দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে গেলেন অঙ্কুর রায়। চাপা স্বরে বললেন, 'মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারণে! থামুন, রানা!'

'সময় নেই!' সিত্রোঁর কাছে পৌঁছে গেছে রানা। দ্বিতীয়বার জোরে গুঁতো দিয়ে বড় কোনও ক্ষতি হয়েছে মায়া খোইলের গাড়ির। 'গতি কমছে ওটার। এবার হাতে পাব ওকে!'

সেতু পেরিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এক অ্যাভিনিউ-এ ঢুকে পড়ল সিত্রোঁ। লাফ দিয়ে সামনে থেকে সরে গেল একদল দর্শক। এইমাত্র চওড়া এক ফুটপাথে গাড়ি তুলে দিয়েছে মেয়েলোকটা। কর্কশ শব্দ তুলে বাজছে হর্ন। প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ তুলে দর্শকদের সরিয়ে সিত্রোঁর পেছনে চলেছে রানার ফোক্সভাগেন।

সামনেই পড়ল খোলা এক বড় প্লাযা। শহরের কেন্দ্র লক্ষ্য করে পায়ে হেঁটে চলেছে হাজার হাজার দর্শক ও টুরিস্ট। একটা লনে উঠে দু'জনকে চেপ্টে দিয়ে এগোল মায়া খোইল। কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে তার গাড়ির ইঞ্জিনের জীবন। হুডের ভেতর থেকে ভুসভুস করে উঠছে সাদা বাষ্প। কড়া ব্রেক কষে মাটি ও ঘাস উপড়ে হতভম্ব একদল দর্শকের গায়ে গাড়ি চাপিয়ে দিল খোইল। প্লাযা ভরে উঠল মানুষের আর্তচিৎকারে।

গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে নেমে এল রানা। পরিষ্কার দেখল বিমূঢ় মানুষগুলোর চোখের সামনে ঝেড়ে দৌড় দিল পিশাচী। তার পেছনে ছুটতে শুরু করে রানা শুনল, ফোনে চিৎকার করছেন

অঙ্কুর রায়: 'প্লেস লুই প্রেডেল, ভাইট!' পরক্ষণে ফোন রেখে চেঁচালেন, 'পুলিশ!' সামনে থেকে লোক সরিয়ে দিয়ে ধাওয়া করতে চান মায়া খোইলকে।

হাউমাউ করে আপত্তি তুলল একদল দর্শক। তাদের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ডাইনী। ওই লোকগুলোর দিকে ছুটল রানা। সামনেই সরু রাস্তা। মাথার ওপর উজ্জ্বল বাতির মস্ত এক ছাতা। লাখে লাখে খুদে বাল্‌ব্‌ দিয়ে তৈরি ওটা, যেন অসংখ্য নক্ষত্র। জটলায় হৈ-চৈ করছে অনেক মানুষ। মায়া খোইল গোপনে আবারও আগের পথে ফিরতে পারে। হয়তো রানার মাত্র তিন ফুট দূর দিয়ে গেছে, কিছুই বুঝতে পারেনি ও।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনল রানা। ধাক্কা দিয়ে ছোট এক বাচ্চাকে ফেলে দিয়েছে ডাইনী। পরক্ষণে গর্জন করে উঠল মোটা গলায় এক লোক। খেপে গেছে মেয়েলোকটার নিষ্ঠুরতা দেখে। তার ওপর মায়া খোইলের পরনে পুলিশের পোশাক। লোকটা ভেবে পাচ্ছে না, কী ধরনের পুলিশ ওই মেয়েলোক। ভিড় ঠেলে লোকটাকে পাশ কাটাল রানা। কিন্তু ওর পেছনে তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে ওই ছেলের বাবাকে ধাক্কা দিয়ে বসলেন অঙ্কুর রায়, ফলে পড়ে গেলেন তার খপ্পরে। ঘাড় ধরে তাঁকে মাটিতে ফেলল দানবীয় লোকটা। মুখটা সমান করে দেয়ার জন্যে তুলল লাথি।

কিন্তু ঠিক সময়ে ফিরে মাপা এক ঘুষি মেরে খেপা বাবার খাড়া নাকটা সমান করে দিল রানা। চোয়ালে আরেকটা ঘুষি নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল লোকটা, অজ্ঞান।

মাটিতে পড়ে আছে বাচ্চা ছেলেটা। এক টানে ওকে কোলে তুলে নিল রানা, মাত্র এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল, তারপর বুঝে গেল পাশেই ছেলেটার মা। মহিলার হাতে বাচ্চাটাকে গছিয়ে দিয়ে কলার ধরে টেনে তুলল অঙ্কুর রায়কে। পরস্পরের চোখে তাকাল, তারপর চোখ বোলাতে লাগল চারপাশে।

কোথায় গেল খুনি মেয়েলোকটা?

তখনই ভাঙা গলায় চিৎকার ছাড়ল বাচ্চার মা। পুলিশের সাহায্য চাইছে। অপরাধী রানা ও অঙ্কুর রায়ের চরম শাস্তি চায়!

কিছুই জানে না এমন ভঙ্গি নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল রানা। পাশে ইন্টারপোল এজেন্ট। সরু রাস্তা শেষ হলো বড় এক প্লাযায়। আবারও সেই প্লেস দেস টেরোক্স। চাপা পড়ল কার্নিভালের আওয়াজ দর্শকের উল্লসিত চিৎকারে। শুরু হয়েছে মূল আকর্ষণ: ফেস্টিভাল অভ লাইট্স্।

স্কয়্যার ভরে গেছে হাজার হাজার লোকে।

অত্যুজ্জ্বল আলো দেখে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে রানার মনে হলো, চাপড় মারা হয়েছে ওর চোখে। চারপাশের বাড়ির কারণে এদিকটা হয়ে উঠেছে বিশাল কোনও প্রজেকশন পর্দা, শহর যেন ক্যালিডোস্কোপিক, নানাদিকে লাখো রঙের বিস্ফোরণ। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বদলে যাচ্ছে দৃশ্য। পরমুহূর্তে নামছে আঁধার। দেখা দিচ্ছে দর্শকের ওপর ছুটে বেড়ানো অ্যানিমেটেড সব চরিত্র।

স্কয়্যারের রয়েছে বিশেষ সব ডিসপ্লে।

শীতের রাতে টাওয়ারের মত আকাশে উঠেছে স্কাল্পচার। ঘুরছে, সেই সঙ্গে চোখ ফাঁকি দিতে জ্বলছে নিয়ন বাতি। পাশেই নিচে পেডেস্টালে নানান দৈহিক কসরত দেখাচ্ছে খুব খুদে সব বাল্ব্ দিয়ে তৈরি পরাবাস্তব এক দশ ফুটি মানবমূর্তি। নিচ থেকে লেসার বিম ছুঁড়ে তৈরি হচ্ছে হলোগ্রাম। পটকার বিকট শব্দে আঁৎকে উঠছে দর্শকরা। চাপা পড়ছে ভিড়ের চিৎকার ও নানান বাজনা।

শুরু হয়েছে জোরালো এক হুউউউশ্ ও দর্শকদের ফুর্তির চিৎকার। স্টেজে এক লোক মুখ থেকে ছিটকে দিচ্ছে আকাশে লাল-হলদে-নীল আগুনের মস্ত হলকা। বোঝার উপায় নেই আশপাশে কোথাও আছে কি না ডাইনীটা। বিশাল সব প্রজেক্টর

প্রতি মুহূর্তে নানান দিকে ফেলছে হাজারো রঙিন আলো। এখন বিশেষ কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব।

'পেলেন তাকে?' রানার কানের কাছে মুখ নিয়ে জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'না।' পাশের দালানে ড্রেনপাইপ দেখেছে রানা। ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে গেল ওটার দিকে। বাঁদরের মত কয়েক ফুট ওঠার পর চোখ বোলাল ভিড়ের ভেতর। মাথা নাড়ছে সবাই, এদিক ওদিক দেখছে। কিন্তু ওর চাই এমন একজনকে, যে কি না তাড়াহুড়ো করে সরে যাচ্ছে দূরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর নিজেকে যুদ্ধ-বিজয়ী সম্রাট আলেকযাণ্ডার মনে হলো রানার।

ওই যে!

যা ভেবেছে, তার চেয়েও অনেক কাছে মেয়েলোকটা!

আলোর কোটি খেলা দেখে চমকে গেছে সে। প্লাযার মুখে দ্বিধা করছে কোথায় যাবে। এক সেকেণ্ড পর ঠিক করল স্কয়্যারের কাছে আগুনখেকোর দিকে যাওয়াই ভাল।

লাফিয়ে ড্রেনপাইপ থেকে নেমে পড়ল রানা, অঙ্কুর রায়কে ইশারা করে চলল মায়া খোইলকে ধরতে।

ফ্রেঞ্চ ভাষায় আর্তচিৎকার ছাড়ল চমকে যাওয়া এক মেয়ে। মুহূর্তের জন্যে সামনের লোকগুলো পথ থেকে সরে যেতেই ওদিকে পুলিশের ইউনিফর্ম দেখল রানা। মাত্র বিশ ফুট দূরে আছে মায়া খোইল।

আবারও আগুনের মস্ত হলকা ছোঁড়া হলো আকাশে। ভয় পেয়ে-পিছিয়ে গেল একদল লোক, তাতে থামল না প্রশংসা ও হাততালি। পিছিয়ে আসা লোক আটকে দিয়েছে পথ, দিক পরিবর্তন করল মায়া খোইল।

তিন ফুট গেলেই তার ঘাড় চেপে ধরতে পারবে রানা। কিন্তু

বাঁক নিল ডাইনী। ঘাড় না পেয়ে ইউনিফর্মের হাতা ধরতে চাইল রানা, কিন্তু ওটাও গেল ফস্কে। ভিড় ঠেলে পিছু নিল আবার একটু দূরেই ডিম্বাকৃতির ফাঁকা এক জায়গা। বিস্মিত হয়ে ঘুরে দেখল আরবের পোশাক পরা আগুনখেকো দানবের মত বিশাল লোকটা, হাতের মশাল প্রায় মুখের কাছে। এক চোখে ঝট্ করে রানার দিকে ঘুরে তাকাল মায়া খোইল। বাম চোখে নিষ্প্রাণ, ফাঁকা দৃষ্টি।

আগুনখেকোর পাশেই ছোট এক মঞ্চে নানান রকম খেলার জন্যে রাখা হয়েছে জ্বলন্ত মশাল। পাশেই কন্টেইনার ভরা প্যারাফিন। রানার উদ্দেশে ওই প্লাস্টিকের বোতল ছুঁড়ল মায়া খোইল।

রানা লাফিয়ে সরে যেতে বোতল গিয়ে পড়ল এক তরুণের কাঁধে। ছলকে পড়ছে প্যারাফিন।

রানার দিকে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়েছে মায়া খোইল।

আগুনের স্পর্শে দপ্ করে জ্বলে উঠল প্যারাফিন। ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে পিছাতে চাইল দর্শকরা। হুমড়ি খেয়ে পড়ছে একে অপরের ওপর। ফাঁকা এলাকার মাঝ দিয়ে ছুটে গেল লেলিহান আগুনের স্রোত। সরে যেতে চাইলেন অঙ্কুর রায়, কিন্তু আগুন ধরে গেল তাঁর জ্যাকেটের হাতায়। চাপড়ে শিখা নেভাতে না পেরে ব্যস্ত হলেন জ্যাকেট খুলতে। এদিকে এক্সটিংগুইশার আনতে ছুটল আগুনখেকোর সাগরেদ।

জটলার সবাই আতঙ্কিত এবং হতভম্ব, সে সুযোগে আবারও ভিড়ের ভেতর ঢুকল মায়া খোইল। পিছু নিল রানা।

সামনেই দপ্-দপ্ করে জ্বলছে উজ্জ্বল অজস্র নিয়ন বাতি। বিশাল পুরুষ কিউলেক্স মশার মত তীক্ষ্ণ শব্দ তুলছে হলোগ্রাফিক ডিসপ্লে, ক্রমেই বাড়ছে কানে তালাদেয়া আওয়াজ। ওটা ছাপিয়ে পেছনে এক্সটিংগুইশারের হিসহিস শুনল রানা। ছুটন্ত মায়ার

খোঁপার একাংশ খুলে যেতেই ওর মনে হলো, ওটা যেন আরবি ঘোড়ার দীর্ঘ, কালো লেজ।

কাছে পৌঁছেই তার চুল চেপে ধরল রানা।

জোর টান পড়তেই তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েলোকটা। হাতে পিস্তল!

রাস্তায় ঝুপ করে বসে পড়ল রানা। বিকট বুম আওয়াজ তুলল বুলেট, মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে ওর পিছনের লোকটার বুকে বিঁধল। আশপাশের ক'জনের পোশাকে লাগল রক্তের ছিটা।

দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধ দিয়ে মায়া খোইলের পেটে বেদম গুঁতো দিল রানা। কাত হয়ে রাস্তায় পড়ল মেয়েলোকটা, হাত থেকে ছুটে গেছে পিস্তল। ঠং শব্দে সরে গেল দূরে।

অস্ত্রটা তুলে নিতে চাইল রানা, কিন্তু তখনই দেখল ও আছে অসংখ্য ছুটন্ত পায়ের জঙ্গলের ভেতর। আগুন আর গোলাগুলি থেকে বাঁচতে গিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে একদল লোক। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল রানা। মোটা এক লোক মাড়িয়ে দিল ওর ডানহাত। ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল রানা। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইছে। তারই ভেতর বুঝল, আবারও হারিয়ে ফেলেছে ডাইনীটাকে! সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে-ওদিক দেখল। চরম ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর।

না, কোথাও নেই পুলিশের ইউনিফর্ম...

তখনই পেছন থেকে এল সরু ফাঁস। পেঁচিয়ে ধরেছে ওর গলা!

সহজাত রিফ্লেক্সের বশে ঝট্ করে গলার কাছে হাত নিয়েছে রানা। আঙুলসহ ফাঁস এঁটে বসতেই চাপ লাগল কণ্ঠার হাড়ে। আটকে গেছে শ্বাস। টান দিয়ে সরাতে চাইল ধারালো, চিকন তার। কিন্তু আঙুলের মাংস কেটে বসছে ওটা। তিরতির করে

বেরোল চিকন রেখায় রক্ত। হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো দেয়া হলো রানার কোমরে। আরও টানটান হলো স্টিলের তার। একদিকে কাত হয়ে রাস্তায় বসতে চাইল রানা, পরক্ষণে উল্টো দিকে মোচড় মেরে গায়ের জোরে বুট নামিয়ে আনল ডাইনীর পায়ের পাতার ওপর। চিলের মত চিৎকার ছাড়ল মেয়েলোকটা। ওই একই সময়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অঙ্কুর রায়। ভারসাম্য রাখতে না পেরে রাস্তায় হুড়মুড় করে পড়ল ওরা তিনজন। টান দিয়ে গলা থেকে তার সরাতে ব্যস্ত রানা, উঠে বসতে শুরু করেছেন অঙ্কুর রায়, কিন্তু তাঁর পাঁজরে কনুইয়ের মারাত্মক এক গুঁতো মেরেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মায়া খোইল। এবার দৌড়ে পালাবে, কিন্তু স্কয়্যারের চারদিক থেকে এল সাইরেনের কর্কশ আওয়াজ। মেগাফোন ব্যবহার করে আসছে একের পর এক নির্দেশ। পৌঁছে গেছে পুলিশ। এখন আর নতুন করে প্লেস দেস টেরোক্স-এ ঢুকতে পারবে না মায়া।

উঠে ধমকের সুরে বলল রানা, 'কোথাও পালাতে পারবে না!'

'সে চেষ্টা করলে তোমার অন্য চোখটাও তুলে নেব!' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন অঙ্কুর রায়। এইমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছেন।

একবার রানা, আরেকবার তাঁকে দেখল মায়া। একমাত্র চোখটা খুঁজছে নিরাপদ পথ। না, কোথাও যেতে পারবে না সে!

উঁচু টাওয়ারের নিয়ন ডিসপ্লের নিচে পেডেস্টালে নেচে চলেছে হলোগ্রাফিক নর্তক।

'আমরা চুক্তি করতে পারি,' বললেন রায়। 'তোমার মনিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে...'

কিছুই শুনছে না মায়া খোইল, ছিটকে চলে গেল নিয়ন স্কাল্পচারের দিকে। পাঁচ সেকেণ্ডে ওখানে পৌঁছে তরতর করে উঠতে লাগল উঁচু টাওয়ারে।

'পেছনে যান, পালাতে যেন না পারে!' অঙ্কুর রায়কে বলল

রানা, 'আমি এদিকটা...' থেমে গেল। বুঝে গেছে, ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ডাইনীর। মইয়ের মত বেয়ে উঠছে সেণ্ট্রাল ফ্রেম, ঘুরন্ত হাজার বাতির মাঝে যেন বিশাল এক বাদুড়।

রানা ভাবল, আসলে কী চায় মেয়েলোকটা?

জবাব পেয়েও গেল।

তিরিশ ফুট ওপরে চূড়ায় পৌঁছে গেছে মায়া খোইল। নেমে আসার কোনও ইচ্ছে দেখা গেল না। অন্তত জীবিত অবস্থায় ধরা দেবে না।

'অ্যাই!' ডাকল রানা।

শুনেও শুনল না মায়া, বুকে জাপ্টে ধরল বৈদ্যুতিক তার। পরক্ষণে ঝিলিক দিল হাজারো নিয়ন বাতি, স্কাল্পচারের চূড়ায় জোরালো ফস-ফস শব্দে প্রবাহিত হলো কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ! বীভৎস দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল অনেকে। তুমুল ঝড়ে পড়া সরু বাঁশপাতার মত থরথর করে কাঁপছে মায়া খোইল, নড়িয়ে দিচ্ছে গোটা টাওয়ার! দেহটা ঘিরে পাক দিয়ে উঠছে ধূসর ধোঁয়া!

পরক্ষণে ইলেকট্রিকাল শর্ট হয়ে দপ্ করে নিভল সব বাতি। আঁধার আকাশ থেকে মঞ্চ লক্ষ্য করে নেমে এল মায়া খোইল। কয়েক সেকেণ্ড তাকে ছুঁতে চাইল হলোগ্রাফিক মূর্তি। কিন্তু ওই মোহ দূর হতে সময় লাগল না কারও।

উচ্চশক্তি লেসার দেখিয়ে দিল, হলোগ্রাফিক জেনারেটর লক্ষ্য করে নামছে মায়া খোইল। চালু বৈদ্যুতিক যন্ত্রে হাত-পা ছড়িয়ে পড়তেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল ইউনিফর্ম ও তার লম্বা মাথার কেশ। অপারেটর চট্ করে লেসার বন্ধ করলেও অন্যান্য উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, ভাজা-পোড়া লাশের গা থেকে ভুস-ভুস করে উঠছে রঙিন ধোঁয়া!

সাত

'কী হয়েছে সেই মেয়ের?' অবাক সুরে জানতে চাইল লাবনী। ওর ধারণা, ভুল শুনেছে। কড়কড় আওয়াজ তুলছে আন্তর্জাতিক ফোন কানেকশন।

'হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুতের তার বুকে জাপ্টে ধরেছিল, তিরিশ ফুট নিচেই ছিল হলোগ্রামের জেনারেটর, তার ওপর পড়তেই দাউ-দাউ আগুনে পুড়ে গেল লাশ,' নির্বিকার সুরে বলল হতক্লান্ত রানা, 'দর্শকরা ভাবতেও পারেনি ফেস্টিভাল অভ লাইট্স্-এ এমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখবে। যাই হোক, মায়া খোইল ধরা দেবে না বলেই ডেকে এনেছে নিজের মৃত্যু।'

'আগেও শুনেছি কেউ কেউ প্রাণ দেয় মনিবের জন্যে, সে-ও তেমনই কেউ,' বলল লাবনী। 'আর দস্যু জর্জ মাইকেল? সে বেঁচে আছে?'

'না, তাকে জবাই করেছে মায়া খোইল। ওর নকল চোখের ভেতর ছিল চিকন তারের ফাঁস। ওটা দিয়েই খতম করে দিয়েছে জর্জ মাইকেলকে। বিলিয়নেয়ার অনুপম মঙ্গেলকারের হয়ে কাজ করত মহিলা।'

পুরো বিশ সেকেণ্ড পর বিস্মিত কণ্ঠে বলল লাবনী, 'সত্যি? ঠিক জানো?'

'মায়া খোইলকে দেখেছি স্যান ফ্রান্সিসকোর এক্সিবিশন হলে।

মোবাইল ফোন দিয়েছিল অনুপম মঙ্গেলকারের হাতে। কারও সঙ্গে আলাপ করে লোকটা। কিছুক্ষণ পর এল হামলা, লুঠ হলো স্টাডা কোডেক্স। ...আবার পরে জর্জ মাইকেলকে ইন্টারপোলের অফিসের নিরাপদ ঘরে খুন করল মহিলা। নইলে হয়তো মুখ খুলত লোকটা। সে সুযোগ তাকে দেয়া হয়নি। এ-কারণেই মনে হচ্ছে, এসব ডাকাতির পেছনে আছে ওই ভারতীয় ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রী।'

'আমি স্টাডা কোডেক্স অনুবাদ করতে দিলাম না, কাজেই বি প্ল্যান ব্যবহার করল অনুপম মঙ্গেলকার, এ হতেই পারে,' বলল লাবনী। 'এবার ইন্টারপোল কী করবে?'

'মায়া খোইলকে স্যান ফ্রান্সিসকোর এক্সিবিশন হলে দেখেছি, তা বিশ্বাস করেছে অঙ্কুর রায়, কাজেই ভারতে গিয়ে খোঁজ নেবে মঙ্গেলকারদের ব্যাপারে।'

'সত্যিই যদি বোঝে এ ধরনের ডাকাতি করছে মঙ্গেলকাররা, তখন কী করবে ইন্টারপোল?'

'জানি না, তবে ইন্টারপোলের আগেই কাজে নামতে পারে সৌদি জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ডিরেকটোরেট বা চাইনিজ এক্সটার্নাল সিকিউরিটি— সেক্ষেত্রে তাদের দেশের সম্পদ সরিয়ে ফেলার চেষ্টার কারণে খুন হবে মঙ্গেলকাররা।'

'তুমি নিজে কী করবে?' জানতে চাইল লাবনী।

'আমি?' মস্ত এক হাই চাপল রানা। 'প্রথম কাজ হোটেলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া। আগামীকাল ইন্টারপোলকে স্টেটমেন্ট দেয়ার পর সোজা নিউ ইয়র্ক।'

'তোমার ওখানে এখন ক'টা বাজে?' ঘড়ি দেখল লাবনী। নিউ ইয়র্কে সন্ধ্যা সাতটার বেশি।

'প্রায় রাত দেড়টা। তুমি কি এখনও অফিসে?'

'শেষ করে এনেছি কাজ। একটু পর বাড়ি ফিরব। হোটেলে

ফিরে বিশ্রাম নাও।'

'ঠিক আছে, দেখা হবে, লাবনী।'

'গুড বাই।' দুপুর থেকে একের পর এক আমলাতান্ত্রিক মিটিঙে যোগ দিয়েছে, ফোন রেখে আড়ষ্ট দেহে চেয়ারে আড়মোড়া ভাঙল লাবনী। চাক-চাক ব্যথা সারাশরীরে।

বিশ মিনিট পর সব কাজ শেষ করে অফিস ছেড়ে এলিভেটরে উঠল ও, নেমে এল প্রথমতলায়। ইউনাইটেড নেশন্স প্লাযায় বেরিয়ে চলল ফার্স্ট অ্যাভিনিউ লক্ষ্য করে। সাধারণত চার ব্লক হেঁটে ওঠে গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনালের কোনও সাবওয়ে ট্রেন-এ। কিন্তু আজ ইচ্ছে হলো একটু আগে বাড়ি ফিরতে। বেশিরভাগ সময় ইউএন-এর চারপাশের রাস্তায় থাকে একগাদা হলদে ক্যাব, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কেউ না কেউ আগেই পৌঁছে যায় ওগুলোর কাছে।

একটু দূরে পার্ক করা এক ক্যাবের ছাতে জ্বলে উঠেছে বাতি। আজ আমার কপাল ভাল, ভাবল লাবনী। কিন্তু ক্যাবের দিকে পা বাড়িয়েই বুঝল, আজও ওই প্রতিযোগিতাই করতে হবে। মাঝবয়সী এক মোটা লোক প্রায় দৌড়ে আসছে ক্যাবের দিকে। প্রায় একই সময়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল লাবনী ও মোটকু।

পেছনের দরজার হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে লোকটা বলল, 'সরি, লেডি, দেরি করে ফেলেছেন!'

'আমি আগে দেখেছি!' আপত্তি তুলল লাবনী।

'দেখলেই হয় না, আগে পৌঁছুতেও হয়,' দাঁত খিঁচাল মোটকু।

মাঝের বুলেটপ্রুফ স্ক্রিনে টোকা দিল ড্রাইভার। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'লেডি আগে এসেছেন।'

পাত্তা না দিয়ে সিটে চেপে বসতে চাইল মোটকু। 'সোজা যাও ইস্ট নাইনটিন্থ্!'

‘অ্যাই, মিয়া!’ এবার কাঁচের ওপর জোর এক ঘুষি বসাল ড্রাইভার। ‘কথা কানে ঢোকে না? লেডি আগে এসেছেন! পরের ক্যাব জোগাড় করে নাও!’

দ্বিধায় পড়ল মোটকু, কয়েক সেকেণ্ড পর অপমানিত হয়ে নেমে এল গাড়ি ছেড়ে। বেসুরো সুরে ড্রাইভারকে বলল, ‘দাঁড়াও, বাতিল করিয়ে দেব তোমার লাইসেন্স!’ কঠোর চোখে দেখল লাবনীকে। ‘যান; মজা করে বাড়ি যান!’

‘তাই তো করব!’ মৃদু হাসল লাবনী। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে বলল ড্রাইভারকে, ‘থ্যাঙ্ক ইউ!’ প্রতিযোগী মোটকু কেন বাড়াবাড়ি করেনি, তা বুঝে গেল। ড্রাইভার তো নয়, হুইল ধরে বসে আছে যেন রোবট। দেহের সব মাংসপেশি বোধহয় লোহা দিয়ে তৈরি। চেহারা কঠোর, মাথা ন্যাড়া।

‘নো প্রবলেম। কোথায় যেতে হবে?’ জানতে চাইল সে।

ঠিকানা জানিয়ে সিটে হেলান দিল লাবনী। ওর জানা নেই, ও ক্যাবে উঠতেই একটু দূরে নিজের গাড়িতে চেপেছে হাসিখুশি এক বাঙালি তরুণ। তার কাজ লাবনীর পিছু নেয়া এবং নিরাপত্তা দেয়া। কিন্তু সর্বক্ষণ চারপাশে চোখ রাখেনি বলেই মস্তবড় ভুল করেছে। সাইলেন্সারসহ পিস্তল হাতে অন্ধকারে পেছনে পৌঁছে গেছে গম্ভীর চেহারার এক লোক। গুলি করেছে তরুণের ঘাড়ে, তারপর দেরি না করেই পিস্তল পকেটে রেখে রওনা হয়েছে নিজ পথে। এখন পুরনো গাড়িটার ফ্রন্ট সিটে কাত হয়ে পড়ে আছে রানা এজেন্সির অপারেটর কামাল আজিজের লাশ।

ক্যাব রওনা হতেই ভাবল লাবনী, অনুপম মঙ্গেলকার বা তার স্ত্রী কেন চুরি করাচ্ছে আর্টিফ্যাক্ট? টাকা আছে, ভাড়া করছে জর্জ মাইকেলের মত লুটেরাদেরকে, কিন্তু কখনও কাউকে দেখাতে পারবে না চোরাই জিনিস। সেক্ষেত্রে এসব সংগ্রহ করছে কেন? তা ছাড়া, স্টাডা কোডেক্স দিয়ে কী করবে? জিনিসটা দুর্মূল্য,

ঐতিহাসিক, কিন্তু কখনওই তুলনা চলে না মাইকেলেঞ্জেলোর চোরাই ডেভিডের সঙ্গে...

জন কিগানের কথা আবারও মনে পড়তেই আনমনে মাথা নাড়ল লাবনী। আবারও নিজেকে মনে করিয়ে দিল: না, ওর দোষে খুন হননি কিগান। কথাটা মাত্র বিড়বিড় করে বলেছে, এমনসময় হোঁচট খেয়ে থামল ক্যাব। সামনে সরু এক চৌরাস্তা। পথ ফাঁকা, তা হলে থামল কেন ক্যাব?

পেছনের বাম দরজা খুলে যেতেই চমকে গেল লাবনী। সিটে ওর পাশে উঠল দাড়িওয়ালা এক দানব!

'হায়, আল্লা, এসব কী!' ভাবল লাবনী। ব্যাগ তুলে নিয়েই খুলতে চাইল ডান দিকের দরজা...

নিজে থেকেই খুলে গেল ওটা, ওকে ঠেলে সিটে উঠল মাঝারি এক চিমসে লোক। স্যাণ্ডউইচের পুরের মত দু'জনের মাঝে আটকা পড়েছে লাবনী। চট্ করে দেখে নিল দু'পাশের লোকদু'জনকে। গায়ের রং তাদের ভারতীয়দের মত। দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো।

যেন কিছুই হয়নি, আবারও রওনা হলো ক্যাব।

তা হলে ইউরোপিয়ান ড্রাইভার এই দলেরই লোক!

কেউ যদি ভেবে থাকে হাল ছেড়ে দেব, তো ভুল করছে, ভাবল লাবনী। বাঁমহাত ঢুকে গেছে ব্যাগের ভেতর, ডান কনুই ঠাস্ করে নামল চিমসের শুকনো চোয়ালে। ভীষণ ঝটকা খেল শুঁটকির মাথা। বেধড়ক মার খাওয়া নেড়ি কুকুরের মত কেঁউ করে উঠল, 'আঁই রে, বাপ্, সালী বহোৎ ডেঞ্জারাস, ইয়ার! মার ডালা!'

এদিকে লাবনীকে বাগে পেতে রোমশ বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে বিশালদেহী দানব, তখনই চোখে ছিটকে লাগল ঝাল মরিচের স্প্রে। চোখ বুজে পিছিয়ে গেল সে। পানি থেকে তোলা মস্ত এক কাতলা মাছের মত দাপাচ্ছে সিটে। বদ্ধ জায়গায় নিজের চোখে

মরিচের ঝাঁঝ লাগতেই সরতে চাইল লাবনী। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক বাইসনের ভারী হাড়ের মতই পুরু হাড় চিমসের, সরানো গেল না তাকে। এখনও ঠেসে রেখেছে ওকে।

ওর কনুই এবার বিদ্যুদ্বেগে গেল তার চোয়াল লক্ষ্য করে।

কিন্তু খপ্ করে হাত ধরে ফেলল লোকটা।

লাবনীর মনে হলো, খুব জোরে পাকা দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে ওর হাড়। সরে গিয়েও ছোটাতে পারল না কনুই। আকারে ছোট হলেও চিমসের গায়ে পাশবিক জোর।

ভীষণ ভয় নিয়ে তাকে দেখল লাবনী।

মার সামলে হাসছে লোকটা, মুখে ঠিক হাঙরের দাঁতের মত এবড়োখেবড়ো সব ধারালো দাঁত! রাঁদা মেরে চোখা করা! মস্ত এক হাঁ মেলে লাবনীর বাহু লক্ষ্য করে মুখ নামাল চিমসে!

নিজে কী করেছে ভুলে করুণ আর্তনাদ ছাড়ল লাবনী: 'ওরে, বাবারে, গেছি!' তখনই ঘ্যাচ করে ওর বাহুর মাংসে কামড় বসাল শুঁটকি হাঙর। হাতের মারাত্মক ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে লাবনী, তারই ভেতর লোকটার চোখে ছিটাতে চাইল মরিচের স্প্রে। কিন্তু ওদিকে একটু সামলে নিয়েছে পাশের দানব। নিজের মুঠোয় খপ্ করে পুরে নিয়েছে ওর দু'হাত। এমন এক ভয়ঙ্কর চাপ দিল, মুড়মুড় করে উঠল লাবনীর পাঞ্জার হাড়। মুঠো খুলে যেতেই সিটে পড়ল মরিচের ক্যান।

'খবরদার, ডক্টর আলম!' ধমক দিল ড্রাইভার, 'বাড়াবাড়ি করবেন না।'

তার মানে ওকে চেনে এরা, ভাবল লাবনী। সাধারণ কোনও ছিনতাই বা ডাকাতি নয়, এটা কিডন্যাপিং!

ওর জখমি বাহু থেকে চোয়াল খুলে ওকে দেখল চিমসে হাঙর, থুতনি বেয়ে দরদর করে পড়ছে তাজা রক্ত।

'হায়, আল্লা!' ভীষণ ব্যথা সহ্য করে বলল লাবনী, 'কী চান

আপনারা?'

হাতদুটো ছেড়ে দিল দানব। ঠুং করে মেঝেতে পড়ল তুবড়ে যাওয়া ঝাল মরিচের ক্যান। পথের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লাবনী দেখল, কোনও একসময় দানবীয় লোকটার ঠোঁট পুড়ে গিয়েছিল। ক্ষত-বিক্ষত। চুপসে আছে গালদুটো।

'কেন এবং কোথায় নেয়া হচ্ছে, শীঘ্রিই জানবেন,' বলল ড্রাইভার। কাঁচের মাঝের ক্যাশ স্লটের মাধ্যমে এদিকে পাচার করল কাগজের একটা ঠোঙা। ওটা নিয়ে ভেতর থেকে ছোট এক অ্যান্টিসেপটিকের বোতল ও ক'টা ব্যাণ্ড-এইড নিল দানব। 'আমরা চাই না আপনার ইনফেকশন হোক।'

'এত দরদের জন্যে ধন্যবাদ,' তিক্ত সুরে বলল লাবনী।

ওর হাতের জখমে মলম দিতে লাগল দানব।

নিউ ইয়র্কের উত্তর দিকে চলেছে ক্যাব। মেইন রোড থেকে সরে যাওয়ার পর আর কিছুই চিনল না লাবনী।

একঘণ্টা পর ক্যাব ঢুকল একটা ব্যক্তিগত এয়ারফিল্ডে। থামল ওরা মাঝারি এক জেট বিমানের পাশে। এরই ভেতর চালু হয়েছে ওটার ইঞ্জিন। ট্যাক্সি থেকে নামানো হলো লাবনীকে। ঠেলে তোলা হলো বিমানের সিঁড়িতে। ওপরের হ্যাচে এক লোককে দেখল লাবনী। চট্ করে চিনেও গেল, সে কে।

'আশ্চর্য তো!' শুকনো গলায় বলল, 'এইমাত্র আপনার কথাই ভাবছিলাম, মিস্টার মঙ্গেলকার।'

এখন লোকটার চাঁদের মত গোল মুখে চশমা নেই। আগের মতই অনুভূতিহীন চেহারা। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো, ডক্টর আলম।' লাবনীকে ধরে রেখেছে হাঙর ও দানব। শেষেরজনের দিকে ফিরল সে, 'নিয়ে এসো। আসার পথে কোনও গোলমাল করেছে, নরেশ?'

লাবনী ভেবেছিল কথা বলে উঠবে দানব, কিন্তু চমকে গেল

বোবার বিদঘুটে কর্কশ আওয়াজ শুনে। বুঝে গেল, কেন এর মুখে এত ক্ষতচিহ্ন, বা কেন চুপসে আছে গাল। আসলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল জিভ!

হিন্দি ভাষায় কী যেন বলল হাঙর। কিন্তু রাঁদা মেরে দাঁত এমনই করেছে, কথা বেরোল সাপের হিসহিস শব্দের মত।

'গুড, সন্তোষ, সন্তুষ্ট হলাম,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার।

সে পিছিয়ে যেতে লাবনীকে ঠেলে তুলে দেয়া হলো বিমানে।

কয়েক সেকেণ্ডে আবছা আলোয় নিজের চোখ মানিয়ে নিল লাবনী। আছে একটা বিলাসবহুল কেবিনে। একটু দূরে আরামদায়ক সিটে বসে শীতল চোখে ওকেই দেখছে মাধুরী মঙ্গেলকার। পাশে দাঁড়িয়ে আছে চৌকো চোয়ালের এক লোক, পরনে কালো টার্টলনেক। সতর্ক ভঙ্গি দেখে মনে হলো, সে আসলে বডিগার্ড।

'এবার কী, মিস্টার মঙ্গেলকার?' বাইরে থেকে জানতে চাইল ক্যাবের ড্রাইভার।

'প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করুন, মিস্টার রিচি,' বলল ভারতীয় ব্যবসায়ী। 'ডক্টর আলম, আপনার চাবি দিন।'

'চাবি? কীসের?'

লাবনীর ব্যাগ হাতড়ে চাবি নিয়ে ক্যাব ড্রাইভারের হাতে দিল চোখা দাঁতের সন্তোষ।

'ডক্টর আলমকে টেলিফোনে না পেলে ওর ফ্ল্যাটে খোঁজ নেবে মিস্টার রানা, কাজেই তার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবেন,' বলল বিলিয়নেয়ার, 'জানিয়ে দেবেন, এই মেয়েকে বাঁচাতে চাইলে আমাদের কথামত কাজ করতে হবে তাকে।'

ভয় আড়াল করতে গিয়ে রাগের সুরে বলল লাবনী, 'কী কাজ? কী করতে হবে রানাকে?'

'আমাদের যা চাই, তা এনে দেবে তোমার প্রেমিক,' বরফের

মত ঠাণ্ডা গলায় বলল মাধুরী মঙ্গেলকার। থমথম করছে চেহারা। 'স্টাডা কোডেক্স।'

তিক্ত চোখে তাকে দেখল লাবনী। 'সুখস্বপ্ন দেখছেন নাকি? বোধহয় জানেন না, এরই ভেতর ইন্টারপোল জেনে গেছে, আপনারা স্যান ফ্রান্সিসকোতে এক্সিবিশন হলে ডাকাতি করেছেন। এসব করে পার পাবেন না!'

হাতের ইশারায় জ্যাক রিচিকে বিদায় দিয়ে লাবনীকে বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'হ্যাঁ, সন্দেহ করছে। কিন্তু হাতে কোনও প্রমাণ নেই। কিছুই করতে পারবে না তারা।'

এগিয়ে এসে হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে গেল বিমানের এক ক্রু।

'রানাকে এসবে জড়াচ্ছেন কেন?' বলল লাবনী, 'সত্যিই যদি স্টাডা কোডেক্স চান, আমাকে বাধ্য করুন না, যাতে নিয়ে আসি?'

'আপনি কোডেক্স আনতে গেলে সতর্ক করবেন সবাইকে। তা ছাড়া, আপনি আমাদের জিম্মি। আপনাকে বাঁচাতে গিয়ে বড় সব ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করবে না মিস্টার রানা। কাজেই ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারব তাকে।'

'আপনারা চেনেন, মাসুদ রানা আসলে কে?' অবজ্ঞার সুরে জানতে চাইল লাবনী।

'দ্য কোয়েশ্চেন আপনাদের সবাইকে চেনে। সব তথ্য অ্যানালাইয করা হয়েছে। খুবই সাহসী লোক মাসুদ রানা। ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না, এসপিয়োনাজ জগতে তার তুলনা নেই, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণে এনে কাজ করিয়ে নেয়া একটুও কঠিন হবে না। আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে নিজেকে সামলে রাখবে সে। সহজেই দাবি আদায় করব আমরা।'

'নিয়ন্ত্রণে রাখবেন ওকে, তাই না?' টিটকারির হাসি হাসল লাবনী। 'আপনাদের মত নির্বোধ আর কাউকে দেখিনি!'

'জিভ সামলে!' ধমকে উঠল মাধুরী মঙ্গেলকার। ঘাড় বাঁকা

করে চেয়ে আছে, দুলছে সোনার বৃত্তাকার বড় দুল। 'অনুপম, চলো, বাড়ি ফেরা যাক। উলঙ্গ মানুষের নোংরা এই দেশে ভাল লাগছে না।'

'বলো তো, কবে তোমার কথা রাখিনি?' ঘুরে ককপিটে গিয়ে ঢুকল অনুপম মঙ্গেলকার। লাবনী ভেবেছিল সে কাউকে নির্দেশ দেবে। কিন্তু দেখা গেল নিজেই বসে পড়েছে পাইলটের সিটে। মাথায় পরে নিল হেডফোন।

'সিটে বসিয়ে দাও,' বুড়ো আঙুল দিয়ে কেবিনের পেছনের দিক দেখাল মাধুরী মঙ্গেলকার। লাবনীকে দু'পাশ থেকে ধরে রেখেছে সন্তোষ ব্যাপারী ও নরেশ শর্মা। 'চাণ্ডাল, ড্রাগ দাও।'

'ড্রাগ?' চমকে গেল লাবনী।

টার্টলনেক পরা লোকটা পিস্তলের মত এক ডিভাইস তাক করেছে। ওটা আসলে জেট ইনজেক্টর। হাইপোডারমিক নিডলের বদলে ড্রাগ দেবে দেহে, কিন্তু থাকবে না কোনও চিহ্ন। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইল লাবনী, কিন্তু দু'পাশ থেকে শক্ত করে ধরা হয়েছে ওকে, নড়ার উপায় নেই।

'আমার মনে হয় আপনার ড্রাগ নেয়াই ভাল, ডক্টর আলম,' ককপিট থেকে বলল মঙ্গেলকার। 'নইলে বাধ্য হয়ে মার্শাল আর্ট ব্যবহার করবে চাণ্ডাল। তাতে জ্ঞান হারাবার সময় দারুণ ব্যথা পাবেন।'

ভয় লাগিয়ে দেয়া পৈশাচিক হাসি দিল কালো পোশাকের লোকটা। 'আসলে পুরো দেহে পাবেন এক শ' আটটা মারমা প্রেশার পয়েন্ট। আর ভার্মা আতি গুরুরা তার বারোটা ব্যবহার করে সঙ্গে সঙ্গে খুন করতে পারে যে-কাউকে।'

'ও, আর আপনি তেমনই কোনও গুরু?' বিমর্ষ সুরে জানতে চাইল লাবনী।

'মনে সন্দেহ রাখবেন না। আরও একটু জেনে নিন, অজ্ঞান

করা বা প্যারালাইয করে দেয়ার মত পয়েন্টের খুবই কাছে থাকে খুন করে ফেলার জায়গা। এখন আপনি যদি বেশি ঝটকা-ঝটকি করেন, হয়তো ভুলে একটু দূরের পয়েন্টে মার পড়বে। ফলাফল: মৃত্যু।' হাসিটা আরও চওড়া হলো। 'আপনি কি ড্রাগ নেবেন, ডক্টর আলম?'

দাঁতে দাঁত চেপে হার মেনে নিল লাবনী। ভাবল, ঠিক আছে, আপাতত কিছুই করতে পারব না, কিন্তু প্রথম সুযোগে শোধ নেব। 'ঠিক আছে, ড্রাগ দিতে গিয়ে ব্যথা দেবেন না।'

লাবনীর ঘাড়ে ইনজেক্টরের নাযল ঠেকাল চাঞ্চাল আধিকারী, আস্তে করে চেপে দিল ট্রিগার। খেপা সাপের মত ফোঁস করে আওয়াজ তুলল গ্যাস।

ভীষণ ব্যথায় ঝটকা খেল লাবনী। কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ করে মাথা ঘুরে উঠতেই পড়ে যেতে লাগল মেঝের দিকে। দু'পাশ থেকে ওকে ধরে ফেলল দু'জন, টেনে নিয়ে বসিয়ে দিল একটা সিটে। তীক্ষ্ণ হুই-হুই আওয়াজ তুলছে বিমানের জেট ইঞ্জিন। একটু পর টেকঅফ করবে।

'রানা যখন আসবে, আপনারা বুঝবেন...' বিড়বিড় করল লাবনী, তারপর হারিয়ে গেল কালো এক গভীর শূন্যতার ভেতর।

ফ্রান্সের হোটেল কক্ষে রানা শুনেছে চরম দুঃসংবাদ— খুন হয়েছে রানা এজেন্সির তরুণ এজেন্ট কামাল আজিজ। লাশ এখন ম্যানহাটান মর্গে।

রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা প্রধানের সঙ্গে কথা শেষ করে সরাসরি লাবনীর অ্যাপার্টমেন্টে ফোন দিয়েছে রানা। ধরেনি কেউ ফোন। বুঝতে ওর দেরি হয়নি, লাবনীকে তুলে নেয়ার জন্যেই কামালকে খুন করিয়েছে অনুপম মঙ্গেলকার বা তার স্ত্রী।

তখনই শপথ নিয়েছে রানা, বেঁচে থাকলে কামাল আজিজের

খুনের শোধ নেবে, যেভাবে হোক উদ্ধার করবে লাবনীকে। দুনিয়ার যেখানেই যাক ওই লোক ও তার ম্যানিয়াক স্ত্রী, মাফ নেই তাদের।

দীর্ঘ বিমানযাত্রা শেষে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে সরাসরি রানা এজেন্সির গাড়িতে উঠেছে রানা। মর্গে গিয়ে কামাল আজিজের লাশ দেখে ফিরেছে অফিসে। সংক্ষিপ্ত মিটিং ডেকেছে। বুঝিয়ে দিয়েছে যার যার কাজ। শহরে ছড়িয়ে পড়বে ওরা, খুঁজে বের করবে প্রয়োজনীয় তথ্য।

সবাই বিদায় নিতে লাবনীর অফিসে ফোন করল রানা।

তিনবার রিং হতেই ওদিক থেকে .বল লিপি গোমেজঃ 'আইএইচএ ডিরেক্টরের অফিস। সেক্রেটারি মিস গোমেজ বলছি।'

নিজ পরিচয় না দিয়েই সরাসরি জানতে চাইল রানা, 'লিপি, তুমি কি জানো লাবনী এখন কোথায়?'

'ও, মিস্টার রানা...' গলা চিনতে পেরে বলল লিপি, 'উনি আজ অফিসে আসেননি। ভাবছিলাম, বাসায় ফোন করে জানতে চাইব, শরীর খারাপ হলো কি না।'

'ফোনে ওকে পেলাম না,' বলল রানা, 'এখন ওর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

ফোন রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা। মাত্র আধঘণ্টার ভেতর পৌঁছে গেল লাবনীর ফ্ল্যাটের সদর দরজায়। তালার চাবি কোথায় রাখা হয় জানে, কোনও অসুবিধে হলো না, ওয়ালথার পি.পি.কে. হাতে নিঃশব্দে ফ্ল্যাটে ঢুকল রানা।

ড্রয়িংরুমে কেউ নেই। বেডরুম অন্ধকার।

কিচেনের টেবিলে কোনও মেসেজ রাখা আছে কি না দেখতে ওদিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল। বাতাসে ভাসছে কফির কড়া গন্ধ। একটু আগে কেউ এসেছিল এখানে।

কিচেনের দরজার পর্দা সামান্য সরিয়ে ভেতরে চোখ রাখল রানা, হাতে কক্ করা পিস্তল। ওদিকের দেয়ালের কাছে লাউঞ্জ চেয়ারে বসে আছে এক লোক, তার হাতেও সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। নলটা রানার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'ওয়েলকাম, মিস্টার মাসুদ রানা!'

নিজের ওয়ালথারের নল তার বুক থেকে না সরিয়ে কিচেনে ঢুকল রানা। চেনে না লোকটাকে। কথায় ব্রিটিশ সুর। পেশিবহুল। রোদে পোড়া চেহারা। বোধহয় এক সময়ে আর্মিতে ছিল। জর্জ মাইকেলের কোনও সঙ্গী? হতে পারে। তবে, প্রতিশোধ নিতে চাইলে পিস্তল সরিয়ে নিত না।

'তুমি কে?' জানতে চাইল গম্ভীর রানা। 'লাবনীকে কোথায় রেখেছ তোমরা?'

'আমার কথা বাদ দিই,' বলল লোকটা। 'আপাতত নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে ডক্টর আলমকে। যাঁরা আমাকে কাজ দিয়েছেন, তাঁরা চাইছেন তুমি তাঁদেরকে জরুরি একটা জিনিস সংগ্রহ করে দেবে। কাজটা শেষ করলে ফেরত দেয়া হবে ডক্টর আলমকে।'

'তোমার নিয়োগকারীরা... অর্থাৎ মঙ্গেলকাররা?'

বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখল জ্যাক রিচি। হাত তুলে দেখিয়ে দিল টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন। 'হ্যাঁ, তাঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আগেই নাম্বার তুলে দিয়েছি, বাটন টিপে দিলেই কল চলে যাবে।'

লোকটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ফোন নিল রানা। কল বাটন টিপতেই জ্বলে উঠল স্ক্রিন। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে নম্বর দেখল ও। ডায়াল করা হচ্ছে। অদ্ভুত এক প্রিফেক্স কোড: ৯৯১। রানা বুঝল, কানেক্ট করা হচ্ছে কোনও স্যাটেলাইট ফোনে।

অরবিটিং রিলে থেকে ঘুরে এল সিগনাল, তারপর শোনা গেল

শান্ত এক মোলায়েম পুরুষ কণ্ঠ: 'হ্যালো।'

অনুপম মঙ্গেলকারের একঘেয়ে কণ্ঠ চিনল রানা। 'মঙ্গেলকার, বাড় অনেক বেড়েছে তোমার। পরে কিন্তু আর সামাল দিতে পারবে না।'

সামান্য বিরতি নিল স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন। 'রূঢ়ভাবে কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, মিস্টার রানা।'

'কথা বলব না, হাতের নাগালে তোমাকে পেলে স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলব।'

'জানতাম এমনই হবে আপনার পৌরুষদীপ্ত আচরণ। হতাশ হইনি। ঠিকই ধরেছে দ্য কোয়েশ্চেন। এবার আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। নিশ্চয়ই এরই ভেতর মিস্টার রিচি বলেছেন, আমরা আপনার বান্ধবী লাবনী আলমকে জিম্মি করেছি।'

'রিচি?' লোকটাকে আরেকবার দেখল রানা। আবছাভাবে মনে পড়ছে, আগেও শুনেছে ওই নাম।

'মিস্টার রানা, আমরা চাই, মিস্টার রিচির হাতে স্টাডা কোডেক্স তুলে দেবেন আপনি। কাজটা শেষ হলে ছেড়ে দেয়া হবে ডক্টর আলমকে। কিন্তু আপনি কাজে গাফিলতি করলে, মেয়েটাকে খুন করব আমরা। আজ মঙ্গলবার, আপনি সময় পাবেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত।'

গত কয়েক ঘণ্টা বারবার শুনেছে একটা আওয়াজ। আবারও ওটা পেল রানা। চালু জেট ইঞ্জিন। মঙ্গেলকাররা আছে কোনও বিমানে। তার মানে, লাবনীও আছে ওখানেই। 'অনুপম, তুমি কি জানো, মরণ ঘনিয়ে এসেছে তোমার?'

'জী?!'

'চাইলেও ওই কোডেক্স সরাতে পারব না। লাবনী ছাড়া কেউ পারবে না। ওই ভল্ট খুলতে হলে লাগবে ওর হাতের ছাপ। কিন্তু তুমি যেহেতু ওকে সরিয়ে নিচ্ছ ভল্ট থেকে দূরে...'

'জানি, ভল্টে আছে হ্যাণ্ডপ্রিন্ট স্ক্যানার। সঠিক সময়ে ড ্
আলমের হাতের ছাপ পাবেন আপনি।'

খুব গম্ভীর হয়ে গেল রানার কণ্ঠ: 'তুমি যদি ভেবে থা
লাবনীর হাত কেটে পাঠিয়ে দেবে, সেক্ষেত্রে ধরে নাও, তোমা
বিশেষ একটা অঙ্গ কেটে নেব আমি। ওই জিনিস মাত্র একটা
থাকে।'

'দেখুন, মিস্টার রানা, দয়া করে হুমকি দেবেন না। আপ
ভুল ভাবছেন। আমি পাঠিয়ে দেব ডক্টর আলমের হাতের ছাপ।'

'তা-ই নাকি? কথা বলতে দাও ওর সঙ্গে!'

কাকে যেন হিন্দি ভাষায় কিছু বলা হলো।

শোনা গেল আবছা ফোঁস-আওয়াজ।

এক সেকেণ্ড পর এল চাপা গোঙানি, তারপর দীর্ঘশ্বাস।

'লাবনী?' ডাকল রানা।

'কে... ওহ্... রানা!' বাচ্চার মত নালিশ করল লাবনী, 'ও
মাথা ছিঁড়ে পড়ছে! রানা, এরা ড্রাগ দিয়েছে! কিডন্যাপ করে
আমাকে!'

'সব ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না,' বলল রানা।

'রানা, এরা চায় তুমি চুরি করবে স্টাডা কোডেক্স। কি
কোনওভাবেই এদের হাতে যেন না পড়ে ওটা!'

'তোমাকে ফেরত পেতে এদের হাতে স্টাডা কোডেক্স তু
দিতে হবে, এই তো? দরকার হলে তাই করব আমি।'

'নাহ্, কক্ষণও না! জানি না কী চায়, কিন্তু বুঝতে পারছি, খু
খারাপ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে ওর! কোডেক্স কারও কাছে বি
করবে না, বা বড় অঙ্কের টাকার কোনও বিষয়ও নয়! ও
কোডেক্স এদের চাই অন্য কোনও ভয়ঙ্কর কারণে!'

কর্কশ, তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ শুনল রানা। মাধুরী মঙ্গেলকার।

'অ্যাই, তোমরা! কাঙালি-বাঙালি ডাইনীটার মুখ বন্ধ করো!'

ফোন থেকে এল ধস্তাধস্তির অস্পষ্ট আওয়াজ।

'লাবনী!' গলা চড়াল রানা। 'মঙ্গেলকার, ওকে লাইনে দাও!'

আবারও ফোঁস করে উঠল কী যেন।

'না, শয়তানের বাচ্চা!' চেঁচিয়ে উঠল লাবনী, আর কোনও সাড়া নেই।

'ওর ক্ষতি না করেই স্রেফ অজ্ঞান করা হয়েছে,' ফোনে নরম সুরে বলল অনুপম মঙ্গেলকার। 'আপনি আমাদের জন্যে কোডেক্স জোগাড় করলেই ফেরত পাবেন তাঁকে। কথা না শুনে আইনী সংস্থায় যোগাযোগ করলে, বা সঠিক সময়ে মিস্টার রিচি ফোন না করলে, আমরা বাধ্য হয়েই খুন করে ফেলব ডক্টর লাবনী আলমকে। এবার ফোনটা দিন মিস্টার রিচির হাতে।'

গনগনে রাগে মোবাইল ফোনটা মেঝেতে আছড়ে ফেলতে ইচ্ছে করলেও কয়েক পা এগিয়ে জ্যাক রিচির হাতে ডিভাইসটা দিল রানা। কানে ফোন ঠেকিয়ে শুনতে লাগল লোকটা। কিছুক্ষণ পর কল কেটে দেয়ার আগে বলল, 'ঠিক আছে, বুঝেছি।'

জ্যাক রিচি পকেটে মোবাইল ফোন ঢোকাতেই জানতে চাইল রানা, 'কী ভাবছেন, কীভাবে ভল্ট থেকে বের করব কোডেক্স? এমন তো নয় যে ওখানে ঢুকে বগলের নিচে চেপে রেখে হেঁটে বেরোতে পারব!'

'কী করবেন সেটা আপনার সমস্যা, মিস্টার রানা— আমার নয়,' উঠে দাঁড়াল জ্যাক রিচি। 'আমার কাজ শুধু কোডেক্সটা মিস্টার মঙ্গেলকারের হাতে পৌঁছে দেয়া। অবশ্য আপনি কোনও চালাকি করতে গেলে সেটা ঠেকিয়ে দেয়ার কাজও আমার।'

'আমার কাছে লাবনীর জীবনের মূল্য ওই পুরনো বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি, কাজেই কোনও ঝুঁকি নেব না,' বলল রানা। 'এখনও জানি না কী করে ওখান থেকে বের করব কোডেক্স। ভেবে বের করব কিছু।' লাবনীর গুছিয়ে রাখা কিচেনে পায়চারি

শুরু করেছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ থমকে গিয়ে তাকা
আর্টিফ্যাক্ট লুঠেরার চোখে। 'জ্যাক রিচি! কঙ্গোয় মার্সেনারির এ
ইউনিটে এই নামের এক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ইতালি
ভিটেলা রেমারিকের, তুমিই কি সেই জ্যাক রিচি?'

মৃদু মাথা দোলাল রিচি। 'পৃথিবীটা খুব ছোট, তাই না?'

'শুনেছি সৎ নীতিবান যোদ্ধা ছিলে। জানোয়ার মঙ্গেলকারদে
সঙ্গে ভিড়লে কী করে?'

'আজকাল মার্সেনারির কাজ পাওয়া কঠিন, বুঝতেই পার
কেন কেউ নেয় অপমানজনক কাজ,' বলল জ্যাক রিচি। 'মিথ্যা
বলব না, মোটা অঙ্কের টাকা দেবে এরা। আগে আমি ছিলাম জ
মাইকেলের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। ও ধরা পড়লে অনুপম মঙ্গেলকা
বলল, ওর জায়গায় দলের নেতা হতে পারি। আপত্তি করিনি।'

'তুমি জানো, অনুপম মঙ্গেলকারের সেক্রেটারি কাঁচের নক
চোখের ওই মেয়েলোক জর্জ মাইকেলকে জবাই করেছে?' বিম
হয়ে গেল জ্যাক রিচির চোখ, চুপ করে থাকল। 'জর্জ মাইকেলে
বন্ধু ছিলে, না? যে ওকে খুন করাল, তার টাকা নিতে আপত্তি নেই
টাকাই আসল? মাইকেল তোমাকে চিনতে পারেনি।'

বিব্রত কণ্ঠে বলল রিচি, 'ক্যান্সার আমার একমাত্র ছেলের।
চিকিৎসার ব্যয় সাধ্যের বাইরে। টাকা আসলেই খুব দরকার।' চুপ
হয়ে গেল। বুঝেছে, এরই ভেতর বলেছে অনেক বেশি কথা। কণ্ঠ
হয়ে উঠল কঠোর, 'আগামী দু'দিন সময় পাবেন, ভেবে বের
করুন কীভাবে সরাবেন কোডেক্স। নইলে খুন হবে ওই মেয়ে।'

'পাথরের মত ভারী ওই বই সরাতে হলে ঢুকতে হবে টপ
সিকিউরিটি ভল্টে, যা প্রায় অসম্ভব,' রিচির চোখে চেয়ে বলল
রানা, 'চেষ্টা করতে হলেও চাই কয়েকজনের সহায়তা।'

আট

প্রাসাদের অভ্যন্তরে হঠাৎ করেই ঘুম ভাঙল লাবনীর। চোখ মেলে দেখল, এখন আর বিমানে বা বদ্ধ কোনও কুঠরিতে নেই। দামি মখমলের চাদরে ঢাকা, বিশাল এক রাজকীয় খাটে শুয়ে আছে প্রকাণ্ড এক ঘরে। দেয়ালে ও ছাতে ভারতীয় প্রাচীন জটিল নকশা। মেহগনি কাঠের দরজা ও জানালার ওপরের খিলান ধনুকের মত বাঁকা, কারুকাজ করা।

কেন যেন ওর মন বলল, আসলে সত্যিকারের প্রাসাদে নেই ও। এ ঘর বোধহয় ভারতীয় থিম প্যালেস বা কোনও হোটেলের। মর্মরের খাট থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়াল জানালার সামনে। দুই পাল্লার মাঝের সরু, ফাঁকা অংশ দিয়ে আসছে সোনালি রোদ। ভেবেছিল বাইরে থেকে বন্ধ থাকবে জানালা। কিন্তু পাল্লা খুলে দিতেই দেখল, নিচে বিশাল এলাকা নিয়ে লন ও বাগান। হাজারো রঙে ফুটেছে ফুল। চোখে পড়ল প্রাসাদের অন্যান্য অংশ। হ্যাঁ, সত্যিই এটা ভারতীয় কোনও রাজপ্রাসাদ। দূরে মিনার ও গম্বুজ। সব এতই পরিচ্ছন্ন, বুঝে গেল লাবনী, আসলে এটা নকল কোনও থিম পার্ক হতে পারে না।

'ডক্টর আলম,' পেছনে অনুপম মঙ্গেলকারের কণ্ঠ শুনে চমকে ঘুরে দাঁড়াল লাবনী। 'গুড মর্নিং।'

এইমাত্র একদিকের দেয়ালের এক অংশ সরে গিয়ে হাজির

হয়েছে বড় টিভি স্ক্রিন। ওখানে তিন ফুটি অনুপম মঙ্গেলকার, চোখে চশমা নেই। গভীর আগ্রহে দেখছে ওকে। লাবনী বুঝে গেল, সর্বক্ষণ চোখ রাখা হচ্ছে ওর ওপর। ডিসপ্লের নিচে চকচক করছে শক্তিশালী লেন্স।

'ঘুমাচ্ছি, সেটা গোপনে দেখছিলেন, মিস্টার মঙ্গেলকার?' কড়া সুরে জানতে চাইল লাবনী। 'জানতাম না ওয়েব ক্যাম বিক্রি করে এত বড়লোক হয়েছেন!'

খোঁচাটা পাত্তা দিল না মঙ্গেলকার। 'আপনার ওই ঘরে আছে মোশন সেন্সর। আপনি ঘুম থেকে উঠতেই কম্পিউটার আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, জেগে গেছেন। স্বাগতম আমার বাড়িতে।'

'হ্যাঁ, খুবই খুশি হয়েছি আসতে পেরে,' তিক্ত সুরে বলল লাবনী। যেভাবে লেন্সের দিকে চেয়েছে, সত্য যুগ হলে বহু দূর থেকেও অনুপম মঙ্গেলকারের গায়ে ফোস্কা পড়ত। 'জানতে পারি, আমাকে জোর করে কোথায় নিয়ে এসেছেন?'

'ব্যাঙ্গালোরের পুবে আমার এস্টেটে। আপনি যে প্রাসাদে, এটা তৈরি করা হয়েছে মহীশূর, কোউদিয়ার আর লক্ষ্মী নিবাস রাজপ্রাসাদের মিশ্রণে। রয়েছে আধুনিক স্থাপত্যের সব সুযোগ সুবিধা। এ ছাড়াও, আছে সর্বাধুনিক টেকনোলজি।'

'তা তো রাখবেনই। এবার বোধহয় আপনার টেলিস্ক্রিনের মাধ্যমে লেকচার শুরু করে দাদাগিরি ফলাবেন... নাকি...'

'মুখ-হাত ধুয়ে নিন, তারপর ড্রাইভ করে আপনাকে পৌঁছে দেয়া হবে আমাদের কাছে।'

'ড্রাইভ?' ভুরু কপালে তুলল লাবনী। 'আপনার এ জায়গাটা কত বড়?'

'প্রাসাদে পাঁচতলা জুড়ে এক শ' পঁয়ষট্টিটা কামরা,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রশ্নের জবাব দিল, 'তবে আপাতত আমরা প্রাসাদে নেই, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে

অভয়ারণ্যে।'

'অভয়ারণ্য? কী আছে ওখানে?'

বিলিয়নেয়ারের নির্লিপ্ত চেহারায় দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল একছা হাসি। 'বাঘ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।'

আধঘণ্টা পর গোসল সেরে নতুন পোশাকে বাথরুম থেকে বেরোল লাবনী। আগেই চমৎকার কয়েকটি দামি পোশাক রেখে গিয়েছিল কেউ। ঝরঝরে লাগছে ওর।

কয়েক মিনিট পর প্রকাণ্ড ঘরে হাজির হলো মার্শাল আর্টিস্ট চাঞ্চাল আধিকারী, চোখে প্রশংসা নিয়ে একবার দেখল লাবনীকে।

এলিভেটরে চেপে প্রাসাদের পেছনে ভূগর্ভস্থ গ্যারাজে ওকে নিয়ে এল লোকটা। প্রকাণ্ড ঘরে সারি দিয়ে রাখা বেশ কিছু গাড়ি। তার মধ্যে রয়েছে ঊনবিংশ শতকের বেন্‌য্ মোটরওয়াগেন ট্রাইসাইকেল থেকে শুরু করে সোনার মত চকচকে সোনালি ম্যাকলারেন সুপারকার। আসলে সংগ্রহ করা হয়েছে নানান ধরনের গাড়ি। যেমন ব্রিটিশ মিনির পাশেই উনিশ শ' ঊনষাট সালে তৈরি ক্যাডিলাক রকেটশিপ। একটু দূরেই খুদে টাটা ন্যানোর পাশেই ঝুঁকে আছে রেকর্ড সময়ে দুর্দান্ত গতি তুলতে সক্ষম বুগাটি ভেরন। প্রতিটি ভেহিকেলের ডিযাইন কোনও না কোনও দিক থেকে বিশিষ্ট, নইলে স্থান পেত না এই সংগ্রহের ভেতর।

এসব বাদ দিয়ে লাবনীকে চকচকে এক ইলেকট্রিক গল্‌ফ্ কার্ট-এ তুলল চাঞ্চাল আধিকারী। র‍্যাম্প বেয়ে সমতল এলাকায় উঠে এল খুদে গাড়ি। পথের দু'দিকে ছায়া তৈরি করেছে সারি সারি গাছ। আধ মাইল দূরে দেখা গেল বড় একটা ছিটমহল। ওটা ঘিরে রেখেছে উঁচু কংক্রিটের দেয়াল। তার ওপর চেইন লিঙ্ক ও রেযর ওয়ায়্যার। পাশ দিয়ে গেছে রানওয়ে, শেষ অংশে চোখ পড়তেই লাবনী বুঝল, কতবড় সীমানা নিয়ে মঙ্গেলকারের

এস্টেট। বাইরে খোলা আকাশের নিচে জেট বিমান। হ্যাঙারে অর্ধেক খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল ছোট, অদ্ভুত এক এয়ারক্রাফট। ওটার ফিউজেলাজ কালো-খয়েরী রঙের, পেছনে প্রপেলার। মনে হলো না কোনও মানুষের ওজন নিতে পারবে ওই আকাশযান। যাওয়ার পথে ওদিকে তাকাল লাবনী, কিন্তু জেট বিমানের আড়ালে চলে গেল ওটা।

বৃত্তাকার ছিটমহলের বাইরের দেয়ালের পাশেই দোতলা এক দালান। স্থাপত্যটা প্রাসাদের মতই, তবে অনেক ছোট। লাবনীকে নিয়ে দালানের দোতলায় উঠল চাঞ্চাল আধিকারী। সামনেই পড়ল কাঁচের দেয়াল। পরিষ্কার দেখা গেল অভয়ারণ্যের ভেতরের অংশ। খুব কিছু দেখার আছে, তা নয়। ঘন পাতার বড় বড় সব গাছ। ওখান থেকে মুখ তুললে কঠিন হবে আকাশ দেখা। আরেক অংশে ঘাসের জমি ও ঝোপঝাড়। ছিটমহলের মাঝে খাল।

'ডক্টর আলম,' মস্তবড় ঘরের একপ্রান্ত থেকে ডাকল ভারতীয় টাইকুন অনুপম মঙ্গেলকার। বসে আছে একটা কন্ট্রোল স্টেশনে। সামনে এক সারিতে কয়েকটা কমপিউটারের মনিটর। সবচেয়ে বড় মনিটরে দেখা গেল বড় একটা গাছের ডাল ও ঘন পাতা। স্বামীর পাশের সিটে বসা মাধুরী মঙ্গেলকার। দেহে টানটান ভাব, যেন আছে খুব টেনশনে। একবার ভীষণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখল লাবনীকে, আবারও মনোযোগ দিল মনিটরে। মাধুরীর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে জিভছেঁড়া দানব আর দাঁত-চোখা হাঙর। লাবনীকে দেখেই সতর্ক হয়েছে তারা। 'ওয়েলকাম টু দ্য স্যাংচুয়ারি।'

'বাঘ দেখছেন?' হালকা সুরে বলল লাবনী।

'ওরা রাজকীয় প্রাণী, চাইলেই দেখা দেয় না,' বলল মাধুরী মঙ্গেলকার। বলার সুরেই বোঝা গেল, অন্তর থেকে ভালবাসে বাঘমামাকে। 'যতই রাজকীয় হোক, চোরাশিকারীরা প্রায় শেষ করে এনেছে ওদেরকে। গত দু'বছরে এ দেশের বড় দুটো জঙ্গলে

থেকে হারিয়ে গেছে শেষ বাঘ। আসলে খুন হয়েছে ওরা।'

'কাজেই আপনারা নিজেরাই তৈরি করেছেন বাঘের জন্যে অভয়ারণ্য?'

শীতল হাসল মাধুরী মঙ্গেলকার। 'আমার বাঘকে খুন করতে এলে কপালে চরম দুঃখ আছে চোরাশিকারীর।'

লাউডস্পিকারে কড়কড় করে উঠল একটা কণ্ঠ: 'তিন নম্বর স্টেশনে আমরা তৈরি।'

হেডসেট-এ জবাব দিল অনুপম মঙ্গেলকার। চট্ করে দেখে নিল স্ক্রিনের মানচিত্র। ধীরে ধীরে ওটার ওপর ছড়িয়ে পড়ছে রঙ। স্ত্রীকে বলল, 'বাঘিনী ওর টোপের দিকে চলেছে।'

'আমাকে দেখাও,' মনিটরে চোখ রাখল উত্তেজিত মাধুরী মঙ্গেলকার।

বিলিয়নেয়ার কি-বোর্ডে টোকা দিতেই চালু হলো দ্বিতীয় মনিটর। দেখা গেল নতুন দৃশ্য। 'আসুন, ডক্টর আলম, মন দিয়ে দেখলে আগ্রহ বোধ করার মত কিছু পেয়েও যেতে পারেন।'

অস্বীকার করবে না লাবনী, কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সেই ছোটবেলা থেকেই আর সব কিছুর চেয়ে বেশি আগ্রহ ওর বাঘের ব্যাপারে। যদিও কখনও চিড়িয়াখানা ছাড়া সামনে থেকে কোনও বাঘ দেখেনি। আসলে রাজকীয় ওই সোনালি জন্তুর প্রচণ্ড শক্তি বা অদ্ভুত সৌন্দর্য সবসময় টানে বাচ্চাদেরকে। দেখা যাচ্ছে পরিণত বয়সেও ওই মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি মাধুরী মঙ্গেলকার।

স্ক্রিনে দেখা গেল সমতল থেকে একটু ওপরে চৌকো এক কংক্রিট বাঙ্কার। গাছপালা ও ঝোপঝাড় দিয়ে এমনভাবে ঢাকা, চট্ করে বোঝা যায় না মানুষের তৈরি। বাঙ্কারের একপাশে ওপরে ঝুলছে ছাতহীন খাঁচা। ভীষণ ভয় নিয়ে মেঝেতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঝারি আকারের এক ছাগল। পালাবার উপায় নেই, বেঁধে রাখা হয়েছে খুঁটিতে। স্পিকারে আবছাভাবে শোনা

গেল তার ম্যা-ম্যা ডাক।

'আপনারা কী করবেন?' জানতে চাইল লাবনী।

'আমাদের এক বাঘিনীর থাবা জখম হয়েছে,' বলল মাধুরী মঙ্গেলকার। 'ওকে বের করে আনতে হবে, যাতে পশু-চিকিৎসক ক্ষতটা দেখতে পারেন।'

'আমাদের তিনটে আছে, একটা পুরুষ বাঘ, অন্য দুটো বাঘিনী,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার। 'যে যার রাজ্যে বাস করে, কাজেই বাধ্য হয়ে তৈরি করতে হয়েছে বেশ কয়েকটা স্টেশন। ওগুলো সুড়ঙ্গের মাধ্যমে যুক্ত, ওদিক দিয়েই অভয়ারণ্যে ঢোকা হয়, বা দরকার হলে জীবিত জন্তু পৌঁছে দেয়া হয়।'

ছাগলটাকে কোমল দৃষ্টিতে দেখল লাবনী। 'সরি, বাছা।'

কমপিউটারের দিকে ফিরল অনুপম মঙ্গেলকার। পাল্টে গেল প্রধান মনিটরের দৃশ্য। সরে যাচ্ছে ক্যামেরা। এক সেকেণ্ড পর লাবনী বুঝল, এই ক্যামেরা ভাসছে আকাশে। ধীরে ধীরে নামছে ফাঁকা এক জায়গায়। মঙ্গেলকার বাটন টিপতেই স্ক্রিনের মাঝে এল বড় এক ক্রসহেয়ার। 'ঠিক আছে, নামিয়ে দাও খাঁচা।'

স্পিকারে ভেসে এল শেকলের ধাতব আওয়াজ। বাঙ্কারের মেঝেতে নামল খাঁচা। ধাতব চওড়া পাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছাগল। তর্জনীর লাল নেইলপলিশ মাখা দীর্ঘ নখ তাক করল মাধুরী মঙ্গেলকার। 'খুব কাছে চলে এসেছে! অনুপম, আমাকে দেখতে দাও!'

অনুগত ভক্তের মত মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার স্ত্রীকে দেখে নিয়ে কণ্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করল বিলিয়নেয়ার। বামে সরল ক্যামেরার চোখ, নিচে দেখাচ্ছে। ঝোপঝাড় শেষে শুরু হয়েছে ফাঁকা জায়গা। 'বাঘের দেহে ট্র্যাকার বসিয়ে দেয়া হয়েছে,' লাবনীকে বলল সে। 'এক মিটারের ভেতর ট্র্যাক করতে পারি আমরা। এই বাঘিনী এবার দেখা দেবে... ওই যে!'

প্রথমে কিছুই দেখল না লাবনী, তারপর ঝোপঝাড়ের ভেতর টের পেল সামান্য নড়াচড়া। হঠাৎ করেই মনে হলো, ছায়ার মধ্যে নড়ল সামান্য হলদে আলো, তারপর সত্যিই বেরিয়ে এল মৃত্যুদূত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!

ওটা তিন শ' পাউণ্ড ওজনের ভয়ঙ্কর শিকারী বাঘিনী। উচ্চতা তিন ফুটেরও বেশি। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে আট ফুট। আহত থাবা আরও সতর্ক করেছে ওকে। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে চলেছে জরুরি কাজে।

'সাধারণত ছাগল বেঁধে রাখি না আমরা,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার। দেখল হতবাক হয়ে দৃশ্যটা গিলছে লাবনী। 'উচিত বাঘদের শিকারের সহজাত অনুভূতিকে গুরুত্ব দেয়া, নইলে ভোঁতা হবে ওদের মগজ।'

'ড্রোন পিছিয়ে নাও!' কঠোর সুরে বলল তার স্ত্রী, 'রোটরের আওয়াজ শুনলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।'

'ওটা আছে চব্বিশ ফুট ওপরে, ছয় গজ দূরে থেকেও শোনা যায় না রোটরের আওয়াজ।' মুখে বলেছে, কিন্তু স্ত্রীর কড়া দৃষ্টি দেখে ড্রোন আরও সামান্য পিছিয়ে নিল অনুপম মঙ্গেলকার।

ভয়ঙ্কর বিপদটা টের পেয়েছে নিরীহ ছাগল, ম্যা-ম্যা আওয়াজে ডেকে উঠে দৌড়ে পালাতে চাইল, কিন্তু ঝাঁকি খেয়ে থামতে হলো খুঁটির কারণে। রকেটের গতি তুলে খোলা জমিটা পেরিয়ে কালো-সোনালি বিদ্যুতের ঝিলিক তৈরি করে ছাগলের কাছে পৌঁছুল বাঘিনী। এতই দ্রুত, তাকে অনুসরণ করতে পারল না অনুপম মঙ্গেলকারের ক্যামেরা। আবারও নতুন দৃশ্য দেখাল ওটা। কিন্তু তার আগেই খাঁচার একপাশে ছাগলটাকে ছিটকে ফেলেছে বাঘিনী, পরক্ষণে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে অসহায় জন্তুটার গলায়। ক্যামেরা দেখাল, ধূসর কংক্রিটের মেঝেতে গলগল করে পড়ছে তাজা রক্ত। প্রাণপণে সরতে চাইছে মারাত্মক আহত

ছাগল, কিন্তু থাবা দিয়ে ওটাকে আঁকড়ে ধরেছে বাঘিনী। নখর দিয়ে ছিঁড়ে ফালাফালা করে দিল শিকারের পেট। মেঝেতে থুপ করে পড়ল রক্তাক্ত নাড়িভুঁড়ি।

দৃশ্যটা দেখে চোখ কুঁচকে ফেলল লাবনী।

জয়স্টিক কন্ট্রোল নিয়ে কাজ করছে অনুপম মঙ্গেলকার। দৃশ্যটা আরও ভালভাবে দেখতে ড্রোন নামাচ্ছে সে। ক্রসহেয়ারে দেখা গেল বাঘিনীর দেহ।

'ওকে আবার আহত কোরো না,' সতর্ক করল তার স্ত্রী।

'তা করব না, জান,' জবাবে বলল বিলিয়নেয়ার। চিরকালের নির্লিপ্ত কণ্ঠে এখন সামান্য অধৈর্য সুর। নিচে নামছে ক্যামেরা।

রোটরের আবছা গুঞ্জন শুনে চোখ তুলে তাকাল বাঘিনী। ওই একই সময়ে জয়স্টিকের বাটন চাপল অনুপম মঙ্গেলকার। স্পিকারে শোনা গেল থ্যাপ্ আওয়াজ। হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে গেল দৃশ্যটা, কাঁপছে খুব। কয়েক সেকেণ্ড পর স্থির হলো ক্যামেরা। দেখা গেল ছাগলটাকে ছেড়ে এক ছুটে গিয়ে আবারও ঘন জঙ্গলে ঢুকতে চাইছে বাঘিনী। কিন্তু কয়েক গজ যেতে না যেতেই মাতালের মত কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তার পেছনের পায়ে গেঁথে আছে রুপালি ডার্ট।

'চেতনা হারিয়েছে,' হেডসেট-এ জানাল বিলিয়নেয়ার, 'এবার নিয়ে এসো।' ছোট এক মনিটরে দেখা গেল, মাটির দিকে নামছে একটা প্ল্যাটফর্ম। কিছুক্ষণ পর আবারও উঠে গেল ওটা। এখন ওখানে সাদা ওভারঅল পরা ক'জন লোক। খুব সাবধানে নাড়াচড়া করছে অচেতন জানোয়ারটাকে।

'ও ঠিক আছে তো?' কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল মাধুরী মঙ্গেলকার।

বাঘিনীর শরীর হাতড়ে দেখল এক লোক, তারপর উড়ন্ত ক্যামেরার দিকে চেয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিল অনুপম মঙ্গেলকার। টিপল সবুজ একটা বাটন। বড় স্ক্রিনে ফুটে উঠল: অটো রিটার্ন। ঘুরল ক্যামেরা, গাছপালা পেরিয়ে উঠতে লাগল ড্রোন। নিজেই ফিরবে স্থির করে দেয়া জায়গায়, কাউকে চালাতে হবে না।

উঠে আড়মোড়া ভাঙল ভারতীয় বিলিয়নেয়ার। 'হ্যাঁ, এবার আলাপ করতে পারব, ডক্টর আলম। জানি, কথা বলে লাভ নেই, কিন্তু দ্য কোয়েশ্চেনের ধারণা, এখনও তেরো ভাগ সম্ভাবনা আছে, আপনি রাজি হবেন আমার হয়ে কাজ করতে।'

'এক শ'ভাগ ভুল করে আপনার দ্য কোয়েশ্চেন,' কাঁধ ঝাঁকাল লাবনী। 'তবুও বলুন, শুনি কী বলতে চান।'

'তা হলে বলেই ফেলি, নিশ্চয়ই ভাবছেন, কী কারণে আমরা এত ব্যস্ত হয়ে উঠলাম স্টাডা কোডেক্স হাতে পাওয়ার জন্যে?'

'কথাটা যে মনে আসেনি, তা নয়।'

'এরই ভেতর আইএইচএ-র সব রিসার্চ বা অনুবাদের কপি আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সংগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন মিস্টার রিচি। তাতে দেখলাম আমার আগের ধারণাই ঠিক। আসলে স্টাডা কোডেক্সের ভেতরেই রয়েছে জরুরি সূত্র। ওটাই বলে দিতে পারে কোথায় আছে স্রষ্টা শিবের গুহা।'

'আপনি আসলেই ভাবছেন ওটা আছে?'

'স্বয়ং শিবের মতই ওই গুহাও একদম বাস্তব।' লাবনীর চোখে গভীর সন্দেহ দেখে বলতে লাগল অনুপম মঙ্গেলকার, 'হয়তো ভাবছেন, আমার মত কমপিউটার বিলিয়নেয়ার কী কারণে ব্যোম ভোলানাথের অন্ধ ভক্ত হলাম! আসলে আপনার বুঝতে হবে, ডক্টর আলম, এটা ভারতবর্ষ। আমাদের চারপাশে অসংখ্য দেব-দেবতা ও দেবী। প্রতিটি মুহূর্তে তাঁদের সহায়তা নিয়ে জীবনের পথে চলেছি আমরা। বলতে পারেন, এ বিষয়টা সুপেয় জলের মত। ওটা ছাড়া চলবে না। মাধুরী আর আমি

দু'জনেই শিবের দাস। তাঁর সামান্য ইঙ্গিত না পেলে আঙুলও নড়াই না। তা করবই বা কেন? আমাদের এই বিপুল সম্পদ আর ক্ষমতা, সবই এসেছে স্রষ্টা শিবের কাছ থেকেই। তাঁর প্রতি ভক্তির শেষ নেই আমাদের। তিনিই তো স্থির করেন কীভাবে চলবে পৃথিবী। তাঁর প্ল্যানের বাইরে কিছুই নেই।'

'আপনাদের জন্যে কী প্ল্যান করেছেন তিনি?' জানতে চাইল লাবনী। আরও কিছু বলত, কিন্তু থামতে হলো। এইমাত্র খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে উড়ে এসেছে কালো-রুপালি ঘুড়ির মত এক খুদে বিমান। দৈর্ঘ্যে বড়জোর দু'ফুট। ত্রিকোণ। দুই ডানার শেষে বনবন করে ঘুরছে দ্রুতগতি রোটর। 'ওটা কী?'

'আমার বিমান। প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্যে রয়েছে এর নাম ও কীর্তির কথা। এসব ব্যবহার করতেন দেবতারা। বর্ণনা অনুযায়ী ওগুলো ছিল উড়ন্ত রথ, যান্ত্রিক পাখি, বা এমন কী ছিল ভাসমান প্রাসাদ। কিন্তু, আজ আর নেই আমাদের সেই বিশাল ও মহান সভ্যতা, সময়ে হারিয়ে গেছে প্রায় সবই।' ঘরের এক কোণে ভনভন করছে খুদে এয়ারক্রাফট। ইঞ্জিনের গতি কমতেই ওটার দিকে চলল অনুপম মঙ্গেলকার। পিছু নিল লাবনী। ওকে পাহারা দিচ্ছে বিলিয়নেয়ারের তিন বডিগার্ড।

আরেকটু এগোতেই লাবনী দেখল, খুদে বিমানের পেটের কাছে ক্যামেরার লেন্সের নিচে ডার্ট গান। 'ও, তা হলে ওটা দিয়েই ঘায়েল করেছেন বাঘিনীকে? দারুণ মজার খেলনা।' ডার্ট গানের ট্রিগার সাধারণ অস্ত্রের ট্রিগারের মতই, ড্রোনের পেট থেকে বেরোনো মেকানিযম ওটাকে চালায়। ম্যাগাযিনে এখনও আছে দুটো ডার্ট। ছোট এক বোতল কমপ্রেস্ড্ গ্যাসের কারণে ছিটকে যায় ওগুলো।

সামনে ঝুঁকে গ্যাসের বোতল দেখল লাবনী।

যে ট্র্যাঙ্কুলাইযার ব্যবহার করে বাঘকে অজ্ঞান করেছে, সে

পরিমাণ ওষুধ খুন করবে যে-কোনও মানুষকে। একবার ট্রিগার মেকানিযম কাজে লাগাতে পারলেই খতম হবে অনু...

'মাধুরী আছে ওর পোষা জানোয়ার নিয়ে, আমি আমারগুলো নিয়ে। বড় হয়েছি ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্ট এলাকায়। যখন ছোট ছিলাম, এয়ারলাইনার দেখে ভাবতাম, ওই যে বাবার বলা বেদ ও মহাভারতের সেসব বিমান। আসলে চেয়েছি ইঞ্জিনিয়ার হতে। বিমান তৈরি করব। কিন্তু পরে আবিষ্কার করলাম, বেশি মাথা খোলে কমপিউটারে।' নিজ পছন্দের বিষয় পেয়ে উষ্ণ হয়ে উঠছে লোকটার কণ্ঠঃ 'আজও আমাকে আকর্ষণ করে বিমান। ভারতের মিলিটারি এয়ারক্রাফট নির্মাণকারীদের প্রধান আমি। বিনিয়োগ করেছি বিশাল অঙ্কের টাকা। এই যে-ড্রোন দেখছেন, এটা তৈরি করেছি একা, আসলে খুদে ফ্রেমে হাই থ্রাস্ট টু ওয়েট রেশিয়ো...'

'অনুপম,' কণ্ট্রোল স্টেশন থেকে ভুরু কুঁচকে স্বামীকে দেখছে মাধুরী মঙ্গেলকার। 'যদি ওই মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেই হয়, তো মূল কথায় এসো।'

মুহূর্তে আবারও নিষ্প্রাণ-নির্লিপ্ত হলো অনুপম মঙ্গেলকারের চেহারা। 'হ্যাঁ, ঠিক, শিবের গুহা। বিশ্বাস করি, ওটা আছে। ওখানে আছে অদ্ভুত কিছু জ্ঞান। সেসবের মাধ্যমে পরের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নোংরা এই পৃথিবীটাকে। জ্ঞানের শেষ নেই যে মহাদেবের, সেই তিনি দিয়েছেন ওসব লিখিত বচন।' দীর্ঘক্ষণ লাবনীর চোখে চেয়ে রইল বিলিয়নেয়ার, তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা মোটেও বিশ্বাস করছেন না।'

'কষ্টকল্পনা মনে হচ্ছে।'

'কেন? আপনাদের অনুবাদ থেকেই তো জেনেছেন, সত্যিই শিবের গুহা থেকেই এনে স্টাডাকে পাথুরে ট্যাবলেট দেখান সাধুরা। ওটাই শিব-বেদ, স্রষ্টার লিখিত বক্তব্য।'

'এমন নয়, স্বয়ং শিব পাথর কুঁদে ওসব লিখেছেন।'

'আমি তা বলছি না, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে... ওগুলো তৈ হয়েছিল ঠিক কোন্ সময়ে। ডক্টর আলম, আপনি কি নানান যু সম্পর্কে কিছু পড়েছেন বা জেনেছেন?'

'সামান্য। হিন্দু মিথোলজি অনুযায়ী সৃষ্টির চাকায় বে কয়েকটি যুগ বা ধাপ আছে।'

'ঠিক। বর্তমান পৃথিবীতে রয়েছে চারটে চক্র: সত্য যুগ ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ, শেষে কলি যুগ। শেষ যুগ হচ্ছে কলি যুগ চক্রের ভেতর ওটাই সবচেয়ে জঘন্য সময়। সত্য যুগ থেকে অনেক দূরের। আর আমরা আছি ওই যুগেই।'

'প্রায় প্রতিটি ধর্মে আছে এই যুগের কথা,' বলল লাবনী। 'স যুগেই বলা হয়েছে, আগে ছিল ভাল কাল, এখন সময় খু খারাপ। এসব বলা হয়েছে নস্টালজিয়ার কারণে। বলা বা লেখ হয়েছে, *প্রমাণ তো দেখছেন নিজ চোখেই— পাপ-কলঙ্কে ডুবে গেছে মানবজাতি।* কিন্তু আসলে এসব দিয়ে স্বাধীনচেতা মানুষে মুক্ত-চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে দিত ধর্মান্ধ সব যাজক, নইলে নিজেদের পেটে খাবার জুটত না তাদের।

'কিন্তু সত্যিই কলি যুগ আসায় মহান হিন্দুধর্ম প্রায় ধ্বংস হয়েছে। কালো অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে গোটা পৃথিবী। আর ঠিক এমনি এক সময়ে চক্র শেষ করবেন শিব।'

'ধ্বংসের মাধ্যমে।'

'যাতে নতুন করে আবার শুরু হতে পারে পৃথিবী বা মানুষের চক্র। তখনই আসবে নতুন সত্য যুগ। মানুষের হৃদয় হবে উদ্ভাসিত, মন হবে প্রশান্তিময় ও ভালবাসাপূর্ণ। এবং এসবই সম্ভব শিবের বেদটা পাওয়া গেলে।'

'পাবেন কী করে? মানে, বেদ পেলেই কাটবে সব সমস্যা?'

লাবনীর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেল ভারতীয় বিলিয়নেয়ার, 'আটলাণ্টিয়ান স্টাডা কোডেক্সের কারণে আমরা

জানি, আটলান্টিস যখন ছিল, সে সময়েও ছিল শিবের বেদ। তার মানে, যিশুর জন্মের নয় হাজার বছর আগে। ঠিক, ডক্টর আলম?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'অর্থাৎ শিবের ওই বেদ আরও আগের— অন্তত দ্বাপর যুগের। হিন্দু পাঁজি হাজার হাজার বছরের পুরনো। আমাদের জানা আছে, কলি যুগের শুরু হয় যিশু জন্মের তিন হাজার এক শ' দুই বছর আগে। গ্রেগরিয়ান ডেটিং অনুযায়ী সেদিন ছিল তেইশে জানুয়ারি। কিন্তু শিবের বেদ যেহেতু আরও আগের, ওখানে আছে আরও নিখুঁত হিসাব। লিখিত বেদও হবে সত্য ও অন্তরস্পর্শী। কলি যুগের নোংরামি ছুঁতে পারেনি সেই বেদকে। শিবের ওই লিখিত বক্তব্য হবে মানবজাতির জন্যে মস্ত এক শিক্ষামূলক পাথেয়। আর এসব পেলেই নতুন করে পৃথিবীর বুকে ডেকে আনব সত্য যুগ।'

'মানে, ভাবছেন, এ যুগের ভোলানাথ আপনিই?' ঠাট্টার সুরে জানতে চাইল লাবনী

'না, অত ভাগ্য নিয়ে আসিনি। আমি শুধু পালন করব শিবের নির্দেশ। শেষ করে দেব এবারের চক্রের খেলা। কিন্তু সবার আগে চাই শিবের বেদ, নইলে তাঁর দেয়া শিক্ষা ও পথ হারিয়ে দুর্নীতির নরকে পড়বে মানবজাতি। সেক্ষেত্রে শেষ হবে আমার এত কষ্টের ফসল। বুঝতেই পারছেন, শিবের ওই বেদ পেতে হলে ঢুকতে হবে ওই গুহায়। সেজন্যে লাগবে স্টাডা কোডেক্স।'

'আপনি তো অনুবাদ করা প্রায় সব তথ্যই পেয়ে গেছেন। তা হলে আবার কীসের দরকার ওই কোডেক্স?'

'ওই চাবি, ডক্টর আলম। স্টাডাকে যে চাবি দেখান সাধুরা, ওটার ছাপ আছে কোডেক্সের প্রচ্ছদে। একবার ওটা পেলে তৈরি করব চাবির ডুপ্লিকেট। ওটা দিয়েই খুলব গুহার দরজা।'

'চাবির চেয়েও বেশি কিছু লাগবে,' বলল লাবনী। 'স্টাডাকে

জানান সাধুরা, যাঁরা জানেন শিবের সত্যিকারের ভালবাসা, শুধু তাঁরাই ওই চাবি ব্যবহার করে ঢুকতে পারবেন সেই গুহায়।'

'আমি অন্তর থেকে ভালবাসি শিবকে,' গদ-গদ সুরে বলল অনুপম মঙ্গেলকার। 'সারাজীবনে এত ভালবাসা কাউকে দিইনি, যতটা দিয়েছি মহান শিবকে। মাধুরী আর আমি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু। কিন্তু কখনও কাউকে নিচু চোখে দেখেননি শিব। ভারতের সরকার বলে থাকে আমরা হরিজন। মুখের ওপর না বললেও তাদের কাছে মনে হয় আমরা অস্পৃশ্য! আমাদের কোনও সম্মান থাকতে পারে না, দমিয়ে দেয়া উচিত চাবুক মেরে। আমাদের দেখলে ভুরু কুঁচকে ফেলে ব্রাহ্মণরা। কিন্তু সত্যি কথা: জন্মের দোষে বা পেশার কারণে কখনও কাউকে ছোট করা যায় না। উঁচু বংশের হিন্দুরা ওসব পেশা তৈরি করেছে আমাদের জন্যে হাজার হাজার বছর আগে।' কখন যেন তিক্ত হয়ে গেছে মঙ্গেলকারের কণ্ঠ: 'এমন কী আজও, মাধুরী বা আমি নানান হয়রানির ভেতর পড়ি। ব্যবসার জগতে, সমাজে, সব জায়গায়। যাদেরকে কিনতে পারি সামান্য পয়সায়, আমাদেরকে দেখে নাক কোঁচকায় সেসব উচ্চবর্ণের হিন্দুরা।'

'ভারতের সমাজের পরিবর্তন চান, না গোটা পৃথিবী বদলে দিতে চান?' টিটকারির সুরে বলল লাবনী।

'একদিক থেকে ঠিকই প্রশ্ন তুলেছেন,' স্বীকার করল মঙ্গেলকার। 'হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেব ক্ষমতা। যেন দুনিয়ার সব তথ্য পায় তারা। আরও ভালভাবে বললে: আমি হয়ে উঠব ওদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। ভারত চলবে আমার আঙুলের ইশারায়। শুধু তাই নয়, গোটা পৃথিবী...'

তিন বডিগার্ডকে দেখাল লাবনী। 'তার মানে, পয়সা ছড়িয়ে এদের মত লোকদের কিনে নিজের নোংরা কাজ করিয়ে নেবেন?'

'কিছু সমস্যা কখনও আলাপের মাধ্যমে দূর হয় না। যেমন

জর্জ মাইকেল। ইন্টারপোলের সঙ্গে চুক্তি করত। তার মুখ বন্ধ না করে উপায় ছিল না। ওই মহান কাজটা করেছে মায়া খোইল।'

জিভহীন দানব কর্কশ শব্দে কী যেন বোঝাতে চাইছে। ভারতীয় বিলিয়নেয়ার বলল: 'হতভাগিনী মায়া খোইল আমার বিশ্বস্ত অনুসারী, নিশ্চয়ই স্রষ্টা শিবের কল্যাণে স্বর্গে যাবে সে।'

'হ্যাঁ, রানা বলেছে কী ধরনের বিশ্বস্ত ছিল, গ্রেফতার এড়াবার জন্যে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করেনি,' বলল লাবনী।

'নিজ কাজে সেরা ছিল। এক মাতাল আঁধার রাতে ওকে পতিতা মনে করে ধরে বসেছিল, ও বাধা দিতেই ছোরা দিয়ে উপড়ে নেয় বাম চোখ। পরে যখন আমাদের দাতব্য সংস্থা থেকে জানানো হলো মেয়েটার খুবই করুণ অবস্থা, সাহায্য করলাম মাধুরী আর আমি। বেশ কয়েকবার অপারেশন করে মেরামত করা হলো মায়া খোইলের চেহারা। ও যখন সুস্থ হলো, দ্য কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে সেই হামলাকারীকে খুঁজে বের করে তুলে দিলাম ওর হাতে। মায়া খোইলের জন্যে প্রথম পরীক্ষা ছিল ওটা। খুব কষ্ট পেয়ে লোকটা ইহলোক ত্যাগ করতেই বোঝা গেল, ভালভাবে পাশ করেছে মেয়েটা। আমার হয়ে উঠল গোপন অস্ত্রের মত। তুলনা ছিল না ওর।'

'দয়ার শেষ নেই আপনাদের,' বলল লাবনী। দেখল তিন বডিগার্ডকে। চোখ স্থির হলো চাঞ্চাল আধিকারীর ওপর। 'এই যে বলিউডের ব্রুস লি, এর ব্যাপারটা কী?' মনে হলো না অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করায় অখুশি হয়েছে লোকটা। চকচকে চোখে দেখছে লাবনীকে। 'আর অন্য দু'জন?'

'নরেশ শর্মা,' দাড়িওয়ালা দানবকে আঙুল তুলে দেখাল অনুপম মঙ্গেলকার, তারপর দেখাল করাতের মত দাঁতওয়ালা চিমসে লোকটাকে, 'বা সন্তোষ ব্যাপারী। রাস্তার মারপিটে অংশ নিত সন্তোষ অন্যের হয়ে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না ওর। পরিবার

ছিল ঋণগ্রস্ত। তেমন শক্তিশালী ছিল না বলে মালিক বাড়তি একটা অস্ত্র দান করে ওকে।' লাবনীর দিকে চেয়ে পেরেকের মত চোখা দাঁত বের করে হাসল সন্তোষ ব্যাপারী।

'তার মানে আপনাদের কর্মচারীদের দাঁত-মুখ অস্বাভাবিক হতেই হবে?'

'ওর একান্ত ইচ্ছেতেই দাঁত এমন করা হয়। খুবই কাজের জিনিস। আগেই তো টের পেয়েছেন।' অস্বস্তি নিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা বাহু স্পর্শ করল লাবনী। 'আর নরেশ শর্মা, ও ছিল এক গুণ্ডাদলের নেতার ডানহাত। কিন্তু নেতার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। উঁচু বংশের ব্রাহ্মণদের পুরনো এক শাস্তি দেয়া হয় ওকে, মুখে পুরে দেয়া হয় টকটকে লাল কয়েকটা আগুনে পোড়ানো পেরেক। গুণ্ডাদলের নেতার মনে হয়েছিল ওটাই হবে ওর উপযুক্ত শাস্তি।'

দাড়িওয়ালা দানবের দিকে তাকাল লাবনী। 'হায়, আল্লা! এখন বোধহয় আর বেঁচে নেই সেই গুণ্ডাদলের নেতা?'

'না, সে আছে পরবর্তী চক্রের কোথাও। আপনি আবার নরেশ, চাণ্ডাল বা সন্তোষকে আমার সামান্য চাকর ভাববেন না। ওদের মতই মাধুরী ও আমি শিবের দাস। তাঁর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসের কারণেই আজ আমি এখানে। আবার এ কারণেই তাঁর হয়ে মানবজাতিকে পৌঁছে দেব নতুন চক্রে।' ড্রোনের দিকে এগোল অনুপম মঙ্গেলকার। 'তো, ডক্টর আলম, সবই তো শুনলেন কী করব। এবার একটা কথাই জানতে চাইব, আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন শিবের গুহা খুঁজে বের করতে?'

বুকে দু'হাত বাঁধল লাবনী। 'আপনাদের কারণে খুন হয়েছেন আমার এক বড়ভাই। শুধু তাই নয়, আরও বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ মারা পড়েছেন। তারপরেও কি আপনি সত্যিই ভাবছেন স্বেচ্ছায় আপনাদেরকে সহায়তা করব?'

'না, আসলে তা ভাবছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল বিলিয়নেয়ার। 'এক শ'ভাগের মধ্যে তেরো পার্সেন্ট অত্যন্ত ক্ষীণ সম্ভাবনা। তবুও চেষ্টা করে দেখলাম। পরে দোষ দিতে পারব না নিজেকে।'

ঘরের মাঝ থেকে বলল মাধুরী মঙ্গেলকার, 'আমি অপারেশন থিয়েটারে চললাম। দেখব কী করছে।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সে। পেছনে চলল তার বিকৃতমুখ দুই বডিগার্ড।

'তা হলে প্রাসাদে দেখা হবে,' বলল বিলিয়নেয়ার। স্ত্রী বিদায় নিচ্ছে বলে সেদিকে তাকাল।

সে আছে এখন ঠিক ড্রোনের সামনে। ঝট্ করে এগিয়েই ডার্ট গানের হাতল ধরল লাবনী, টিপে দিল ট্রিগার। ওর হাতের ভেতর লাফিয়ে উঠল অস্ত্রটা। থ্যাপ্ আওয়াজ তুলে বেরোল হাই-প্রেশার গ্যাস। ব্যারেল থেকে ছিটকে গেল স্টিলের ডার্ট...

কিন্তু অনুপম মঙ্গেলকারের বুক থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে থমকে গেল ওটা। মাত্র এক সেকেণ্ডে ঘটে গেল সব। ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ডার্ট ধরেছে মার্শাল আর্টিস্ট চাঞ্চাল আধিকারী।

শিউরে উঠে লাইন-অভ-ফায়ার থেকে সরল বিলিয়নেয়ার। চশমার ওদিকে বিস্ফারিত দু'চোখ। তার পায়ের কাছে ডার্ট ফেলল চাঞ্চাল আধিকারী। কয়েক সেকেণ্ড পর নিজেকে সামলে নিয়ে চাপা স্বরে বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'মস্তবড় ভুল করেছেন, ডক্টর আলম।'

মাধুরী মঙ্গেলকারের অনুভূতি পরিষ্কার বোঝা গেল, লাবনীর দিকে ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করল সে, 'তোমরা ধরো হারামজাদীকে!' তার দুই বডিগার্ড আগেই পৌঁছুল লাবনীর কাছে। চট্ করে সরে যেতে চাইল ও, কিন্তু সম্ভব হলো না। ওকে কোণঠাসা করে ফেলল দাড়িওয়ালা দানব। ওর ডানহাত ধরে মুচড়ে তুলে দিল পিঠের ওপরের দিকে। লোকটার হাঁটুর নিচের হাড়ে খটাস্ করে পায়ের হিল নামাতে চাইল লাবনী, কিন্তু তার

আগেই আরও ওপরে ঠেলে দেয়া হলো ওর হাত। কড়-মড় আওয়াজ তুলল কাঁধের জয়েন্ট। যে-কোনও সময়ে ভাঙবে। তীব্র ব্যথায় চোখে নিকষ কালো অন্ধকার দেখছে লাবনী।

ওর লড়াই সত্যিই সমাপ্ত।

কাছে পৌঁছে গেল মাধুরী মঙ্গেলকার। কর্কশ স্বরে কী যেন বলল। ভাষাটা চিনল না লাবনী। এগিয়ে এল হাঙর দাঁত। লাবনী ভীষণ ভয় নিয়ে ভাবল, আবারও ওকে কামড়ে দেবে লোকটা!

কিন্তু তা না করে পকেট থেকে কী যেন বের করে মাধুরীর হাতে দিল সে।

ওটা সুইচব্লেড ছোরা, ফলা চার ইঞ্চি, রুপোর মত চকচক করছে আলোয়। একটানে লাবনীর ডান কানের ওপর থেকে চুল সরিয়ে ছোরার ডগা ফুটোর ভেতর ভরে দিল মাধুরী। হিসহিস করে বলল, 'এখনও খুন হওনি, কারণ জিম্মি হিসেবে তোমার মূল্য আছে।' ছোরা একটু পিছিয়ে নিল, ওটার ফলা দিয়ে সামান্য চিরে দিল কানের লতি। ব্যথায় চমকে গেল লাবনী। 'কিন্তু আবারও তেড়িবেড়ি করলে আর মাফ পাবে না।'

কানের লতির চেরা মাংসে একটু চেপে বসল ছোরার ফলা। আতঙ্কে ও তীব্র ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লাবনী।

'খুন হবে, কিন্তু তার আগে ফালি ফালি করব তোমাকে,' বলল মাধুরী মঙ্গেলকার। পিছিয়ে গেল এক পা। 'চাণ্ডাল, আমার সঙ্গে এসো।' চাকরের হাতে রক্তাক্ত ছোরাটা ধরিয়ে দিল সে। তীব্র ঘৃণা নিয়ে লাবনীকে আরেকবার দেখে নিয়ে সম্রাজ্ঞীর মত গটমট করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। পিছু নিল মার্শাল আর্টিস্ট চাণ্ডাল আধিকারী।

'খুনি মেয়েলোক!' বিড়বিড় করল লাবনী। ওর গ্রীবা বেয়ে দরদর করে নামছে উষ্ণ রক্ত।

কৌতূহলী চোখে ওর নতুন ক্ষত দেখল অনুপম মঙ্গেলকার।

ভাবটা এমন, দেখছে ল্যাবোরেটরিতে অদ্ভুত কোনও জন্তু। কয়েক সেকেণ্ড পর আদেশ দিল, 'সন্তোষ, ব্যাণ্ডেজ করে দাও।' হাঙরের মত দাঁত বের করে লাবনীকে টিটকারির হাসি উপহার দিল চিমসে বদমাস। ফার্স্ট-এইড কিট আনতে গেল একটু দূরের ডেস্কের কাছে। 'নরেশ, একে ছেড়ে দাও।'

মুচড়ে ধরা হাত ছেড়ে দিল দানব। কাঁধের ব্যথা সহ্য করে রক্তাক্ত কান স্পর্শ করল লাবনী। বেশ গভীরে গিয়ে কার্টিলেজ কেটে দিয়েছে ছোরা। বিড়বিড় করল, 'হায়, আল্লা! মেয়েলোকটা সত্যিকারের সাইকো!'

'আশা করি এরপর আমাদেরকে হালকা চোখে দেখবেন না,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'ভাববেন না, আমি সামান্য কোনও কমপিউটার নার্ড।' অদ্ভুত শোনাল তার কথা। চেহারায় বা কথার সুরে অনুভূতির কোনও ছাপ নেই। 'বড় হয়েছি বস্তিতে। প্রতিটি পদে লড়াই করে তবেই এসেছি আজ এই পর্যায়ে। যা জরুরি, তাই করেছি এবং করব— কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে লক্ষ্যে পৌঁছুতে।'

ফিরে এসেছে সন্তোষ ব্যাপারী, কানের ক্ষতে লাগাতে গেল ব্যাণ্ড-এইড, কিন্তু প্রায় ছোঁ দিয়ে তার হাত থেকে ওটা কেড়ে নিল লাবনী। রাগ নিয়ে বলল, 'নিজের কাজ নিজেই করতে পারব!' কানের ক্ষতে ঠিকভাবে জিনিসটা লাগানোর পর কড়া চোখে দেখল অনুপম মঙ্গেলকারকে। 'তো শিবের বেদ পেয়ে গেলে তখন কী করবেন আপনি?'

জবাব না দিয়ে বডিগার্ডদের ইশারা করল বিলিয়নেয়ার, তারা যেন সরিয়ে নেয় লাবনীকে।

নয়

'বুঝতেই পারছ আগামী রাতে কাজ শেষ করতে হবে,' বলল রানা। 'কারও নতুন কোনও আইডিয়া?'

নিউ ইয়র্ক রানা এজেন্সির ওপরতলায় রানার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে বসে আছে ওরা ক'জন, কাউকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে না।

'সাদ্যিমত সবই কত্তে হবে, সার,' ভরসা দিতে চাইল গিল্টি মিয়া। রানার সঙ্গেই আমেরিকায় এসেছে, আপাতত কিছু দিনের জন্যে উঠেছে শাখা প্রধান রবি চৌধুরির বাসায়। আজকের জরুরি মিটিঙে ডাকা হয়েছে পরামর্শক হিসেবে। 'মোটেও চিন্তে করবেন না, সার, দেকবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মাসুদ ভাই, মঙ্গেলকারদেরকে ধরে তাদের কাছ থেকে ডক্টর লাবনীকে কেড়ে নিলে হতো না?' জানতে চাইল রায়হান রশিদ।

মাথা নাড়ল রানা। 'উপায় থাকলে ভারতে গিয়ে প্রতিশোধ নিতাম, এবং সঠিক সময়ে তাই করব। কিন্তু আপাতত আমার ওপর চোখ রাখছে জ্যাক রিচি।'

'ওই ব্যাটাকে ধরে নোংরাভরা বাতরুমে এঁটকে দোওয়া উচিত,' বলল গিল্টি মিয়া।

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। 'তার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে যোগাযোগ করছে মঙ্গেলকারের লোক। ঠিক সময়ে ফোন না দিলে...'

রানার কথা শুনে মুখ নিচু করে ভাবতে লাগল সবাই।

'আপনি কি সত্যিই ভল্টে ঢুকতে পারবেন?' দ্বিধা নিয়ে বলল লোলা ভার্নিও, কাউচে বসে আছে বাগদত্ত রবি চৌধুরির পাশে। 'আমার কেমন যেন ভয় লাগছে! ধরা পড়ে গেলে...'

ঘরের দেয়াল দেখাল রানা। ওখানে ঠেস দিয়ে রাখা ছয় ফুট দৈর্ঘ্যের স্টিলের ভেন্টিলেশন ডাক্ট। 'লিপির ওখান থেকে ঘুরে এসে প্ল্যান করেছি, ভল্টের এয়ারভেন্ট ওই অফিসের ভেন্টিলেশন ডাক্টের সমান। আশা করি ঢুকতে পারব ওখানে।'

সরল চোখে রানার কোমর মেপে নিয়ে বলল গিল্টি মিয়া, 'সার, আমি গেলেই বোধায় ভাল ছিল।'

'ওজন বাড়েনি আমার,' গম্ভীর হলো রানা, 'একটু পরেই দেখছি আঁটব কি না। ওখানে ঢুকতে না পারলে জরুরি ভিত্তিতে লিপোসাকশন করাতে হবে, এ ছাড়া উপায় নেই।'

'ওই সরু ডাক্টে ক্রল করা...' বিড়বিড় করল রায়হান।

স্ট্রাকচারাল ব্লুপ্রিন্ট মেলে ধরল লাবনীর সেক্রেটারি লিপি গোমেজ। 'আইন মেনে রাখতে হয়েছে এই আকারের ডাক্ট। ইউএন অফিস আছে আন্তর্জাতিক এলাকায়। যখন তৈরি হলো, তখন ডাক্ট ছিল না। ওই দালান ছিল নিউ ইয়র্কের বিল্ডিং কোডের বাইরে। কিন্তু পরে প্রতিটি ঘরের সঙ্গে ডাক্ট দিতেই হলো, নইলে আগুন ধরলে সাহায্যে আসবে না নিউ ইয়র্ক ফায়ার ডিপার্টমেন্ট। বাধ্য হয়ে কয়েক বছর আগে নতুন করে ভেন্টিলেশন ডাক্ট বসাল গোটা দালানে। তখন কোড মেনেই তা করা হয়েছে। কোড অনুযায়ী এক্সটার্নাল ভেন্টিলেশন রাখতে হবে, নইলে ভেতরে আটকে যেতে পারে যে-কেউ। কোডে এ-ও আছে, দালানের ভূগর্ভস্থ অংশে সারাক্ষণ অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে হবে। প্রতি মিনিটে কতটুকু, তা-ও ঠিক করে দেয়া হয়েছে।'

'ওই ডাক্ট কি এই ডাক্টের সমান?' জানতে চাইল রায়হান।

মাথা দোলাল রানা। 'নয় ইঞ্চি বাই চোদ্দ ইঞ্চি।'

'কিন্তু সবাই জানে, ভল্টে এই আকারের ডাক্ট থাকলে যখন তখন চুরি হতে পারে,' বলল লিপি, 'বিশেষ করে যে ডাক্ট যাবে ইউএন-এর সিকিয়োর আর্কাইভে। কাজেই ওটার শেষে ওয়েল্ডিং করে আটকে দেয়া হয়েছে পুরু স্টিলের ঝাঁজরি। বাতাস আসা-যাওয়া করবে, কিন্তু কারও সাধ্যি নেই ওদিক দিয়ে ঢুকবে। মাটি থেকে সত্তর ফুট ওপরে সত্যিকারের এয়ার ভেন্ট। সপ্তমতলার ডাক্ট দিয়ে নামলে গিয়ে পড়তে হবে সরাসরি সত্তর ফুট নিচে।'

থুতনি চুলকে নিল শাখা প্রধান রবি চৌধুরি। 'তার মানে, কোনও একটা ভেন্ট দিয়েই ঢুকতে হবে। আগে বুঝতে হবে কোথা দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় ভল্টে।'

'সেটা সমস্যা নয়,' বলল রানা। 'সমস্যা অন্যখানে।'

'সেটা কোতায়, সার?' জানতে চাইল গিল্টি মিয়া, 'সন্দো করবে সাদা গাঠগুনো?'

'গার্ড তো আছেই, আরও আছে সিকিউরিটি ক্যামেরা ও অ্যালার্ম,' বলল রানা, 'গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে হয়তো ডিসএবেল করলাম ক্যামেরা আর অ্যালার্ম, কিন্তু তাতেই হবে না, ওই দালান থেকে সরাতে হবে কোডেক্স। কারও চোখে পড়া চলবে না।'

'আপনার দেখানো পথেই ব্যবস্থা করব ক্যামেরার,' বলল রায়হান রশিদ। 'আমাদের জাহাজের রোভ ব্যবহার করলে পৌঁছে যাব জাংশন বক্স পর্যন্ত।'

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রিক শিপিং টাইকুন চ্যান্দ্রো পাপাগোপালার কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল অত্যন্ত আধুনিক জাহাজ দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। বাংলাদেশ বা বিসিআই-এর জরুরি সব কাজে ব্যবহার করা হয় ওটা। আপাতত আছে নিউ ইয়র্কের বন্দরে।

‘ছোঁক-ছোঁক কাজ করবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই,’ বলল রানা।

‘ও আবার কী, সার?’ করুণ সুরে জানতে চাইল গিল্টি মিয়া।

‘সেগমেন্টেড রোবট ভেহিকেল অপারেশন্স,’ বলল রায়হান রশিদ । ‘সাপের মত, পানির নিচে সরু সব জায়গা দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু জোয়ার না এলে কাজ করবে না। আমরা হাতে পাব খুব কম সময়। পানি নেমে গেলে বা কোনও কারণে কাজে বাধা পড়লে সর্বনাশ।’

‘মোটামুটি সবই গুছিয়ে নিয়েছি আমরা,’ বলল রানা। ‘কিন্তু সত্যি ডাক্টের ভেতর দিয়ে ভল্টে পৌঁছুব কি না, তা এখনও দেখা হয়নি।’

‘স্যর, আমার মতন কারও যাওয়াই বুজি ভাল ছিল,’ বলল গিল্টি মিয়া। ‘আমি...’

মৃদু মাথা নাড়ল রানা। ‘কাজটা আমার, আমিই করব। যদি ধরা পড়ি, জেল হবে অন্তত দশ বছরের। অন্য কাউকে বিপদে ফেলব না। ঠিক আছে, এবার দেখা যাক কাজটা সম্ভব কি না।’

উঠে দাঁড়াল ও, দেখাদেখি রায়হান রশিদ ও রবি চৌধুরি। ওরা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ডাক্ট শুইয়ে দিল মেঝেতে। চৌকো পাইপের মত মোটা ডাক্টের আরেক মাথায় উঁকি দিল লিপি গোমেজ। ‘বাপরে! এত সরু? মিস্টার রানা, এটা মাত্র নয় ইঞ্চি? আমার তো মনে হচ্ছে না আপনি ঢুকতে পারবেন এর ভেতর!’

একই কথা ভেবেছে রানা। গলা শুকিয়ে গেছে। গম্ভীর গলায় বলল, ‘গিল্টি মিয়া, রায়হান, শক্ত করে মেঝেতে চেপে রাখো ডাক্ট। আমি ওটার ভেতরে ঢুকতে শুরু করলে ঠেলে দেবে রবি।’

মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও। শক্ত করে ডাক্ট ধরেছে গিল্টি মিয়া ও রায়হান। পেটে ভর দিয়ে ডাক্টে ঢুকতে লাগল রানা। মাথা ঢুকে যাওয়ার পর আটকে গেল চওড়া দু'কাঁধ। জোর খাটিয়ে এগোতে

লাগল রানা। পাতলা ধাতুর পাত চেপে এল নিতম্বের কাছে।

'বেরিয়ে আসুন, সার, শেষে দম এঁটকে মরে যাবেন,' বাইরে থেকে বলল গিল্টি মিয়া, 'এসপ আপনার কাজ লয়। সিংগো কি আর সাদারণ শেয়াল চোট্টার মত গর্তে ঢোঁকে?'

'মাসুদ ভাই, মনে হয় না...' শুরু করেছিল রায়হান, কিন্তু টের পেল মুচড়ে গেল রানা। নিতম্বের বামদিক নিচে গিয়ে ওপরে উঠল ডানদিক।

ওই এক ইঞ্চি ফাঁক পেল বলেই শুয়োপোকার মত এগোতে পারল বুক ঘষটে। মনে হলো দম আটকে মরবে বদ্ধ জায়গায়। ধমক দিল নিজেকে: কাঁধ ঢুকেছে, দেহের অন্য অংশও ঢুকবে. প্লেইন লজিক!

'এগোন, মাসুদ ভাই!' উৎসাহ দিল রবি চৌধুরি।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে চলল রানা, ডাক্টের ওপরদিক লাগছে মাথায়। কাত হয়ে এগোল, তাতে বাড়ল অস্বস্তি। দরদর করে ঘামছে। ডাক্টের মসৃণ ধাতব পাতে পিছলে যাচ্ছে হাতের তালু, আঙুল। 'আর এগোতে পারছি না,' চাপা স্বরে বলল রানা, 'ভেবেছি সঙ্গে নেব না, কিন্তু পোর্টেবল ইলেকট্রোম্যাগনেট ছাড়া বোধহয় চলবে না।'

জিনিসটা ব্যাটারি চালিত, শক্তিশালী। ব্যবহার হয় পানির নিচে। সুইচ টিপলেই কাজ করবে। কিন্তু একবার ওটার নিচে আঙুল চাপা পড়লে চুরমার হয়ে যাবে।

সামনে ছাড়া কোনও দিক দেখছে না রানা। বৃত্তাকার হয়ে গেছে ওর দুনিয়া। একটু দূরে দরজা, ওদিক থেকেই হাত বাড়িয়ে ওর নাকের কাছে দুই ধাতব ডিস্ক রাখল রায়হান। দুই হাতে ও-দুটো নিয়ে সুইচে টিপ দিল রানা। এতই জোরে ধাতব ডাক্টে ঠং আওয়াজে আটকে গেল ম্যাগনেট, কেঁপে গেল গোটা ডাক্ট।

'ইয়ে, সার, গোপনে হবেনি কো,' বলল গিল্টি মিয়া। 'যা

কাঁসির বাদ্যি বাজচে...'

'দেখি ধীরে এগোলে কী হয়,' একটু দমে গেছে রানা।

'তিলতিল করে শুঁয়োপোকার মত এগোন,' পরামর্শ দিল গিল্টি মিয়া।

ম্যাগনেট অফ করে যতটা পারা যায় সামনে ওটা রাখল রানা, অন করল সুইচ। কিন্তু ডাক্টের ধাতব দেহে আবার জোর আওয়াজ তুলল ডিস্ক। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ওই আওয়াজ বন্ধ করার উপায় নেই।

'মুশকিল,' বিড়বিড় করল রানা। ডিস্কের হাতল ধরে ছেঁচড়ে এগোল। 'এবার... যাহ্!' যে-কেউ সতর্ক হবে, এমন কর্কশ শব্দে ম্যাগনেট পিছলে গেছে স্টিলের প্যানেলে। 'না, এই জিনিস দিয়ে হবে না!'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল রায়হান রশিদ। 'ওটা তৈরি করেছে খাড়াভাবে ব্যবহারের জন্যে। তখন ঠিকই ওজন নিত।'

ম্যাগনেটের সুইচ অফ করল রানা। 'এটা তো কাজে এল না। এবার দ্বিতীয় মালটা দাও।'

ম্যাগনেট সরিয়ে আরেকটা ডিভাইস বাড়িয়ে দিল রায়হান রশিদ।

কালো রাবারের পাঁচ ইঞ্চি বৃত্তাকার গম্বুজের মত সাকশন কাপ দুটো নিল রানা। ওপরে ইউ শেপের ধাতব হ্যাণ্ডেল। নিচে ছোট লিভার। হ্যাণ্ডেল ওপরে তুললে তৈরি হবে সাকশন কাপে ভ্যাকিউম। আবার ভ্যাকিউম সরাতে চাইলে নিচে টানতে হবে লিভার। পরীক্ষা করল রানা, হিস শব্দে বাতাস বেরোল কাপ থেকে। হ্যাণ্ডেল ধরে ওটার জোরে সামনে বাড়ল। মোটেও ম্যাগনেটের মত নয়, কাজ হচ্ছে চমৎকার। স্টিলের পাতকে কামড়ে ধরেছে সাকশন কাপ। হ্যাণ্ডেল ওপরে টানতেই নষ্ট হলো ভ্যাকিউম। নতুন উদ্যমে ডাক্টের সামনে কাপ বসিয়ে এগোল

রানা।

'হুম্!' বলল রায়হান, 'মোটা হয়ে গেছেন! মার্ভেলের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার রাইনারের খপ্পরে পড়লে দু'দিনে সব রস বের করে নেবে; কাঠির মত শুকিয়ে যাবেন, মাসুদ ভাই!'

মস্ত এক অজগরের মত গা ঘষটে ডাক্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে রানা। 'ওরেব্বাপ, ফারার খপ্পরে পড়তে চাই না! মোটেও মোটা হইনি, মূল আসামী জিন্সের প্যান্ট। ইউএন-এর ডাক্টে যখন ঢুকব, পরনে থাকবে অন্য পোশাক।' ভাবল, ক্লস্ট্রোফোবিয়া নেই, অথচ সামান্য এই দূরত্ব পেরোতেই হাঁপ লেগে গেছে! ভল্টে ডাক্টের ভেতর দিয়ে কতটা পথ যেতে হবে?

একই কথা ভাবছে গিল্টি মিয়া, নরম সুরে বলল, 'সার, পেরোলেন তো মাত্র ছ'ফুট, তাতেই ঘেমে নেয়ে উটেচেন। আসল সময় সঙ্গে নেবেন আরও কিচু, তকন কী হবে?'

ডাক্ট থেকে রানা বেরোতেই বেজে উঠল কলিং বেল।

'যাহ্, আবারও জ্যাক রিচি!' রবি চৌধুরির দিকে তাকাল রানা।

স্টাডির দরজার ওদিকে চলে গেল রানা এজেন্সির শাখা প্রধান, হাতে রিভলভার।

'সবাই অন্য ঘরে যাও,' বলল রানা। 'তোমাদের যত কম চেনে, ততই ভাল।'

যার যার দরকারী জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে গেল দলের অন্যরা।

দরজার দিকে চলল রানা। আরেকবার কলিং বেল বাজার পর খুলে দিল কবাট।

ইমপ্যাক্ট রেযিস্ট্যান্ট প্লাস্টিক বক্স হাতে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল জ্যাক রিচি, বামহাতে মাঝারি ক্যারিঅল। চোখ পড়েছে মেঝেতে শুইয়ে রাখা ডাক্টের ওপর। 'ও, তো ইউএন-এর ভেন্ট

এই আকারের?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

ডাক্টের একমাথা দিয়ে বক্স পুরল জ্যাক রিচি। কোনওমতে ভেতরে এঁটে গেছে ওটা। 'আপনার কপাল ভাল, নইলে বিপদে পড়তেন। এটা সঙ্গে করে নিতে হবে।'

'এটার সঙ্গে কপালের কী সম্পর্ক? জিনিসটা কী?'

ডাক্ট থেকে বাক্সটা নিয়ে একটা ইকুইপমেন্ট বের করল রিচি। মেশিনটা দেখতে ডেস্কটপ স্ক্যানারের মত। ঘাড়ের ওপর স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ছোট এক ট্যাঙ্ক, গভীরতা হবে পাঁচ ইঞ্চি। 'এটা পোর্টেবল র‍্যাপিড প্রোটোটাইপ। ভেতরে রয়েছে...'

'আগেও ব্যবহার করেছি,' বলল রানা। 'স্ক্যান হেড-এ দুটো লেসার থাকে। মাঝের মিডিয়ামের ভেতর দিয়ে যায় বিম। এক এক করে তৈরি করে স্তর। থ্রি-ডি ফ্যাক্স মেশিনের মত, জিনিসটা তৈরি হলে ট্যাঙ্ক থেকে বের করতে হয়। তার মানে, এটার মাধ্যমে লাবনীর হাতের ছাপ তৈরি করে নেব?'

হাসল জ্যাক রিচি। 'তা-ই। এ ছাড়া, ডক্টর আলমের হাতের ছাপের মেমোরি কার্ডও পাবেন।'

দ্বিধা চেপে বলল রানা, 'এটার রেসোলিউশন কেমন? আগে যেগুলো ব্যবহার করেছি, এত নিখুঁত ছিল না যে হাতের ছাপ তৈরি করবে।'

জবাব দেয়ার আগে কী শুনেছে মনে করে নিল রিচি, তারপর বলল, 'এটা সাবমিলিমিটার। অর্থ যা-ই হোক, নিখুঁতভাবে কাজ করবে।'

'বেস মিডিয়াম কীসের?' জানতে চাইল রানা। 'ওটা কি ফোটোপলিমার, না থার্মোপ্লাস্টিক পাউডার? তা ছাড়া, হাতের ছাপ তৈরি করতে কতক্ষণ লাগবে?'

ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল রিচি। 'দশ মিনিট। লিকুইড আছে

ব্যাগে। আপনার এত জানার দরকার কী? জিনিসটা কাজ করলেই তো হলো! ছাপ তৈরির পর ঠাণ্ডা করতে হবে, নইলে কাজ করবে না।' হোল্ডঅল খুলে ভেতর থেকে ডিজিটাল থার্মোমিটার নিল সে। 'বডি টেম্পারেচার আর হাতের ছাপ ভালমত পরীক্ষা করবে সিকিউরিটি স্ক্যানার।'

'কাজ আরও বাড়ল,' বিড়বিড় করল রানা।

টেবিল থেকে সরানো হয়নি ব্লুপ্রিন্ট। ওটা চোখে পড়তেই রানার দিকে তাকাল জ্যাক রিচি। 'কী ধরনের প্ল্যান করেছেন?'

'এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। আপনি তো নিজের কাজ শেষ করেছেন, পৌঁছে দিয়েছেন খেলনা, এবার বিদায় নিন। আমার কাজ আমাকে করতে দিন।'

অপমান গায়ে মাখল না রিচি, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আগামীকাল রাত পর্যন্ত সময়, তার মধ্যেই জোগাড় করবেন কোডেক্স। আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্যে।'

শীতল হয়ে গেল রানার কণ্ঠ, 'আমিও অপেক্ষা করব।' রিচি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোতেই দরজা বন্ধ করে তালা দিল ও।

স্টাডি থেকে বেরিয়ে তিক্ত সুরে বলল রবি চৌধুরি, 'সর্বক্ষণ ওর কপালে তাক করা ছিল রিভলভার। এক গুলিতে পৌঁছে দিতে পারতাম ঈশ্বরের কাছে। ইচ্ছেও হচ্ছিল।'

'আপাতত উপায় নেই,' বলল রানা, 'আগে সরিয়ে আনতে হবে লাবনীকে। পরের কথা পরে।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, নিশ্চয়ই জ্যাক রিচিকে বলে দিয়েছে মঙ্গেলকার, কোডেক্স পেলেই যেন গুলি করে মারে আপনাকে। পরে নিজেদের খুশিমত সময়ে খুন করবে ডক্টর আলমকে।'

তিক্ত হাসল রানা। 'তা-ই, কাজেই ব্যবহার করব প্ল্যান বি।'

দশ

বিরক্তি চেপে থম মেরে বসে আছে লাবনী, ঘরের দরজায় জোরে টোকা পড়তেই চমকে সচেতন হলো। গতকাল থেকে বন্দি হয়ে সময় কাটছে সুইটে। ঠিক সময়ে এসে খাবার দিয়ে গেছে কাজের মানুষ। বাইরে সর্বক্ষণ ছিল গার্ড। ও ভেবেছে, একবার চেষ্টা করবে কি না জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে, কিন্তু মাটি এত নিচে যে সাহস হয়নি। তা ছাড়া, ওর ওপর চোখ রাখা হয়েছে ইলেকট্রনিকভাবেও। দু'বার জানালা খুলতেই ঘরে এসে ঢুকেছে গার্ড, কঠোর সুরে বলেছে, 'ওটা বন্ধ করে চুপচাপ চেয়ারে, কাউচে বা খাটে বসে থাকুন।'

সোজা হয়ে বসল লাবনী। 'কী চাই?'

ঘরে ঢুকেছে চাঞ্চাল আধিকারী। 'আপনাকে ডাকছেন মিস্টার মঙ্গেলকার।'

দেখা করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই লাবনীর, কিন্তু বসে থেকে ক্লান্তি ও বিরক্তি লেগে গেছে। তা ছাড়া, লোকটার পেট থেকে জরুরি তথ্য বেরোলে হয়তো তা পরে কাজে লাগবে।

'ঠিক আছে, চলুন।'

প্রাসাদের এঘর-ওঘর বা করিডোর ধরে লাবনীকে নিয়ে চলল আধিকারী, প্রতিটি মুহূর্তে থাকল একটু পেছনে। কয়েক মিনিট পর উঁচু সিলিঙের এক ঘরে ঢুকল ওরা।

অবাক হলো লাবনী। এ ঘর যেন কোনও অদ্ভুত হাই-টেক ডিস্কো। প্রায় অন্ধকার, ছাত থেকে আসছে মৃদু আলো। ঘরের মাঝে গম্বুজের মত উঁচু আকৃতির মস্ত এক ফ্রেমওঅর্ক। গম্বুজের বুকে জ্বলছে অন্তত এক ডজন বিশাল আকারের ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটর, তৈরি করেছে প্রায় তিন শ' ষাট ডিগ্রি ভিডিয়ো দৃশ্য।

'আসুন, ডক্টর আলম,' ডিসপ্লের ওদিক থেকে ডাকল অনুপম মঙ্গেলকার। রঙিন স্ক্রিনের মাঝ দিয়ে লাবনীকে পথ দেখাল চাঞ্চাল আধিকারী। বার কয়েক চোখ পিটপিট করে চারপাশ দেখল লাবনী। গম্বুজের ভেতরের দৃশ্য সত্যিই বিস্মিত করার মত। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি মনিটরে ভিন্ন দৃশ্য। দুনিয়ার নানান টিভি নেটওঅর্কের ব্রডকাস্ট, জটিল সব কমপিউটার জেনারেটেড গ্রাফ ও চার্ট, ওয়েবপেজ— পাল্টে যাচ্ছে সব প্রতি মুহূর্তে।

গম্বুজের মাঝে পডিয়ামে দাঁড়িয়ে আছে অনুপম মঙ্গেলকার, যেন লেকচার দেবে। তবে আপাতত তার চোখ বিশেষ কয়েকটি স্ক্রিনের দিকে। ডানহাতের তর্জনী তুলে খোঁচা দেয়ার ভঙ্গি করল সে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মনিটরে কী সব খেলে গেল। পরক্ষণে একটি মনিটরে জড় হলো সব তথ্য। একপাশ থেকে আরেক পাশে হাতের ইশারা করল লোকটা। কয়েকটা মনিটরে এল নতুন দৃশ্য। বোধহয় অনুপম মঙ্গেলকারের সঙ্গে মিটিঙের জন্যে অপেক্ষা করছে কয়েকজন। ডানহাত কানের কাছে নিল সে, যেন ধরেছে অদৃশ্য টেলিফোনের রিসিভার। অন্যহাতের আঙুলে ডায়াল করল। মনিটরে হাজির হলো পয়েন্টার ও নিউমেরিক কি-প্যাড। আসলে পডিয়াম বুঝতে পারছে অনুপম মঙ্গেলকারের প্রতিটি ইশারা। লাবনী বুঝল, এটা মৌন কন্ট্রোল সিস্টেম। কিছুক্ষণ পর তিক্ত কণ্ঠে লাউড স্পিকারে হিন্দিতে নির্দেশ দিয়ে হাতের ইঙ্গিত করল বিলিয়নেয়ার। কেটে দিল লাইন। মনিটরে আবছা হয়ে হারিয়ে গেল ভার্চুয়াল কি-প্যাড। কয়েক সেকেণ্ড মনিটর খেয়াল করল

সে, তারপর ঘুরল লাবনীর দিকে। 'ওয়েলকাম টু মাই ইনফোট্যারিয়াম।'

'দেখার মত,' কণ্ঠের প্রশংসা লুকাল না লাবনী। 'এসবের মাধ্যমে হিস্টরি চ্যানেল দেখা যাবে?'

'দুনিয়ার প্রতিটি চ্যানেল ধরবে। সাধারণ সব কনভার্সেশনাল মিডিয়ার চেয়ে দ্রুত এর মাধ্যমে ডেটা প্রসেস করতে পারি। খুব এফিশিয়েণ্ট উপায়। নইলে প্রতি দিনের টনকে টন ডেটা ও ইনফর্মেশনের ওজনে খুন হতাম।'

একের পর এক স্ক্রিনে দপদপে আলো ও লেখা দেখে কেমন ক্লান্তি লাগল লাবনীর, তাই শুকনো গলায় বলল, 'আমি বরং খবরের কাগজই দেখব।'

'ভুলে গিয়েছিলাম আপনি আর্কিওলজিস্ট, কাজেই সেকেলে তো হবেনই। আপনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, মাধুরীও এসব টেকনোলজি পছন্দ করে না। ও বলে, এসব দেখলে নাকি ওর মাথা-ব্যথা হয়।'

খোঁচা দিতে চাইল লাবনী, 'বুঝতে পারছি, এ ধরনের কথা অনেক শুনতে হয় আপনাকে, তাই না?'

কথাটা পাত্তা দিল না অনুপম মঙ্গেলকার, অথবা বুঝতে পারেনি টিটকারি। 'যাক গে, কীভাবে নতুন ইনফর্মেশন পৌঁছে দেয়া যায়, তা নিয়ে আলাপ করতে আপনাকে ডাকিনি।' দু'হাতের তালু সামনে বাড়িয়ে দিল সে। ওটার মাধ্যমে একগাদা মনিটরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছেঃ যথেষ্ট হয়েছে! এবার সব চুপ!

একইসঙ্গে কালো হলো সব মনিটর। কিন্তু পরক্ষণে সব জায়গা জুড়ে দেখা দিল বড় একটা কমপিউটার মনিটর। ওটা কোনও ডেস্কটপের। হাত তুলে বাতাসে ট্যাপ করল অনুপম। একটা আইকনে যেন চাপ পড়ল। ডিসপ্লেতে দেখা দিল টেক্সট্।

ওগুলো যে স্টাডা কোডেক্সের অনুবাদ, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে

বুঝে গেল লাবনী। কিন্তু ও যেভাবে পড়েছে, ঠিক সেভাবে নেই ডেটা। এখানে একটু আলাদা শব্দ-সমষ্টির তালিকা। আইএইচএ এখনও অনুবাদ করেনি, এমন অংশেরও অনুবাদ দেখা গেল। 'এটা কি আপনার নিজের করা অনুবাদ?'

'হ্যাঁ, দ্য কোয়েশ্চেনের। আগেই স্যান ফ্রান্সিসকোয় বলেছি, দ্য কোয়েশ্চেন সাধারণ অনুবাদের প্রোগ্রাম নয়। ওটা অ্যানালাইয করতে গিয়ে জোগাড় করে নতুন সব তথ্য। শুধু যে ভাষা তা নয়, যে-কোনও বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। আর যতই ইনফর্মেশন পায়, ততই ভাল হয় ওর দেয়া রেযাল্ট।'

'তবুও সব ডেটা জোগাড় করতে পারে না, নইলে আপনি কিডন্যাপ করতেন না আমাকে, তাই না?' বলল লাবনী।

'আপনারা মাসের পর মাস ধরে যে তথ্য জড় করেন, সেই একই কাজ করবে দ্য কোয়েশ্চেন মাত্র কয়েক ঘণ্টায়। সমস্যা অন্য, অনেক ডেটাবেস বা যথেষ্ট ইনফর্মেশন না পেলে ঠিকভাবে কাজ করবে না দ্য কোয়েশ্চেন।'

তর্ক হয়েছিল মঙ্গেলকারের সঙ্গে স্যান ফ্রান্সিসকো শহরে, মনে পড়েছে লাবনীর, তাই বলল, 'এজন্যেই চাই মানুষের অভিজ্ঞতা, বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তা।'

বিলিয়নেয়ারের নির্বিকার চেহারায় খেলে গেল অস্বস্তি। 'তবে এরই ভেতর দ্য কোয়েশ্চেন আমাকে যা জানিয়ে দিয়েছে, তা যথেষ্টরও বেশি। অন্যসব ডেটার সঙ্গে কোডেক্স অ্যানালাইয এবং ক্রস-রেফারেন্স করলে সহজেই বেরবে ঠিক কোথায় আছে শিবের গুহা।' বাতাসে টোকা দিল সে। দেয়ালে দেখা দিল মানচিত্র। 'ওই গুহা হবে বিরান কোনও দূর এলাকায়। শিবের ভক্তরা ঠিকই খুঁজে পাবে ওটা। কিন্তু স্টাডা কোডেক্স পেলে সহজ হবে কাজ।' আঙুল তাক করতেই কার্সার স্থির হলো ম্যাপের নির্দিষ্ট অংশে। 'কৈলাস পর্বত। ওটাই স্রষ্টা শিবের বাড়ি।'

‘ওটা না তিব্বতে?’

‘হ্যাঁ। ভারত-চিনের সীমান্ত থেকে সত্তর মাইল দূরে। ওই এলাকা নিয়ে যেহেতু বিবাদ আছে, কাজেই সঠিক জায়গা খুঁজে বের করা কঠিন।’

‘অবশ্যই আছে ওটা চিনের দিকে,’ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল লাবনী। ‘আপনার জন্যে কঠিন হবে ও দেশে নাক গলানো।’

‘মোটেও তা নয়, আপনি জানেন না, চাইনিজ সরকারের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক আমার, তাদেরকে দরকারী নানান সফটওয়্যার ও সার্ভিস দেয় আমাদের কোম্পানি। তা ছাড়া, ওই পবিত্র পর্বত হিন্দুদের তীর্থ, তাই প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ যায় ওখানে। ওটা পৃথিবীর সেরা দুর্গম পর্বত, যেটার চূড়ায় এখনও উঠতে পারেনি কেউ। ওই সাইট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার সাহস রাখে না চাইনিজ কর্তৃপক্ষ।’

‘কিন্তু আপনি ঘাঁটাঘাঁটি না করে ছাড়বেন না, এই তো?’

চেহারা দেখে মনে হলো অপমানিত বোধ করেছে বিলিয়নেয়ার। ‘আমিও তীর্থকে অপমান করব না। তা ছাড়া, পর্বতে নেই সে গুহা। ওটা এমন কোথাও আছে, যেখানে এক দিনের ভেতর পৌঁছে যেতেন সাধুরা।’

‘আর ফিরতেন পরের এক ঘণ্টার ভেতর।’

‘ওই রহস্যের কথা ভাল করেই জানে দ্য কোয়েশ্চেন। এমন হতে পারে, ওই দু’এলাকার মাঝে রয়েছে নদী। ওপরের দিক থেকে নামতে শুরু করলে নৌকা পৌঁছে যেত মন্দিরের কাছে।’

গঙ্গা নদী থেকে সরে পাহাড়ি পথে ওপরে গিয়ে সেই মন্দির পান স্টাডা, তথ্যটা চেপে গেল লাবনী। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, ‘জানি না শিবের গুহা পেলে কীভাবে পাল্টে দেবেন পৃথিবীটাকে। আপনি যদি ওই গুহা খুঁজেও পান, ওকে বড়জোর বলা যাবে অবিশ্বাস্য এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। সত্যিই হয়তো পাওয়া গেল

শিবের নিজ হাতে লেখা ট্যাবলেট... কিন্তু তাতেই বা কী? ওটার কারণে তো কোনও স্বর্গীয় রহস্যোন্মোচন হবে না বা ধ্বংস হবে না মানবজাতি।'

'আপনি যা-ই বলুন, ডক্টর আলম, কলঙ্কিত এই মানবজাতির জন্যে ঘনিয়ে এসেছে নতুন প্রলয়,' লাবনীর চোখে তাকাল অনুপম মঙ্গেলকার। চশমার ওদিকের দৃষ্টি বড় ফাঁকা। 'অন্ধকারে তলিয়ে গেছি আমরা। চারপাশে যেদিকে দেখুন, খালি হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণা। বর্বর হয়ে উঠেছি। তাই চলবে বহু দিন। আগামী পঞ্চাশ বছরের ভেতর ধ্বংস হবে আধুনিক সমাজ।'

'আপনি একমাত্র লোক নন, যিনি এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা বলেছেন। বুক অভ রেভেলেশন, নস্ট্রাডামাস, মায়াদের ক্যালেণ্ডার মতে দু'হাজার বারো সালে ধ্বংস হবে পৃথিবী। কিন্তু সবই তো পেছনে ফেলে এসেছি আমরা! কিছুই হয়নি পৃথিবীর! অতীতের সেসব ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে!'

'এবার ভুল হবে না, মানবজাতির রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই।' চারপাশের মনিটর দেখাল মঙ্গেলকার। নানান দৃশ্য ওখানে: উজাড় হয়েছে বিশাল এলাকার অরণ্য, ভলকে ভলকে ফ্যাক্টরি থেকে বেরোচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া, জায়গায় জায়গায় রায়ট করছে মানুষ, পুড়ছে গাড়ি বা দালানবাড়ি...

একের পর এক চার্ট দেখানো হচ্ছে মনিটরে। 'প্রাপ্ত ডেটা অনুযায়ী যৌক্তিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে দ্য কোয়েশ্চেন। প্রতিটি গণনা থেকে পাওয়া গেছে একই ফলাফল। এবার হারিয়ে যাবে আমাদের চেনা সভ্যতা। অবশ্য, একেক গণনায় একটু এদিক ওদিক সময় বলা হয়েছে প্রলয়ের।'

'কমপিউটারের পাগলামি বলতে পারেন,' ঠাট্টার সুরে বলল লাবনী। 'অঙ্ক কষে কবে প্রলয় হবে, তা বের করা অবাস্তব ব্যাপার। আঠারো শ' শতাব্দীর বুড়ো টমাস ম্যালথাসের সময়

থেকেই এসব অঙ্ক কষছে লোকে।'

'কিন্তু এটা বলতে পারবেন না, আজকাল আরও অধঃপতিত হয়নি মানবজাতি। আমরা পৌঁছে গেছি কলি যুগের গভীর কালো অন্ধকারে। মহাভারতে পরিষ্কার লেখা আছে: "আরও বাড়বে মানুষের পাপ ও জাগতিক উন্নতি, একই সময়ে হারাবে মানুষের হৃদয়ের সব পুণ্য।" মনিটরের লেখা আবারও দেখাল মঙ্গেলকার। 'দ্য কোয়েশ্চেনের কাছে দেয়া হয়েছে এ ধরনের প্রচুর তথ্য। বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ আজ চাইলেই জানতে পারে ইতিহাস— অথচ কী দেখছে?' স্ক্রিনের দিকে তর্জনী তাক করল সে। অদৃশ্য কেউ যেন মনিটরে দেখিয়ে দিল লাল সব অক্ষর। 'ওরা দেখছে সেক্স মুভি! পর্নোগ্রাফি! হাজারো নায়ক বা নায়িকার অর্থহীন খবর! খুন বা ধ্বংসের ছবি! আসলে পচে গেছে মানবসমাজ। মানুষ ওসবই শুনতে বা জানতে চায়, হারিয়ে গেছে নৈতিকতা। চারপাশে চরম দুর্নীতি। তা হলে কেন রক্ষা পাবে মানবসভ্যতা?'

'বুঝলাম, সমাজ পুরোপুরি...'

অনুপম মঙ্গেলকারের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা দিতেই মসৃণ গালে টোল পড়ল। 'আমরা কী দেখব... আসলে কী চান আপনি, ডক্টর আলম?' স্ক্রিনে দেখা দিল কি-বোর্ড। বাতাসে টাইপ করল সে। টেক্সট্ দেয়ায় টিপটিপ করে জ্বলতে লাগল কী।

অক্ষরগুলোর ভেতর নিজের নাম দেখল লাবনী। কেমন যেন দমে গেল ওর মন। 'একমিনিট! আমি তো...'

'কে ব্যবহার করল, কখন, এবং কেন— এসব ভালভাবেই মনে রাখে দ্য কোয়েশ্চেন। এসব নিয়ে অ্যানালাইয শেষে সংগ্রহ করে ডেটা। এমন কী এটাও বলে দিতে পারবে, ঠিক কোন্ সময়ে আবারও ওকে ব্যবহার করবেন আপনি।' আরও কয়েকটি কি টিপে দেয়ার পর তিন কলাম লেখা ফুটে উঠল স্ক্রিনে। প্রথম কলামে লাবনীর জন্যে তথ্য। দ্বিতীয়টায় মাসুদ রানা সম্পর্কে

তথ্য। তৃতীয় কলামে অনির্ণীত ডেটা। রানার কলাম থেকে একটা অংশ হাইলাইট করল বিলিয়নেয়ার। 'আপনি হয়তো ভীষণ কষ্ট পাবেন, এখনও বিসিআই-এর মহিলা এজেন্ট সোহানা চৌধুরিকে অন্তর থেকে ভালবাসে মাসুদ রানা।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল লাবনী।

'আপনি আমার ওপর হামলা করলেও আসলে বেশ নিরীহ,' ওর কলামের ওপরে কার্সার নিল অনুপম মঙ্গেলকার। 'এবার তা হলে দেখা যাক...'

'বুঝতে পেরেছি কী বোঝাতে চেয়েছেন,' বলল লাবনী।

'বেশ।' কার্সার সরিয়ে নিল লোকটা।

'এত তথ্য নিয়ে ইন্টারনেটের সবাইকে ব্ল্যাকমেইল করবেন?'

'না, শুধু শেষ করব কলি যুগ।' রোবটের মত আবেগহীনভাবে বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'বর্তমান সভ্যতাকে মুখ থুবড়ে ফেলতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। জাগতিক এ চক্রের বাইরে কেউই নয়। নতুন করে আবারও আনব সত্য যুগ। তখন মনে থাকবে শুধু পুণ্য। নীতিবান হবে সবাই। আমার কমপিউটার মডেলে দেখেছি, যত জলদি শেষ হবে কলি যুগ, মধ্যকালের বিশৃঙ্খলা হবে তত কম। সেক্ষেত্রে চট্ করে ফিরবে সত্য যুগ। অথচ, বর্তমান সভ্যতার পতনে লাগবে কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর, এরপর শুরু হবে অবক্ষয়। সে গভীর কূপ থেকে আবারও উঠতে অন্তত আরও এক শ' বছর। এ সময়ে শেষ থাকবে না কষ্টের। অথচ, এখনই আণবিক যুদ্ধের মাধ্যমে বর্তমান কলঙ্কিত মানবসভ্যতাকে শেষ করলে, মাত্র দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে আসবে নতুন সত্য যুগ।'

'তাও তো দশ বা পনেরো বছরের নরক যাপন!'

'এক শ' বছরের চেয়ে দশ বা পনেরো বছরের নারকীয় কষ্ট অনেক ভাল,' লাবনীর সামনে দাঁড়াল বিলিয়নেয়ার, 'নিষ্ক্রিয় থেকে

সবাইকে যা খুশি করতে দেব, তেমন নিকৃষ্ট লোক আমি নই, মিস্টার আলম। উঠে এসেছি বস্তি থেকে, সব সময় নজর ছিল সুযোগের দিকে, ভুলও করিনি কখনও। এখনও সুযোগ নেব। যা ভাল হবে তেমন কাজই করব, কল্যাণ হবে পৃথিবীর। এ আমার জন্যে মস্তবড় সুযোগ। উপকৃত হবে গোটা মানবজাতি। শেষ হবে কলি যুগ, সঠিক সময়ে অবশিষ্ট মানুষগুলোকে দেখিয়ে দেব সত্য যুগের আলোকিত পথ।'

'সভ্যতার ক্ষতি হলে আপনার ব্যবসায়িক লাভ আছে?' জানতে চাইল লাবনী।

'পরে হবে, কিন্তু তা নিয়ে এখন ভাবছি না। কোটি কোটি মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে আমার হাত ঠিক পথ দেখাবে অল্প কিছু মানুষকে। ভারতে দুর্গম এলাকায় তৈরি করেছি দুর্ভেদ্য সব আশ্রয়। সঠিক সময়ে ওখানে পৌঁছুবে একদল সুযোগ্য লোক। এরই ভেতর জোগাড় হয়েছে অন্তত দশ লাখ মানুষের জন্যে পনেরো বছরের খাবার, পোশাক ও অন্যসব জিনিসপত্র। ডেটার জন্যে বড় কোনও সমস্যা হবে না, নিজেদেরই আছে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার। দুনিয়া জুড়ে যতই যুদ্ধ চলুক, কিছুই হবে না আমাদের। দেশে দেশে চরম লড়াই শেষ হলে একদল অসহায় লোককে সাহায্য করব। আমার নির্দেশ না পেলে এক পা-ও ফেলবে না তারা।'

চোখ সরু হয়ে গেছে লাবনীর। নিচু স্বরে বলল, 'তার মানে, তারা হবে আপনার ক্রীতদাস?'

'তা কেন, মানুষ বুঝবে সত্য স্রষ্টা আসলে শিব, তিনিই সৃষ্টি করেন, আবার দরকারে ধ্বংসও করেন। বেশিরভাগ দেশে লড়াই শুরু হলে ধ্বংস হবে মূল্যবান সব নিদর্শন বা আর্টিফ্যাক্ট, তাই নিরাপদে সেসব সরিয়ে ফেলছি নানান দেশ থেকে। আসলে দেবতার কাজেই ভাড়া করেছি জ্যাক রিচির মত দুর্ধর্ষ একদল

লোককে। তাদের সংগ্রহ করা আর্টিফ্যাক্ট পরে দেখে মানুষ বুঝবে কতটা খারাপ ছিল কলি যুগ।'

'ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখছেন? কোথায়?'

'বলতে দ্বিধা নেই, অভয়ারণ্যে যে লেক দেখেছেন, ওটার পানির নিচে মস্ত এক ওঅটার প্রুফ ঘরে রাখা হচ্ছে সব,' কিছুই পাত্তা না দেয়ার সুরে বলল বিলিয়নেয়ার।

লাবনী বুঝে গেল, আর প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে না এই প্রাসাদ থেকে।

'নতুন আলোকিত মানবসভ্যতা এলে বের করব ওগুলো আগেই ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধে অনেক হ্রাস পাবে জনসংখ্যা। যারা রয়ে যাবে, তারা বুঝবে কী করা উচিত, আর কোন্টা নয়। তখন কোনও সম্পদ থাকবে না যে খেয়ে-পরে বাঁচবে মানুষ। অন্য সব ধর্ম প্রায় মুছে যাবে অন্তর থেকে। যখন বলব: সাহায্য চাইলে দাও আনুগত্য, আপত্তি তুলবে না কেউ। সে সময়েই দুনিয়া জুড়ে প্রচার করা হবে শিবের বেদ বা আদি স্রষ্টার লিখিত প্রস্তর-পুস্তক।'

'আনুগত্য না পেলে চলছে না আপনার?' তিক্ত সুরে বলল লাবনী।

'সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আনুগত্য চাওয়া অন্যায় নয়,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার। 'তবে বোকার মত তা প্রথমেই চাইব না। মহাযুদ্ধের পর টাকার মূল্য থাকবে না, কিন্তু ঠিকই কাজে আসবে মানসিক প্রভাব। বিলিয়ন বিলিয়ন টাকায় কেনা খাবার, কাপড়, দরকারী সবকিছু পেলে অসহায় মানুষ অন্ধের মত শুনবে আমার কথা। আশপাশে ভিড়বে একদল অনুগত সাধু। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে শিবের বাণী। অন্যসব ধর্ম যত শত বছর ধরে মানুষের মনে জেঁকে বসেছে, তার চেয়ে অনেক দ্রুত শিবের প্রাচীন ধর্ম গ্রহণ করবে মানুষ। সত্যিকারের বেদ পাবে তারা। তবে তার আগে চাই শিবের বেদ, সেজন্যে খুঁজে বের করতে হবে

ওই গুহা।'

'আমার মনে হচ্ছে, স্রেফ দিবাস্বপ্ন দেখছেন,' বলল লাবনী। 'আপনি ব্ল্যাকমেইল করলেও হাজার হাজার বছরের সব ধর্ম এভাবে মুছে দেয়া যাবে না মানুষের মন থেকে।'

'খিদে এমনই জিনিস, ডক্টর আলম, চরম অসহায়ত্ব কী, আপনি কখনও টের পাননি। এক স্রষ্টা যখন কিছুই দেবে না, অথচ আরেক স্রষ্টা দেবে সাহায্য ও পরকালে স্বর্গ পাওয়ার সম্ভাবনা, তখন কাকে বেছে নেবেন আপনি?'

সরাসরি অনুপম মঙ্গেলকারের চোখে তাকাল লাবনী।

ওর খুব কাছে পৌঁছে গেল চাঞ্চাল আধিকারী, প্রয়োজনে ঠেকিয়ে দেবে মনিবের ওপর হামলা।

'কিন্তু কীভাবে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবেন? এমন কোনও সার্চ ইঞ্জিন নেই, যা যুদ্ধ ডেকে আনবে।'

'ভুল জানেন, ডক্টর। দ্য কোয়েশ্চেন বড় ভূমিকা নেবে।'

নিজেকে খুব বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে ব্যস্ত লোকটা, ভাবছে লাবনী। কিন্তু কতটা তথ্য দেবে? বিলিয়নেয়ার কি ঝুঁকি নেবে গোপন তথ্য প্রকাশে? হালকা সুরে বলল ও, 'সার্চ রেযাল্ট দিয়ে দুনিয়া উল্টে দেবেন ভাবছেন?'

দু'হাত তুলে স্ক্রিনে ভার্চুয়াল কি-বোর্ড আনল মঙ্গেলকার। কয়েকটা নির্দেশ দিতেই দেয়ালে জ্বলে উঠল বেশ কিছু পাতা। ওগুলো গোটা পৃথিবীর সেরা সব নিউয সাইট।

'মানুষ নিউয সাইটের কথা বিশ্বাস করে, কারণ তাদের ধারণা ওগুলো নিরপেক্ষ খবর সরবরাহ করে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, যার যার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে তারা। সাধারণ মানুষের মতই তারাও নিরপেক্ষ নয়।' স্ক্রিন দেখাল সে। 'দু'সপ্তাহ আগে বোমা মারা হয়েছে মুম্বাইয়ে। দেখুন, অন্তত বারোটা নিউয এজেন্সি প্রকাশ করেছে ওই খবর। তারা আলাদা সব দেশের। মনোভাবও

আলাদা।'

'তো?'

আরও কয়েকটা নির্দেশ দেয়া হলো স্ক্রিনে। 'কিন্তু মানুষ যখন বিশেষ কোনও তথ্য চায়, তারা খুঁজতে থাকে সার্চ ইঞ্জিনে। যেমন দ্য কোয়েশ্চেন। এবার দেখুন, ভারতের হিন্দুরা মুম্বাই বোমার বিষয়ে কী ধরনের সার্চ করেছে।'

স্ক্রিনে এল এক ক্লাউড। আর সব কিছুর চেয়ে জ্বলজ্বল করছে দ্য কোয়েশ্চেনের আইকন।

ওই সার্চ ইঞ্জিনের তথ্যে চোখ বোলাল লাবনী:

পাকিস্তানি ইসলামী জঙ্গিরা হামলা করেছে মুম্বাইয়ে!

'বুঝলাম, দেখতে সুন্দর আপনার সাইট। কিন্তু গুগলের চেয়ে কোন্ দিক থেকে বিশেষ ভাল হলো?'

'এবার দেখুন পাকিস্তানি মুসলিমরা সার্চ করলে কী পাবে।'

আবারও টাইপ করল মঙ্গেলকার। নতুন করে রিলোড হলো ক্লাউড। এবারের রেযাল্ট একদম আলাদা।

আবারও পড়ল লাবনী:

অন্যায়ভাবে পাকিস্তানিদের দোষ দিচ্ছে ভারতীয় সরকার! অথচ কোনওভাবেই পাকিস্তান এসবে জড়িত নয়!

লাবনী বুঝে গেল, আসলে কী করছে ওই সার্চ ইঞ্জিন।

'তা হলে আপনারা ভারত-পাকিস্তানের মাঝে উত্তেজনা তৈরি করছেন!'

মাথা দোলাল বিলিয়নেয়ার। 'আগেই বলেছি, দ্য কোয়েশ্চেন ভাল করেই জেনে নেয় তার ব্যবহারকারীকে। তথ্য দেয়ার সময় সংগ্রহ করে তার সম্পর্কে জরুরি সব তথ্য। তার নীতি বুঝে নেয়। এটা সামান্য একটা দিক। আসলে মানুষের মন পড়তে শুরু করে দ্য কোয়েশ্চেন।'

'হায়, আল্লা, আপনারা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করছেন,' আপত্তির

সুরে বলল লাবনী। 'ডাহা সব মিথ্যা!'

'মোটেও না, আমরা শুধু সেটা দিচ্ছি, যা ওরা চায়। নিজ বুক ভরে নিচ্ছে ঘৃণা-হিংসায়। হাজার বছর ধরেই এভাবে বিকৃত করা হয়েছে তথ্য। কাউকে না কাউকে সাহায্য করেছে সেসব। ওই একই কাজ করছি, তবে তা করছি মহান আদর্শ মাথায় রেখে।'

'মহান আদর্শ?' ভুরু কুঁচকে ফেলল লাবনী। 'আপনি চান আধুনিক সভ্যতাকে শেষ করে দিতে। ফলে যে কত লাখ-কোটি লোক খুন হবে, সেটা ভেবে দেখেছেন?'

'বড় উদ্দেশ্যের কারণে ছোটখাটো কিছু ক্ষতি মেনে নিতেই হবে।'

'কত দিন ধরে হলুদ সাংবাদিকতা করছেন?' স্ক্রিন দেখাল লাবনী। 'মানুষের মন ঘৃণায় ভরে দিচ্ছেন অন্যের প্রতি! সে কারণে হয়তো দেশে-দেশে হবে যুদ্ধ! ফলাফল কী হবে?' কথাটা বলেই বুঝে গেল লাবনী, আগেই জবাব দিয়েছে অনুপম মঙ্গেলকার। তার চাই ভারত-পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ। দুই দেশই আণবিক বোমার মালিক। বছরের পর বছর খোলাখুলিভাবে বিবাদ করছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ অন্য কোনও না কোনও দেশের আচরণে চরম বিরক্ত। আর সে বিরক্তি উস্কে দিয়ে নিজ রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করবে লোকটা। বোধহয় সতর্ক হয়ে উঠেছে, আর ব্যাখ্যা করে বলছে না এরপর কী করবে।

তখনই বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'শীঘ্রি দেখবেন কী করি। দেখবে গোটা দুনিয়ার মানুষ। কিন্তু সেজন্যে আপনাকে এখানে ডেকে আনিনি। আসুন আমার সঙ্গে।' গম্বুজ থেকে বেরিয়ে গেল বিলিয়নেয়ার। ঠেলে লাবনীকে মনিবের পিছনে রওনা করিয়ে দিল চাঞ্চাল আধিকারী।

সারি সারি মনিটর পেছনে ফেলে পাশের ঘরে গেল অনুপম মঙ্গেলকার। ডেস্কের ওপর লাবনীর চোখে পড়ল বেশ কিছু হাই-

টেক ইকুইপমেন্ট। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরনো এক জিনিস— কাঁচের ডিসপ্লেতে ছোট কমপিউটার। চিনল না ও, তবে ওটার বয়স হবে অন্তত পঁয়তাল্লিশ বছর।

লাবনীর চোখ অনুসরণ করে ওটা দেখল অনুপম মঙ্গেলকার। 'আমার প্রথম কমপিউটার, স্পেকট্রাম প্লাস। ওটার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে সার্চ ইঞ্জিন দ্য কোয়েশ্চেনের যাত্রা।' উষ্ণ হয়ে উঠল কণ্ঠ: 'ছোটবেলায় যখন পরিবারের হয়ে পয়সা রোজগারের কাজে নানান ভাঙা জিনিস জোগাড় করে মেরামত করতাম, তখন পেতাম ভাঙা সব রেডিয়ো, টেপ রেকর্ডার বা ওই ধরনের জিনিস। এমনই এক দিন পেয়ে গেলাম ওই কমপিউটার। নিজের কপালকে বিশ্বাস করতে পারিনি। সত্যিই কমপিউটার! ওটার মূল সমস্যা ছিল পাওয়ার সাপ্লাই-এ। মেরামতও করে ফেললাম। বিক্রি করে দেব, কিন্তু তখন হঠাৎ মন চাইল গবেষণা করতে। লিখে ফেললাম কিছু সহজ প্রোগ্রাম। এরপর আর কখনও পেছনে ফিরে দেখতে হয়নি।'

লোকটার নস্টালজিয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে মন চাইছে না বলে নিচু সুরে বলল লাবনী, 'বুঝলাম।'

আবারও শীতল হলো বিলিয়নেয়ার কণ্ঠ: 'ঠিকই ধরেছেন। এবার আসুন, আপনার ডান হাতটা দিন এখানে।'

লাবনীকে ঠেলে ডেস্কের কাছে নিল চাঞ্চাল আধিকারী।

সন্দেহ নিয়ে সামনের মেশিনটা দেখল লাবনী।

ওটা অ্যাডজাস্ট করছে বিলিয়নেয়ার।

হাত কেটে ফেলতে চায় লোকটা?

'ওটা কী?' একটু কেঁপে গেল লাবনীর কণ্ঠ।

'লেসার স্ক্যানার। ইউনাইটেড নেশন্স-এর ভল্ট থেকে স্টাডা কোডেক্স সরাতে হলে আপনার হাতের প্রিন্ট লাগবে।' মেশিনের পাশে র‍্যাপিড প্রোটোটাইপার দেখাল বিলিয়নেয়ার। লাবনী জানে

না, ওই একই জিনিস রানাকে দিয়েছে জ্যাক রিচি। 'স্ক্যানার থেকে যে প্যাটার্ন তৈরি হবে, তা হবে আপনার হাতের ছাপের মত। এতই নিখুঁত, বোকা করে দেবে সিকিউরিটি সিস্টেমকে।'

মাথা নেড়ে বুকে দু'হাত বেঁধে ফেলল লাবনী। 'আমি পাম প্রিন্ট নিতে দেব না।'

'আগে হোক বা পরে, ওই ছাপ নিউ ইয়র্কে পাঠাব,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'কথা হচ্ছে, হাতের কপি পাঠানো হবে, না সত্যিকারের হাত!'

চেহারা দেখে মনে হলো চাঞ্চাল আধিকারী খুশি হবে আস্ত হাত কেটে পাঠিয়ে দিলে। মুখটা শুকিয়ে গেল লাবনীর। আস্তে করে বাড়িয়ে দিল হাত। স্ক্যানারের ওপর ঠিকভাবে হাত পেতে নিল বিলিয়নেয়ার। অন করা হলো বাটন। ঘুরতে লাগল প্রিযম। এতই দ্রুত, ভুতুড়ে দেখাল ওটাকে। হাতে পড়ছে উজ্জ্বল নীল আলো। সুচের মত সরু বিম ছড়িয়ে পড়ছে প্রিযমে। তৈরি হচ্ছে লাবনীর হাতের ছাপ। কিছুক্ষণ পর বিঁপ আওয়াজ তুলে থেমে গেল মেশিন। উধাও হয়েছে নীল আলো। ক্লিক আওয়াজ তুলে থেমে গেছে প্রিযম।

মনোযোগ দিয়ে রিডিং দেখল অনুপম মঙ্গেলকার, মনে হলো সন্তুষ্ট। 'আপনার হাতের ছাপ রেকর্ড করা হয়েছে। দরকারী সবই পাওয়া গেল। গুড!'

হাত সরিয়ে নিল লাবনী। 'কিন্তু কোডেক্স পাননি। ওটা না পেলে কিছুই করতে পারবেন না।'

নির্বিকার সুরে বলল মঙ্গেলকার, 'কোডেক্স ঠিকই জোগাড় করবে মাসুদ রানা, নইলে পাবে আপনার বিকৃত লাশ।'

এগারো

ডেলাকোর্ট হোটেল। মার্বেলের বিশাল লবির কোণে সোফায় বসে চুপ করে ফোর্টিফোর স্ট্রিটে চোখ রাখছে রানা। কাঁচের ওদিকে নামকরা এক নায়কের সাক্ষাৎ পাবে সে, আশায় জড় হয়েছে উত্তেজিত একদল ভক্ত ও পাপারায্যি। তাদেরকে বারবার ঠেলে আঙ্গিনা থেকে বের করে দিচ্ছে হোটেল স্টাফরা, কিন্তু একটু পর সুযোগ পেলেই আবারও এগিয়ে আসছে তারা।

রাত আটটা। আর চোদ্দ মিনিট পরেই পূর্ণ জোয়ার। কিন্তু এখনও লিপি গোমেজের কাছ থেকে বার্তা নেই, কাজেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে রানাকে। ওদিকে যা করার ঝটপট করতে হবে আতাসি, রায়হান রশিদ ও রবি চৌধুরিকে।

এইমাত্র ভিড় ঠেলে হোটেলে ঢুকতে চাইতেই এক লোককে ঠেকিয়ে দিল ডোরম্যান। তবে দু'চার কথার পর ছাড়া পেল সে। এগিয়ে আসতেই তাকে চিনল রানা। জ্যাক রিচি, পরনে এখন ভারী ওভারকোট। চেহারা দেখে মনে হলো ডোরম্যানের প্রশ্নের কারণে বিরক্ত। রানাকে দেখে এগিয়ে এসে পাশের সোফায় বসল সে। আঙুল তুলে দেখাল বাইরের ভিড়। 'ওখানে কী হচ্ছে?'

'পাপারায্যি,' উদাস সুরে বলল রানা, 'শুনলাম হোটেলে উঠেছে বিখ্যাত হলিউডি এক নায়ক।' তিক্ত চোখে দেখল ব্রিটিশ দুর্বৃত্তকে। 'জিনিসটা এনেছ?'

রানার হাতে ছোট্ট একটা মেমোরি কার্ড দিল রিচি। 'ডক্টর আলমের হ্যাণ্ড প্রিন্ট। প্রোটোটাইপারে দিলেই পরের কাজ করবে মেশিন। তবে মনে রাখবেন, স্ক্যানারে দেয়ার আগে ওটার তাপ হতে হবে শরীরের তাপের সমান।' চোখ সরু করল। 'আবারও জানাতে বলেছেন মিস্টার মঙ্গেলকার, কোডেক্স না এনে দিলে খুন হবে ডক্টর আলম।'

'আমি কালা নই, আগেই বলেছ,' বলল রানা।

'নিজের দায়িত্ব শেষ করলাম।'

'তোমার স্ত্রী বা অসুস্থ ছেলে জানে কী করছ?' রানার এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না জ্যাক রিচি। চোখে চোখ রেখেও আবার দৃষ্টি দূরে পাঠাল সে। 'তোমার স্ত্রী জানে, মানুষ খুন করতেও দ্বিধা নেই তার স্বামীর? বাচ্চাটা জানে, ওর বাবা একজন খুনি?'

'বাজে কথা বাদ দাও,' কড়া সুরে বলল রিচি, 'আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাজে লোকগুলোকেই সবসময় খুন করেছি। আর তা করতে গিয়ে বেসামরিক কেউ খুন হলে তার দায় আমার নয়।'

'তা-ই নাকি?' জ্যাক রিচিকে দেখল রানা, 'আসলে টাকা পাওয়াই সব?' ওর মনে হলো ঠিক জায়গায় খোঁচা খেয়েছে দুর্বৃত্ত। 'এবার লাবনীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'জানতাম,' মোবাইল ফোন বের করে কল দিল জ্যাক রিচি। 'মিস্টার মঙ্গেলকার? ডক্টর আলমের সঙ্গে কথা বলতে চায় মিস্টার রানা।' কয়েক সেকেণ্ড জবাব শুনল, তারপর ফোন দিল রানার হাতে।

ওটা কানে ঠেকাতেই শুনল রানা: 'মিস্টার রানা, আশা করি কোডেক্স ঠিকঠাকভাবে মিস্টার রিচির হাতে তুলে দেবেন। তা না হলে কী হবে, সেটা তো ভাল করেই জানেন। ডক্টর আলম...'

'হ্যাঁ, আগেও শুনেছি এ হুমকি,' কড়া সুরে বলল রানা। 'এইমাত্র ওই একই কথা বলেছে জ্যাক রিচি। ...লাবনী কোথায়?'

'আমার পাশেই।'

ফাঁপা আওয়াজ পেল রানা, তারপর শুনল লাবনীর কণ্ঠ: 'রানা? তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ?'

মনে হলো রানার কথা শুনতে পায়নি লাবনী। 'রানা? শুনছ? হ্যাঁ, ভালই আছি। রানা, কোডেক্স ডাকাতি করতে যেয়ো না। মস্ত বিপদে পড়বে। জেনে গেছি মঙ্গেলকারদের প্ল্যান! এরা...'

'যথেষ্ট!' বলল অনুপম মঙ্গেলকার। ফাঁপা আওয়াজ শুরু হয়ে মিলিয়ে গেল। 'মিস্টার রানা, সময় হয়েছে আমার হাতে কোডেক্স তুলে দেয়ার। সেক্ষেত্রে নিরাপদে ডক্টর আলমকে তুলে দেব আপনার হাতে।' কেটে গেল কল।

জ্যাক রিচির হাতে মোবাইল ফোন দিল রানা। বুঝে গেছে, ডাহা মিথ্যা বলছে অনুপম মঙ্গেলকার। তার সঙ্গে নেই লাবনী। ওর কথা এসেছে স্যাটেলাইট কানেকশনের মাধ্যমে। মেয়েটাকে আটকে রেখেছে ভারতে, নিজের আস্তানায়। নিজে চলে এসেছে অনুপম আমেরিকায়, ব্যক্তিগতভাবে বুঝে নেবে স্টাডা কোডেক্স। আর তখনই দেরি না করে খুন করবে ওকে লোকটা। ওদিকে ভারতে খুন হবে লাবনী।

কিন্তু আপাতত কিছুই করার নেই, এদের প্ল্যান অনুযায়ী খেলতে শুরু করে আশা করতে হবে, কাজে আসবে ওর বি প্ল্যান। বেজে উঠতেই পকেট থেকে ফোন নিয়ে কল রিসিভ করল রানা। 'লিপি?'

'সবই ঠিক আছে, মিস্টার রানা,' বলল লাবনীর সেক্রেটারি লিপি গোমেজ, 'আপনার মনে আছে তো লকার নাম্বার?'

'মুখস্থ।'

'গুড। গুড লাক।' লাইন কেটে দিল লিপি গোমেজ।

স্টিল দিয়ে কিনারা ঘেরা বড়, কালো চামড়ার ব্রিফকেস পাশ থেকে তুলে উঠে দাঁড়াল রানা। জ্যাক রিচিকে বলল, 'সিগনাল দেয়া হয়েছে। কাজ শেষ হলে এই হোটেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'কোডেক্স সহ।'

'হ্যাঁ, ওটা সহ, তখন যেন তোমার সঙ্গে থাকে লাবনী।' দরজার দিকে রওনা হলো রানা। একবার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল লোকটাকে। ওর চোখ পড়ল সুট পরা খুদে এক লোকের ওপর। মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে গিল্টি মিয়া। চট্ করে মুখ তুলে একবার দেখল রানাকে। তার পাশে কালো এক ব্রিফকেস।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

কনকনে শীতেও জড় হয়েছে নায়কের ভক্তরা। তাদের পাশ কাটিয়ে ফোর্টিফোর স্ট্রিটের শেষমাথা লক্ষ্য করে পা বাড়াল ও। রাতের ঘন কালোর বুকে জ্বলজ্বল করছে ফার্স্ট অ্যাভিনিউর আরেক দিকে দ্য ইউনাইটেড নেশন্স কমপ্লেক্স।

আবারও ফোন থেকে কল দিল রানা। 'রায়হান, তৈরি?'

'সব ঠিক আছে, মাসুদ ভাই,' বলল বিসিআই এজেন্ট। 'রোভ ঢুকে পড়েছে পাইপে। কোথাও কোনও সমস্যা নেই।'

ইউএন-এর বিশাল দালানের কাছে ইস্ট রিভারে ভাসছে ধূসর একটা মাঝারি আকারের বোট। ডেকে দাঁড়িয়ে ভারী কোট পরেও শীতে কাঁপছে রানা এজেন্সির শাখাপ্রধান রবি চৌধুরি, চোখ ঝলমলে আলোয় স্নাত সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর ওপর। ম্যানহাটানের বোটিং আইন জানা নেই ওর, তবে বোধহয় ব্যস্ত ওঅটার ওয়েতে নোঙর করা বেআইনী। তার চেয়েও খারাপ দিক,

কর্তৃপক্ষ ওদের দিকে মনোযোগ দিলে চট্ করে বুঝবে, এ বোটের তিনজনই বিদেশি। বিশেষ করে সন্দেহ পড়বে আতাসির ওপর, কারণ সে আরব।

আজকের মিশনের জন্যে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজ থেকে বোটে করে ওকে নিয়ে এসেছে রবি ও রায়হান।

হ্যাচ খুলে নিচের ডেক থেকে উঁকি দিল আতাসি। 'বস যোগাযোগ করেছেন। ভল্টে ঢুকবেন।' আবারও মাথা নিচু করে নেয়ার আগে একবার দেখল চারপাশ। দূরে সন্দেহজনক বোটটা বোধহয় এনওয়াইপিডির হার্বার ইউনিটের।

আতাসির পর পর নিচের ডেকে নামল রবি।

ছোট্ট কেবিনে যেন দোকান খুলে বসেছে রায়হান। সামনের টেবিলে ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকে নিয়েছে দুটো ল্যাপটপ ও জটিল রিমোট-কণ্ট্রোল ইউনিট। খুলে দেয়া হয়েছে পোর্টহোল। ওখান থেকে আসছে হু-হু ঠাণ্ডা হাওয়া। স্পুল থেকে ধীরে পোর্টহোল দিয়ে বেরোচ্ছে শক্ত কাঁচের সুতো বা ফাইবার-অপটিক কেইবল। স্পুলের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয়েছে একটা ল্যাপটপের। নদীর পশ্চিম তীরে পাইপের মাঝ দিয়ে ঢুকে পড়েছে কাঁচের সুতো, ওটার শেষে রিমোট অপারেটেড ভেহিকেল।

'সুন্দরী, নিজ পথে চলো,' বিড়বিড় করল রায়হান। রোভ চালাতে গিয়ে ব্যবহার করছে দুটো জয়স্টিক। 'যাও, বাপু।' দুই ল্যাপটপের একটার স্ক্রিনে দেখল রোবটের ক্যামেরায় ধরা দৃশ্য। আঁধার পাইপ দিয়ে গেছে প্লাস্টিকে মোড়া কেইবল। ধীরে ঘুরছে স্পুল। ওটা থেকে ফাইবার-অপটিক কণ্ট্রোল কেইবল টেনে নিয়ে সামনে বাড়ছে রোবট।

পুরো ম্যানহাটানের বুক চিরে নানান দিকে গেছে ভূগর্ভস্থ সব কণ্ডিউট— সাবওয়ে টানেল হোক বা শহরের টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা, সব জায়গায় আছে। বিশেষ বৃত্তাকার এই পাইপ ঢুকেছে

অন্য কারণে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আগুন নেভাতে নদী থেকে পানি নিতে বসানো হয়েছিল পাইপ ও শক্তিশালী সব পাম্পিং মোটর। পরে টেলিকম কোম্পানি টের পেল, ব্রডব্যাণ্ডের জন্যে শত শত মাইল দীর্ঘ ফাইবার অপটিক শহরে ছড়াতে হলে দারুণ কাজে আসবে ওসব পাইপ।

একদল রোবট ব্যবহার করে সরু পাইপের মাঝ দিয়ে নেয়া হলো কেইবল। সেসব রোবটের মতই চলেছে রায়হানের ছোঁক-ছোঁক রোভ। ওটা দেখতে সাপের মতই। অবশ্য, দেহে তিনটে অংশ। প্রয়োজনে এঁকেবেঁকে চলবে পানিভরা পাইপের ভেতর। দেহের শেষাংশে প্রপেলার ও স্টিয়ারিং ফ্যান, মাঝে ব্যাটারি প্যাক, আর সামনে ক্যামেরা, বাতি ও ভাঁজ করা ম্যানিপুলেটর বাহু।

অন্য ল্যাপটপের দিকে তাকাল রায়হান। স্ক্রিনে ইউনাইটেড নেশন্স-এর পাইপ সিস্টেমের গ্রাফিক ডিযাইন। টিপটিপ করা আলোকিত এক কার্সার দেখাল, সেক্রেটারিয়েট দালানের বাইরে কোথায় আছে ছোঁক-ছোঁক। 'সময়?' জানতে চাইল রায়হান।

'আটটা চার মিনিট,' বলল আতাসি।

'কপাল! মাত্র দশ মিনিট পর পূর্ণ জোয়ার! গতি বাড়াতে হবে!' একটা জয়স্টিকের থ্রটল আরও সামনে ঠেলল রায়হান। আগের চেয়ে গতি তুলে স্পুল থেকে বেরোতে লাগল ফাইবার-অপটিক কেইবল।

আইএইচএ অফিসে ঢুকে লিপি গোমেজকে তার নিজের টেবিলের পেছনে দেখল রানা। সহজ সুরে বলল, 'ওভার টাইম, লিপি?' এখনও রয়ে গেছে কয়েকজন কর্মচারী। আসলে প্রাচীন কোনও আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া গেলে বুঁদ হয়ে কাজ করে এরা, মনেই থাকে না ফিরতে হবে বাড়ি। এদের ভেতর সেরা ওভারটাইম করা মানুষটা

এখন নেই— সে ডক্টর লাবনী আলম। আপাতত এখানেই অপেক্ষা করবে, ভাবছে রানা। যার যার কাজ শেষ করুক আতাসি, রবি আর রায়হান, তারপর নিজের কাজে নামবে ও।

'যতটা পারি সেরে রাখছি আগামীকালের পেপারওঅর্ক,' বলল লিপি। গলা নিচু করে নিল, 'ডক্টর আলমের সিকিউরিটি কোড ব্যবহার করে লকার খোলার ব্যবস্থা করেছি। আপনি ওখানে গিয়ে নিজের আইডি দেখালেই ঢুকতে দেবে ওরা। গার্ডরা জেনে গেছে, লকার খুলতে আপনাকে অথোরাইযেশন দিয়েছেন ডক্টর আলম।'

'ওরা চেক করে দেখবে না, অফিসে লাবনী আছে কি না?'

'কে বলল তিনি নেই,' সরল চোখে তাকাল লিপি। টোকা দিল কি-বোর্ডে। 'কমপিউটার বলছে, সেই সকাল থেকে উনি এখনও আছেন কনফারেন্স রুমে। বেশি ব্যস্ত। আর আপনি তো জানেন, মিস্টার রানা, কমপিউটার কখনও মিথ্যে বলে না।'

মৃদু হাসল রানা। 'থ্যাঙ্ক্স্, লিপি।' ভারী কেস হাতে সোজা গিয়ে ঢুকল লাবনীর অফিসে। চট্ করে দেখে নিল হাতঘড়ি।

আটটা দশ।

রায়হান, আতাসি আর রবি কী করছে!

বেশি দেরি হলে মস্ত বিপদে পড়বে ও!

ধীর গতি তুলে সামনে বাড়ছে কার্সার, খেয়াল করে দেখছে আতাসি। রোবট ঢুকে পড়েছে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের নিচে। কিন্তু নানাদিকে ভাগ হয়েছে পুরনো সব পাইপ। নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে হলে আঁকাবাঁকা পথে চলতে হবে রোবটকে।

অন্য ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ বোলাল আতাসি। সামনে ভাগ হয়েছে পাইপ। একটা গেছে তীরের মত সরাসরি, অন্যটা বাঁক নিয়েছে নব্বুই ডিগ্রি।

‘কোন্ পথে?’ জানতে চাইল রায়হান।

‘বামে,’ বলল আতাসি, ‘বিশ গজ গেলে আরেক জাংশন, তখন ডান দিকে যেতে হবে।’

পরের মোড়ে চল্লিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে বাঁক নিয়েছে পাইপ। ‘এবার ওপরের বামে,’ বলল আতাসি, ‘এরপর সরাসরি জাংশন বক্স।’

‘সময়?’ বাঁক নিয়ে জানতে চাইল রায়হান।

‘আটটা বারো,’ জানাল রবি।

‘দু’মিনিট পর পূর্ণ জোয়ার, সর্বনাশ!’ থ্রটল আরও খুলে দিল রায়হান।

শাফটের শেষে পৌঁছেছে রোবট। গলা শুকিয়ে গেল সবার। সামনের পাইপ পুরো ভরা নয় পানিতে, ওপরে এখনও রয়ে গেছে বাতাস। চকচক করছে রুপালি পাইপ।

পুরো জোয়ারেও হয়তো ভরবে না ওটা।

থ্রটল ঠেলে রোবটকে পূর্ণগতি দিল রায়হান। ভিডিয়ো গেমের দৃশ্যের মত পাইপের মাঝ দিয়ে ঝোড়ো গতি তুলেছে ছোঁক-ছোঁক। ‘আর কতটা দূরে জাংশন বক্স!’

‘বিশ মিটার,’ ম্যাপ দেখছে আতাসি। ‘পনেরো...’

‘সাবধান!’ চমকে গিয়ে বলল রবি। জোয়ারের পানিতে ভেসে এসে পাইপের পথ আটকে দিয়েছে কোনও আবর্জনা।

ঠিক সময়ে থামতে পারবে না ছোঁক-ছোঁক। বাধার মুখে বার কয়েক পাক খেল ক্যামেরার দৃশ্য। থেমে গেছে খুদে রোবট।

‘যাহ্! শালার কপাল!’ বিড়বিড় করল রায়হান। দুলছে দৃশ্য। একবার এদিক আবার ওদিক করলেও এগোতে পারছে না ছোঁক-ছোঁক। জয়স্টিক নিয়ে ব্যস্ত হলো ও। আবর্জনা পাশ কাটিয়ে ঢুকতে চাইছে পাইপের গভীরে।

বনবন করে প্রপেলার ঘুরছে বলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে পানি।

তখনই খারাপ আরেকটা দিক খেয়াল করল আতাসি। 'রায়হান, কমে যাচ্ছে পাইপের পানি!'

এখন বাজে আটটা পনেরো।

শুরু হয়েছে ভাটা।

জয়স্টিক নিয়ে প্রায় ধস্তাধস্তি করছে রায়হান। 'আরে, শালা, পারবি তুই, ভাই, ছোঁক-ছোঁক! এগিয়ে যা, বাপ!'

গলা শুকিয়ে গেছে আতাসি ও রবির।

ফুল স্পিড দেয়া হয়েছে ছোঁক-ছোঁককে, তবুও এগোচ্ছে না।

'আরে, শালার ভাই!' রোবট সরাল রায়হান। দেয়ালে ঘষটে গেল ক্যামেরা।

ভীষণ দুলে উঠেছে দৃশ্যটা। ধাক্কা দিয়ে আবর্জনা ঠেলে পাইপের ভেতর দিয়ে রওনা হয়ে গেছে ছোঁক-ছোঁক। ওটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইল রায়হান। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'পথের শেষ কতটা দূরে?'

'দশ গজ,' বলল আতাসি।

এখনও পাইপে কমছে পানি। সার্ফেস দেখতে শুরু করেছে ক্যামেরা। লেন্স-এ ছলকে লাগছে ঢেউ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই হয়তো পানির অভাবে আটকা পড়বে সাবমেরিন রোবট।

'প্রায় পৌঁছে গেছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবি, 'মাত্র তিন গজ... দুই...'

পাইপ চওড়া হতেই বোঝা গেল, রোভ পৌঁছেছে অ্যাকসেস শাফটে। দেয়ালের পাশে জং ধরা মই, উঠে গেছে ওপরে। প্রপেলার উল্টো ঘোরাচ্ছে এবার রায়হান। প্রায় স্কিড করে ছোঁক-ছোঁক থামতেই সামনের পাইপে তৈরি হলো বো ওয়েভ।

'যাক, বাঁচা গেল,' বিড়বিড় করল রবি, 'আরেকটু হলে সর্বনাশ হতো!'

পাইপের দূরে চোখ রাখল আতাসি। 'জাংশন বক্স কই?'

'শাফটের ওপরে,' বলল রায়হান। ব্যস্ত হয়ে উঠল দ্বিতীয় জয়স্টিক নিয়ে। ব্যবহার করছে রোভ-এর ম্যানিপুলেটর বাহু। ওটার কবজির ওপরে আরেকটা খুদে ক্যামেরা। ওটার কারণে সংকীর্ণ হলো ওদের দৃষ্টি। সোজা করা হচ্ছে যান্ত্রিক বাহু, দেখা গেল ওটার হাতে ধারালো কাটার। 'এবার দেখা যাক...'

ওপরে তাক হলো ক্যামেরা। শাফটের ছাতে পড়ল সরু লেড স্পটলাইটের আলো। ছোট্ট লেন্স-এর কারণে ঠিক বোঝা গেল না জায়গাটা কতটা ছোট বা বড়। মই দেখে যে-কেউ ভাববে, ওটা তৈরি করা হয়েছে দানবের জন্যে। অনেক ওপরে এক এক ধাপ। কিন্তু মেঝের ম্যান হোলের ঢাকনি হবে বড়জোর নয় ফুট ওপরে। লক্ষ্যবস্তুর খুব কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। শাফটের দেয়ালে ফাইবার অপটিক জাংশন বক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে মেইন কেইবল ট্রাঙ্ক। আবার বক্স থেকে ওপরে গেছে পুরু এক কেইবল। ওটা ইউএন-এর ভূগর্ভস্থ ডেটা সেন্টার থেকে যোগ দিয়েছে গোটা পৃথিবীর সব দেশের ডিজিটাল জগতে।

বক্সের সামনের প্যানেলে ছোট তালা দেখে বলল রবি, 'ওই মাল কাটতে পারবেন না, রায়হান?'

'ভাববেন না,' বলল দুর্ধর্ষ কমপিউটার হ্যাকার। তালার খুব কাছে ম্যানিপুলেটর বাহু নিয়ে টিপে দিল একটা সুইচ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে আগুনের মত তপ্ত হয়ে রক্তিম হলো কাটারের ডগা। সাবধানে কন্ট্রোল নাড়ল রায়হান। তালার চারপাশের প্যানেলে কাটারের ডগা স্পর্শ করতেই গলতে লাগল ধাতু। জাংশন বক্স অ্যানোডাইযড় অ্যালিউমিনিয়ামে তৈরি, ওঅটারটাইট ও জংহীন, কিন্তু ওটার পাত খুব পাতলা, অ্যালিউমিনিয়ামের গলন্ত সব ফোঁটা পড়ছে নর্দমার পানিতে।

একমিনিট পেরোবার আগেই প্যানেল থেকে খসে ধুপ্ করে ড্রেনে পড়ল তালা। কাটার অফ করে বাহু সরিয়ে নিল রায়হান,

ক'সেকেণ্ড পর ওটার থাবা ঢুকল প্যানেলের বুকের গর্তে। টান দিতেই খুলে গেল প্যানেলের ডালা। 'ঠিক আছে, এবার কী?' আতাসির দিকে তাকাল হ্যাকার।

স্ক্যামেটিক দেখছে লেবানিজ। প্রিন্ট আউটের কয়েকটা সকেট দেখাল। 'বসের সোর্সের কথা অনুযায়ী, ডায়াগনস্টিক পোর্ট হচ্ছে... ওটা। দ্বিতীয় সারি। নিচের সকেট।'

বাহু পিছিয়ে নিল রায়হান। ওটার আলোয় আগের চেয়ে ভাল দেখা গেল প্যানেলের ভেতর।

বাহু নামাল রায়হান, দেখছে রোবটের ইকুইপমেন্ট বে-তে। ভেতরে ছোট এক ফাইবার-অপটিক কেইবল, ওটার দু'প্রান্তে প্লাগ কানেক্টর। 'ডেটা লিঙ্কের সঙ্গে ছোঁক-ছোঁকের সংযোগ দিতে কয়েক মিনিট লাগবে। আশা করি কাজ করবে ল্যাপটপের প্রোগ্রাম।'

দ্বিতীয় ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে মানচিত্র হাওয়া করল রবি, চালু হলো নতুন প্রোগ্রাম: লিউনেক্স ডান ডায়াগনস্টিক ৫.২বি। 'বলেছেন ইউএন সিস্টেমে ঢুকবেন। দেখুন কী করা যায়।'

'ভল্টের ক্যামেরার ডিজিটাল ফিড পাব,' বলল রায়হান।

'সোর্স মিথ্যা বলেনি তো?' জানতে চাইল রবি।

মাথা নাড়ল রায়হান। 'সোর্স আসলে ইউএন মেইন ফ্রেম কমপিউটার, হ্যাক করেছি ওটাকে। যদি মিথ্যা তথ্য দেয়, আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না।'

'তা হলে মাসুদ ভাইকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা আছি সঠিক পযিশনে।' মোবাইল ফোন বের করল রবি।

লাবনীর অফিসে চুপ করে বসে নেই রানা, ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় পায়চারি করছে। এমনসময় বেজে উঠল মোবাইল ফোন। কল রিসিভ করে কয়েক সেকেণ্ড শুনে তারপর বলল, 'ঠিক

আছে, রবি, কাজে নামছি।' কল কেটে ফোন পকেটে রেখে ব্রিফকেস তুলে নিল, বেরিয়ে এল আইএইচএ চিফের ঘর ছেড়ে।

সেক্রেটারির ডেস্ক পাশ কাটাবার সময় নীরবে ঠোঁট নেড়ে গুড লাক জানাল লিপি। জবাবে মৃদু মাথা দোলাল রানা।

মাত্র একমিনিটে নেমে এল থার্ড বেসমেন্ট লেভেলে। হাঁফ ছেড়েছে, কপাল ভাল কেউ ছিল না এলিভেটরে। দরজা খুলে যেতেই অলস পায়ে চলল সিকিয়োর স্টোরেজ এরিয়ার উদ্দেশে। যতটা পারে সময় দিচ্ছে রায়হানকে। ঠিকভাবে হ্যাক করতে হবে ইউএন-এর ভল্টের ভিডিয়ো ক্যামেরা সিস্টেম।

কিন্তু বেশিক্ষণ সময় ওর নিজের হাতেই নেই, কাছে চলে আসছে ডেডলাইন, তার আগেই পৌঁছুতে হবে রিচির কাছে।

সিকিউরিটি স্টেশনে হাজির হয়ে মিষ্টি করে হাসল রানা। 'ইভিনিং, ল্যারি, হেনি।'

'এখনও কাজ শেষ হলো না ডক্টর আলমের?' জানতে চাইল ল্যারি জ্যাকসন। বিরক্তি কাটাবার জন্যে নিনটেণ্ডো ডিএস খেলছে হেনি, একবার মুখ তুলে মাথা দুলিয়ে রানাকে সম্মান জানাল।

'লাবনী প্রাচীন কী নিয়ে বড় ব্যস্ত,' বলল রানা, 'অনুরোধ করল, যেন ওর হয়ে কয়েকটা ফাইল ঘেঁটে দেখি।'

মৃদু হেসে কমপিউটার দেখাল জ্যাকসন। 'কী ধরনের ফাইল আপনার দরকার?'

নিজের আইডি মেশিনে দিল রানা, ওটায় রয়েছে প্রয়োজনীয় লকার নম্বর। স্ক্রিনে চেক করে দেখছে যুবক গার্ড। হিমশীতল স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে নামল রানার। যদি প্রমাণ হয় লিপি আসলে লাবনীর সিকিউরিটি কোড ব্যবহার করেছে...

সরাসরি মনিটর দেখছে না রানা। ওটা থেকে সবুজ আলো পড়ছে গার্ডের মুখে। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, সমস্যা হয়নি।

'হ্যাঁ,' বলল গার্ড, 'লিপি ওই লকারে নতুন ফাইল রেখেছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সায়েন্টিস্ট! দরকারী ফাইল দেখছে, এসে রেখে যাচ্ছে, আবার একটু পর ছুটে আসছে। ভীষণ বিরক্ত হয়েই এবার পাঠাল আমাকে।'

'আপনার বিপদ, তাই না,' গেট খুলে করিডোরে পা বাড়াল যুবক গার্ড। 'আসুন, মিস্টার রানা।'

করিডোরে বাঁক নেয়ার সময় চট্ করে ভল্টের দরজা দেখল রানা। প্রথম সারি লকারের কাছে পৌঁছে গেল দু'জন। বেল্টের চেইনের শেষ প্রান্তে ঝুলন্ত চাবি দিয়ে নির্দিষ্ট লকার খুলল ল্যারি। ডালা খুলে দেয়ার পর দেখা গেল, ভেতরে ইলাস্টিক ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে রাখা বড়সড় একটি বক্স ফাইল।

ওটা বের করবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ল্যারি, কিন্তু সামনে বেড়ে লকারের ছাতে ব্রিফকেস রাখল রানা। 'ঠিক আছে, ল্যারি, বাকি কাজ আমিই পারব।' হাত বাড়িয়ে বক্স ফাইল তুলে নিল। এ মুহূর্তে ওর দেহের কারণে ওদিকটা দেখছে না ল্যারি। চট্ করে মুড়িয়ে রাখা ছোট এক কার্ডবোর্ড ভরে দিল রানা তালার প্লেটের ত্রিকোণ স্লটে।

বেশ ওজন বক্স ফাইলের, ভেতরে টুং-টাং শব্দ তুলছে কী যেন। পিছিয়ে এল রানা, হাতে ভারী বক্স। ল্যারি জ্যাকসন লকারের দরজা বন্ধ করতেই ক্লিক শব্দে আটকে গেল তালা। ধক্ করে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। যাহ্! আটকে গেছে লক! আবারও সিকিউরিটি চাবি কোথায় পাবে? তার মানে আজ চাইলেও বের করতে পারবে না কোডেক্স। অর্থাৎ, খুন হবে লাবনী!

লকারের দরজা ও ফ্রেমের মাঝে সরু রেখার মত কার্ডবোর্ড দেখল রানা। ওটার ওপর চেপে বসেছে তালার বোল্ট। কিন্তু আশা করা যায়, খোলা যাবে ওটা।

ব্রিফকেস হাতে ল্যারি জ্যাকসনের পিছু নিল রানা। পরের লকারের সামনে থামল ওরা। এটায় আছে শুধু ডিকয়। লাবনীর

অফিস থেকে ঝটপট তুলে নিয়ে ভেতরে কী আছে না দেখেই এসব রেখে গেছে লিপি গোমেজ। গার্ডকে এবার ফাইল বের করতে দিল রানা। ওর হাতে ফাইল ধরিয়ে দিয়ে লকারে তালা মারল যুবক। রিডিং এরিয়ার দিকে চলেছে ওরা। চট্ করে একবার চারদিকের ক্যামেরা দেখে নিল রানা। এখন বাইরে থেকে ওদেরকে দেখছে অন্য গার্ড। ওই একই কাজ করছে আতাসি, রবি ও রায়হান। নিজেদের কাজ ঠিকভাবে সমাধা করতে পারবে তো ওরা?

'ঠিক আছে, যে-কোনও বুথে গিয়ে বসে পড়ুন, মিস্টার রানা,' বলল জ্যাকসন। মস্ত ঘরের একপাশে বেশ কয়েকটা বুথ। চারদেয়াল যথেষ্ট উঁচু, চট্ করে কেউ দেখবে না কী পড়ছে অন্যরা। কপাল ভাল, আপাতত সব বুথ খালি। 'যে-কোনও বুথে বসতে পারেন। আপনার কাজ শেষ হলে হাতের ইশারা করবেন। আমরা যে-কোনও একজন এসে আপনাকে নিয়ে যাব।' আঙুল তাক করে ক্যামেরা দেখিয়ে দিল গার্ড। কোনও ডকুমেন্ট পড়তে না পারলেও লেন্সটা কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে দেবে বসে থাকা মানুষটাকে।

'পরে দেখা হবে,' মস্ত ঘরের দরজা থেকে সবচেয়ে দূরের বুথ বেছে নিয়ে হাত নাড়ল রানা। ডেস্কের ওপর ব্রিফকেস রাখার পর বক্স ফাইল থেকে বের করল বিশাল এক কাগজ, বিছিয়ে নিল। এমনভাবে ঝুঁকে গেল, মনে হলো নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছে ওই পাতায়। ঘরের দরজা লক করে চলে গেল জ্যাকসন। আবারও বক্স ফাইল খুলল রানা। ভেতরে দুটো জিনিস: স্বচ্ছ তরল দিয়ে ভরা তিন লিটারের প্লাস্টিকের কন্টেইনার আর একটা ইয়ারপিস। শেষ জিনিসটা লাগানো ছিল বক্সের ডালায়। ইয়ারপিস খুলে ডান কানে গুঁজে নিল রানা।

'বস্, পৌঁচেছেন?' জানতে চাইল আতাসি। রানা মাটির

অনেক নিচে আছে বলে বিকৃত শুনল লেবানিজের কণ্ঠ। 'আপনি যদি কথা শুনে থাকেন, মাইক্রোফোন চেক করুন।'

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গুনগুন করে গাইল রানা।

হতাশ হয়ে বলল আতাসি, 'ছিহ্, বস্! বেসুরো হচ্ছে যে!'

'হোক না, দোষ কী! তোমাদের কী খবর?'

'রায়হান এখনও ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত।'

'আর কতক্ষণ লাগবে?'

রায়হানের কানে হেডফোন পরিয়ে দিল আতাসি। 'মাসুদ ভাই, আরও কয়েক মিনিট চাই। ক্যামেরার ব্যাপারে ফোটোশপে ব্যস্ত। আগে নিতে হবে আপনার ফুটেজ, তারপর তৈরি করব লূপ। দু'মিনিটের ছায়াছবি পেলেই চলবে।'

'আমার নিজের কিছু করতে হবে?'

'হালকা-পাতলা নড়াচড়া করুন। ওরা যেন আবার মনে না করে, একই দৃশ্য বারবার দেখছে। কিন্তু মনে রাখুন, শুরু আর শেষে যেন একই পযিশন থাকে। স্পিড মুভিতে তো দেখেইছেন কী করে। ঘড়ির দিকে চোখ রাখুন। দু'মিনিট পর একেবারে থিতু হয়ে বসবেন। ভাবুন, সিনেমায় অভিনয় করছেন। আপনি ব্যর্থ প্রেমিক, মন দিয়ে পড়ছেন প্রেমিকার শেষ চিঠি। ...রেডি?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে, থ্রি... টু... ওয়ান... স্টার্ট!'

গম্ভীর চেহারায় ডেস্কে বিছিয়ে রাখা কাগজে চোখ রাখল রানা। কেউ দেখলে ভাববে গভীর মনোযোগে পড়ছে ডকুমেন্ট। কচ্ছপের গতি তুলে পেরোতে লাগল সময়। রানা বুঝে গেল, দুই মিনিট আসলে দীর্ঘ সময়। বার পাঁচেক ওর মনে হলো কান ও পিঠ চুলকে নেয়া খুবই জরুরি। ভাল করেই জানে, সিকিউরিটি মনিটরে দেখাতে হবে একই ফুটেজ, কাজেই অস্বাভাবিক কোনও প্রতিক্রিয়া দেখানো চলবে না।

এক এক করে পেরোতে লাগল সেকেণ্ড।

দু'মিনিট পর জানাল রায়হান, 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই, আপনার কাজ শেষ।'

পিঠ সোজা করে বসল রানা। 'যাক, বাঁচলাম!'

'বাঁচা অত সোজা না,' বলল রবি, 'মনে রাখবেন, আবারও ঠিক আগের পযিশনে থাকতে হবে। একটু পর লূপ চালু করবে রায়হান।'

'তাতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বড়জোর দু'এক মিনিট।'

তিন মিনিট পার করে দিল রায়হান। দ্বিতীয় ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কে রেখেছে হাইজ্যাক করা রেকর্ডেড ডিজিটাল ভিডিয়ো ফুটেজ। ব্যবহার করেছে সুপার প্রফেশনাল ভিডিয়ো-এডিটিং সফটওয়্যার। তৈরি হয়েছে মাস্ক। প্রতিটি ফ্রেমের ওপরের কোণ থেকে মুছে ফেলেছে টাইম কোড। পরে দু'মিনিটের লূপ ভিডিয়োর সঙ্গে জুড়ে দেবে ঠিক সময়ে, বারবার একই দৃশ্য দেখবে সিকিউরিটি স্টেশনে গার্ডরা।

'হ্যাঁ, তৈরি,' আরও কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রায়হান। চালু করেছে অন্য প্রোগ্রাম। তার মাধ্যমে দেখানো হবে বেশ কয়েকটা সিকিউরিটি ক্যামেরার দৃশ্য। আর্কাইভের ভেতর কিছুই নড়ছে না, সময় পেরোচ্ছে। ঘরের প্রতিটি ক্যামেরার দৃশ্য একইরকম স্থির বলেই ধারণ করা হয়েছে ভিডিয়ো। কিন্তু স্ক্রিনে সত্যিকারের ঘড়ির বদলে গার্ডরা দেখবে নকল সময়। রানা বুথ ছেড়ে অন্য কাজে গেলে, নকল ছায়াছবি চলবে গার্ডদের মনিটরে। 'মাসুদ ভাই, পযিশনে রেডি হোন। কাউণ্টডাউন শুরু হবে। আপনাকে নির্দেশনা দেবেন পরিচালক মিস্টার আতাসি।'

রিডিং এরিয়ার ক্যামেরার দিকে না চেয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে

গেল রানা। 'আমাদের বস্ রেডি,' রায়হানকে জানাল আতাসি।

'দেখা যাক গার্ডরা কী করে,' অন্য ল্যাপটপে ভিডিয়ো ফিড এ চোখ রবির। 'দু'জনই স্টেশনে।'

'ওকে, বস্,' বলল আতাসি, 'থ্রি... টু... ওয়ান... ব্যস!'

এন্টার কি টিপল রায়হান।

একবার কেঁপে উঠল লাইভ ফুটেজ, পরক্ষণে সিকিউরিটি ক্যামেরার বর্তমান ছবির বদলে মনিটরে হাজির হলো রেকর্ড করা ছায়াছবি। চট্ করে প্রতিটি স্ক্রিন দেখল রায়হান। 'টাইম কোড ঠিক আছে।'

গার্ডদের বিষয়ে দুশ্চিন্তা করছে আতাসি। লোকগুলো মনিটরে অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই সর্বনাশ! না, কোনও গোলমাল দেখা গেল না। আগের মতই সিটে বসে আছে দু'গার্ড। একজন খেলছে তার ডিএস। অন্যজন উদাস হয়ে দেখছে দূরের দেয়াল। 'বস্, কাজ হয়েছে! এবার রওনা হয়ে যান!'

ডেস্কে ব্রিফকেস রেখে, ওটা খুলে প্লাস্টিকের চৌকো বাক্স থেকে র‍্যাপিড প্রোটোটাইপার বের করল রানা। জিনিসটার সঙ্গে ইলাস্টিক ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে নিল স্বচ্ছ তরলের কন্টেইনার। কাজটা শেষ করে ডেস্কের নিচে রাখল ব্রিফকেস। প্লাস্টিকের বক্স ও কন্টেইনার তুলে নিয়ে থামল স্যাবোটাজ করা লকারের সামনে। আস্তে করে খুলতে চাইল তালা। ওটার প্লেটের পাশে বাড়ি খেয়ে খুট-খাট শব্দ তুলল বোল্ট।

'চিচিং ফাঁক,' ফিসফিস করল রানা। আগের চেয়ে জোরে লকারের হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিল। তালা না খুললে...

গুঁজে রাখা কার্ডবোর্ড নড়ে গেল। খটাং আওয়াজ তুলে সরল বোল্ট। আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। খুলে গেছে লক। কিন্তু গার্ডরা আওয়াজ পেয়ে থাকলে...

'আতাসি! গার্ডরা কী করছে?'

এল আতাসির জবাব, 'বসে আছে চুপচাপ।'

সন্তুষ্ট হয়ে লকারের ডালা খুলল রানা। দেখা গেল গ্যাঁট মেরে বসে আছে আরেকটা বক্স ফাইল। ওটা খুলল, ভেতর থেকে নিল ইলাস্টিক স্ট্র্যাপসহ শক্তিশালী, ছোট একটি লেড ফ্ল্যাশলাইট। এ ছাড়া রয়েছে এক সেট স্ক্রু-ড্রাইভার, কবজির জন্যে দুটো স্ট্র্যাপ, সাকশন কাপ ও হিট গান— শেষের জিনিস আছে রায়হানের রোভের ইকুইপমেন্ট বে-তেও। আরও আছে ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের বোতল। সবই মেঝেতে রাখল রানা। এবার খুলতে লাগল গায়ের পোশাক।

'মাসুদ ভাই কি উলঙ্গ হবেন?' আনমনে বলল রায়হান।

'একটু বড় হয়ে গেছি, তোমার মত নেই,' বলল রানা।

কমপিউটারের ডিসপ্লেতে ক্যামেরার লাইভ পিকচার দেখছে আতাসি, রবি ও রায়হান। গার্ডরা দেখছে নকল দৃশ্য।

প্যান্ট, কোট ও শার্ট মেঝেতে ফেলল রানা। এখন ওর পরনে স্কিনটাইট পলিআরথিন বডিসুট। প্রতিযোগিতার সময় আগে ওই জিনিস ব্যবহার করত সাঁতারুরা, কিন্তু পানিতে পিছলে এগোয় বলে ওটাকে পেশাদার প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ।

লকারে পোশাক গুঁজে রাখল রানা। সাবধানে ডালা বন্ধ করে কবজিতে স্ট্র্যাপ পরে নিল। ওটার সঙ্গে ঝুলিয়ে নিল হিট গান, স্ক্রু-ড্রাইভার ও সাকশন কাপ। মাথার স্ট্র্যাপে ফ্ল্যাশলাইট। লকারের ছাতে রাখল সিলিকন কন্টেইনার ও প্লাস্টিকের বোতল।

এবারের কাজ কঠিন। লাফিয়ে লকারের কিনারা ধরে উঠতে হবে ছাতে। পরনে বুটের বদলে রয়েছে আঁটসাঁট, কালো ক্লাইমিং শ্যু। আশা করল, ঠিকমত আঁকড়ে ধরবে রাবারের সোল।

সাধ্যমত কম শব্দ তৈরি করে লকারের ছাতে উঠল রানা।

ধুলো ভরা লকারের মাথা থেকে মাত্র এক ফুট ওপরে সিলিং।

লিপির কাছ থেকে শুনেছে, একটু দূরেই ভেন্টিলেশন গ্রিল। ওর সব মালসামান সামনে নিয়ে গোবর ঠেলা গুবরে পোকার মত এগোল রানা।

পরের মিনিটে ব্যস্ত হয়ে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুলতে লাগল ভেন্ট কাভারের একপাশ। কাজটা শেষ হতেই কাভারের অন্য পাশের স্ক্রু ঢিলা করল। পুরো খুলল না। কবজার মত কাজ করছে স্ক্রু। কাত করে লকারের ছাতে নামাল কাভার। তৈরি হয়েছে খাটো র‍্যাম্প। প্লাস্টিকের কেসের স্ট্র্যাপ আটকে নিল নিজের বেল্টে। ছোট্ট প্লাস্টিকের বোতলে চাপ দিয়ে ভেতরের তরল ফেলল বডিসুটের বুক-পেটে ও উরুর ওপর। জিনিসটা খুব পিচ্ছিল। সেক্স শপ থেকে কিনতে হয়েছে ওটা। কালো অন্ধকার ডাক্টে চোখ বোলাল রানা, মনে হলো না ওকে খুব আনন্দ দেবে সেক্স লুব্রিক্যান্ট।

'এবার ঢুকে পড়ছি,' দু'হাতে দুই সাকশন কাপ তুলে নিয়ে বলল রানা। 'গার্ডরা এদিকে এলে আগেই জানিয়ে দিয়ো।'

'অবশ্যই, বস,' বলল আতাসি। 'গুড লাক!'

'তোমরাও ভাল থেকো।' ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ধাতব ডাক্টের একটু ভেতরে সাকশন কাপ বসাল রানা। নিজেও ঢুকে পড়ল সমান্তরাল চৌকো পাইপে।

যা ভেবেছে, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ভেতরে। রানার অ্যাপার্টমেন্টে খাটো ডাক্ট ছিল পরিষ্কার, কিন্তু এখানে চট-চটে কী দিয়ে যেন ছাত, মেঝে ও দেয়াল মাখিয়ে রেখেছে কোথাকার কোন্ পাপিষ্ঠ। গিরগিটির মত বুকে ভর করে চলতেই ওর পেছনে মৃদু ঘট-ঘট শব্দ তুলে পিছু নিল প্লাস্টিকের কেস ও কন্টেইনার।

পাতলা বডিসুট পরেও সুবিধা হচ্ছে না, অন্ধকার এই ডাক্টে খুব বদ্ধ অবস্থা। মাথা সামনে তাক করে শাফটের দূরে আলো ফেলল রানা। অন্তত পঞ্চাশ ফুট গেলে পৌঁছুতে পারবে ভল্টে—

আর ওখানে অপেক্ষা করছে প্রথম বাধা।

কড়-কড় শব্দ তুলল আতাসির কণ্ঠ। ধাতব ডাক্টের জন্যে খুব খারাপ রেডিয়ো রিসেপশন। 'আপনি ঠিক আছেন তো, বস?'

'হুঁ।' গরম সিন্থেটিক সুটের কারণে বেশি ঘামছে রানা।

'ঠিক আছে, বস, গার্ডরা এখনও ডেস্কে।'

'আচ্ছা।' রুটিনের মত নিয়ম মেনে এগিয়ে চলেছে রানা। খুলে নিচ্ছে সাকশন কাপ, আবারও রাখছে ছয় ইঞ্চি সামনে, তৈরি করছে ভ্যাকিউম, নিজেকে টেনে নিচ্ছে, আবারও শুরু হচ্ছে নতুন করে একই কাজ। সঙ্গে ভারী ওজনের জিনিস আছে বলে চট্ করে হয়ে উঠছে ক্লান্ত। ওর বডিসুট এঁটে বসেছে ডাক্টের চার দিকে, উপায় নেই বাতাস চলার। গুমোট ডাক্ট। আটকে আসছে শ্বাস। তার চেয়েও খারাপ লাগছে গরমের অত্যাচারে।

চলায় মন দিল রানা। মগজ থেকে মুছে ফেলতে চাইছে, চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে স্টিলের ডাক্ট। প্রতিবারে এগোচ্ছে ছয় ইঞ্চি করে।

চোখ বোলাল সামনে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দূরে কী যেন!

কুঁচকে গেল ওর ভুরু, চোখ পিটপিট করে পাপড়ি থেকে ঝরাতে চাইল ঘামের ফোঁটা।

পঁয়ত্রিশ ফুট দূরে ওই যে সামনে ডাক্টের প্রথম বাধা! কারও এগিয়ে যাওয়া ঠেকাবে ধাতব প্লেট। সরাতে হলে ব্যবহার করতে হবে কাটার।

আরও ছয় ইঞ্চি এগোল রানা, তারপর আরও ছয় ইঞ্চি। ব্যথায় টনটন করছে কাঁধ। সহ্য করতে হবে। চাইলেও ইচ্ছেমত চলতে পারবে না সরু ডাক্টে। বডিসুটের ভেতর দরদর করে ঘামছে। ভীষণ চুলকে উঠছে পিঠ-কোমর।

আবার এগোও।

আবারও।

একফুট যেতেই ওর ওজনের কারণে ধাতব ক্লং শব্দ তুলল ডাক্ট। বদ্ধ জায়গায় বেশ জোরালো আওয়াজ। বরফের মূর্তি হয়ে গেল রানা।

'বস্! ওই আওয়াজ কীসের!' চমকে গেছে আতাসি।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'সিট ছাড়ল গার্ডরা?'

'হ্যাঁ, একজন!'

'মিস্টার রানা?' গলা উঁচু করে ডাকল গার্ড জ্যাকসন। ওর মনে হয়েছে পড়ে গেছে ভারী কিছু। মনিটরের দিকে তাকাল। বুঝে বসে আছে রানা। বোধহয় শুনতে পায়নি কিছু। আওয়াজটা সে করেনি। তা হলে ওটা কী?

'হয়তো খুলে গেছে কোনও লকার,' বলল প্রাক্তন পুলিশ অফিসার হেনি। 'আগেও এমন হয়েছে।'

'যাই, দেখে আসি।' রওনা হয়ে গেল যুবক গার্ড।

ল্যাপটপে প্রতিটি ক্যামেরার ফিড থেকে গার্ডকে পরিষ্কার দেখছে রায়হান।

'বস্!' চাপা স্বরে বলল আতাসি। 'সে আসছে! আর্কাইভের দরজা খুলে ঢুকে পড়লে...'

বড় একটা ঢেউ বাড়ি দিতেই হঠাৎ হোঁচট খেল ওদের বোট। খোলা পোর্টহোল দিয়ে এল উজ্জ্বল সাদা আলো।

'অ্যাই! অ্যাই, বোট!' বাইরে থেকে এল অ্যামপ্লিফায়েড কণ্ঠ। 'আমরা এনওয়াইপিডি হার্বার ইউনিট! উঠে আসছি তোমাদের ডেকে!'

বারো

ডাক্টের নিচে আবছাভাবে খট-খট শব্দ পেল রানা। হেঁটে আসছে গার্ড।

পৌঁছে গেছে অনেক কাছে।

আতাসির আবার কী হলো? হঠাৎ থামিয়ে দিয়েছে কথা। 'আতাসি?' ফিসফিস করে ডাকল রানা। 'শুনছ? আতাসি?'

কাছে পৌঁছে গেছে এনওয়াইপিডি বোট, ঝিলিক দেয়া আলো পড়ছে রায়হানদের ধূসর বোটের ওপর। 'আবারও বলছি,' বুলহর্ন ব্যবহার করে ধমকে উঠল এক জলপুলিশ। 'আমরা পুলিশ! ওপরের ডেকে উঠে এসো তোমরা!'

একবার আতাসি আরেকবার রায়হানকে দেখল রবি। 'এরা বোটে উঠে এলে...'

'উঠতে বাধা দেয়া ঠিক হবে না,' বলল আতাসি।

'আমিও তাই বলি,' সায় দিল রায়হান। 'আপাতত কিছুই করতে পারব না।' দেখিয়ে দিল, স্পুল থেকে বেরোচ্ছে ফাইবার-অপটিক লাইন। 'আমাদের লাইনের ওপর চেপে বসেছে ওদের বোট! এখন সুতো ছিঁড়লে সঙ্গে সঙ্গে ভল্ট বা আর্কাইভের সব ক্যামেরা সত্যিকারের দৃশ্য দেখাবে!' ড্রাম ঘুরিয়ে আরও লাইন ছাড়ল ও। ফাইবার-অপটিক লাইন খুব শক্ত ও টেকসই— তবুও

জিনিসটা কাঁচের তৈরি, বেশি চাপ পড়লে মট্ করে ছিঁড়বে। 'আপনারা ওদেরকে ব্যস্ত রাখুন, আমি স্পুল থেকে আরও সুতো ছাড়ছি!'

একবার পরস্পরকে দেখে নিয়ে হ্যাচ বেয়ে ওপরের ডেকে উঠল আতাসি ও রবি, হেডসেট রেখে এসেছে। ওদের মুখে স্থির হলো উজ্জ্বল সাদা আলো। তবুও ওরা দেখল, বোটের পাশে ভিড়েছে নীল-সাদা রঙের বড় একটা বোট।

আতাসির আড়াল থেকে বেরিয়ে নরম সুরে জানতে চাইল রবি, 'কী সমস্যা, বলুন তো?' হ্যাচের নিচে দেখল, প্রাণপণে স্পুল থেকে ফাইবার-অপটিক সুতো ছাড়ছে রায়হান।

ধমকের সুরে বলল এক পুলিশ, 'ইস্ট রিভারের মাঝে নোঙর করেছেন, আবার বোঝেন না কী সমস্যা?' অপেক্ষাকৃত ছোট বোটে নামতে তৈরি সে এবং আরেক পুলিশ অফিসার। বাঙালি রবি আর লেবানিজ আতাসির চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে আলো মেরে। 'ও, বোধহয় ঠিকই ধরেছি! আপনারা আমেরিকান নন!'

খুব কাছে পদশব্দ। নিজেকে পাথরের ভারী টুকরো ভাবতে চাইছে রানা। কোনও নড়াচড়া নেই। এমন কী আটকে ফেলেছে শ্বাস।

খট-খট-খট.... খট-খট...

থেমে গেছে গার্ড। এখন রানার ঠিক নিচেই আছে সে।

আতাসিদের বোটে লাফিয়ে নামল প্রথম পুলিশ অফিসার। দুলছে মাঝারি জলযান। চোখে ভীষণ সন্দেহ নিয়ে আতাসি ও রবিকে দেখল লোকটা। একবার তাকাল কালো ক্রিস্টালের মত সেক্রেটারিয়েট দালানের দিকে। একটা কথাও বলছে না। অবশ্য বোঝা যাচ্ছে, কী ভাবছে। এদের একজন আরব... একটু দূরেই স্কাইস্ক্র্যাপার... টেরোরিস্ট... হোলস্টারের কাছে পৌঁছে গেল

পুলিশ অফিসারের হাত। 'আপনারা এখানে কেন, সেজন্যে যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে, নইলে ধরে নিয়ে জেলে ভরে দেব!'

কোমরে হাত রেখে চারপাশ দেখছে ল্যারি জ্যাকসন। যত দূর দেখা যায়, খোলা নেই কোনও লকার। হয়তো ভেন্টিলেশন সিস্টেমের কারণেই হয়েছিল ওই দমকা হাওয়ার শব্দ। অথবা ওপরের তলায় সরানো হয়েছে ভারী কিছু।

নিজের স্টেশনে ফিরবে ঠিক করল জ্যাকসন, কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, যখন উঠেই এসেছি, চক্কর কেটে দেখে যাই আর্কাইভ।

রিডিং এরিয়ার দিকে পা বাড়াল গার্ড।

'একমিনিট, আমি উঠে আসছি!' নিচ থেকে এল রায়হানের কণ্ঠ। হ্যাচ গলে ডেকে উঠল হ্যাকার। কঠোর চোখে দেখল পুলিশ অফিসারকে। 'কী হয়েছে? আপনাদের সমস্যাটা কী? আরেকটু হলে তো সব গোলমাল করে ফেলতেন!'

প্রথম পুলিশের পেছনে থেমেছে আরেক পুলিশ অফিসার। নরম কণ্ঠে বলল সে, 'গোলমাল করে ফেলতাম মানে কী, স্যর? বলুন তো, এখানে কী করছেন আপনারা?'

'আমি রায়হান রশিদ,' বুক পকেট হাতড়ে কী যেন খুঁজতে লাগল বাঙালি হ্যাকার।

'খবরদার!' ধমকে উঠল প্রথম পুলিশ। হোলস্টার থেকে বের করেছে পিস্তল। 'হাত সাবধান!'

তিক্ত চেহারা করল রায়হান। 'আরে, কী শুরু করলেন! আমি তো শুধু আইডি বের করছি! কাজ করি ইউনাইটেড নেশন্সে।' বামহাতে বিশাল দালান দেখাল। ডানহাতে বের করল ইউএন আইডেন্টিটি কার্ড। 'ওশেনিক সার্ভে অর্গানাইযেশন। এরা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

‘এটা সাগর নয়,’ পিস্তল নেড়ে বলল প্রথম পুলিশ।

‘এটা টাইডাল ওঅটারওয়ে, কাজেই জরুরি কাজেই এখানে আছি আমরা।’

আইডি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে দ্বিতীয় পুলিশ। কার্ড ফেরত দিয়ে বলল, ‘ঠিক কী ধরনের কাজ করছেন আপনারা?’

‘পলিউশন সার্ভে। দেখতে হবে সাগরের আবর্জনা নদীর কতটা উজানে পৌঁছাচ্ছে। আরেকটু হলে আপনাদের কারণে নষ্ট হতো দেড় লাখ ডলারের ইকুইপমেণ্ট। আমাদের কণ্ট্রোল লাইন ছিঁড়ে দিতেন আপনারা!’

বোটের পাশে উঁকি দিল দ্বিতীয় পুলিশ।

‘কী ধরনের ইকুইপমেণ্ট?’

‘রোভ ব্যবহার করে জোগাড় করছি নদীতলের স্যাম্পল। সেজন্যে ব্যবহার করতে হচ্ছে ফাইবার-অপটিক লাইন। আপনারা বোট চাপিয়ে দিয়েছেন বলেই বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয়েছে প্রায় সব লাইন।’

‘কী কারণে এত রাতে এখানে কাজ করছেন?’ প্রথম পুলিশের সন্দেহ দূর হয়নি।

‘কারণ, আমাদেরকে পরীক্ষা করতে হবে জোয়ারের সময়। আর এ সময়েই আসে পূর্ণ জোয়ার।’

চোখ সরু করল অফিসার। ‘দিনেও তো পূর্ণ জোয়ার হয়।’

‘হ্যাঁ, হয়, কিন্তু তখন নদীতে চলে অনেক বেশি জলযান! আরেকটু হলে আপনাদের বোট আমাদের লাইনে চাপিয়ে দিয়ে বারোটা বাজাতেন সার্ভের! আপনারা কি আশা করেন দিনের বেলায় এত বড় ঝুঁকি নেব আমরা?’

একটু কুঁজো হয়ে হ্যাচ দিয়ে নিচের কেবিন দেখল দ্বিতীয় পুলিশ। হয়তো ভেবেছিল থাকে থাকে বিস্ফোরক, ব্যাগ ভরা ড্রাগ্‌স্ বা অস্ত্র দেখবে— কিন্তু বাস্তবে একটা টেবিলে বসে আছে

ল্যাপটপ কমপিউটার ও ইকুইপমেন্ট। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'আর কতক্ষণ এখানে থাকতে হবে আপনাদেরকে?'

'বলা মুশকিল। ঠিকঠাক পেতে হবে স্যাম্পল। তাতে লাগতে পারে পঞ্চাশ মিনিট থেকে একঘণ্টা।'

'ও।' দীর্ঘক্ষণ রায়হানের চোখে চেয়ে রইল দ্বিতীয় পুলিশ, তারপর ফিরল নিজের বোটে। তার হাতের ইশারায় নিজেদের বোটে উঠল প্রথম পুলিশ। 'বেশ, ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরছি আমরা। তার আগেই শেষ করবেন নিজেদের কাজ।'

'আরও দেরি করতে চাইলে স্রেফ ধরে জেলে ভরে দেব,' অশুভ সুরে বলল প্রথম পুলিশ। সড়াৎ করে হোলস্টারে রেখে দিল পিস্তল। বগ-বগ আওয়াজ তুলে বুদ্বুদ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল পুলিশের ডিজেল বোট। চলেছে ভাটির দিকে।

মাত্র বিশ সেকেণ্ডে আবারও কেবিনে নামল ওরা তিনজন। হেডসেট পরে নিয়ে ডাকল আতাসি, 'বস্!'

রানা পরিষ্কার শুনছে, বুথের দিকে চলেছে গার্ড। ওখানে ওর বুথে একবার উঁকি দিলেই...

কানে গুঞ্জন শুনল রানা। 'বস্? আপনি কই?'

'কী হয়েছে, আতাসি?' ফিসফিস করল রানা।

'পুলিশের বোট। গেছে, কিন্তু পৌনে এক ঘণ্টা পর আবারও আসবে।'

'পরের কথা পরে ভাবব। বলো তো, গার্ডরা কোথায় আর কী করছে?'

রিডিং এরিয়ায় পৌঁছে গেছে যুবক গার্ড ল্যারি জ্যাকসন। কয়েক সেকেণ্ড পর রানার বুথে উঁকি দিয়ে হতবাক হলো। ডেস্কের ওপর পড়ে আছে কাগজপত্র ও ফাইল, কিন্তু নিজে উধাও হয়েছে মাসুদ

রানা।

'মিস্টার রানা?'

জবাব নেই।

পুরো করিডোর ঘুরে দেখল জ্যাকসন।

কেউ নেই!

ভুরু কুঁচকে গেল তার। আবারও ফিরল সিকিউরিটি ডেস্কে। 'কোথায় গেল লোকটা?'

ডিএস থেকে মুখ তুলে তাকাল বয়স্ক গার্ড। 'কী বললে?'

'মাসুদ রানা। সে কোথায় গেল?'

'ওই তো, রিডিং এরিয়ায়। দেখছ না?' মনিটর দেখাল গার্ড হেনি।

স্ক্রিনে চোখ রেখে অবাক হলো জ্যাকসন। 'তাই তো, তবে চক্কর কাটার সময় তাঁকে দেখিনি।' নিজ সিটে বসে পড়ল সে। বুঝেছে, বিরক্তিকর কাজ, তাই পায়চারি করতে গিয়েছিল মাসুদ রানা।

জীবনের বড় একটা অংশ দান করে দিতেও আপত্তি করবে না রানা, যদি বদলে পায় পা সোজা করার সামান্য সুযোগ। এখন আর শুনছে না পদশব্দ। কিন্তু এত সাহস নেই যে নড়বে। আগে জানতে হবে এগোতে পারবে কি না। 'আতাসি? কী হয়েছে?'

'আবারও ডেস্কে গিয়ে বসেছে,' বলল লেবানিজ।

'বেশ।' সাবধানে আবারও সামনে বাড়ল রানা। শরীর টেনে নেয়ার সময় খুব মৃদু থুপ-থুপ শব্দ হচ্ছে। তা এত জোরালো নয় যে শুনবে কেউ। আবারও সাকশন কাপ ধরে এগিয়ে চলেছে ও। গতি এখন আগের চেয়ে বেশি।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে যাচ্ছে গন্তব্যের দিকে। টপটপ করে ঘাম ঝরছে ধাতব মেঝেতে। যেতে হবে আরও কমপক্ষে দশ ফুট।

এখন পরিষ্কার দেখছে কোথায় বাধা।

আর ছয় ফুট দূরে।

পাঁচ...

চার...

তিন...

দুই...

আর এক ফুট গেলেই...

ধাতব প্লেটে থপ্ করে আটকে গেল সাকশন কাপ।

যাক, বাঁচা গেছে, ভাবল রানা। মরা কাঠের মত শুকিয়ে গেছে জিভ-গলা। কবজির পাশ থেকে খুলে নিল কাটার। 'ঠিক আছে, প্লেট কাটতে শুরু করলাম।'

'ওটা কতটা পুরু, বস্?'

'এক মিলিমিটার হবে। দুটো। একেকটা দৈর্ঘ্যে আট ইঞ্চি।'

'তা হলে, বস্, একেক প্লেট কাটতে লাগবে মোটামুটি চার থেকে পাঁচ মিনিট।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। জলপুলিশ কতক্ষণ পর ফিরবে?'

'আন্দাজ তিরিশ মিনিট পর, বস।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। জ্যাক রিচি আগেই বলে দিয়েছে, র‍্যাপিড প্রোটোটাইপার সময় নেবে আট মিনিট। তার মানে, ডাক্ট পেরিয়ে ভল্টে ঢুকে সব কাজ শেষ করে বেরোতে চাইলে হাতে থাকবে খুব কম সময়।

কিছু করার নেই।

'ঠিক আছে, কাটার চালু করছি।' মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে লাল টকটকে হয়ে উঠল ব্যাটারি চালিত যন্ত্রের ডগা।

সমান্তরাল, ছোট্ট কোনও কূপের মত জায়গায় অস্বাভাবিক দ্রুত বাড়ছে তাপ, যেন ঝলসে দেবে ওর মুখ-হাত। এই কাটার তৈরি পানির নিচে ব্যবহারের জন্যে, সে সময় তাপ এমনিতেই

কম থাকে। কিন্তু ডাক্টের ভেতর কোথাও সরবে না গরম হাওয়া।

ডাক্টের ছাতে ঝালাই করে আটকে দিয়েছে লোহার পাত, ওখান থেকেই কাজ ধরেছে রানা। নরম হয়ে উঠছে ধাতু। কাটতে হচ্ছে খুব সাবধানে। খোঁচা দেয়ার মত অংশ রয়ে গেলে জায়গাটা পেরোবার সময় মারাত্মক জখম হবে ও।

কাটারের কাজটা খুব ধীর। এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার করে কাটা পড়ছে পাত, ফাঁক তৈরি হচ্ছে ছাত থেকে। একমিনিট পর অর্ধেক জায়গা কাটতে পারল। আতাসির আন্দাজ ঠিকই আছে। চুপচাপ কাজে ব্যস্ত থাকল রানা।

বেশ কিছু দিন ধরেই প্রাক্তন পুলিশ হেনির ইলেকট্রনিক সময় নষ্ট করার জিনিসটা দেখে মনে মনে খুব হিংসে হচ্ছে জ্যাকসনের। আসলে ওরও উচিত কোনও খেলায় মনোযোগ দেয়া। তা হলে আর এত বিরক্তি লাগবে না। আবারও মনিটর দেখল সে। ফাঁকা পড়ে আছে আর্কাইভের সরু সব পথ। চোখ রাখলে একটু পর মনে হয়, ওটা স্থির ছবি। কিন্তু স্ক্রিনের ওপরে টাইম কোড জানিয়ে চলেছে, লাইভ দৃশ্য দেখছে ওরা। মানুষের চিহ্ন বলতে ওই রিডিং এরিয়ায় মাসুদ রানা। ডক্টর আলমের যে কাজই হোক, মনোযোগ দিয়ে করছে সে। ঝুঁকে পড়ে বুঁদ হয়ে আছে কাগজের ওপর, আবারও সিটে বসার পর বলতে গেলে নড়েইনি।

আরেক চক্কর কেটে আসবে কি না, ভাবল ল্যারি জ্যাকসন। কিন্তু মন থেকে সায় এল না। এখনও ডিউটি দিতে হবে আরও তিন ঘণ্টা। কাজেই পরে ওদিক থেকে ঘুরে এলেও চলবে। ঠিক করল, বিশ মিনিট পর আরেকবার ঢুঁ দেবে আর্কাইভে।

আরও একমিনিট পর ছাত থেকে খসল ধাতব পাতের ওপরের অংশ। এবার নিচে মনোযোগ দিল রানা। আরও সতর্ক হতে হবে

কে। ভুল করে ডাক্টের মেঝে কাটলে গলন্ত ধাতু আগুন ধরিয়ে দেবে ঝুলন্ত ছাতে।

নিখুঁতভাবে কাজ সারতে গিয়ে ধীর হয়ে গেল রানা। আরও তিন মিনিট পর খুলে গেল পাত। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে গরম জিনিসটা ধরে আস্তে করে রেখে দিল এক পাশে। মুখ বিকৃত করে বিড়বিড় করল, 'উফ্-ওফ্, বাপ্স্!' ফুঁ দিয়ে চলেছে আঙুলে। একটু পর পরীক্ষা করে দেখল ডাক্ট। এখানে ওখানে তীক্ষ্ণ দু'একটা অংশ মনে হলো একটু বিপজ্জনক। কিন্তু ওসব পেরোতে গিয়ে মারাত্মক আহত হবে না।

এবার পাশের পাত নিয়ে ব্যস্ত হলো রানা। এরই ভেতর পূর্ণ তাপ পেয়েছে কাটার, ধাতু গলাতে গিয়ে সময় কম লাগল। ওর মনে হলো রয়েছে আভেনের ভেতর। দ্বিতীয় পাতও নামিয়ে রেখে হাতঘড়ি দেখল। এই বাধা পেরোতে গিয়ে লেগেছে পুরো দশ মিনিট। ভেন্টে পৌঁছুনো এখনও বাকি।

কাটারের সুইচ অফ করে দিল রানা। 'আমি ভেন্টে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, বস্,' আগের চেয়ে উত্তেজিত আতাসি। 'আর বিশ মিনিটও নেই, তার আগেই হাজির হবে পুলিশ। আমাদেরকে যদি বাধ্য করে সরে যেতে, কাটা পড়বে ক্যামেরার ফিড। তার আগেই আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে, বস্!'

'সহজ, তাই না?' বাহুর স্ট্র্যাপে কাটার রাখল রানা। এমনভাবে রেখেছে, গরম ডগা যেন না লাগে ত্বকে। আবার তুলে নিল সাকশন কাপ। নতুন উদ্যমে এগোল। প্রতিবারে যাচ্ছে ছয় ইঞ্চি করে। ডাক্টের কাটা অংশ পেরোতে গিয়ে টের পেল, ওর বডিসুটে লাগছে ধাতুর এবড়োখেবড়ো তপ্ত অংশ। তখনই কী যেন ভীষণ কামড় বসাল দেহে। 'ওফ্!'

'কী হলো, বস?'

'গরম লোহা মাংস চিরে দিয়েছে।' এগোবার সময় খেয়াল

রাখছে ওপরে তুলতে হবে দেহ। এবার নিচ থেকে কামড় দিল না কিছু। 'কপাল ভাল, বডিসুটের ওপর দিয়ে গেছে মূল বিপদ।'

আতাসি, রায়হান ও রবি এতই উদ্বিগ্ন যে চুপ হয়ে গেছে।

পরের কয়েক সেকেণ্ডে ভল্টের কাছে পৌঁছল রানা। সামনে ডাক্টের মাঝে ভেণ্টিলেশন ফ্যান, শোঁ-শোঁ শব্দে ভল্টে বাতাস পাঠাচ্ছে। 'বেশ, পৌঁছে গেছি ফ্যানের কাছে। এবার দেখি...'

মাথা কাত করে মেশিনারির ওপর আলো ফেলল রানা। যা দেখল, ভাল লাগল না ওর। 'গ্রিলটা ধরে রেখেছে স্ক্রু, ঢুকে গেছে ফ্যানের ফ্রেমের ভেতর। চট্ করে খোলা সম্ভব নয়, কাটতে হবে স্ট্রাট।' আবারও কবজি ও বাহুর স্ট্র্যাপ থেকে কাটার নিল রানা। ডাক্টের ছাতের স্ট্রাট ওপর থেকে ধরে আছে ফ্যানের ফ্রেম। ওপরের স্ট্রাট কাটলে হয়তো ঠেলে সরাতে পারবে গোটা ইউনিট। সেক্ষেত্রে খুলবে পথ, পৌঁছুতে পারবে ভেন্টের মুখে।

দেরি না করে ফ্যানের একটা স্ট্রাট কাটল রানা। তাতে একটু ঝুলে গেল ফ্রেম। এবার উল্টো দিকের স্ট্রাট কাটতেই মৃদু হোঁচট খেল গোটা ফ্যান ফ্রেম— কপাল ভাল, ডাক্টের গ্রিলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও থামল দু'ইঞ্চি আগে। দেখতে যেমন, তার চেয়ে অনেক ভারী ফ্যানের সিস্টেম। কয়েকটা ফ্যানের জন্যে আছে পুরু কেইবল, গিয়ে ঢুকেছে ডাক্টের ওপরের এক গর্তে। রানা ঠিক করে নিল এরপর কী করবে। তৃতীয় স্ট্রাট কেটেই ঝট করে ধরবে কেইবল। ওটা কাজ করবে নোঙরের মত, নইলে ভেন্ট ভেঙে হুড়মুড় করে ফ্যানের ভারী ফ্রেম গিয়ে পড়বে ভল্টের মেঝেতে।

তৃতীয় স্ট্রাট কাটতেই ওজন সামলাতে না পেরে ভাঙল ছাতের শেষ স্ট্রাট, ভল্টের মেঝের দিকে রওনা হয়ে চলল ফ্যান সিস্টেম ও গ্রিল। ওই একই সময়ে বামহাত ঝট্ করে সামনে বাড়িয়ে পুরু কেইবল ধরতে চাইল রানা। ওজন বেশি, কেইবল ধরে রাখতে গিয়ে ঠং করে কনুই লাগল ডাক্টের বাইরের অংশে।

ঘামে ভেজা হাতে সরসর করে বেরিয়ে গেল কেইবল। কাটার রেখে দু'হাতে কেইবল আঁকড়ে ধরল রানা।

ধাক্কা খেয়ে কিনারা থেকে পড়ল সাকশন কাপ। মেঝেতে পড়লেই বেজে উঠল অ্যালার্ম...

থ্যাপ্ করে একটা আওয়াজ শুনল রানা।

ওই মৃদু শব্দের পর কান ফাটিয়ে বাজল না অ্যালার্ম। বদলে নিচ থেকে এল ফ্যাট-ফ্যাট শব্দ। যেন উড়াল দেয়ার আগে ডানা ঝাপটে নিচ্ছে কবুতর। কনুইয়ের ব্যথায় অস্থির লাগছে রানার। একটু সামনে বেড়ে নিচে উঁকি দিল। মেঝে থেকে এক ইঞ্চি ওপরে ঝুলছে ফ্যানের সিস্টেম। একটা ফ্যানে আটকে গেছে সাকশন কাপ, বিশ্রী আওয়াজ তুলছে পাখার বাড়ি খেয়ে।

'পাতলা হাগু হচ্ছে নাকি, বস্? আওয়াজটা কীসের?' জানতে চাইল আতাসি।

'আমার ফ্যান ক্লাব,' চাপা স্বরে বলল রানা। টেনে তুলতে লাগল কেইবল। 'বাইরে গার্ডরা আওয়াজ পায়নি তো?'

'মনে তো হয় না।'

ভল্টের পুরু দেয়াল ঠেকিয়ে দিয়েছে শব্দ।

মেঝে থেকে দু'ফুট ওপরে ফ্যান র‍্যাক তুলে কেইবল ভাঁজ করে প্রজাপতি গিঁঠ মারল রানা। এখন আর নিচে গিয়ে পড়বে না কিছু। 'হাতে কত সময়, আতাসি?'

'তেরো মিনিট, বস্। কিন্তু তার আগেই আসতে পারে ওরা।'

'নেমে পড়ছি ভল্টে।' কেইবল সরিয়ে ডাক্ট থেকে বেরোতে লাগল রানা। বুক বেরোতেই হাতের জোরে নিজেকে টেনে তুলল ডাক্টের বাড়তি অংশের ওপর। বেল্টের স্ট্র্যাপ ধরে টেনে আনল ওর কার্গো। বেল্ট থেকে খুলে ফ্যানের কেইবলের সঙ্গে বেঁধে দিল স্ট্র্যাপ। এবার সাবধানে পা নামাল ভল্টের মেঝের দিকে।

ওর গিঁঠ দেয়া কেইবলের কারণে একটু দুলছে ফ্যানগুলো।

ওদিকে সাকশন কাপ থেকে আসছে ফ্যাট-ফ্যাট শব্দ। দু'ফুট দূরে সিকিউরিটি টার্মিনালের পেডেস্টাল ডেস্ক। সাবধানে ওটার ওপর নামল রানা।

পৌঁছে গেছে ভল্টের ভেতর!

ঝুঁকে তুলে নিল ফ্যানের ভেতর থেকে সাকশন কাপ। বুঝতে দেরি হলো না, সর্বনাশ হয়ে গেছে ওর প্ল্যানের।

ফ্যানের পাখা ফাটিয়ে দিয়েছে সিন্থেটিক রাবার। ডেস্কের ওপর চেপে ধরে ভ্যাকিউম তৈরি করতে চাইল রানা, লাভ হলো না। ভুস্ করে ফাটল দিয়ে বেরোল বাতাস। ভ্যাকিউম তৈরি করবে না সাকশন কাপ।

তার মানে, বেরোতে পারবে না ডাক্টের ভেতর দিয়ে।

'যাহ্!' ফিসফিস করল রানা। হাতে সময় নেই, তার ওপর এখন খুঁজতে হবে অন্য কোনও পথ।

আগের কাজ আগে। ডেস্কে দাঁড়িয়ে স্ট্র্যাপ টেনে ডাক্ট থেকে বের করল প্লাস্টিকের কেস। ধুপ করে পড়ে যাওয়ার আগেই ধরল ওটা, নামিয়ে রেখে দ্বিতীয় স্ট্র্যাপ টানতেই এল কন্টেইনার। জিনিসটা ডেস্কে রেখে প্লাস্টিকের কেস খুলে নিল প্রোটোটাইপার, ট্যাঙ্কে ভরল প্লাস্টিক কন্টেইনারের আঠালো তরল। টাঙ্কি ভরতেই চালু করল মেশিন। প্রথমেই ওটা দেখাল সেলফ টেস্ট মোড, তারপর চালু হলো লেসার হেড। তাতে পেরোল পুরো তিরিশ সেকেণ্ড। এখন কাজ করতে তৈরি মেশিন।

স্লটে মেমোরি কার্ড রেখে স্টার্ট বাটন টিপল রানা।

ট্যাঙ্কে নড়ে উঠল দুটো আলোকরশ্মি। একটা আরেকটাকে কেটে দিচ্ছে। মেশিনের ভেতর খুব ধীরে নড়ছে লেসার হেড, তৈরি হচ্ছে ভুতুড়ে, অবাস্তব হাতের অস্পষ্ট এক ছাপ।

ওটা দ্বিমাত্রিক। প্রোটোটাইপারের লেসার সামনে-পেছনে গিয়ে এক স্তর এক স্তর করে তৈরি করছে হাতের ছাপ। পুরু হয়ে

উঠছে স্তর। একেকটার উচ্চতা হবে বড়জোর এক মিলিমিটার। রানা বুঝে গেল, হ্যাণ্ডপ্রিন্ট স্ক্যানারকে ফাঁকি দিতে হবে বলেই সঠিক ছাপ তৈরি করতে সময় লাগবে।

কিন্তু ওদিকে ফুরিয়ে আসছে সময়।

ভল্টের চারপাশ দেখল রানা। সবচেয়ে সহজে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় হচ্ছে মেঝেতে কিছু ফেলে দেয়া, তা হলেই শুরু হবে অ্যালার্মের কর্কশ হুঙ্কার। কী হয়েছে জানতে দরজা খুলবে গার্ডরা, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তাদেরকে ফাঁকি দিতে পারলেও, খুব কঠিন হবে এই দালান থেকে জান হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। ওর পরনে স্কিনটাইট বডিসুট, হাতে মস্তবড় এক সোনালি বই। গুলি করে ফেলে দেবে গার্ডরা ওকে।

তা হলে কী করা যায়?

সিলিঙের গর্ত আবারও দেখল রানা।

সাকশন কাপ নেই, কাজেই ওদিক দিয়ে বেরোতে পারবে না।

কিন্তু অন্য একটা কাজ করা যায়...

রবি ও রায়হান মনোযোগ দিয়ে দেখছে মনিটর, ওদিকে ওপরের ডেকে উঠে এসেছে আতাসি। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দেখল ইউএন দালান। মনে মনে প্রার্থনা করল, বস্ যাতে বেরিয়ে আসতে পারেন ওই দুর্গম দুর্গ থেকে। ভাটির দিকে তাকাল। রাতের এ সময়ে খুব কম জলযান চলছে নদীতে। অনেক দূরে থেকেও দেখা যাচ্ছে একটা দুটো থেমে থাকা ভেসেলের বাতি।

ক'সেকেণ্ড পর চিনে ফেলল উজ্জ্বল, বড় বাতিটা।

হার্বার ইউনিট বোট।

এখনও এক মাইল দূরে। গতি ধীর। কিন্তু আসছে উজান বেয়ে ওদের দিকেই। ব্যস্ত হয়ে নিচের কেবিনে নামল আতাসি।

'আবারও ঝামেলায় পড়ে গেলাম আমরা।'

'শুধু আমরা নই, মাসুদ ভাইও পড়তে যাচ্ছে বিপদে,' তর্জনী তাক করে ল্যাপটপ দেখিয়ে দিল রবি।

স্ক্রিনে তাকাল আতাসি।

এইমাত্র সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে যুবক গার্ড।

'যাই, আবারও এক পাক ঘুরে আসি,' বলল ল্যারি জ্যাকসন। 'বসে বসে দেখুন মিস্টার রানাকে।'

মাথা কাত করল প্রাক্তন পুলিশ অফিসার হেনি। 'মনিটরে চোখ রেখে লাভ নেই, কিছুই ঘটছে না। উনি প্রায় নড়েনই না।'

স্ক্রিনের দিকে তাকাল ল্যারি জ্যাকসন। এখনও ডেস্কে ব্যস্ত মাসুদ রানা। রিডিং রুমের দিকে ঘুরে গেল সে। আবার বদলে ফেলল মনোভাব। আগে ঘুরে দেখবে আর্কাইভের অন্যদিক। টহলের শেষ দিকে দেখা করে আসবে মাসুদ রানার সঙ্গে। তাতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

তেরো

প্রোটোটাইপারের ট্যাঙ্কের কাঁচা মাংসের মত জিনিসটা দেখলে কেমন গা ঘিনঘিন করে। ওটাই লাবনীর ডানহাতের তালু ও আঙুলের ছাপ। তর্জনীর গোড়ায় কাটা দাগ। হাড়হীন মাংস, যেন গভীর সাগরের অচেনা প্রাগৈতিহাসিক কোনও ভয়ঙ্কর জন্তুর।

তৈরি হয়েছে আঙুল, প্রতিটি গিঁঠ পরিষ্কার। বারবার কিরকির শব্দ তুলে ছাপের ওপর ঘুরছে লেসার। স্তরে স্তরে আরও পুরু হচ্ছে তালুর ভারী অংশ ও বুড়ো আঙুল। এরই ভেতর পেরিয়ে গেছে আট মিনিট, অথচ এখনও শেষ হলো না কাজ। একটু আগে আতাসি সতর্ক করেছে, টহল দিতে বেরিয়ে গেছে এক গার্ড। কিন্তু চিন্তা করেই বা কী করবে, কিছুই করার নেই রানার।

ক'সেকেণ্ড পর কিরকির বন্ধ করে থামল স্ক্যানার। তিনবার বিপ-বিপ আওয়াজ তুলল প্রোটোটাইপার। কাজ শেষ।

তিক্ত চেহারায় আলতো করে নরম জিনিসটা স্পর্শ করল রানা। লাবনীর নকল রাবারের হাত ঠিক মাংসের মত নয়, বেশ তপ্ত। তরলে ডিজিটাল থার্মোমিটার নামাল রানা। তাপমাত্রা এক শ' ডিগ্রি ফারেনহাইটেরও বেশি। তরল থেকে তাপযন্ত্র বের করল না। চোখ রেখেছে ডিসপ্লের ওপর। দশ ভাগের এক ভাগ কমল তাপ। তারপর আরও সামান্য।

খুব সাবধানে ট্যাঙ্কের তরল থেকে হাতের ছাপ তুলে নিল রানা। ওটা থেকে থকথকে তরল গড়িয়ে পড়ল ডেস্কে। বেশ আঠালো, সঙ্গে আনা কাপড় দিয়ে আঠা মুছে ফেলল ও। আবারও দেখল তাপমাত্রাঃ ৯৯.১ ডিগ্রি। তাপ প্রায় মানুষের দেহের সমান। কতটা ওপরে বা নিচে মানবদেহের তাপকে স্বাভাবিক ধরে নেবে হ্যাণ্ডপ্রিন্ট স্ক্যানার, ওর জানা নেই। কিন্তু আঁচ করল, এক ডিগ্রির দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে এদিক ওদিক হলেই আপত্তি তুলবে ওই মেশিন।

কমপিউটারে লাবনীর সিকিউরিটি কোড টাইপ করল রানা। ওয়ান, নাইন, সিক্স, ওয়ান, টু, ফাইভ, ফোর, যিরো, নাইন। প্যানেলে জ্বলে উঠল সবুজ বাতিঃ কোড অ্যাকসেপ্টেড। সিস্টেম এখন অপেক্ষা করছে বায়োমেট্রিকভাবে পরিচয় নিশ্চিত করতে।

ছাপের উষ্ণতা এখন আটানব্বুই দশমিক আট ডিগ্রি। প্রায়

স্বাভাবিক তাপ। প্যানেলে ছাপটা পেতে দিল রানা। নিচে দেখা গেল নড়ছে আলো। লকারের দিকে ঘুরে তাকাল। ওখানে হাতলে লাল লেড বাতির জায়গায় জ্বলে উঠবে সবুজ বাতি।

তা হলো না।

মনিটরে দেখা দিল মেসেজ।

গলা শুকিয়ে গেল রানার।

মনিটরে লেখা: আনএবেল টু কনফার্ম। প্লিয রিস্ক্যান।

ধরা পড়ে গেছে অনুপম মঙ্গেলকারের কৌশল!

এই মেশিন বুঝে গেছে প্যানেলে দেয়া হয়েছে নকল হাত!

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা, হাত নকল বলে ধরে নিলে অ্যালার্ম বাজাতে শুরু করত মেশিন। আসলে ওটার মেমোরিতে রাখা ছাপের সঙ্গে মিলছে না সিলিকন পাম প্রিন্ট।

তাপমাত্রা আটানব্বুই দশমিক চার। স্বাভাবিক দেহের তাপের চেয়ে কম। এবার ধীরে ধীরে আরও নামবে তাপ।

সমস্যাটা আসলে কী?

স্ক্যানার থেকে হাতের ছাপ তুলে নিল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল।

কোনও খুঁত চোখে পড়ছে না।

তা হলে...

বোঝা গেছে!

তর্জনী ও মধ্যমার মাঝের কাটা দাগে সিলিকনের মধ্যে চুলের মত সূক্ষ্ম ফাটল, ফলে ওই সামান্য কারণে কমপিউটার স্থির করেছে, আসল মানুষ হাত রাখেনি স্ক্যানারে।

আবারও স্ক্যানারে থলথলে ছাপ রাখল রানা, এবার ওপর থেকে টিপে এক করে রাখল কাটা জায়গাটা।

দেখা যাক এতে কাজ হয় কি না!

আবারও চালু হলো রশ্মি। ঘুরে লকারের হাতল দেখল রানা।

লাল বাতির ওপর জ্বলে উঠল সবুজ বাতি।

নিভে গেল লাল বাতি।

'ব্যস!' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল রানা।

'বস্, কাজ হলো?' জানতে চাইল আতাসি।

'হ্যাঁ, খুলে গেছে লকার। বাইরে কী অবস্থা?'

'এখনও আর্কাইভের আরেক মাথায় গার্ড, ঘুরে আসছে বুথের দিকে। আর নদী বেয়ে উঠে আসছে জলপুলিশ।'

'তর্ক না করে চলে যাবে,' নিষ্কম্প গলায় বলল রানা, 'আমার জন্যে ভাবতে হবে না।' ডেস্কে উঠে দাঁড়িয়ে কিনারায় রাখল দু' পা। একহাত বাড়িয়ে ধরল লকার। অন্যহাতে খুলল ওটার বড় ডালা। ভেতরে কেস-এ কোডেক্স। সাবধানে লকার ধরে অন্যহাতে তুলে নিল ভারী কেস। লকারে জোর ঠেলা দিয়ে আবারও সিধে হতে চাইল ডেস্কে। এক সেকেণ্ড ওর মনে হলো, রাবারের সোল পিছলে যাচ্ছে বলে পড়বে মেঝেতে, পরক্ষণে ঠিকভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল।

কেস খুলল রানা। ওর ফ্ল্যাশলাইটের জোর আলোয় ভল্টের দেয়াল ও ছাতে দেখা দিল কোডেক্সের প্রচ্ছদের সোনালি-লালচে আভা।

দরকারী জিনিস পেয়ে গেছে।

এবার ওটা নিয়ে বেরোতে হবে এখান থেকে।

আর্কাইভের একপাশ দেখা শেষ করেছে ল্যারি জ্যাকসন। গুন গুন করে মাইকেল জ্যাকসনের গান গাইতে গাইতে চলল পাশের ভল্টের দিকে।

আবারও তড়িঘড়ি করে ডেকে উঠে এসেছে রায়হান রশিদ। আর মাত্র আধ মাইল দূরে পুলিশের বোট। আসছে সরাসরি ওদের

বোট লক্ষ্য করেই।

সব জিনিসপত্র ভেন্টে তুলে দিয়েছে রানা, ডেস্ক এখন প্রায় পরিষ্কার। রয়ে গেছে শুধু কেস ভরা কোডেক্স। স্ক্রু-ড্রাইভার ধরেছে দু'সারি দাঁতের মাঝে, কাঁধ উচ্চতায় তুলে গর্তে বসাল ভেন্টিলেটর। কাজটা করতে গিয়ে ব্যথা পেল জখমি কাঁধে। ভুরু কুঁচকে মুখ থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে কাঠির মত স্টিলের দণ্ড ভরে দিল ফ্যানের মধ্যে।

ঝটকা খেয়ে থামল একটা ফ্যানের পাখা। কর্কশ আওয়াজে আপত্তি তুলল মোটর। আরও জোরে পাখার ভেতর ভরে দিল ইনসুলেটেড হ্যাণ্ডেল। খট-খট বৈদ্যুতিক আওয়াজ তুলল ফ্যান। বাধা পেয়ে পুড়ছে মোটর।

এক টানে স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে নিল রানা, পরক্ষণে বারোটা বাজিয়ে দিল আরেক ফ্যানের। বিদ্যুতের ফুলকি ছড়াল দ্বিতীয় মোটর। বেরোচ্ছে কয়েলের বিশ্রী পোড়া গন্ধ, মোটর থেকে বেরিয়ে এসে ভল্টে ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর ধোঁয়া।

প্রধান করিডোর ধরে ভল্টের সামনে পৌঁছেছে ল্যারি জ্যাকসন। এখন চলেছে রিডিং এরিয়ার দিকে। এমন সময় হঠাৎ করেই ওর ওয়াকি-টকিতে বলে উঠল হেনি: 'অ্যাই, ল্যারি! ভল্টে কী যেন গোলমাল দেখাচ্ছে কমপিউটার!'

আবারও ফিরে ভারী, পুরু স্টিলের দরজার সামনে থামল ল্যারি, একবার তাকাল দূরের সিকিউরিটি ডেস্কের দিকে। 'কোনও ধরনের অ্যালার্ম বেজেছে?'

'না, কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে ভেন্টিলেশন সিস্টেমে। আমি ভল্টের দরজা খুলছি, চেক করে দেখো।'

স্লটে নিজের কার্ড ভরে অপেক্ষা করল ল্যারি, ওর সঙ্গী নিয়ম

অনুযায়ী কোড দিয়ে খুলবে দরজা। পুরো একমিনিট পর গুঞ্জন তুলে খুলে গেল ভল্টের ভারী, স্টিলের দরজা।

ভেতরে পা রেখেই ধোঁয়ার কড়া গন্ধ পেল ল্যারি, ওপরে খ্যাট-খ্যাট শব্দ তুলছে কিছু। মুখ তুলেই দেখল ভেন্টিলেশনের গ্রিলের ওদিকে নীল আগুনের ফুলকি। 'হ্যাঁ, কারেন্টের কিছু শর্ট হয়েছে,' রেডিয়োতে বলল সঙ্গীর উদ্দেশে। 'ইঞ্জিনিয়ার ডাকুন।'

ভল্টের দরজা খুলে রেখেছে ধোঁয়া বের করে দিতে। এগিয়ে গেল মেইন ডেস্ক লক্ষ্য করে। ওদিকে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়েছে প্রাক্তন পুলিশ হেনি।

ল্যাপটপ স্ক্রিনে ভল্টে গার্ডকে দেখল আতাসি। অন্য গার্ড ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে কল করছে। 'বস্! এখনই! ভাগেন!'

নিঃশব্দে খুলে গেল লকার। একটু আগেও ওখানে ছিল স্টাডা কোডেক্স রাখা কেস। এখন আরও কিছু আছে লকারে। সরু অংশে ঝাড়ুর কাঠির মত দাঁড়িয়ে আছে রানা। এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল ডাক্টে। কয়েক মিনিট আগে ভেন্ট থেকে সংগ্রহ করেছে কাটার। ওটা ব্যবহার করে স্যাবোটাজ করেছে ভল্টের দরজার লক মেকানিযম।

এবার চোরের মত পালাতে হবে। সুযোগও পেয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডেলে পা রেখে লকারের ছাত থেকে পেড়ে নিল কোডেক্সের কেস। মস্ত এক লাফে ওটা হাতে গিয়ে নামল মাঝের ডেস্কের ওপর।

ওর দিকে পিঠ রেখে ভল্টের আরও গভীরে যাচ্ছে জ্যাকসন। বাম পা দিয়ে নিঃশব্দে লকারের দরজা বন্ধ করল রানা। পা ফেরত এনে বিশাল লাফে গিয়ে পড়ল ভল্টের দরজার ওদিকে।

ওজন সেনসিটিভ মেঝে থেকে পুরো ছয় ইঞ্চি বাইরে গিয়ে

পড়েছে ওর পা। বেকায়দাভাবে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে মচকে গেছে গোড়ালি। কিন্তু এসব পাত্তা না দিয়ে আরেক লাফে এক সারি লকারের ওদিকে আড়াল নিল।

রাবারের সোল ক্রিঁচ আওয়াজ তুলেছে মেঝেতে।

ঝট্ করে ঘুরল জ্যাকসন, বুঝতে চাইছে শব্দটা কীসের।

পদশব্দ শুরু হয়েও থেমে যেতে শুনল রানা। মূর্তি হয়ে গেছে কেবিনেটের পাশে।

পায়ের শব্দ শুরু হলো... ফিরে আসছে...

'কী হলো, ল্যারি?' জানতে চাইল দ্বিতীয় গার্ড।

ভল্টের দরজা থেকে বলল জ্যাকসন, 'মনে হলো এদিকেই কোথাও আওয়াজ পেলাম।'

আড়ষ্ট হয়ে গেছে রানার দেহ।

দরকারে এদেরকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে বেরিয়ে যেতে হবে।

আবারও ফুলকি তুলল ভল্টের একটা ফ্যান।

থমকে গেল জ্যাকসন। তার ছায়া দেখছে রানা। আর এক ফুট বাড়লে লোকটা দেখবে ওর ছায়া...

আবার ঘুরে গেল গার্ড, ধরে নিয়েছে ওটা বৈদ্যুতিক ফুলকির শব্দ। ক'সেকেণ্ড অপেক্ষার পর রানা টের পেল, ভল্টের আরও ভেতরে চলেছে যুবক। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে কাপড় রাখা লকারের কাছে পৌঁছুল ও, ডালা খুলে বের করল প্যান্ট, শার্ট ও কোট।

খোলা পোর্টহোল দিয়ে ধূসর বোটের পেটে ঢুকছে স্পটলাইট। লাউড স্পিকারে গর্জে উঠল পুলিশ অফিসার: 'আপনাদের সময় শেষ! এবার এখান থেকে চলে যান!'

ডেক থেকে চিৎকার করল রায়হান, 'আমরা গুটিয়ে নিচ্ছি ইকুইপমেণ্ট! দু'এক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

‘ঠিক আছে, একমিনিট দেয়া হলো, কিন্তু এর ভেতর রওনা না হলে সোজা যাবেন জেলে।’

‘আমরা সাধ্যমত করছি!’ কেবিনে নেমে এল রায়হান। লাইভ ফিডে দেখল: রিডিং এরিয়ায় পৌঁছে গেছে মাসুদ ভাই। এক হাতে কোডেক্স, অন্যহাতে পোশাক।

এইমাত্র রায়হানের পিছু নিয়ে কেবিনে নেমেছে আতাসি। স্ক্রিন দেখে নিয়ে হেডসেট পরে বলল, ‘বস্, আর সময় দেয়া গেল না!’

নিজের বুথে পৌঁছে গেছে রানা, আসার পথে লকারে ফেলে এসেছে কোডেক্সের কেস। দেরি না করে মস্ত বইটা ভরল ব্রিফকেসে, তারপর ব্যস্ত হয়ে নোংরা বডিসুটের ওপর পরতে লাগল প্যাণ্ট।

‘ইঞ্জিনিয়ার রওনা হয়ে গেছেন,’ ফোন রেখে ল্যারি জ্যাকসনের উদ্দেশে ওয়াকি-টকিতে বলল গার্ড হেনি।

‘আমি যাই গিয়ে মিস্টার রানাকে বের করে আনি,’ রিডিং এরিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেল জ্যাকসন।

সোয়েটারের ওপর কোট পরে নিয়েছে রানা, কিন্তু হাতের তেল-ঝুল ময়লা সাফ করার সময় নেই।

‘রওনা হয়ে যান!’ ধমকের সুরে বলল জলপুলিশ।

ডেকে উঠে এসে ছোট্ট পাইলট হাউসে ঢুকল রবি। ‘যাচ্ছি! এত তাড়া দেবেন না!’ চালু করতেই খড়খড় আওয়াজ ছাড়ল ডিজেল ইঞ্জিন। ‘ইউএন থেকে জানতে চাওয়া হবে, কেন এ ধরনের আচরণ করা হয়েছে আমাদের সঙ্গে!’

বাটন টিপতেই উইঞ্চ টেনে তুলল নোঙর। থ্রটল ঠেলতেই সামনে বাড়ল বোট। চলেছে ভাটির দিকে।

নিচের কেবিনে সর্বোচ্চ গতি তুলে স্পুলে ফাইবার-অপটিক টানছে রায়হান। পোর্টহোলের ব্রাসের ফ্রেমে বেধে গেল কাঁচের সুতো।

কুট্ করে কেটে গেল লাইন।

মনিটরের দৃশ্য ঝাঁকি খেতেই চট্ করে ওদিকে তাকাল হেনি। নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বৈদ্যুতিক সমস্যা?

মাসুদ রানার বুথে গিয়ে পড়ল তার চোখ...

'মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, কী ব্যাপার, জ্যাকসন?' যুবক আসার এক সেকেণ্ড আগে চেয়ারে বসে পড়েছে রানা।

'বৈদ্যুতিক সমস্যা, স্যর, আপাতত এখান থেকে সরে যেতে হবে আপনাকে,' নরম সুরে বলল জ্যাকসন, 'সমস্যা দূর না হওয়া পর্যন্ত বাইরের কাউকে এখানে রাখতে পারব না। সেফটি রুল।'

'ঠিক আছে, আমার কাজও শেষ,' কাগজপত্র বক্স ফাইলে রাখল রানা। 'এবার ওপরে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিতে হবে।'

'ফাইল রাখতে সাহায্য করব?' জানতে চাইল জ্যাকসন।

'না, আমিই পারব।' কাগজপত্র রেখে ভারী ফাইল হাতে উঠে দাঁড়াল রানা। পাশ থেকে তুলে নিল ব্রিফকেস। 'চলুন, যাওয়া যাক।'

আবারও ডেকে উঠে এসেছে রায়হান। পিছু নিয়েছে আতাসি। পুলিশের বোটের দিকে তাকাল ওরা।

'আরেকটু হলে ধরা পড়তাম,' নিচু স্বরে বলল রায়হান।

'মাসুদ ভাই বেরোতে পেরেছেন?' পাইলট হাউস থেকে জানতে চাইল রবি।

'তাই তো দেখলাম,' বলল আতাসি।

'যাক্, বাঁচা গেল,' হাঁফ ছাড়ল রায়হান। 'এবার অপেক্ষা ঝাড়ি খাওয়ার জন্যে। মার্ভেল জাহাজের সব কিছুর জন্যে দায় সোহেল ভাইয়ের। ওঁকে যখন বলব আমাদের রোভ আটকা পড়েছে ইউএন-এর বেসমেন্টে...'

রানার সঙ্গে এসে প্রথম লকারের তালা খুলল জ্যাকসন। 'রেখে দিন।'

'অনেক ধন্যবাদ,' লকারে ফাইল রাখল রানা। তারই ফাঁকে চট্ করে তালার স্লট থেকে সরিয়ে ফেলেছে কার্ডবোর্ড। 'ঠিক আছে, আমার কাজ শেষ।'

পিছিয়ে গেল রানা। ডালা বন্ধ করল জ্যাকসন।

রানা অপেক্ষা করছে, এবার ওকে নিয়ে সিকিউরিটি স্টেশনে যাবে যুবক। কিন্তু কেমন যেন দ্বিধা দেখা যাচ্ছে তার চোখে-মুখে।

'কী হয়েছে?' খুব সহজ সুরে জানতে চাইল রানা।

'আপনার হাতে কী যেন লেগেছে।'

হাত তুলে দেখল রানা, তালুর পাশে কালো কালির মত ধুলো-ময়লা। 'যাহ্!' ঊরুর কাছে প্যান্টে হাত মুছল ও। 'কীসে যেন হাত লেগেছে!' স্বাভাবিক হাসি হাসল। মনে মনে বলল, হাসিটা নকল না মনে হলেই বাঁচি! 'এক শ' বছরের পুরনো ডকুমেন্টে ধুলোবালি মাখিয়ে দিয়ে থাকলে আমাকে খুন করবে লাবনী।'

আবারও হাসি ফিরল গার্ডের ঠোঁটে, কৌতুকের সুরে বলল, 'আমি কিছু বলে দেব না। বেশ, চলুন, যাওয়া যাক।'

সিকিউরিটি স্টেশনে ফিরল রানা, সই করে দিল খাতায়। একবার নড করে চলল ফিরতি করিডোর ধরে। পিছনের দু'জনের চোখের আড়ালে যেতেই গতি বেড়ে গেল ওর হাঁটার।

আবারও ভল্টে ফিরেছে ল্যারি জ্যাকসন। গ্রিলের দিকে তাকাল। এখন আর আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছে না ফ্যান থেকে। কিন্তু কী যেন ঠিক নেই! আরও কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকার পর জ্যাকসন টের পেল, সমস্যা কোথায়। একটু কাত হয়ে আছে গ্রিল। কেউ খুলেছিল ওটা! কিন্তু সে কে? এবং কেন ওই কাজ করেছে?

ডেস্কে উঠে গ্রিল দেখবে, এমনসময় আরেকটা জিনিস দেখল জ্যাকসন। নোংরা একটা দাগ। ডেস্কের কিনারায়। মনে হচ্ছে ওটা কারও পায়ের জুতোর ছাপ...

ভয়ঙ্কর সন্দেহ জেগে উঠল জ্যাকসনের মনে। লাফিয়ে ডেস্কে উঠে হাত বাড়াল ওপরের ভেন্টের দিকে। 'হেনি! আমার মনে হয়...'

আঙুল লাগতেই খটাং করে খুলল গ্রিল। ঝটকা দিয়ে পিছিয়ে গেল জ্যাকসন। হতবাক হয়ে দেখল, মেঝের দিকে রওনা হয়েছে ভেন্টিলেশন। থামল ওটা মেঝের একটু ওপরে। পুরু কেইবলের কারণে এখনও ঝুলছে। কেঁপে উঠেছে পুরো ডাক্ট, ওটার মুখ থেকে ঝরে পড়ল আরও কী সব। খালি একটা প্লাস্টিকের কন্টেইনার... কোনও ধরনের সাকশন কাপ...

ভল্টে ঢুকেছিল কেউ!

আশপাশে আর কেউ ছিল না মাসুদ রানা ছাড়া!

শুধু তাকেই সন্দেহ করা যায়!

'হায়, ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠল ল্যারি জ্যাকসন, 'হেনি! অ্যালার্ম বাজান! ঠেকান! বিল্ডিং থেকে যেন বেরোতে না পারে মাসুদ রানা!'

লবিতে পৌঁছে গেছে রানা। হাতে ব্রিফকেস, হনহন করে হেঁটে চলেছে এগযিটের দিকে। ডিউটিরত গার্ডদেরকে দেখল, বরাবরের মতই তাদের চেহারায় উদাস ভদ্রতা। রাতের এ সময়ে দালানে কারও কোনও তাড়া থাকে না। আর কয়েক গজ গেলেই গার্ডদের আওতার বাইরে চলে যাবে রানা।

কড়-কড় আওয়াজ তুলল কারও ওয়াকি-টকি। ওদিক থেকে কর্কশ আওয়াজে কী যেন বলছে কেউ। কয়েক সেকেণ্ড পর তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়ল ঘণ্টির মত অ্যালার্ম।

ভেতর থেকে গার্ডরা সিকিউরিটি লক আটকে দেয়ার আগেই গেটের কাছে পৌঁছে কাঁধ দিয়ে কবাট ঠেলে ইউনাইনেড নেশন্স প্লাযায় বেরোল রানা। দূর হয়েছে ওর ভাবগম্ভীর ভদ্রলোকের আচরণ, প্রায় ভীত হরিণের মত তীর বেগে ছুটল ফার্স্ট অ্যাভিনিউ লক্ষ্য করে। পেছনে শুনল সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের গার্ডদের চিৎকার। তেড়ে আসছে তারা!

ট্রাফিক ঠেকাতে সবসময় ব্যারিয়ার দিয়ে আটকে রাখা হয় ইউনাইটেড নেশন্স প্লাযার মুখ। তার পরেই রাস্তার কাছে উঁচু সিকিউরিটি গেট। এখন খোলা এক কবাট। ওদিক দিয়ে এইমাত্র বেরিয়ে গেল দামি এক গাড়ি। আবারও বন্ধ হচ্ছে কবাট, ঝড়ের বেগ তুলে ওটার দিকে ছুটল রানা। এইমাত্র গেটহাউসে বাজতে শুরু করেছে অ্যালার্ম। ঘরের ভেতর চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এক গার্ড।

মস্ত লাফে ট্রাফিক ব্যারিয়ার টপকে বুজে আসা কবাট ঝড়ের বেগে পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল রানা। ওর পেছনে জোরালো ধাতব আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো গেট। চিতার গতি নিয়ে পেরোতে লাগল ফার্স্ট অ্যাভিনিউর রাস্তা। নানান দিক থেকে হর্ন বাজিয়ে আপত্তি তুলছে ড্রাইভাররা। কিছুই পাত্তা না দিয়ে ফোরটিফোর স্ট্রিটে ঢুকে

পড়ল ও। চট্ করে একবার পেছনে তাকাল।

নিজেদের ব্যারিয়ারে আটকা পড়েছে ইউএন গার্ডরা, গেটহাউসের কারও উদ্দেশে বদ্ধ উন্মাদের মত হাত নাড়ছে তারা। নতুন করে খুলতে হবে গেট। রাস্তার ওপারে পৌঁছে গেল রানা, কোনা ঘুরেই দেখল উত্তেজিত মানুষের মস্ত এক জটলা।

জড় হয়েছে আরও ভক্ত। তাদের ভেতর অন্তত ত্রিশজন পাপারায্যি। তাদেরকে সংখ্যায় হারিয়ে দিয়েছে তরুণী মেয়েদের মিছিল। অন-লাইনে খবর ছড়িয়ে গেছে, গিবন মুর উঠেছে সামনের ওই নামকরা হোটেলে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আছে নতুন গার্লফ্রেণ্ড!

রাস্তার ওদিকে এনওয়াইপিডির গাড়ি দেখল রানা। ওটার গায়ে ঠেস দিয়ে জটলা দেখছে বিরক্ত এক নারী পুলিশ। তাকে পাশ কাটিয়ে ভিড় ঠেলে হোটেলের দরজায় পৌঁছল রানা। ওকে চিনতে পেরেছে ডোরম্যান, কবাট খুলে ঢুকতে দিল লবিতে।

আগের মতই একই জায়গায় বসে আছে জ্যাক রিচি। চট্ করে চারপাশ দেখল রানা। একটু দূরের সিটে এখনও গিল্টি মিয়া। চোখে চোখ পড়তেই চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে চলে এল সে। পাশ কাটিয়ে গেল রানাকে। তখন এক মুহূর্তের জন্যে রানাকে দেখতে পেল না জ্যাক রিচি। বাঙালি গুপ্তচরকে কী যেন দিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে গিল্টি মিয়া।

দশ সেকেণ্ড পর প্রাক্তন মার্সেনারির পাশে গিয়ে বসল রানা।

'পেয়েছ?' জানতে চাইল রিচি।

ব্রিফকেস খুলল রানা, ভেতর থেকে ঝিলিক দিল স্টাডা কোডেক্স। প্রায় অবিশ্বাস নিয়ে একবার ওকে দেখল জ্যাক রিচি। স্পর্শ করে দেখল সত্যি জিনিস কি না। খোদাই করা প্রচ্ছদ বলে দিল, মোটেও নকল নয় ওটা।

'এত অবাক হওয়ার কী আছে?' ভুরু নাচাল রানা। ব্রিফকেস

রাখল হাঁটুর ওপর। কোটের পকেট থেকে বের করল কক্ করা ওয়ালথার পি.পি.কে.। নলটা তাক করল জ্যাক রিচির তলপেটে। 'চুক্তি অনুযায়ী কোডেক্স পাবে, কিন্তু তার আগে ফেরত দাও লাবনীকে। ও কোথায়?'

রানার কাছে পিস্তল থাকবে তাতে অবাক হয়নি জ্যাক রিচি। নিরাসক্ত সুরে বলল, 'ডক্টর আলম আছে মিস্টার মঙ্গেলকারের সঙ্গে তাঁর বিমানে।'

'কোথায় সেই বিমান?'

'একটা ব্যক্তিগত এয়ারপোর্টে।'

'তা হলে নিয়ে চলো আমাকে। হাতে বেশি সময় পাব না। ইউএন-এর কেউ বুঝে ফেলবে ভল্টে আমিই ঢুকেছিলাম। এবার পুলিশের তাড়া খেয়ে নিউ ইয়র্ক ছাড়তে হবে।'

'ব্রিফকেস আমার হাতে দাও,' বলল জ্যাক রিচি।

শীতল চোখে তাকে দেখল রানা।

'তোমার হাতে তো পিস্তল থাকলই,' বলল ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত। 'ব্রিফকেস আমার হাতেই থাকুক।'

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে লোকটার হাতে ব্রিফকেস দিল রানা। 'এবার লাবনীর কাছে নিয়ে চল।'

উঠে দাঁড়াল ওরা। কোটের পকেটে পিস্তল রেখেছে রানা। কিন্তু অস্ত্রের নল তাক করা রিচির পিঠে। 'সামনে বাড়ো।'

এগযিটের দিকে চলেছে দু'জন। এমন সময় লবির আরেক প্রান্তে এলিভেটর নেমে আসতেই ওটা থেকে বেরোল এক সুদর্শন যুবক এবং তার সঙ্গিনী। কাঁচের দরজার ওদিক থেকে তাদেরকে দেখে ফেলেছে বাইরের সবাই। শুরু হয়ে গেল উত্তেজিত হৈ-চৈ। বারবার দপ-দপ করে জ্বলতে লাগল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।

যার জন্যে উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই, সেই নায়কের নাম গিবন মুর। পাশের মেয়েটি লোলা ভার্নিও। দু'জনের

পরনেই পার্টির পোশাক। একটু এলোমেলো মেয়েটির চুল। মনে হলো ব্যক্তিগত কোনও কাজে নায়কের সঙ্গে ব্যস্ত ছিল। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে গেল সুঠামদেহী বাদামি রঙের এক লোক। বডিগার্ড সে। কালো সুটের ওপর দিয়েও দেখা গেল সুগঠিত বাইসেপ ও বুকের মাংসপেশি। সামনে বেড়ে নায়ক ও তার সঙ্গিনীর জন্যে সদর দরজা খুলে দিল সে। একহাত তুলে রানা ও রিচিকে ইশারা করল। 'প্লিয, আগে এঁদের যেতে দিন!' বিরক্ত হয়ে তাকে পাশ কাটাতে চাইল জ্যাক রিচি, কিন্তু সামনে বেড়ে থামল রানা।

সঙ্গিনীকে পাশে নিয়ে রাস্তায় নামল উজ্জ্বল তারকা। দপদপ করে জ্বলতে লাগল অজস্র ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। চিৎকার জুড়েছে তরুণীরা। গলা ফাটিয়ে নানান প্রশ্ন করছে পাপারায্যিরা।

'মুর! মুর! মুর!'

এক ফোটোগ্রাফার চিৎকার করে জানতে চাইল, 'আপনার সঙ্গের সুন্দরী কে?'

'লাসিয়া কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

'লাসিয়া কোন্ জন?' জানতে চাইল পাশেরজন।

'কী দরকার, ওদের ছবি তুললেই পয়সা!' ক্যামেরা বাগিয়ে ছবির পর ছবি তুলতে লাগল ফোটোগ্রাফার। 'কিন্তু একে চিনলাম না!'

'মুর! এদিকে!' ডাকল এক মেয়ে, 'মনে নেই আমাকে? ক্যাথি! বলেছিলে আমার চুল সুন্দর!'

জ্বলে উঠল শতখানেক মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ। অপেশাদাররা ঝামেলা করছে বলে খুব বিরক্ত হয়ে উঠছে পাপারায্যিরা। কয়েকজন মিলে ঠেলে পেছনের মানুষগুলোকে সরাতে চাইল তারা। শুরু হলো চেঁচামেচি। বেশি করে আপত্তি তুলছে সুন্দরী তরুণীরা।

'ওঁদেরকে যেতে দিন!' কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিল নায়কের

বডিগার্ড। ভিড়ের ভেতর একটা পথ তৈরি করে দিচ্ছে হোটেলের স্টাফরা। একটু দূরেই নায়কের লিমাযিন, অপেক্ষা করছে তাকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্যে।

'লড়াই করে বেরিয়ে যেতে হবে,' জ্যাক রিচিকে বলল রানা। দরজা পেরিয়ে সোজা নামল ভিড়ের ভেতর। ওর ডান কনুইয়ের এক গুঁতো খেয়ে পথ ছাড়ল এক ফোটোগ্রাফার। তাল সামলাতে না পেরে পড়ল পেছনের এক তরুণীর গায়ে। জড়াজড়ি করে হুড়মুড় করে দু'জন ভূমিষ্ঠ হতেই চিলের মত চিৎকার জুড়ল মেয়েটা।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে ওর বান্ধবীরা, বিশৃঙ্খল হয়ে গেল একদল মানুষ। তাদের ভেতর দিয়ে চলেছে রানা। ঠিক পেছনেই জ্যাক রিচি, হাতের ভারী ব্রিফকেস দিয়ে গুঁতো মারছে কারও কারও হাঁটুর নিচের হাড়ে বা উরুতে।

লিমাযিনের কাছে পৌঁছে গেছে নায়ক ও তার সঙ্গিনী। গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল বডিগার্ড, পরক্ষণে হোটেলের ডোরম্যান এবং সে মিলে রুখে দিতে চাইল এগিয়ে আসা ভিড়। পেশাদার বক্সারের মত মুঠো বাগিয়ে ধরেছে বডিগার্ড। তাতে পিছিয়ে যেতে চাইল সামনের কয়েকজন। তাদের পায়ের নিচে চাপা পড়ল এক তরুণ, তার পাশের ফোটোগ্রাফার পিছলে গেল ফুটপাথে। তার হাতের দামি ক্যামেরার লেন্স গেল মট্ করে ভেঙে। করুণ এক হাহাকার বেরোল লোকটার বুক চিরে।

থমকে গেছে রানা। সামনের পথ রুদ্ধ। পেছনেই ব্রিফকেস হাতে জ্যাক রিচি। ধস্তাধস্তির ভেতর তার গায়ে পড়ল খুদে এক লোক। এত জোরে বাড়ি খেয়েছে, আরেকটু হলে রিচির হাত থেকে ছুটে যেত ব্রিফকেসের হ্যাণ্ডেল। ভীষণ ঝাঁকি খেয়েছে ব্রিফকেস। মুখ নিচু করে ওটাকে দেখল রিচি। আরও শক্ত হাতে ধরল হ্যাণ্ডেল। খুদে লোকটা ভিড়ের ভেতর রাস্তায় খুঁজছে নিজের

ব্রিফকেস। তার শীর্ণ পাছায় কষে লাথি দেবে কি না, ভাবল রিচি। কিন্তু তখনই চিৎকার করে ধমকে উঠল এক মহিলাঃ 'অ্যাই! সরে যাও সবাই! এনওয়াইপিডি! রাস্তা ছাড়ো!'

মহিলা পুলিশকে পাশ কাটাল রানা। পিছু নিয়ে ভিড়ের প্রান্তে পৌঁছুল জ্যাক রিচি। শক্ত হাতে ধরেছে ব্রিফকেস। একটু দূরে রওনা হয়েছে নায়কের লিমাযিন। বিরক্তির সুরে রিচিকে বলল রানা, 'কে চায় এত জনপ্রিয়তা!'

'ওই ব্যাটা কে?' জানতে চাইল জ্যাক রিচি।

'গিবন মুর! নতুন ফিল্ম স্টার!'

মাথা নাড়ল রিচি। 'সময় কই যে সিনেমা দেখব, বাস্তবের রূঢ় ধাক্কায় অস্থির!'

'শহরে কারও ব্যক্তিগত এয়ারপোর্ট নেই,' বলল রানা। 'ট্যাক্সি করে দূরে যেতে হলে তার ভাড়া আমি দেব না। তোমার সঙ্গে গাড়ি নেই?'

'আছে! সামনেই!'

চোদ্দ

রানাকে পাশে নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা গাড়ি ড্রাইভ করছে জ্যাক রিচি। তার পেটের দিকে তাক করে রেখেছে রানা ওয়ালথার। পেছনের সিটে কোডেক্সের ব্রিফকেস। কেউ ওরা ছুঁয়েও দেখেনি।

ব্যক্তিগত এয়ারফিল্ডে পৌঁছুবার পর গেট থেকে হাতের

ইশারায় ওদেরকে এগিয়ে যেতে বলল গার্ড। রানওয়েতে অপেক্ষা করছে জেট বিমান। ওটা পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন সশস্ত্র লোক। বিমানের পাশে গাড়ি থামতেই আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। কোথাও কোনও গোলমাল দেখলে স্রেফ গুলি করবে জ্যাক রিচির তলপেটে।

'নেমে পড়,' নির্দেশের সুরে বলল ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত।

রানওয়েতে নামল রানা। খোলা জায়গায় বইছে হিমেল হু-হু শীতল হাওয়া। খুলে রাখা হয়েছে জেট বিমানের হ্যাচ। ওপরের সিঁড়ির ধাপে এক লোক। চিনতে দেরি হলো না রানার। ভারতীয় বিলিয়নেয়ার অনুপম মঙ্গেলকার।

এরই ভেতর চারপাশ থেকে গাড়ি ঘিরে ফেলেছে তার লোক। হাতের অস্ত্র রানার বুকের দিকে তাক করা। একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওয়ালথার কোটের পকেটে রাখল ও। পেছনের সিট থেকে ব্রিফকেস তুলে গাড়ি থেকে নেমে এল জ্যাক রিচি।

'ঠিক আছে, মঙ্গেলকার, লাবনী কোথায়?' নিষ্কম্প কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

কথাটা পাত্তা দিল না বিলিয়নেয়ার। রিচির উদ্দেশে বলল, 'পেয়েছেন ওটা?'

মাথা দোলাল প্রাক্তন মার্সেনারি। উঁচু করে ধরেছে ব্রিফকেস।

'আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

বিমানের সিঁড়ির ধাপের কাছে পৌঁছে গেছে রানা। 'কী ব্যাপার? আমি একটা প্রশ্ন করেছি! লাবনী কোথায়?'

রানাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল জ্যাক রিচি। তাকে জায়গা করে দেয়ার জন্যে পিছিয়ে গেছে অনুপম মঙ্গেলকার। এক পাশ থেকে দেখল রানাকে। 'না, মিস্টার রানা, ওই মেয়ে আমার সঙ্গে নেই, এখনও রয়ে গেছে ভারতে। ওকে আর চাই না আমার। আপনাকেও দরকার নেই।' সশস্ত্র অনুচরদের দিকে

ইশারা করল সে। লোকগুলো প্রায় ঘিরে ফেলল রানাকে।

ওকে খুন করার আগেই বাধা দিতে হবে, কাজেই বলে উঠল রানা, 'একমিনিট, মঙ্গেলকার!' ওর মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে হিম শীতল স্রোত। 'আমাকে মেরে ফেলার আগেই তোমার বোধহয় একবার দেখা উচিত ব্রিফকেসের ভেতরটা।'

কথাটা শুনে ঝট্ করে জ্যাক রিচির দিকে ফিরল মঙ্গেলকার। চোখে দোষারোপের দৃষ্টি।

'ওটা ব্রিফকেসে আছে,' জোর দিয়ে বলল ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত। 'নিউ ইয়র্ক ছাড়ার আগে নিজে দেখে নিয়েছি। একবারের জন্যেও ওটা চোখের আড়াল করিনি।'

'খুলুন,' নির্দেশ দিল মঙ্গেলকার। 'এক্ষুণি খুলুন!'

বিমানের মেঝেতে ব্রিফকেস রেখে ঝুঁকে পড়ে ক্যাচ খুলল জ্যাক রিচি। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ডালা খুলল মঙ্গেলকার। দীর্ঘক্ষণ দেখল ভেতরের জিনিস, তারপর দৌড়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। ফুঁসে ওঠা হুলো বিড়ালের মত কর্কশ হলো কণ্ঠস্বর: 'কই! ওটা কই!'

'জানা নেই,' সত্যি কথাই বলল রানা, 'আমার এক লোক নিয়ে গেছে। বলে দিয়েছি, চিনি না এমন কোথাও রাখতে। নিরাপদেই আছে।' কঠোর হলো রানার কণ্ঠ: 'তো, হ্যাঁ, কোথায় লাবনী?'

কেবিন থেকে নামল হতভম্ব জ্যাক রিচি, হাতে ব্রিফকেসের ভেতরের জিনিসপত্র: ডাক্ট টেপ দিয়ে মোড়া বেশ কয়েকটা ডামবেলের চাকতি। মঙ্গেলকারের দিকে তাকাল সে। 'আমি... আমি ঠিক বুঝতে... পারছি না! ভেতরেই ছিল কোডেক্স! সরাবে কী করে?'

'জেনেই বা কী করবে?' সহজ সুরে বলল রানা, 'জানতাম প্রথম সুযোগেই বেঈমানি করবে তোমরা, তাই ব্যবস্থা নিয়েছি।

লাবনীর সঙ্গে কথা বলার সময় জানলাম, ফোনে স্যাটেলাইট একটু বেশি দেরি করছে, যা বোঝার বুঝে গেলাম। নিজেকে এত বোকা মনে করি না যে বাড়তি ঝুঁকি নেব।' ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মঙ্গেলকারের গোল কাঁধ বারকয়েক চাপড়ে দিল রানা। 'ভয় নেই, চুক্তি এখনও বলবৎ। তুমি ফেরত দেবে লাবনীকে, আমি দেব কোডেক্স। কিন্তু আবারও চালাকি করলে পুড়িয়ে ছাই করব তোমার সাধের বই! কথা কানে ঢুকেছে?'

বাঁকা হয়ে গেল মাস্টারমাইণ্ড অনুপম মঙ্গেলকারের ঠোঁট। 'ভেতরে এসো।' আবারও সিঁড়ি বেয়ে বিমানে উঠতে লাগল সে। প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে জ্যাক রিচিকে। বিলিয়নেয়ারের পিছু নিল রানা। বুঝে গেছে, এখুনি খুন করবে না ওকে। এখন প্রথম কথা: কত গভীরভাবে চায় স্টাডা কোডেক্স অনুপম মঙ্গেলকার?

কেবিনে রানা ঢুকতেই ওর পেছনে দাঁড়িয়ে গেল অস্ত্র হাতে এক গার্ড। ভেতরে রয়েছে আরেক ভারতীয় লোক। করাতের মত দাঁত বের করে অশুভ হাসি হাসল সে। 'কোডেক্সের কোনও ক্ষতি হয়নি তো?' জানতে চাইল মঙ্গেলকার।

'এখনও না, তবে হবে, লাবনীকে ফেরত না পেলে,' বলল রানা। 'সোজা কথায় লাবনীকে ফেরত দেবে, বদলে পাবে কোডেক্স। এর কোনও এদিক-ওদিক নেই।'

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত চাপল অনুপম মঙ্গেলকার।

'এবার লাবনীর সঙ্গে কথা বলব, তার ব্যবস্থা করো,' নির্দেশ জারি করল রানা।

আরামদায়ক এক সিটের পাশে থামল মঙ্গেলকার। রানা ভেবেছিল ফোনের রিসিভার তুলবে লোকটা, কিন্তু তার বদলে টিপে দিল একটা বাটন। চেয়ারের হাতলে কালো চোখ নিয়ে চালু হলো ওয়েবক্যাম ও ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটর। পর্দায় এল মেন্যু।

অপশন টিপতেই হাজির হলো কানেকশন আইকন।

কয়েক সেকেণ্ড পর শকুনের মত মাধুরী মঙ্গেলকারের চেহারা দেখল রানা পর্দায়।

'তো, অনুপম?' জানতে চাইল সে। 'পাওয়া গেছে ওটা?'

'সমস্যা দেখা দিয়েছে,' বলল স্বামীপ্রবর। 'ডক্টর আলমকে ক্যামেরার সামনে আনো।'

'কী? তাকে কী কারণে দরকার?' ফুঁসে উঠল মাধুরী। 'এবার দেরি না করে...'

'চুপ করো, বোকা মেয়েলোক!'

চোখ সরু করে ফেলল মাধুরী, দৃষ্টি থেকে ঝরছে তীব্র রাগ। সরে গেল ক্যামেরার সামনে থেকে। নির্দেশ দিল হিন্দি ভাষায়। আরও ক'সেকেণ্ড পর পর্দায় দেখা দিল লাবনী।

'ভারতে কী অবস্থা তোমার, লাবনী?' জানতে চাইল রানা।

'রানা!' কেঁদে ফেলল লাবনী। 'এরা এসব কী করছে?'

'ওদের হাতে তুলে দেব স্টাডা কোডেক্স।'

'কী বললে?' হাঁ হয়ে গেল লাবনী। 'ভুলেও তা করতে যেয়ো না! ওটা পেলেই আমাদেরকে মেরে ফেলবে এরা!'

'জানি। বেঈমানি করবে, তাই কোডেক্স দিইনি। তবে তুমি নিরাপদ জায়গায় চলে গেলে তখন দেব।'

'ওই কাজই কোরো না,' জোর দিয়ে বলল লাবনী। 'এরা ভয়ঙ্কর কিছু করবে বলে ওটা চাইছে। কোডেক্স...'

'চুপ কর্, ছিনাল মাগী!' ধমকে উঠল মাধুরী, 'অনুপম, মাসুদ রানা এখনও বেঁচে আছে কেন?'

'জ্যাক রিচি বুঝতে পারেনি নকল জিনিস দিয়েছে সে,' বলল মঙ্গেলকার। মাথা নিচু করে নিয়েছে ব্রিটিশ দুর্বৃত্ত। 'রানার এক বন্ধু লুকিয়ে ফেলেছে ওটা। রানা এখন বলছে, আমরা লাবনী আলমকে ছেড়ে না দিলে নষ্ট করে দেবে কোডেক্স।'

‘কী!’ খেপে গেছে লাবনী, আবছা শোনা গেল ওর চিৎকার। ‘রানা!’

‘দ্য কোয়েশ্চেন মাসুদ রানার সব বন্ধুকে খুঁজে বের করবে,’ লাবনীর চিৎকার পাত্তা না দিয়ে বলল মাধুরী মঙ্গেলকার। ‘তাদের খুঁজে বের করে...’

‘আমাদের হাতে অত সময় নেই,’ স্ত্রীকে কথা বলার সুযোগ দিল না বিলিয়নেয়ার। ‘এখন কোডেক্স হারালে চলবে না। লাবনী আলমকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো।’

ক্যামেরার দিকে চেয়ে থেকে চাপা স্বরে বলল মাধুরী মঙ্গেলকার, ‘না!’

স্ত্রীর সরাসরি বিরোধিতায় থমকে গেল অনুপম, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘রানার বন্ধুরা কোডেক্স নষ্ট করে ফেললে...’

‘করবে না,’ ক্যামেরার দিকে ঝুঁকল ডাইনী। ‘রানা! এক্ষুণি কোডেক্স দেয়ার ব্যবস্থা করুন, নইলে ভীষণ কষ্ট পাবে লাবনী।’

‘ওর গায়ে টোকা পড়লে কেউ তোমরা মাফ পাবে না,’ পাল্টা হুমকি দিল রানা, ‘কোডেক্সও পাবে না।’ পরিষ্কার দেখল, ভীষণ দ্বিধা ও ভয়ের ভেতর পড়েছে অনুপম মঙ্গেলকার। কোডেক্স হারালে তার সর্বনাশ। কাজেই আশা করা যায়, ওটা পেতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

কিন্তু জুয়া খেলতে ওস্তাদ মাধুরী মঙ্গেলকার। কড়া সুরে নির্দেশ দিল চাঞ্চাল আধিকারীকে।

লোকটা খপ্ করে ধরল লাবনীর হাত।

‘যা বলছি, সেটা করুন, কোডেক্স আমাদের হাতে তুলে দিন,’ বলল মাধুরী। ‘নইলে কী হবে দেখুন। চাঞ্চাল!’

পকেট থেকে কী যেন বের করেছে লোকটা। লাবনী বোঝার আগেই ওর মাথায় টাইট করে পরিয়ে দিল প্লাস্টিকের পুরু ব্যাগ।

পাগলের মত থাবা মেরে ওটা খুলতে চাইল লাবনী। কিন্তু

ছেঁড়া গেল না ওটা। ওর গলায় আরও শক্ত হয়ে বসল ব্যাগের মুখ।

'ওকে ছেড়ে দাও!' ধমকে উঠল রানা। ঝট করে পা বাড়াল অনুপম মঙ্গেলকারের দিকে। তৈরি ছিল হাঙর-দাঁত সন্তোষ। এক পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলল ফিউযেলাজের গায়ে। সামলে নিয়েই কোটের পকেট থেকে ওয়ালথার বের করতে গেল রানা, কিন্তু ওর গালে পিস্তলের নল ঠেসে ধরল অন্য গার্ড।

স্ক্রিনে দেখা গেল কনুই দিয়ে চাঞ্চাল আধিকারীর পাঁজরে খোঁচা দিতে চাইল লাবনী। কিন্তু খুব সতর্ক মার্শাল আর্টিস্ট। হাতের তালু দিয়ে সরিয়ে দিল লাবনীর কনুই।

'অনুপমের হাতে কোডেক্স দাও, নইলে খুন হবে লাবনী,' বলল মাধুরী মঙ্গেলকার।

'ওটা দিলেও তো ওকে খুন করবে তোমরা,' বলল রানা।

অপমানে ঠোঁট মুচড়ে ফেলল মাধুরী। 'তার আগে ভয়ঙ্কর কষ্ট দেব। বারবার মরতে গিয়েও মরবে না।'

অক্সিজেনের অভাবে হাঁফিয়ে উঠেছে লাবনী। ঝটকা দিচ্ছে মাথা। অসহায় ওকে ঠেসে ধরেছে চাঞ্চাল আধিকারী। কিছুই করার নেই রানার। মাধুরী মঙ্গেলকারের সঙ্গে চুক্তি করলে, কোডেক্স এদের হাতে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ওরা দু'জনই খুন হবে। চুক্তি করা উচিত অনুপম মঙ্গেলকারের সঙ্গে, বুঝে গেল রানা। বিলিয়নেয়ার হয়তো যুক্তি বুঝবে।

ছটফট করছে লাবনী, দুর্বল হয়ে পড়ছে গোঙানি। শীতল চোখে রানাকে দেখছে মাধুরী মঙ্গেলকার।

'ঠিক আছে, তোমাদের হাতে তুলে দেব কোডেক্স,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

সরু হাসি হাসল মাধুরী। হাত নেড়ে ইশারা করল। 'চাঞ্চাল, আপাতত ছেড়ে দাও।'

লাবনীকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা।

ব্যস্ত হয়ে মুখ থেকে ব্যাগ খুলতে চাইছে বেচারি। কয়েক সেকেণ্ড পর সফল হয়ে বড় করে দম নিল।

রানার গাল থেকে অস্ত্র সরিয়ে নিল গার্ড।

এবার বলল রানা, 'তবে একটা শর্ত আছে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল মাধুরী। আবারও লাবনীর মাথায় ফাঁস পরাতে বলবে, এমনসময় তার স্বামীর দিকে ফিরল রানা, 'আমরা দু'জন এমন দুটো জিনিস চাই, যেটা হারাতে চাই না। কেউ বিশ্বাস করি না একে অপরকে। আমার কথা ঠিক?'

'অল্প কথায় তা-ই,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার।

'তো এবার আমার নতুন প্রস্তাব শোনো, আমি নিয়ে আসব কোডেক্স, তুমি নিয়ে আসবে লাবনীকে। অসংখ্য মানুষ আছে এমন কোনও জায়গায় লেনদেন হবে। আমাদের কাজ শেষ হলে যে যার পথে চলে যাব। কোনও চালাকি নয়, কোনও বেঈমানিও নয়। রাজি আছ?'

'বিশ্বাস করি না ওকে,' ভারত থেকে চিলের মত চ্যাঁ করে উঠল মাধুরী মঙ্গেলকার।

আরও কিছু বলত, কিন্তু কথা বলে উঠল তার স্বামী: 'মন্দ হয় না। কোথায় লেনদেন করতে চাও?'

'এখনও জানি না, কিন্তু...' কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা। ওর মনে হলো মাধুরী মঙ্গেলকারকে একটু দমিয়ে দিতে হলে বাড়তি সুযোগ দেয়া উচিত তার স্বামীকে। 'ঠিক আছে, লেনদেন হবে তোমাদের দেশে। আসব ভারতে, তারপর স্থির হবে কোথায় দেখা করব।'

ভাবছে বিলিয়নেয়ার। চট্ করে একবার দেখল স্ক্রিনে স্ত্রীর দিকে। মনে হলো মাধুরী বিরক্ত। 'বেশ, লেনদেন হবে আমার দেশে।'

'ব্যাঙ্গালোরে,' জোর দিয়ে বলল মাধুরী।

'ওই শহরের কোথায় দেখা হবে, তা পরে ঠিক করব আমি,' বলল রানা। টের পেয়েছে, একবার সুযোগ দিলেই মেয়েলোকটা আবারও নির্যাতন করবে লাবনীকে।

ও থেমে যাওয়ায় কেউ কিছু বলছে না।

আপত্তি নেই মাধুরী মঙ্গেলকারের।

রানার দিকে ফিরল বিলিয়নেয়ার। 'আমাদের সঙ্গে বিমানে করে যেতে চাও?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল রানা। 'এত বড় ভুল করব না। ঠিক করে নেব কোন্ বিমানে যাব। ধরে নাও, সঙ্গে করে লাগেজে কোডেক্স নেব না। কিন্তু...' আগেই বুঝে গেছে কী বলবে ভারতীয় ব্যবসায়ী, 'হাতে তুলে দেয়ার আগেই দেখিয়ে দেব ঠিক আছে ওটা। ওই একইভাবে তুমি দেখাবে লাবনীকে। ঠিক সময়ে লেনদেন হবে। রাজি তোমরা এ চুক্তিতে?'

'ঠিক আছে। আমার আপত্তি নেই।'

'গুড। ...লাবনী, একটু সুস্থ লাগছে?'

'খুবই ভাল লাগছে,' খুকখুক করে কেশে উঠল লাবনী। স্পর্শ করে দেখল লালচে গলা। 'রানা, কাজটা কোরো না! এমনিতেই মেরে ফেলবে আমাদেরকে ওরা!'

'সরি, আমার তা মনে হয় না। বুঝতে পারছি কোডেক্স দিতে হবে, কিন্তু বড় কথা তোমাকে ফেরত পাব। দু'এক দিনের ভেতর দেখা হবে তোমার সঙ্গে।'

আরও কিছু বলত লাবনী, কিন্তু রাগী চেহারায় ভিডিয়ো লিঙ্ক কেটে দিল মাধুরী।

সশস্ত্র গার্ডের দিকে তাকাল অনুপম মঙ্গেলকার। 'মিস্টার রানা বিমান থেকে নেমে গেলে তাকে এয়ারফিল্ড থেকে বাইরে যাওয়ার সুযোগ দেবে।'

'ট্যাক্সি ডেকে দেবে না?' বলল রানা। ওর পিঠে অস্ত্রের নল দিয়ে খোঁচা দিল গার্ড। 'বুঝলাম, লোক তোমরা বিশেষ সুবিধার নও।' হ্যাচের দিকে পা বাড়িয়েও আবার ঘুরে দাঁড়াল। আঙুল তুলে দেখাল জ্যাক রিচিকে। 'আরেকটা কথা, তোমার পোষা মার্সেনারিকে বলো, সে যেন তার গাড়ির চাবিটা দেয়। হেঁটে ম্যানহাটানে যেতে হলে সময় লাগবে। তাতে কোডেক্স পেতেও দেরি হবে তোমার।'

তিক্ত চেহারা করে রানাকে দেখছে জ্যাক রিচি। কিন্তু অনুপম মঙ্গেলকার গাড়ির চাবি দিয়ে দিতে বলায় মানা করল না। তার ছুঁড়ে দেয়া চাবি রানা নিতেই বিলিয়নেয়ারের দিকে ফিরল সে, 'আমি ফিরব কী করে?'

'সেটা আমার মাথাব্যথা না,' সোজা বলে দিল ভারতীয় ব্যবসায়ী, 'আজ যেভাবে বুদ্ধু বনলেন, এরপর আপনাকে চাকরিতে রাখব কি না সেটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।'

চাবিটা ঝুনঝুন করে নাড়ল রানা। 'চিন্তা কোরো না, রিচি, তোমার যা গুণ, কোথাও না কোথাও টয়লেট পরিষ্কারের কাজ পেয়ে যাবে।' হ্যাচ গলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে রিচির গাড়িতে উঠল রানা।

রানা ঘরে ঢুকতেই রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা প্রধান রবি বলে উঠল, 'মাসুদ ভাই! কী অবস্থা?'

ওর অ্যাপার্টমেন্টে জড় হয়েছে সবাই, তবে হলিউডের উদ্দেশে চলে গেছে নামকরা নায়ক গিবন মুর। সত্যিকারের বিনয়ী মানুষ। রবিকে বলেছে, তার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে যে সহায়তা রানা দিয়েছে, তাতে বাকি জীবনেও ঋণ শোধ করতে পারবে না সে।

এখন ঘরে উপস্থিত রায়হান রশিদ, রবি চৌধুরি, তার বান্ধবী

লোলা ভার্নিও— যে ছিল নায়কের নকল প্রেমিকা, আতাসি, লিপি গোমেজ ও গিল্টি মিয়া। এ ছাড়া রয়েছে, লিগুসে হাওয়ার্ড। সে রানা এজেন্সির পুরনো এজেন্ট। এনওয়াইপিডির হেডকোয়ার্টারের গ্যারাজ থেকে গাড়ি চুরি করে পুলিশ অফিসারের অভিনয় করেছে হোটেলের কাছে।

এখন সবার চোখে দুশ্চিন্তা ও কৌতূহল।

'ঘুরে এলাম মঙ্গেলকারের প্লেন থেকে,' বলল রানা। টেবিলে রাখা খালি ব্রিফকেস দেখল।

জ্যাক রিচির ব্রিফকেসে বসানো হয়েছিল সহজ মেকানিযম বা উচ্চশক্তি চুম্বক। খোলাও ছিল হ্যাণ্ডেলের স্ক্রু। ঠিক সময়ে কাজ করেছে রায়হানের রেডিয়ো কণ্ট্রোল্ড সার্কিট। বাটন টিপতেই খসে গেছে হ্যাণ্ডেল থেকে ব্রিফকেস, ওই একই সময়ে গায়ে জোর ধাক্কা দিয়ে সমান ওজনের হ্যাণ্ডেলহীন ব্রিফকেস মার্সেনারির হাতলে আটকে দিয়েছে এক্সপার্ট গিল্টি মিয়া। চট্ করে ভিড়ের মধ্যে অদল-বদল করা সহজ ছিল ওর জন্যে। তাতে লেগেছে বড়জোর আধ সেকেণ্ড।

'বস্, এরপর কী হলো?' জানতে চাইল আতাসি। 'ম্যাডাম লাবনীকে যে দেখছি না?'

'যা ভেবেছি, তাই, প্লেনে বা এয়ারফিল্ডে ছিল না। আপাতত নিরাপদ। অনুপম মঙ্গেলকার আবারও লেনদেন করতে চায়। এবার যেতে হবে আমাকে ভারতে।'

'মানে, ওর হাতের মুঠোয়,' বলল রায়হান, 'নিশ্চিন্তে খুন...'

'চেষ্টা করবে। তবে তার আগে ওর পেতে হবে কোডেক্স। চোখ-কান খোলা রাখব।'

'কিন্তু, সার, বাগের গুহোয় ঘোগের ডুকে পড়া কি ঠিক হচ্ছে?' জানতে চাইল গিল্টি মিয়া।

'সেজন্যেই সঙ্গে একজনকে নেব,' বলল রানা।

লোলা ও লিপি ছাড়া অন্যরা প্রায় একই সময়ে কথা বলে উঠল। ওরাও যেতে চায় রানার সঙ্গে ভারতে।

মাথা নাড়ল রানা। 'সাহায্য অফার করায় অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু না, জ্যাক রিচি বা তার লোক হয়তো দেখেছে তোমাদেরকে। কাজেই ঝুঁকি নেব না।'

'তা হলে কাকে নেবেন ভাবছেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল রবি চৌধুরি। 'বিসিআই থেকে কাউকে?'

ওর সাহায্য দরকার শুনলে সব ফেলে দুনিয়ার চারপাশ থেকে ছুটে আসবে অন্তত বিশজন দুর্ধর্ষ লড়াকু বন্ধু, কিন্তু তারা কেউ আন্তর্জাতিক পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে যাক, তা চাইছে না রানা। 'না, আমি আছি ছুটিতে, আর বিসিআই-এর সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। কাজ নেই এমন কোনও ইউরোপিয়ান বন্ধুর সাহায্য নেব।' কয়েক সেকেণ্ড পর দ্বিধা ছাড়াই বলল রানা, 'জ্যাঁ মউরোস।'

'কিন্তু আমরা জানি, মউরোস ক'দিন আগে উরুতে গুলি খেয়েছেন,' বলল রায়হান, 'আপাতত দৌড়ঝাঁপ পারবেন না।'

'ওই একই কারণে সন্দেহ করবে না কেউ ওকে,' বলল রানা, 'এক পর্যায় পর্যন্ত ও দেখবে আমার পিঠ নিরাপদ কি না।'

ফরাসি মার্সেনারি জ্যাঁ মউরোস সম্পর্কে সব কথা জানে না রবি, আতাসি বা রায়হান, তবে ওরা বুঝে গেল, বন্ধুর ওপর পুরো ভরসা আছে মাসুদ রানার। আপত্তি তুলল না কেউ।

পনেরো

'আসলে ইণ্ডিয়া সম্পর্কে কতটুকু জানো, রানা?' পাশের সিট থেকে জানতে চাইল জ্যাঁ মউরোস।

'বিশাল দেশ,' বলল রানা, 'প্রায় সব বড় শহরে গেছি। কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় আছে, ব্যস।'

'তাদের কেউ সাহায্য করবে?'

'হয়তো, যদি সাহায্য চাই। ইন্টারপোলের এজেন্ট অঙ্কুর রায় এখন এ দেশে। তার সঙ্গে পরিচয় আছে। সে হয়তো কাজে আসবে।'

'জিম্মি ছুটিয়ে নেয়ায় সাহায্য করবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জড়াতে চাই না।'

'এদিকে ঠ্যাং খোঁড়া আমি...' বিড়বিড় করল মউরোস। একটু পর বলল, 'বিসিআই-এর তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জানলেই সব ফেলে ছুটে আসবে। এ ছাড়া, দুনিয়ার নানান প্রান্ত থেকে আসবে অন্য বন্ধুরা। কিন্তু তুমি কাউকে কিছুই বলবে না।'

'আগেই ঠিক করেছি আপাতত কারও সাহায্য নেব না। গোলমালে জড়াতে পারি ইন্টারপোলের সঙ্গে। তুমি যে এলে, তোমাকে উঠতে হবে অন্য হোটেলে। চোখ রাখবে দূর থেকে।'

'সাধ্যমত করব,' বলল মউরোস, 'কখনও ভুলব না, কতবার বিপদের সময় পাশে পেয়েছি তোমাকে। মরে যাওয়ার কথা ছিল,

শেষবার আটলাণ্টিক সাগরের কত গভীর থেকে তুলে এনেছিলে! একবারও ধন্যবাদ দিইনি। যদি তোমার কাজে আসতে পারি, সে তো আমার সাত কপালের ভাগ্যি!'

চুপ করে থাকল রানা।

'আমরা ওই ভারতীয় শালাকে উল্টো কিডন্যাপ করলে?' দুষ্টু হাসল জ্যাঁ মউরোস।

মাথা নাড়ল রানা। 'কাজটা সহজ হবে না।'

সিটে জ্বলে উঠেছে এয়ারলাইনারের বাতি, অবতরণ করবে মস্ত এয়ার বাস থ্রি নাইণ্টি।

'পরে দেখা হবে,' ক্রাচে ভর করে নিজের খালি সিটের দিকে চলল মউরোস।

বিমানে আলাদা দুই অংশে সিট নিয়েছে ওরা।

রানার ধারণা, এরই ভেতর নিউ ইয়র্কের বাইরে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, ইউএন ভল্ট থেকে স্টাডা কোডেক্স চুরি করেছে ও।

সেক্ষেত্রে এয়ারপোর্টে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে দিল্লি পুলিশ বা ইণ্টারপোল এজেণ্টরা।

মোটেও উচিত হবে না মউরোসকে পাশে রাখা।

তার চেয়েও খারাপ কিছু হতে পারে।

হয়তো নজর রাখছে এয়ারপোর্টে মঙ্গেলকারের লোক।

পাঁচ মিনিট পর রানওয়ে স্পর্শ করল বিমান। ঘুরে ধীরে ধীরে চলল টার্মিনালের দিকে।

সিট ছেড়ে যাত্রীদের সঙ্গে মিশে রওনা হবে ভাবছে রানা, তখনই অর্জন করল নতুন জ্ঞান।

বিমানের হ্যাচে আটকে গেছে ইন্দিরা গান্ধী ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের উঁচু জেটওয়ে, এমনসময় ইণ্টারকমে জানালেন ক্যাপ্টেন, নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে আপাতত সিটে বসে থাকতে হবে যাত্রীদেরকে।

দূর থেকে রানার দিকে তাকাল মউরোস। চোখাচোখি হলো ওদের। দু'মিনিট পর বিমানে এসে ঢুকল তিন সশস্ত্র পুলিশ অফিসার। অ্যাটেণ্ড্যান্টের সঙ্গে নিচু স্বরে আলাপ করল তাদের নেতা। বারকয়েক মাথা দোলাবার পর পথ দেখিয়ে রানার পাশে এসে থামল সুন্দরী মেয়েটা। কড়া সুরে জানতে চাইল অফিসার ইন চার্জ, 'আপনিই মাসুদ রানা?'

'জী,' সরল হাসল রানা।

'দয়া করে আমাদের সঙ্গে আসুন।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিট ছাড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতদুটো টেনে নিয়ে হ্যাণ্ডকাফে আটকে দিল পুলিশ অফিসার।

ওকে নামিয়ে নেয়া হলো বিমান থেকে।

রানা আগেই ভেবেছে: দিল্লি শহরে আসতেই ওকে তুলে দেয়া হবে না ফিরতি কোনও বিমানে। গ্রেফতারও করবে না ইণ্টারপোল এজেণ্টরা। জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে ও বলবে: 'কিছু জানতে হলে যোগাযোগ করুন জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের দপ্তরে। যা বলার ওখান থেকেই বলে দেয়া হবে। সবই বিস্তারিতভাবে লিখে মহাসচিবের কাছে চিঠি দিয়েছি।'

আসলে বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে আলাপ করেই যা করার করেছে রানা।

দিল্লি পুলিশ ঝামেলা করবে, সেটাও মাথায় রেখেছে।

যাদের কারণে কোডেক্স লুঠ করতে হলো, তাদেরকে ছুঁয়েও দেখবে না ভারতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। শুধু তাই নয়, বেআইনী কিছুও করতে পারে: হয়তো অনুপম মঙ্গেলকারের হাতে তুলে দেবে ওকে। তাতে যে খুব আপত্তি আছে ওর, তাও নয়। বুঝে গেছে, এ ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই।

টার্মিনালের সিকিউরিটি এরিয়ায় কি-প্যাড লাগানো এক দরজার সামনে রানাকে নিয়ে থামল তিন পুলিশ অফিসার। দেখা

গেল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। আগেও তাকে দেখেছে রানা মঙ্গেলকারের বিমানে। করাতের ফলার মত চোখা দাঁত।

দরজা খুলে ঘরে ঠেলে দেয়া হলো রানাকে।

বাইরে চারপাশ দেখছে অফিসার ইন চার্জ। হাঙর-দেঁতো তার হাতে তুলে দিল নোটের পুরু বাণ্ডিল। ওটা চট্ করে চলে গেল অফিসারের প্যান্টের পকেটে।

রানা বুঝল, এরা নিয়মিত ঘুষ নিচ্ছে মঙ্গেলকারদের কাছ থেকে। ফাঁকা করিডোরের দু'পাশে একের পর এক রুম। সব দরজা বন্ধ। কেউ নেই এদিকে। হ্যাণ্ডকাফ পরা ওকে যা খুশি করতে পারবে এরা।

'একে দিয়ে এসো মিস্টার ব্যাপারীর গাড়িতে,' অন্য দু'জনকে বলল অফিসার ইন চার্জ। একটু দূরে শাখা করিডোর, ওদিকেই আছে এগযিট।

দু'পাশ থেকে খপ্ করে রানার কাঁধ ধরল দুই পুলিশ। ওকে চোখা দাঁতের হাসি দিল সন্তোষ ব্যাপারী। প্রায় শূন্যে তুলে রানাকে ঘর থেকে বের করল অফিসাররা।

কিন্তু তখনই কড়া সুরে আদেশ দিল কেউ। 'থামো!'

ঘাড় কাত করে তাকাল রানা, বিস্মিত। হনহন করে হেঁটে আসছেন অঙ্কুর রায়, সঙ্গে ভারতীয় পুলিশের ইউনিফর্ম পরনে উচ্চপদস্থ এক অফিসার। কালো হয়ে গেল তিন পুলিশের মুখ। চট্ করে দেখল সন্তোষ ব্যাপারীর দিকে। হঠাৎ করেই প্রায় লাফিয়ে উঠে তুমুল দৌড় দিল লোকটা এগযিটের দিকে। মাত্র কয়েক মুহূর্তে হারিয়ে গেল দূরের গেট পেরিয়ে।

'হঠাৎ আপনি, মিস্টার রায়?' জানতে চাইল রানা।

এইমাত্র সামনে থেমেছেন অঙ্কুর রায়। 'লোকটা কে ছিল?' আরেকবার দেখলেন শাখা করিডোরে।

'অনুপম মঙ্গেলকারের অনুচর।'

জুনিয়র অফিসারদেরকে লালচে চোখ পাকিয়ে দেখলেন বড় অফিসার, বাপ-মা তুলে গোটা দশেক গালি দিলেন। তিনজনের ভেতর সবচেয়ে বড় অফিসারের সামনে হাত পাতলেন।

তিক্ত চেহারায় প্যান্টের পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করল সে। আরেক ধমক খেয়ে অ্যাটেনশন হয়ে লাইন তৈরি করল তিনজন।

'পরে দেখছি এদের কী করা যায়,' অঙ্কুর রায়কে বললেন বড়কর্তা। নোটের বাণ্ডিল পকেটে রেখে রানাকে দেখলেন। 'এর ব্যাপারে কী করবেন, মিস্টার রায়?'

'ইনি এমন কিছু করেননি যে গ্রেফতার করা যায়,' বললেন মিস্টার রায়, 'ইন্টারপোল ম্যাটার নয়। যেখানে খুশি যেতে পারেন। তবে তার আগে একটু আলাপ করতে চাই। খালি কোনও ইন্টারোগেশন রুম পাওয়া যাবে?'

পাশের দরজা দেখিয়ে দিলেন বড় অফিসার।

রানাকে নিয়ে ঘরে ঢুকবেন মিস্টার রায়, তার আগে ওরা দেখল, জুনিয়র অফিসারদের বড়জনের পাছায় কষে একটা লাথি দিয়ে করিডোর ধরে তিনজনকে খেদিয়ে নিয়ে চললেন বড়কর্তা।

ঘরের দরজা থেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ওদের বিচার হবে?'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন অঙ্কুর রায়। 'পাগল নাকি! ওদের জীবনের বড় একটা দুঃখ, মোটা অঙ্কের ওই ঘুষের সামান্য অংশই পাবে। ওদের দলনেতা পাছায় লাথিটা খেল ধরা পড়েছে বলে। ওই বড়কর্তা একবার অবসরে চলে গেলে, তখন সুযোগ পেলে তার পোঁদে লাথি দিতেও দেরি করবে না এরা। এই চলছে বছরের পর বছর ধরে। ভারতে সরকারী কেরানি থেকে শুরু করে বড় প্রায় সব রাজনৈতিক নেতা ঘুষের টাকায় ফুলছে। আপনার তো জানা থাকার কথা, ওই একই অবস্থা আপনাদের দেশেও।

পাকিস্তানের তো আরও করুণ অবস্থা। আফ্রিকা বা এশিয়ার এসব দেশে আরও বহু বছর লাগবে এদের নিমকহারামি দূর হতে।' হাতের ইশারা করে ইণ্টারোগেশন ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি।

ছোট একটা টেবিলে মুখোমুখি হয়ে চেয়ারে বসল দু'জন।

'আপনি হঠাৎ এখানে?' আবারও জানতে চাইল রানা।

'স্টাডা কোডেক্সের মত দামি আর্টিফ্যাক্ট লুঠ করেছেন, ইউএন থেকে নিষেধ করে না দিলে আপনাকে ধরতে রেড অ্যালার্ট জারি করত ইণ্টারপোল। আমাদের দেরি হয়েছিল, নইলে আটকা পড়তেন নিউ ইয়র্কেই। পরে শুনলাম আপনার চিঠি পেয়ে ইউএন-এর মহাসচিব জানিয়ে দিয়েছেন, মিস্টার রানা ইউএন-এর অ্যাণ্টি-টেরোরিস্ট ইউনিটগুলোর সেরা দলটির নেতা, কাজেই জরুরি কোনও কারণ ছাড়া বেআইনীভাবে স্টাডা কোডেক্স সরিয়ে নেননি তিনি। তাই মহাসচিব ভাবছেন: এখনই আপনাকে বাধা দেয়া অনুচিত হবে। আর এসব জেনেই আমি ভাবলাম, আপনি এখানে এলে আলাপ করব। কপাল ভাল, ঠিক সময়ে হাজির হয়েছি। ...আসলে কী হয়েছে, বলুন তো, মিস্টার রানা?'

ফ্রান্সে ইণ্টারপোল অফিস থেকে নিউ ইয়র্কে ফেরার পর কী ঘটেছে, সবই সংক্ষেপে জানাল রানা। সামান্য বিরতির পর বলল, 'জানতাম, ঠিকই কিডন্যাপ করতে চাইবে অনুপম মঙ্গেলকার ও তার স্ত্রী। সেজন্যে মানসিকভাবে তৈরিও ছিলাম। আমার কাজ ওদের কাছে পৌঁছে নিরাপদে লাবনীকে সরিয়ে নেয়া। আরও একটা কাজ আছে, ঘনিষ্ঠ এক ছোট ভাইকে খুন করেছে ওরা, কাজেই প্রথম সুযোগে প্রতিশোধ নেব। এদিকে বন্দি করতে পারলে নির্যাতনের মাধ্যমে আমার পেট থেকে কোডেক্সের খবর বের করবে তারা। বলতে পারেন, দুই পক্ষের ভেতর হচ্ছে অদ্ভুত অসম প্রতিযোগিতা। আমি দুর্বল পার্টি।'

চিন্তায় ডুবে গেলেন মিস্টার রায়। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'মস্ত

ঝুঁকি নিয়েছেন, রানা। মাত্র জানছি মঙ্গেলকারদের সম্পর্কে। এরই ভেতর পেয়েছি অদ্ভুত কিছু তথ্য।'

'সেগুলো কী ধরনের?'

'অসংখ্য ফিন্যানশিয়াল অ্যাকটিভিটি। দুর্গম এলাকায় জমি ও বাড়ি কিনছে, বিপুল টাকার খাবার ও নানান জিনিস কেনা হচ্ছে। দাতব্য সব সংগঠনকে দেয়া হচ্ছে শত শত কোটি টাকা। সবই আইনী পথেই হচ্ছে, তা মনে করছি না। কিন্তু এসব করছে কেন? নিশ্চয়ই এদের বড় কোনও পরিকল্পনা আছে? সেটা এখনও বুঝতে পারিনি।'

'ভাল দিক, সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছেন।'

মৃদু হাসলেন অঙ্কুর রায়। 'স্বাভাবিক। কাগজপত্র এখনও সব ঠিক, তবুও অস্বাভাবিক লাগছে। এরা কেন এসবে নিজেদেরকে জড়াবে? আপাতত কোনও প্রমাণ নেই হাতে, কিন্তু এটা জানি, ফ্রান্সের লিয়ন শহরে মঙ্গেলকারদের জন্যেই নিজের জান দিয়েছে মায়া খোইল। এ-ও বুঝি, জর্জ মাইকেলের লুঠেরা দলকে কাজে লাগিয়ে নানান দেশের আর্টিফ্যাক্ট চুরি করাচ্ছে এরাই। তাদের ব্যাঙ্ক রেকর্ড জোগাড় করব, তাতে হয়তো বেরোবে পাচার করছে টাকা। সেক্ষেত্রে ঠিক সময়ে জালে তুলব লক্ষ-কোটি টাকার ওই দুই কুমিরকে।'

'এখনও কোনও ধরনের ব্যাঙ্ক রেকর্ড জোগাড় হয়নি?'

'তেমন কিছুই না! ঠিকই বলেছিলেন, মঙ্গেলকারদের নাক পুরো ডুবে আছে পাপের গভীরে। এখন দরকার প্রমাণ।'

'এটা কি প্রমাণ নয়, মায়া খোইল তাদের হয়ে কাজ করত? কাজেই জিজ্ঞাসাবাদ তো করতেই পারেন।'

'এখনই দেখাব না হাতের তাস। আপনি বোধহয় বুঝতে পারেননি, ভারতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক অনুপম মঙ্গেলকার। প্রতিটি পদে বাধা দেবে। ইন্টারপোলে আছি, কিন্তু সাহায্য নিতে

হবে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে। বলব না সৎ পুলিশ নেই, কিন্তু যারা ভাল, তারা ভয় পাচ্ছে মঙ্গেলকারদের বিরুদ্ধে কিছু করতে। যখন-তখন খতম করে দেবে ক্যারিয়ার। ওই ঝুঁকি না নিয়ে টাকা খেয়ে চুপ করে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।'

'তার মানে আপাতত তেমন কিছুই করার নেই,' বলল রানা। 'এখন কী করবেন ভাবছেন?'

পকেট থেকে ছোট চাবি বের করে রানার হ্যাণ্ডকাফের তালা খুললেন অঙ্কুর রায়। 'আমার মনে হচ্ছে, আমরা আসলে একই দলের লোক, বিপদে পাশে লড়লে পেয়েও যেতে পারি মঙ্গেলকারদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণ। তখন সহজেই উদ্ধার পাবেন ডক্টর লাবনী আলম। হাতেনাতে ধরব ওদেরকে। কাউকে কিডন্যাপ করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিলে সেই কেসের দায়িত্ব ইন্টারপোলের। ওই সুযোগটা নেব, একবার আমেরিকার আদালতে ওদেরকে তুলতে পারলে কঠিন হবে মুক্তি পাওয়া।'

টেবিলে হ্যাণ্ডকাফ রাখল রানা। 'তো আপাতত একই দলে কাজ করছি আমরা?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। ক্যারিয়ার নিয়ে ভয় পাচ্ছি, কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে জিতে গেলে নিজেকে মনে হবে সত্যিকারের বাঘের বাচ্চা।' মৃদু হাসলেন অঙ্কুর রায়। 'এবার বলুন, কী করতে চান?'

ডিসেম্বর মাসেও শীতের দেখা নেই। এয়ার কণ্ডিশনার নষ্ট গাড়িতে ধুলোবালি ও ধোঁয়ার মাঝে অঙ্কুর রায়ের পাশে বসে আছে রানা। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম, হাজার হর্নের হরেক আওয়াজে ভোঁ-ভোঁ করছে কান।

ইঞ্চি-ইঞ্চি করে মধ্য দিল্লির দিকে চলেছে ওরা।

'জ্যাম আরও বাড়বে,' বললেন মিস্টার রায়। 'জি২০ শীর্ষ

সম্মেলন শুরু হলে টেকা যাবে না এ শহরে। এরই ভেতর বন্ধ করে দিয়েছে প্রধান বেশ কয়েকটা সড়ক।'

চুপ করে আছে রানা।

আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীরা নিজ সুবিধা দেখবে, এটাই এশিয়ার সব দেশে স্বাভাবিক।

গাড়ি থাকা সত্ত্বেও গন্তব্যের শেষ এক মাইল পেরোল ওরা চল্লিশ মিনিট ব্যয় করে। প্রধান কিছু সড়ক বন্ধ করে দেয়ায় এত ঝক্কি সাধারণ মানুষের। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিজয় চক জেলায় আর্চার্ড হোটেলে ঘেমে-নেয়ে পৌঁছুল ওরা।

লবিতে অপেক্ষা করছিল মউরোস। ক্র্যাচে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাপারটা কী, এত দেরি কীসের?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পুলিশি সমস্যা, তুমি এত তাড়াতাড়ি এলে কীভাবে?'

'মেট্রো রেল। পুরো এক ডলার লাগে না, এয়ারপোর্ট থেকে উঠে সোজা দিল্লির বুকে এসে ল্যাণ্ড করেছি।' অঙ্কুর রায়কে একবার দেখে নিল মউরোস। 'বলেছিলে পারতপক্ষে ভারতীয় কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না।'

দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'মিস্টার রায় মঙ্গেলকারদের বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন।'

'অন্তর থেকে বুঝতে পারছি, মঙ্গেলকাররাই সরিয়ে ফেলছে নানান দেশের দামি সব আর্টিফ্যাক্ট, কিন্তু জরুরি প্রমাণের অভাবে তাদেরকে ধরতে পারছি না,' মউরোসকে বললেন অঙ্কুর রায়।

'পারবেন,' জোর দিয়ে বলল মউরোস, 'রানার সঙ্গে লেগে থাকুন। কিডন্যাপিঙের কেসও ঠুকতে পারবেন।'

রিসেপশন ডেস্কে থামল রানা।

'আমার জন্যে একটা প্যাকেজ আসার কথা। বাংলাদেশ দূতাবাসের। এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে।'

কমপিউটারের কি-বোর্ডে টোকা দিল রিসেপশনিস্ট। ‘জী। আপনার জন্যে এখনই নিয়ে আসছি।’ পেছনের রুমে চলে গেল সুন্দরী মেয়েটা। দু’মিনিট পর ফিরল ভারী, বড় এক কার্ডবোর্ডের বাক্স হাতে।

‘জিনিসটা কী?’ জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

‘জরুরি জিনিস,’ সংক্ষেপে সারল রানা।

বাক্সের প্লাস্টিকের লেবেলে ইংরেজিতে লেখা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। বাংলাদেশ দূতাবাস। দয়া করে এক্স-রে করবেন না।

সরাসরি পাঠানো হয়েছে ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসে। ওখান থেকে ওটা এই হোটেলে দিয়ে গেছে সেকেণ্ড অফিসার রাজ্জাক আলী।

অঙ্কুর রায়ের চোখে কৌতূহল দেখে বলল রানা, ‘কোডেক্স আর ওয়ালথার .৩৮ পি.পি.কে.। শেষের জিনিসটা কাজে আসবে লাবনীকে সরিয়ে নেয়ার সময়।’

হোটেলের নীরব বার-এ থামল ওরা।

স্টুলে বসার পর জিজ্ঞেস করলেন অঙ্কুর রায়, ‘ভাল হতো না ব্যাঙ্গালোরের বদলে দিল্লিতে তাদেরকে ডেকে আনলে?’

অল্প কথায় পরিস্থিতি খুলে বলল রানা।

‘দিল্লিতে সহজেই ব্যাকআপ পেতাম,’ বললেন অঙ্কুর রায়।

‘সে সময়ে মাধুরী মঙ্গেলকারের কথা ফেলতে পারিনি,’ বলল রানা, ‘এখন আর কিছু করার নেই।’

‘নিজ শহরে থাকবে ওরা,’ মন্তব্য করল মউরোস, ‘নানান কৌশল করবে।’

‘চেষ্টা করবে, কিন্তু আগে থেকে তাদেরকে কিছুই জানাব না,’ বলল রানা, ‘কথা ঠিক হওয়ার একঘণ্টার ভেতর দেখা করব। আগেই পৌঁছে দেখে নেব চোখ রাখছে কি না তাদের লোক।’

অঙ্কুর রায়ের দিকে তাকাল। ‘আগেই স্থির করতে হবে আমরা কোথায় থাকব। ব্যাঙ্গালোর ভাল করে চেনেন?’

মাথা দোলালেন মিস্টার রায়। ‘মাঝে মাঝেই যেতে হয়, ওখানে গজিয়ে উঠেছে নতুন একদল কমিউনিকেশন মিলিয়নেয়ার। তাদের কেউ কেউ ঝুঁকে পড়ে চোরাই আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহে।’

‘স্থানীয় পুলিশের কাউকে চেনেন?’ জানতে চাইল মউরোস।

‘হ্যাঁ, কিন্তু জোরালো প্রমাণ না পেলে মঙ্গেলকারদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলবার সাহস হবে না তাদের। সাহায্য চাইতে পারি, তাতে কতটা কাজ হবে, বলা মুশকিল।’

‘আপনি খোলা কোন্ জায়গা বেছে নেবেন জিম্মিকে ফেরত পাওয়ার জন্যে?’ জানতে চাইল রানা। ‘এমন কোথাও, যেখানে যথেষ্ট সিকিউরিটি থাকবে।’

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন অঙ্কুর রায়, ‘বলুন তো, ক্রিকেট খেলা কেমন পছন্দ আপনাদের?’

ষোলো

‘আমি ক্রিকেট পছন্দ করি না,’ গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে ঢুকে বলল মউরোস।

গেট দিয়ে ঢুকেই ওর কানের কাছে বলল রানা, ‘ক্রিকেট খেলা দেখতে হলে রুচি লাগে।’

‘উঁহ্!’ নাক বাঁকা করে ফেলল মউরোস। ‘দু’ দিনের যোগী,

ভাতকে বলে অন্ন!'

'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, বাছা, ফ্রান্সের ক্রিকেট টিমকে এক শ'বারের ভেতর এক শ'বারই হারাতে পারবে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম।'

'কবে বিশ্বকাপ জিতল, অ্যাঁ?'

'আসল কথা হচ্ছে স্পোর্টস্‌ম্যানশিপ, ওটা আমাদের আছে,' বলল রানা। 'জিতে যাওয়াই সব কিছু নয়।'

'যাই বলো, খুব বিরক্তিকর খেলা। ফুটবল খেলা বা ফর্মুলা ওয়ানের সঙ্গে ওটার তুলনা হয়?'

'এই স্টেডিয়ামে বিরক্তি লাগবে না আপনার,' বললেন অঙ্কুর রায়, পেছন পেছন চলেছেন। হাতে ভারী ব্যাগ। এম. চিনাস্বোয়ামি স্টেডিয়ামে সার্চ ছাড়া ঢুকতে গিয়ে গার্ডদেরকে দেখাতে হয়েছে নিজের আইডি। 'ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ম্যাচের মত বোরিং হয় না এশিয়ার খেলা।'

ভুরু কুঁচকে চারপাশ দেখল মউরোস। 'ঠাট্টা করছেন?'

জবাব দিল না রানা বা অঙ্কুর রায়।

নিজে থেকেই বুঝে গেল মউরোস তফাৎ কোথায়।

এখনও খেলা শুরু হয়নি, অথচ এরই ভেতর চারপাশ জমিয়ে কার্নিভাল তৈরি করে ফেলেছে হাজার হাজার দর্শক। বিকট আওয়াজে বাজছে নানান বাজনা ও গান। লাউড স্পিকারের অভাব নেই। ওগুলোর সঙ্গে গলা ফাটিয়ে গাইছে অনেকে। হাততালি দেয়া হচ্ছে জোর আওয়াজে। হাতে তৈরি ভেঁপু ও ড্রামের কদরও কম নয়। প্রায় সবার হাতে পছন্দের দলের পতাকা বা ব্যানার। গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের সামনে প্রায় উলঙ্গ হয়ে নেচে চলেছে একদল তরুণী। মেরিলবোন ক্রিকেট ক্লাবের সদস্যরা এসব দেখলে মনের দুঃখে ঢকঢক করে জিন ও টনিক গিলতে শুরু করে

ভাবেন, কেন তাঁদের দেশের মানুষ এমন ফুর্তি করে না!

'ঠিক, মিস্টার রায়, বাপের জন্মেও দেখিনি এত লোক জড় হয় ক্রিকেট খেলা দেখতে!' স্বীকার করল মউরোস।

আলাদা হয়ে গেল ওরা। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে নিজেদের সিটের দিকে চলল রানা ও অঙ্কুর রায়। সাবধানে জায়গা বেছে নিয়েছে ওরা। বেশ কয়েকটি খালি সিটের সামনে রানার সিট। লাবনীকে নিয়ে পেছনের কোনও খালি সিটে বসবে অনুপম মঙ্গেলকার। তাদের পেছনের একটা সিটে থাকছেন অঙ্কুর রায়। পরিষ্কার দেখবেন কী হচ্ছে। ঝামেলা হলে কোডেক্স নিয়ে বেরিয়ে যাবেন এগযিট দিয়ে। একটু দূরে মউরোস। হাতে বিনকিউলার। বিপদ দেখলে আগেই ইশারায় সতর্ক করে দেবে রানাকে।

নিজের সিটে বসে পড়েছে রানা। দেখছে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড। দর্শকদের বেশিরভাগই পুরুষ। নানান বয়স তাদের। পোশাকও একেকজনের একেকরকম।

ওর মনে হলো না কারও মনোযোগ আছে এদিকে। প্রায় সবার চোখ চিয়ারলিডারদের বুক ও তলপেটে।

চট্ করে অঙ্কুর রায়কে দেখল রানা। তাতে সামান্য মাথা দোলালেন ইণ্টারপোল এজেন্ট।

নিজের সিটে বসে পড়েছে মউরোস। চারপাশের চেয়ার ভরে উঠছে দর্শকে। এখন পর্যন্ত কোনও বিপদের আশঙ্কা দেখেনি।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ওটার সঙ্গে ব্লুটুথ হেডসেট আটকে কানে দিল রানা। ডায়ালে সংখ্যা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, মউরোস। সব চেক করে দেখো।'

'পরিষ্কার দেখছি তোমাদেরকে,' বলল মউরোস, 'আশপাশে কোথাও নেই অনুপম মঙ্গেলকার বা লাবনী।'

'এখনও সময় হয়নি। কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না। ক্রিকেট পাগল একদল দর্শক। সেটাই তো অত্যন্ত

সন্দেহজনক।'

'তুমি জীবনেও শিখবে না ভাল জিনিস কীভাবে গ্রহণ করতে হয়,' মাথা নাড়ল রানা।

'মর্, শালা!'

মৃদু হেসে আবারও চারপাশে চোখ বোলাল রানা। কোথাও দেখা গেল না অনুপম মঙ্গেলকার বা লাবনীকে। 'মউরোস, চোখ খোলা রেখো, দেখা যাক কী হয়।'

বিকট চিৎকারের মাঝ দিয়ে শুরু হলো ক্রিকেট খেলা।

ওদিকে পুরো মন না দিয়ে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে রানা। বহুক্ষণ পর এল পানীয় ও খাবারের বিরতি। জোরালো বাজনা বেজে উঠতেই ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয়ভাবে গুরুনিতম্ব দোলাতে লাগল চিয়ারলিডার দল, যে-কেউ ভাবতে পারে, তালকে তাল থলথলে মাংস যখন-তখন খসে পড়বে থপ্-থপ্ করে! নির্দিষ্ট বিরতির পর আবারও ব্যাটিং শুরু হতেই কানের কাছে মউরোসের কণ্ঠ শুনল রানা, 'বেয়াদব বৎস, বাম দিকে দেখো!'

ওদিকে ঘুরে তাকাল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে অনুপম মঙ্গেলকার, সঙ্গে লাবনী নেই। আর কেউ অন্য কোনও দিক থেকে আসছে কি না, তা বুঝতে চারপাশে চোখ বোলাল রানা। চিনে ফেলল এক লোককে। সে-ই লাবনীর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল প্লাস্টিকের ব্যাগ। চিন্তিত চেহারায় একবার রানাকে দেখলেন অঙ্কুর রায়। খুব অস্পষ্ট মাথা নাড়লেন। লাবনী নেই। কিন্তু আসছে মঙ্গেলকার ও তার লোক।

রানার বাম পাশের সিটে এসে বসল অনুপম মঙ্গেলকার। তার ডানদিকে দাঁড়াল কালো পোশাক পরা লোকটা।

'মিস্টার রানা,' ডাকল বিলিয়নেয়ার।

'মিস্টার মঙ্গেলকার,' জবাবে বলল রানা, 'আমি লাবনীকে দেখতে পাচ্ছি না। কিছু কি ভুলে গেছ?'

‘তোমার মতই,’ রানার সিটের নিচে একবার দেখে নিল অনুপম মঙ্গেলকার। ‘আমার কোডেক্সও দেখছি না?’

‘লাবনী কোথায়?’

‘আমার গাড়িতে।’

‘তো ওকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। আশা করি টিকেট কেনার পয়সা তোমার আছে।’

‘কোডেক্স তুমি কোথায় রেখেছ?’

‘চুক্তি অনুযায়ী লাবনীকে ফেরত দিলে ওটা পাবে। নিয়ে এসো ওকে।’

মোবাইল ফোন বের করে সংক্ষেপে কী যেন বলল অনুপম মঙ্গেলকার। তাকাল পিচের দিকে। প্রায় আলাপের সুরে রানাকে বলল, ‘কখনোই খেলা জিনিসটা আমার ভাল লাগেনি। বাবা খুব ভালবাসতেন ক্রিকেট। তাই ভেবে মাঝে মাঝে দু’একটা খেলা দেখি। কিন্তু দেখো কী করুণ অবস্থা পুরনো, সম্ভ্রান্ত এই খেলার।’ আঙুল তাক করে চিয়ারলিডারদেরকে দেখিয়ে দিল সে। ‘রুচিহীন নর্তন-কুর্দন। এ থেকে বোঝা যায়, সত্যিই পচে নষ্ট হয়ে গেছে এই পৃথিবী।’

কোনও জবাব দিল না রানা। খেয়াল করছে মঙ্গেলকারের পাশের লোকটার কাছে পিস্তল আছে কি না।

নেই।

কিন্তু অন্য কোনও অস্ত্র থাকতে পারে।

‘তুমি আসলে এই নোংরা পৃথিবীর পক্ষের মানুষ,’ বলল মঙ্গেলকার। ‘স্বর্গীয় কিছু বোঝার সাধ্য নেই।’

‘স্বর্গের কথা জানা নেই, কিন্তু তুমি যে নরকের নোংরা কীট, তা বুঝতে দেরি হয়নি আমার,’ বলল রানা।

ফাঁকা হাসি দিল অনুপম মঙ্গেলকার।

কানের ভেতর বলে উঠল মউরোস: ‘রানা, লাবনী পৌঁছে

গেছে। সঙ্গে এক লোক। তোমার বামে।'

ধীরে ধীরে ওদিকে চোখ বোলাল রানা।

লাবনীর সঙ্গে আসছে চোখা দাঁতওয়ালা লোকটা।

মনে হলো না মেয়েটাকে আবারও নির্যাতন করা হয়েছে। অবশ্য, জামাকাপড় এলোমেলো।

রানাকে দেখেই ওর চোখে-মুখে স্বস্তির ছাপ পড়ল।

'তুমি সুস্থ, লাবনী?' জানতে চাইল রানা।

'প্রায়,' কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল লাবনী।

রানা খেয়াল করল বেচারির কানের লতির ওপর ছোট্ট একটা ব্যাণ্ডেজ। 'কানে কী হয়েছে?'

খাস বাংলায় বলল লাবনী, 'আরেকটু হলে পেইন্টার ভ্যান গগের মত কানটা কুচ করে কাটা পড়ত। ওই মাধুরী মঙ্গেলকার আসলে কোনও ডাইনী নয়, সত্যিকারের রক্ত-পিশাচী! তার স্বামী আমাকে বলেছে, এরা জি-২০ সামিট কনফারেন্সে...'

'তোমরা ভদ্রতা বজায় রাখছ না,' নির্বিকার সুরে বলল মঙ্গেলকার। 'ইংরেজিতে বলো।'

'লাবনী বলছে, তোমার বউ দুনিয়ার সেরা বদ মেয়েলোক,' জানাল রানা। 'আমি আবার ওর কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি।'

'কী?' শীতল হয়ে গেল লোকটার চোখ। 'বাজে কথা! ডক্টর আলমকে এনে দিয়েছি, এবার কোডেক্স দাও!'

অঙ্কুর রায়ের দিকে ফিরবে রানা, এমনসময় নরম সুরে বলে উঠল লাবনী, 'রানা, সর্বনাশ হবে কোডেক্স দিলে। তার চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াও অনেক ভাল।'

কথাটা শুনে মনে মনে হোঁচট খেল রানা।

কী কারণে লাবনী ভাবছে, প্রাণের চেয়েও বেশি জরুরি কোডেক্স রক্ষা করা?

'কী সমস্যা হবে ওটা দিলে?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ মঙ্গেলকার চাইছে শিবের মতই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষকে মেরে সত্য যুগ ডেকে আনতে, তাই লাগবে ওই কোডেক্স।'

'এতই জরুরি?' ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'কোডেক্স দিয়ে কী করে ডেকে আনবে প্রলয়?'

'জানতে চাওয়ায় জবাব দেয়নি। কিন্তু তারপর...'

'কলি যুগ শেষ করা খুব জরুরি, ডক্টর আলম,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার। 'আগেও বলেছি, এই যুগ শেষ করে দেয়া মানব জাতির জন্যে সব দিক থেকে মঙ্গলকর।'

'তাই সে কাজের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে মঙ্গেলকার?'

'বুঝলে?' রানার দিকে তাকাল লাবনী। 'টাকাওয়ালা এক মাথা-নষ্ট লোক, ভাবছে পৃথিবীর বারোটা বাজিয়ে দিয়ে মঙ্গল করবে!'

সামান্য বিস্ময় নিয়ে বিলিয়নেয়ারের দিকে তাকাল রানা। 'সত্যিই ভাবছ মানবজাতির বেশিরভাগকে খতম করতে পারবে? কী করে? তোমার তো আণবিক বোমার ফ্যাক্টরি নেই, সার্চ ইঞ্জিনের বাটন টিপলেই দুনিয়া জুড়ে শুরু হবে থার্মোনিউক্লিয়ার ওঅর?'

আবছা সরু হাসি ফুটল মঙ্গেলকারের ঠোঁটে। 'যদি প্রলয় ডেকে আনতে পারব সে বিশ্বাস না-ই থাকে, তো কোডেক্স দিতে এত আপত্তি কীসের?' রানার চোখে তাকাল সে। 'ডক্টর আলমকে এনে দিয়েছি, এবার দাও কোডেক্স।'

চাঞ্চাল আধিকারীকে দেখল রানা। হাতের নাগালেই আছে সে। মাথা নাড়ল ও। 'না, মনে হচ্ছে লাবনীর কথার বাইরে যাওয়া আমার উচিত হবে না।'

'চুক্তির বরখেলাপ করলে ভুল করবে।'

'সেক্ষেত্রে কী করবে?' চারপাশ থেকে চোখ ঘুরিয়ে আনল

রানা। 'সবার সামনে খুন করবে আমাদেরকে?'

'এরা সবাই আমার লোক।' অনুপম মঙ্গেলকারের চাঁদের মত গোল মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। 'আমার চাকরি করে।'

'মিথ্যা বলছ,' বলল রানা। 'মাত্র দেড় ঘণ্টা আগে তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি আমরা এখানে আসছি।'

'এসব খেলার বড় স্পন্সার আমার কোম্পানি,' মাঠের দিকে আঙুল তাক করল বিলিয়নেয়ার। বিলবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে দ্য কোয়েশ্চেন সার্চ ইঞ্জিনের সব লোগো। 'যথেষ্ট প্রভাব আছে এখানে। তোমার ফোন পাওয়ার পর লোভনীয় প্রস্তাব পেল আমার কোম্পানির ক্রিকেট প্রেমীরা: আজ এখানে এসে ক্রিকেট খেলা দেখতে পারে। তিন শ' সাধারণ দর্শক যারা আগেই টিকেট কিনে ফেলেছিল, তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, বুকিং-এ সমস্যার কারণে তাদের টিকেট বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য, পরে যে-কোনও ক্রিকেট খেলার দিন তারা ফ্রি টিকেট পাবে।' মুচকি হাসল অনুপম মঙ্গেলকার। 'রানা, তুমি তো আগেই আন্দাজ করেছ, টিকেট কেনার পয়সা আমার আছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল লাবনী ও রানা, চিন্তিত।

ব্যাটসম্যান চার মারতেই চারপাশে দুলতে লাগল নানান ব্যানার। চাপা স্বরে বলল রানা, 'মউরোস! ঝামেলা!'

'মোঁসিউ মউরোস আজ সাহায্য করতে পারবে না,' অনুপম মঙ্গেলকারের কথা শুনে চমকে গেল রানা। 'হ্যাঁ, তাকে ভাল করেই চিনে নিয়েছি। কোনও ঝামেলা করতে পারবে না সে। তোমার বন্ধুদের সবার তালিকা করেছে দ্য কোয়েশ্চেন। ভারতীয় ইমিগ্রেশন ফাইল ক্রস-চেক করা হয়েছে। আসলে ওদের জন্যে সফটওয়্যার তৈরি করে আমার কোম্পানি। সেসময় পেছন দরজা বা কোড তৈরি রাখি আমরা। সহজেই জেনে নিয়েছি, এই দেশে তোমার বন্ধুরা এসেছে কি না।'

মউরোস যেখানে আছে, ওদিকে চোখ গেল রানার।

ঝটকা-ঝটকি চলছে!

'চোখ রাখতে নিয়ে এসেছিলে, তাতে কাজ হলো না,' বলল মঙ্গেলকার। তার দিকে ঘুরে তাকাল রানা। 'আমার চাকরি করে আকারে বড়সড় এমন কয়েকজন এখন তাকে ধরে রেখেছে। আপাতত সিট ছেড়ে উঠতে পারবে না। আর ওদিকে তোমার ইন্টারপোলের বন্ধু...'

ঘুরেই অঙ্কুর রায়কে ইশারা করল রানা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ইন্টারপোল এজেন্ট, কিন্তু তখনই দাড়িওয়ালা এক দানব পেছন থেকে টেনে তাঁকে বসিয়ে দিল সিটে।

দানবকে ভাল করেই চেনে লাবনী।

মিস্টার রায়ের ঘাড়ে নামল নরেশ শর্মার হাতুড়ির মত ভয়ঙ্কর একটা কিল। তীব্র ব্যথায় পিঠ বাঁকা করে ফেললেন বেচারা। গলা চিরে বেরোল আর্তচিৎকার, কিন্তু বিকট আওয়াজের তলায় হারিয়ে গেল সব। হৈ-হৈ করছে সবাই। এইমাত্র আবার চার মেরেছে।

সারাদেহে অ্যাড্রেনালিন ছড়িয়ে পড়ল রানার। লাবনীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে কালো পোশাক পরা লোকটা, পাশেই চোখা দাঁত। কিন্তু বসের বিপদ হলে থামবে এরা।

ঝট্ করে পিস্তল বের করেই অনুপম মঙ্গেলকারের কপালে তাক করতে গেল রানা, কিন্তু...

বিদ্যুৎ খেলে গেছে চাঞ্চাল আধিকারীর দেহে। তার প্রচণ্ড জ্যাব লাগত রানার ঘাড়ের পাশে, কিন্তু চট্ করে বসে পড়েছে ও। ওর বামহাতি জোরালো ঘুষি খটাস্ করে নামল মার্শাল আর্টিস্টের উরু-সন্ধিতে। তাতে নিজেই ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। বুঝে গেছে, ব্যাটা সত্যিকারের ক্রিকেটার, মারামারি করতে এসেছে স্ক্রোটামগার্ড পরে! লাফিয়ে সরে যাওয়ার আগেই ওর

ঘাড়ের নার্ভে খোঁচা দিল লোকটা।

তীব্র ব্যথায় অন্ধকার দেখছে রানা। কাটা কলাগাছের মত কাত হয়ে পড়ল মেঝেতে, প্যারালাইয্ড্। আবছাভাবে বুঝল, ঘড়েল মার্শাল আর্টিস্ট পাশ থেকে তুলে নিল ওয়ালথার। ওদিকে করুণ আর্তচিৎকার ছাড়ছে লাবনী। অবশ ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকাতে পারল না রানা।

অবাক চোখে সব দেখছে অনুপম মঙ্গেলকার। চোখে-মুখে ভীষণ ভয়ের ছাপ। পিছিয়ে যেতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল সিটে। পেছনের চাকুরে দর্শকরা ধরে সিধে করে দিল তাকে।

'আপনারা কী করছেন?' আবারও চিৎকার করল লাবনী। 'সাহায্য করুন!'

একজনও তাকাল না ওর দিকে।

'এদের... এদের তুলে নিয়ে চলো,' বেসুরো কণ্ঠে বলল অনুপম মঙ্গেলকার। কাঁপা হাতে ঠিক করে নিল বাঁকা চশমা। 'দেরি কোরো না!'

চাঞ্চাল আধিকারীর পাশে পৌঁছে গেল নরেশ শর্মা, হাতে এখন অঙ্কুর রায়ের ব্যাগ। ভয় কাটিয়ে লোভী চোখে ওটা দেখল অনুপম মঙ্গেলকার। 'ভেতরে কি কোডেক্স?'

মাথা দোলাল জিভহীন দানব।

'দারুণ ভাল খবর!'

চাঞ্চাল আধিকারীর হাতে ব্যাগ দিল নরেশ শর্মা। এক হাতে ওটা, অন্যহাতে লাবনীর হাত পাকড়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল মার্শাল আর্টিস্ট, সিঁড়ি ভেঙে উঠছে। করুণ চিৎকার ছাড়ছে বেচারি লাবনী, কিন্তু শুনছে না কেউ। ঝুঁকে রানাকে কাঁধে তুলে নিল নরেশ শর্মা, চলল মালিকের পেছনে।

গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে সবার চোখ আঠার মত সেঁটে থাকল খেলায়।

প্রায় দ্বিগুণ আকৃতির দু'জনকে ছিটকে নিচের সিটে ফেলেছে মউরোস, বুকে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে মেঝেতে বসে পড়েছে তৃতীয় লোকটা। এবার রানাকে সাহায্য করবে বলে ক্র্যাচ রেখে বের করতে গেল পিস্তল। কিন্তু তখনই ওর পিঠে জোর খোঁচা দিল ধারালো ছোরার ডগা। একপাশ থেকেও ছোরা ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে তলপেটে।

আপাতত কিছু করার নেই। অসহায় চোখে মউরোস দেখল মেঝেতে পড়ে আছে রানা। আলুর বস্তার মত ওকে কাঁধে তুলে রওনা হলো প্রকাণ্ড এক দৈত্য। অঙ্কুর রায় কোথায় বোঝা গেল না। চারপাশের লোকগুলোর কারণে ওদিকটা দেখা যাচ্ছে না।

ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইল মউরোস। কিন্তু থামতে হলো পিঠে ছোরার ডগা বসে যেতে। শার্টে লাগল রক্ত।

বন্দি রানা ও লাবনীকে নিয়ে গেছে মঙ্গেলকারের লোক দু'জন। মউরোস বুঝতে পারছে, পিছু নিতে হবে। কিন্তু তা করতে হলে আগে ছাড়িয়ে নিতে হবে নিজেকে।

প্রচণ্ড আওয়াজে ফেটে পড়ল স্টেডিয়াম।

এইমাত্র ছক্কা মেরেছে ব্যাটসম্যান।

সিট ছেড়ে নাচতে শুরু করেছে হাজার হাজার দর্শক। তাদেরই কয়েকজনের নাচের কারণে এক সেকেণ্ডের জন্যে সরে গেল মউরোসের পিঠের ছোরা। সামান্য নড়ে উঠেই ধাঁই করে কনুই চালাল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি, চ্যাপটা করল পেছনের লোকটার নাক। চোখের কোণে দেখল ছিটিয়ে পড়ছে রক্ত। ওর অন্যহাতের ঘুষি নামল পাশের ছোরাওয়ালার চোয়ালে।

হাত থেকে ছোরা ছেড়ে দিল লোকটা। বসে পড়ার আগেই তার গলায় লাগল কঠিন এক চপ। সিটের পাশ থেকে ক্র্যাচ নিয়েই ধাক্কা দিয়ে নাক ভাঙা লোকটাকে সরিয়ে দিল মউরোস, মবি ডিক বইয়ের ল্যাংড়া ক্যাপ্টেনের মত প্রায় লাফিয়ে ছুটল

এগযিটের দিকে। বুঝতে চাইছে কোথায় নিয়ে গেছে ওর বন্ধুকে। আশপাশের শত্রুরা সবাই হতভম্ব, বাধা দিল না।

একটু দূরে সিটে পড়ে আছেন অঙ্কুর রায়। কিন্তু কোথাও নেই রানা বা লাবনী। এইমাত্র নড়ে উঠেছেন ইন্টারপোল এজেন্ট। তাঁর পাশে পৌঁছে গেল মউরোস। ক্র্যাচে ভর করে অন্যহাতে তুলতে গেল মানুষটাকে। ওই একই সময়ে একহাতে ঘাড় চেপে ধরে উঠে বসলেন অঙ্কুর রায়। 'মিস্টার রায়, ঠিক আছেন?'

'পেছন থেকে মেরেছে,' প্রায় নালিশ করলেন রায়। চট্ করে উঁকি দিলেন সিটের নিচে। বুঝতে দেরি হলো না সরিয়ে ফেলেছে স্টাডা কোডেক্স। ঘুরে দেখলেন পাশের সিটের লোকটাকে। 'কী হয়েছে জানেন? আমার একটা ব্যাগ ছিল এখানে... ওটা দেখেছেন?'

'কিছুই দেখিনি, খেলা দেখছি,' চোখের দিকে তাকাল না লোকটা।

'দেখেননি মানে?' খেপে গেলেন অঙ্কুর রায়।

'এরা সবাই মঙ্গেলকারের লোক,' বলল মউরোস। 'অনুপম বলেছে নিজের কর্মচারীদেরকে তিন শ' টিকেট কিনে দিয়েছে সে। সবচেয়ে বড় দানব দুটো ছিল আমার পাশে।'

'তারা এখন কোথায়?'

'ওদিকেই আছে। তবে আপাতত অসুস্থ।'

রানার দিকের সিটগুলো দেখলেন অঙ্কুর রায়। 'রানা আর লাবনী! ওরা কোথায়?'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল মউরোস। 'ওদেরকে তুলে নিয়ে গেছে। জানি না রানা বেঁচে আছে কি না। আপনি কি জানেন ওদেরকে কোথায় নিতে পারে?'

উঠে দাঁড়ালেন অঙ্কুর রায়। ঘাড়ের ব্যথায় খুব দুর্বল লাগছে তাঁর। শুকনো গলায় বললেন, 'শহরের বাইরে পুবে অনুপম

মঙ্গেলকারের বড় এস্টেট আছে।'

'তা হলে ওখানে যেতে হবে। চলুন।'

'গিয়ে কী করব? আগেই বলেছি, স্থানীয় আইন প্রয়োগ সংস্থা থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছি না। মঙ্গেলকারদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রমাণও নেই। চাকরি হারাবে, সেই ভয়ে কেউ রাজি হবে না তাদের সঙ্গে লাগতে।' রাগ চেপে দর্শকদের দেখালেন মিস্টার রায়। 'খুব কঠিন সিকিউরিটি মঙ্গেলকারদের। সশস্ত্র তারা।'

'আমরা ওখানে পৌঁছে ঠিক করব কী করা যায়,' ক্র্যাচে ভর করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে লাগল তিক্ত মউরোস। আহত ঘাড় টিপতে টিপতে পিছু নিলেন অঙ্কুর রায়।

অবশভাব সামান্য কাটতে অনেকক্ষণ লাগল রানার। ততক্ষণে লাবনী আর ওকে তুলে দেয়া হয়েছে রেঞ্জ রোভারে। জিপ গাড়ি চলেছে অনুপম মঙ্গেলকারের এস্টেটের দিকে। ড্রাইভ করছে দানব নরেশ শর্মা। ওয়ালথার হাতে রানা ও লাবনীকে কাভার করছে চাঞ্চাল আধিকারী। সামনে চলেছে একইরকম আরেকটা ফোর হুইল ড্রাইভ, ওটার ড্রাইভার চোখা-দাঁত সন্তোষ ব্যাপারী।

রানাকে ধরে সোজা হয়ে বসতে সাহায্য করল লাবনী। 'এখন একটু ভাল লাগছে?'

'ব্যাটা ভাইটাল নার্ভে ব্যথা দিয়েছে,' বিড়বিড় করল রানা। কঠোর চোখে দেখল চাঞ্চাল আধিকারীকে।

'ওটা ছিল স্নায়ু মারমা প্রেশার পয়েণ্ট, প্যারালাইয করে দিয়েছি নার্ভ,' বলল মার্শাল আর্টিস্ট। 'মাত্র এক সেকেণ্ডে খুন করতে পারতাম, কিন্তু মিস্টার মঙ্গেলকার আপনাদের ওপর খেপে আছেন। তাই খুন করা নিষেধ।'

'শুনে খুবই খুশি হলাম,' ওয়ালথার দেখছে রানা। বুঝতে

চাইল, ঝট্ করে নড়ে উঠে ওটা দখল করতে পারবে কি না।

ওর মনের কথা বুঝে পিস্তল একটু পিছিয়ে নিল চাঞ্চাল আধিকারী। 'আমি হলে চেষ্টা করতাম না। অন্তত আরও বিশ মিনিট লাগবে একটু সুস্থ হতে। ততক্ষণে পৌঁছে যাব প্রাসাদে।'

সামান্য নড়েচড়ে রানা বুঝল, বদমাসটা ঠিকই বলেছে। জানতে চাইল, 'প্রাসাদ? মঙ্গেলকার এই এলাকার রাজা নাকি?'

'রাজা না হলেও খুব একটা কম কিছুও নয়, আর মাধুরী মঙ্গেলকার নিজেকে সত্যিই মনে করে রানি,' বলল লাবনী।

ভীষণ ভুরু কুঁচকে ওর পেটে ওয়ালথারের নলের খোঁচা দিল মার্শাল আর্টিস্ট। 'মঙ্গেলকারদের সম্পর্কে বাজে কোনও কথা বলবে না। তাঁরা দেব-দেবীতুল্য মানুষ।'

'যতটুকু চিনেছি, ভাল না বেসে পারিনি,' শুকনো গলায় বলল রানা।

আরও কিছুক্ষণ পর পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল জিপ গাড়ি। কাঁচা মাটির পথ গিয়ে শেষ হলো উঁচু এক দেয়ালে বসিয়ে দেয়া ফটকের সামনে। গেটের সামনে সশস্ত্র গার্ড। খুলে গেল গেট। জিপ ভেতরে ঢুকতেই একপাশে রানওয়ের শেষ অংশ। পাকা রাস্তা গেছে দূরে। রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে মঙ্গেলকারদের ব্যক্তিগত জেট বিমান। ওটা পেরোবার পর অদ্ভুত এক এয়ারক্রাফট। আগেও ওটা দেখেছে লাবনী। এখন ভাঁজ করে রাখা হয়েছে ওটার ডানা। পাশেই ফোর্কলিফট, বড় এক কণ্টেইনারে তুলে দেয়া হচ্ছে ওটাকে। চাপিয়ে দেয়া হবে ট্রাকে।

প্রাসাদের আঙ্গিনায় দু'জন সশস্ত্র গার্ড পাশে নিয়ে রানাদের জন্যে অপেক্ষা করছে মাধুরী মঙ্গেলকার। পেছনের রেঞ্জ রোভার থেকে রানা ও লাবনী নামতে কঠোর চোখে ওদেরকে দেখল মহিলা। একই সময়ে সামনের জিপ থেকে নেমে এসেছে অনুপম মঙ্গেলকার। স্বামীর কাছে জানতে চাইল মাধুরী, 'পেলে

কোডেক্স?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল বিলিয়নেয়ার। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোককে বলল, 'কোডেক্স নিয়ে রাখো ইনফোট্যারিয়ামে। ওটার চাবির ছাপ নেবে। স্ক্যান হলে দেরি না করে তা রাখবে প্রোটোটাইপারে।' লোকটার হাতে কোডেক্সের ব্যাগ ধরিয়ে দিল চাঞ্চাল আধিকারী। একবার মাথা দুলিয়ে গল্‌ফ্‌ কার্টে চেপে বিদায় নিল লোকটা।

'সেক্ষেত্রে এরা এখনও বেঁচে আছে কেন?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল মাধুরী।

'সবার সামনে খুন করি কী করে? আমাদের কর্মচারীরাও দু'একজন মুখ খুলে বিপদ ডাকতে পারে। তার চেয়ে ভাল বুদ্ধি পেয়েছি।' স্ত্রীর কানে মুখ রেখে কী যেন বলতে লাগল অনুপম। কয়েক সেকেণ্ড পর অশুভ হাসিতে হাজার ওয়াটের বাতির মত উদ্ভাসিত হলো মাধুরীর নিষ্ঠুর চেহারা।

'এ যে তোমার এই জনমের সেরা বুদ্ধি, অনুপ!' খুশিতে কাঁচামাছ দিয়ে পেটভরা বিড়ালের মত গর্‌-গর্‌ করে উঠল মাধুরী মঙ্গেলকার। চটাস্‌ তুড়ি বাজাল। ওই নির্দেশ পেয়ে রানা ও লাবনীকে সামনে ঠেলল দানব নরেশ শর্মা।

এদিকে একপাশ থেকে ওয়ালথার হাতে ওদেরকে কাভার করছে চাঞ্চাল আধিকারী।

'তোমাদেরকে ডিনারে আমন্ত্রণ দিচ্ছি,' একটু দূরের বাঘের অভয়ারণ্যের দিকে তাকাল মাধুরী। 'সঙ্গে অতিথি হিসাবে থাকবে আমার অত্যন্ত বিশিষ্ট এক বন্ধু ও দুই বান্ধবী!'

সতেরো

পাকা রাস্তার বাঁকে থামলেন অঙ্কুর রায়। এখানেই ডানে নেমে গেছে কাঁচা রাস্তা। 'ব্যস, এ পথে গেলেই একটু দূরে পড়বে মঙ্গেলকারদের এস্টেট।'

বিনকিউলার চোখে তুলল মউরোস। দুই শ'গজ দূরে সিকিউরিটি ব্যারিয়ার। 'দু'জন বাইরে। পাশের গার্ড কেবিনে একজন। সবাই সশস্ত্র।' বিনকিউলার নিচু করে নিল মউরোস। 'আমি তো জানতাম কঠোরভাবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হয় ভারতে।'

'কথা ঠিক, কিন্তু বড়লোকদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অস্ত্রের লাইসেন্স পায় তাদের কর্মচারীরা। নিশ্চয়ই জানেন, অনুপম মঙ্গেলকার দেশের বড় ব্যবসায়ীদের একজন।'

'কাজেই যা খুশি করবে,' দূরের উঁচু দেয়াল দেখল মউরোস। 'জায়গাটা কত বড়, মিস্টার রায়?'

'তিন স্কয়্যার কিলোমিটারেরও বেশি। ব্যক্তিগত এয়ারস্ট্রিপ আছে। অভয়ারণ্য আছে। নিজেদের ছোট একটা দুনিয়া তৈরি করে নিয়েছে তারা।'

'বেশি ব্যক্তিগত। যা খুশি করবে, রানা বা লাবনীর কী হয়েছে কেউ জানবে না।' গেটের দিকে আবারও মনোযোগ দিল মউরোস। 'পুলিশের ক্রেডেনশিয়াল দেখিয়ে ওই গেট পেরোতে পারবেন?'

মাথা নাড়লেন অঙ্কুর রায়। 'আগে চাইবে সার্চ ওয়ারেন্ট। ওটা পাওয়া খুব কঠিন। বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত সময়ে। স্থানীয় পুলিশের মতই, স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা চাইবে না চাকরি যাক। সবাই জানে, এত বড়লোক ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে আঙুল উঁচু করলে ফলাফল ভাল হয় না।'

'তো কী করবেন ভাবছেন? বের করে আনতে হবে রানা আর লাবনীকে।'

'আমাদেরকে দেখবে না, এমন উপায় না পেলে বিপদে পড়ব। রাত না নামলে কিছুই করতে পারব না। আসলে তাতেও হবে না। যেখানে আছে, সেখান থেকে সিগনাল না দিলে বুঝবও না ওরা আছে কোথায়। যদি যোগাযোগ করত, যথেষ্ট কারণ দেখিয়ে গোটা ব্যাঙ্গালোরের পুলিশকে ডেকে আনতে পারতাম।'

'তার মানে, পুলিশ সাহায্য করবে না,' রেগে গিয়ে বাম হাতের তালুতে ঘুষি দিল মউরোস। বুঝতে পেরেছে, আসলে ওদের কিছুই করার নেই।

অস্ত্রের মুখে ভূগর্ভস্থ করিডোর ধরে হেঁটে চলেছে রানা ও লাবনী। কয়েকটা অবযার্ভেশন বাঙ্কারের একটার দিকে চলেছে ওরা।

'বাঘ দিয়ে খাওয়াবে, এটা কেমন কথা?' আপত্তির সুরে বলল লাবনী। রানার কাছে জানতে চাইল, 'বাংলাদেশ আর্মিতে যখন ছিলে, ওরা শেখায়নি কীভাবে এড়াতে হবে বুনো জন্তু?'

'নিশ্চয়ই!'

'কী বলেছে?'

'বাঘটাঘের ধারে কাছেও যেয়ো না!'

'কেন এলে ভারতে, রানা!' বলল লাবনী, 'তোমাকে পই-পই করে বলে দিলাম, যেন কোডেক্স...'

মাথা নাড়ল রানা। 'উপায় ছিল না, লাবনী। ভেবেছ ওই পচা

কোডেক্সের জন্যে তোমাকে মেরে ফেলবে, তা সহ্য করব?'

'তাতেই বা কী লাভ হলো?' মাথা নাড়ল লাবনী। 'তা ছাড়া, ওটা সাধারণ কোডেক্স নয়! ওটা ব্যবহার করে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটাবে ওরা। যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে দেশে দেশে। আগে জানতাম না, কিন্তু এখন জানি, এরা তা পারবে। যুদ্ধের পর অল্প কিছু মানুষ থাকবে। তাদেরকে নতুন করে দীক্ষা দেবে। সেজন্যে চাই শিবের গুহা থেকে সেই বেদ।'

'সত্যিই যদি পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে, আর তাতে বেশিরভাগ মানুষ খুন হয়, তখনই বা হাজার হাজার বছর আগের বেদ দিয়ে কী করবে?'

'ওটা অন্তত এগারো হাজার বছর আগের...'

'তাতে কী?'

রানার টিটকারি টের পেয়েছে লাবনী। 'তুমি বুঝছ না, রানা। অনুপম মঙ্গেলকার ভাবছে, ওই বেদ না পেলে সফল হবে না তার পরিকল্পনা। কলি যুগ শেষ করে দিয়েও লাভ হবে না তার। তাই পাগল হয়ে গেছে শিবের গুহা ও বেদ পাওয়ার জন্যে। শিবের নিজের দেয়া শিক্ষা হচ্ছে বেদ। ওটার কারণে নাকি শেষ হবে কলি যুগের পর সংক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি।'

করিডোরের শেষমাথায় পৌঁছেছে ওরা। তিক্ত সুরে বলল রানা, 'তার মানে, বদ্ধ-উন্মাদটা ভাবছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে? আর তাতেই মানুষের মঙ্গল?'

'দু'এক কথায় তা-ই।'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'পাগলের পাল্লায় পড়েছি!'

বাঙ্কারে ঢুকে পড়েছে ওরা।

এলিভেটর প্ল্যাটফর্মের দিকে ইশারা করল গার্ডদের একজন। ওখানে গিয়ে দাঁড়াবার সময় চারপাশ দেখল রানা।

ঘরটা অষ্টকোণী। প্রবেশপথ থেকে দূরে চৌকো করিডোরে

এলিভেটরে ওঠার প্ল্যাটফর্ম। ধাতব ওয়াকওয়ে গেছে জানালার সামনে। সরু অংশ দিয়ে একটু ওপরে দেখা যাচ্ছে জমিন। এক পাশে ডেস্কে কমপিউটার ও ফোন, পাশের দেয়ালে অভয়ারণ্যের পাতাল পথের মানচিত্র। ওটা দেখে যতটা পারে আশপাশ বুঝে নিতে চাইল রানা। কিন্তু বেশি সময় পেল না, অপারেট করল এক গার্ড, ঘড়-ঘড় হাইড্রলিক শব্দে ডানে সরল প্ল্যাটফর্ম, উঠতে লাগল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর সূর্যের সোনালি আলোয় লোহার এক খাঁচার ভেতর বেরোল ওরা। জায়গাটা রানা না চিনলেও লাবনী চিনল। এখানেই কয়েক দিন আগে বেচারা ছাগলের ওপর হামলা করেছিল আহত বাঘিনী। 'চারপাশে চোখ রাখছে,' রানাকে বলল লাবনী। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কালো, ধাতব খুঁটির ওপর ভিডিয়ো ক্যামেরা। 'আমাদের খুন হওয়া দেখবে।'

'অবশ্যই, ডক্টর আলম,' ওদেরকে চমকে দিল দুর্বল এক কণ্ঠ। মনে হলো ছোট কোনও স্পিকার থেকে এল আওয়াজ। তা-ই। ওই স্পিকার আছে ত্রিকোণ আকৃতির ড্রোনে। একটু নেমে এল ওটা। ক্যামেরা তাক করেছে ওদের দিকে।

শোনা গেল মাধুরীর নিষ্ঠুর কণ্ঠ, 'মরে গেলেও এই মজা না দেখে স্বর্গে যাব না!'

আবারও বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'তোমরা হয়তো খেয়াল করেছ, আমার বিমানে নতুন কিছু যোগ করেছি।'

'দেখেছি,' বলল লাবনী। আগে ড্রোনে ছিল ডার্ট গান, এখন ওই জায়গায় বিমানের পেটে ঝুলছে রানার ওয়ালথার। কড়া চোখে রানাকে দেখল ও। 'তোমার ওই পিস্তলটা দিয়েই হয়তো খতম করবে আমাদেরকে!'

'লাবনী জানে, ডার্ট গান দিয়ে ভালই লক্ষ্যভেদ করি, এখন মাধুরী চাইছে প্রয়োজন হলে যেন খতম করি তোমাদেরকে,' বলল

অনুপম মঙ্গেলকার। 'ওর বাঘকে তো বাঁচাতে হবে? যদিও মনে করি না বাঘগুলো ওদের খাবার চিনতে ভুল করবে।'

পনেরো ফুট ওপর থেকে নিচের জমিতে নামানো হলো খাঁচা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেছে লোহার গরাদ দিয়ে বানানো দরজার তালা। একপাশে সরে গেল কবাট। ঘুরে যেন মালিকদের ঘন জঙ্গল দেখাচ্ছে ড্রোন। 'কাছের বাঘ ওদিকে চল্লিশ মিটার দূরে, ওদিকে এগোতে শুরু করো।' ওয়ালথার তাক করা হলো রানার মাথার চাঁদি লক্ষ্য করে।

তিক্ত মনে খাঁচা থেকে বেরোল রানা ও লাবনী।

ভীত চোখে চারপাশ দেখছে মেয়েটা, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'হায়, আল্লা, রানা, আমরা এবার কী করব?'

'প্রথম কাজ বাঘের পেটে না যাওয়া,' দুশ্চিন্তা আড়াল করতে চাইল রানা। ওর কাছে কোনও অস্ত্র নেই। বাঘের হামলা হলে বাঁচার উপায় নেই। 'দ্বিতীয় কাজ ওই ড্রোনটাকে নামিয়ে ওয়ালথার উদ্ধার করা। আগে ওটার জায়গায় ডার্ট গান ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে ওয়ালথার দিয়ে গুলি ছুঁড়লে চমকে যেতে হবে হারামজাদাকে। ঠিক আছে, আমার পিছু নাও।'

জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা। মস্তসব গাছের উঁচু ডালের তলা দিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করছে ড্রোন। অনেক ওপরে পাতার সবুজ চাদর।

চারপাশে ঝোপঝাড় ও প্রাচীন সব গাছ। হিসেব কষল রানা, চল্লিশ মিটার মানে মোটামুটিভাবে এক শ' ত্রিশ ফুট। বাঘটা শিকার ধরতে চাইলে, ওরা বোঝার আগেই কাছে পৌঁছে হামলা করবে। হালকা বাতাস বইছে ঝোপের ভেতর, তাই নড়ছে প্রায় সবই। চারদিকে নজর রাখা কঠিন। মাথার ওপর জায়গায় জায়গায় পাতার ফাঁক দিয়ে মাটিতে পড়েছে রোদ, আবার পাশেই

হয়তো গাঢ় ছায়া। কিছু নড়ছে কি না বোঝা মুশকিল।

ঘুরে ড্রোনের দিকে তাকাল রানা। দশ ফুট পেছনে ওটা। উচ্চতা আট ফুট। তার মানে ভারী কিছু লাগবে ওটাকে ছিটকে ফেলতে...

একটু সামনেই পচা পাতার ভেতর প্রায় ডুবে আছে ভাঙা এক ডাল। হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গি করে ঝুঁকে গিয়েও সামলে নিল রানা। তারই ভেতর তুলে নিয়েছে ভারী ডাল। ফিসফিস করে বলল, 'চুপ করে দাঁড়াও। বললেই দৌড়াতে শুরু করবে।'

'কোন্ দিকে দৌড় দেব?'

'এমন কোনও দিকে, যেদিকে বাঘ নেই!' ঝট্ করে ঘুরে ড্রোন দেখল রানা। ডাল ধরা হাত কোমরের পেছনে।

নার্ভাস দৃষ্টিতে চারপাশ দেখল লাবনী। কমলা বা সোনালি কিছু দেখলেই...

আট ফুট দূরে থেমেছে ড্রোন। স্পিকারে নির্দেশ দিল অনুপম মঙ্গেলকার, 'থামবে না, এগোতে থাকো!'

'আমি বরং এখানেই রয়ে যাব ভাবছি,' বলল রানা। 'বলো তো, তুমি জানলে কীভাবে কোথায় আছে বাঘ?'

'প্রতিটি বাঘের গায়ে ট্যাগ করা হয়েছে জিপিএস...'

শুনতে বয়ে গেছে রানার, হঠাৎ নড়ে উঠল ওর হাত— ভারী, ভাঙা ডাল ছুটে গেল ড্রোন লক্ষ্য করে।

ড্রোনের গায়ে খটাস্ করে লাগল ডাল। 'দৌড়াও, লাবনী!'

বেচারির হাত ধরে ঘুরেই দৌড় দিল রানা। গায়ে-মুখে ঠাস্ করে লাগছে নিচের সব ডাল। উড়ে চলেছে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। ওদিকে সামলে নিয়েছে ড্রোন, ঘুরেই ধাওয়া করল ওদেরকে। ওয়ালথারের ট্রিগারে সংযুক্ত ফায়ারিং মেকানিযম কাজ করতেই বুম্ গর্জন ছাড়ল আগ্নেয়াস্ত্র। রানার কানের পাশ দিয়ে বেরোল বুলেট, বিঁধল একটু দূরের গাছে। কিন্তু ওয়ালথারের

রিকয়েলের কারণে নিজেই ছিটকে ঘুরতে ঘুরতে পিছিয়ে গেল ড্রোন। ঠাস্ করে লাগল একটা গাছের গায়ে। বিধ্বস্ত হতো, কিন্তু ওটার রোটর ব্লেড আছে ইমপ্যাক্ট-রেযিস্ট্যান্ট প্লাস্টিকের কেসের ভেতর। গাছের কাছ থেকে সরে মাতালের মত ভীষণ টলতে লাগল ড্রোন।

'সোজা দৌড়াও!' লাবনীর হাত ধরে ঝোপ ভেঙে ছুটে চলেছে রানা। আশপাশে কোনও জন্তু থাকলে অবশ্যই শুনতে পেয়েছে গুলির আওয়াজ। রানার মনে আশা, সেক্ষেত্রে আতঙ্কিত পাখির মতই দূরে সরবে বাঘ।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' হাঁফাতে শুরু করেছে লাবনী।

'বাইরের দেয়ালের দিকে, আগেই ওই ঘরে দেখেছি ম্যাপ। বেরোতে হলে যেতে হবে ওদিকে।'

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, সামনেই একটু দূরে বিশ ফুট উঁচু ধূসর দেয়াল— নিরাপদে রেখেছে অভয়ারণ্যের ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোকে। ষাট ফুট দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা মই দেখল রানা। কিন্তু ওটার নিচের দিক ফায়ার এস্কেপের মত গুটিয়ে তুলে রাখা। সবচেয়ে নিচের অংশ অন্তত বারো ফুট ওপরে। 'লাবনী, আমি বসে পড়লে হাতের ওপর পা রেখে উঠে দাঁড়াবে। আমি উঠে দাঁড়ালে টেনে নামাবে মই।'

তখনই ওপর থেকে এল রাইফেলের বুলেট, ওদের পায়ের একটু সামনে বিস্ফোরিত হলো মাটি। ওই চওড়া দেয়ালের ওপর দুই লোক, রাইফেল হাতে ছুটে আসছে ওদের দিকেই! তৃতীয়জন আবারও তাক করছে রাইফেল। ঘুরেই দৌড় লাগাল রানা-লাবনী। ওদের পেছনে দু'ফুট দূরের মাটিতে বিঁধল বুলেট।

তিন সেকেণ্ড পর এল আরও কয়েকটা গুলি।

লাবনীর হাত ধরে ঝড়ের গতি তুলে জঙ্গলে ঢুকতে চাইল রানা। 'আবারও ওদিকে!'

‘কিন্তু ওখানে বাঘ!’ আপত্তি তুলল লাবনী।

‘বাঘমামার রাইফেল নেই!’ ছুটতে ছুটতে লাবনীকে নিয়ে পড়ে থাকা মোটা এক কাণ্ড টপকে গেল রানা। পেছনে থেমে গেছে গুলি। গতি কমাল রানা, বুঝতে চাইছে কোথায় আছে। ওর মন বলল, আপাতত আশপাশে বাঘ নেই। ‘ঠিক আছে, ওদিকের দেয়াল বাদ। অন্য উপায় চাই। এবার ওদের কোনও বাঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে যাব।’

লাবনী অবাক চোখে রানাকে দেখল। ‘কোন্ দিকে যাব?’

‘এখনও জানি না।’ লাবনীর হাত ধরে জঙ্গলের ভেতর পা বাড়াল রানা।

চারপাশ দেখে এগোতে গিয়ে খুব নার্ভাস লাগছে লাবনীর। যখন-তখন ঝোপ থেকে বেরিয়েই থাবা মারবে বাঘ!

‘বাঙ্কারে যেতে পারলে তখন কী করব?’ প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল লাবনী। ‘বাইরে থেকে এলিভেটর নামানো যায় না।’

‘একবার ওই ড্রোনটা ফেলতে পারলে হাতে পাব ওয়ালথার। জানালা ভেঙে ঢুকব বাঙ্কারে। আগেরটার মত হলে ওখানে টেলিফোন আছে। সেক্ষেত্রে কল করব অঙ্কুর রায় বা মউরোসের কাছে। এখন প্রথম কাজ মঙ্গেলকারের লোকদের এড়িয়ে লুকিয়ে পড়া।’

কথাটা মাত্র বলেছে রানা, শুনল আবছা গুঞ্জন। মগডালের দিকে চোখ যেতেই বুঝল, খুব কাছে পৌঁছে গেছে মঙ্গেলকারের ড্রোন।

‘আমিও শুনেছি,’ ফিসফিস করল লাবনী। ‘ছয় মিটার দূরে এলেই শুনতে পাওয়া যায়। আবার আসছে ওই ড্রোন।’

‘আছে কোথায়?’ থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখল রানা।

‘মগডালের ওপরে কোথাও,’ আকাশের দিকে আঙুল তাক

করল লাবনী।

ডাল-পাতার মাঝে আধ ফুটি একটা জায়গা দিয়ে নিচে নেমে এল ড্রোন, থামল রানা-লাবনীর কাছ থেকে দশ ফুট দূরে। আস্তে করে ঘুরে রানার দিকে তাক করল ওয়ালথার।

স্বাভাবিক সুরেই বলল লাবনী, 'আর অপেক্ষা কীসের, মেরে ফেলুন আমাদেরকে।'

খপ্ করে ওর বাহু ধরল রানা। ঘুরেই থমকে গেল। মাত্র পনেরো ফুট দূরের ঝোপে মৃদু কড়-কড় আওয়াজে ভাঙছে শুকনো ডাল। ভারী কিছুর চাপ পড়েছে ওখানে।

খুব বড় কিছু।

'ইয়ে... বাঘ...' করুণ চেহারা করে ফিসফিস করল লাবনী। 'ওই ঝোপের ভেতর!'

ওদিকে চেয়ে নেই রানা, ওর চোখ একটু দূরে। 'ওই গাছ...' লাবনীকে দেখাল চওড়া এক সামান গাছ। মাটি থেকে মাত্র দু'ফুট ওপর থেকে আরম্ভ হয়েছে মোটা সব ডাল, একেকটা যেন সিঁড়ির ধাপ। 'খুব ধীরে ওটার দিকে এগোতে শুরু করো, লাবনী।'

বাঘ আর লাবনীর মাঝে নিজেকে রেখেছে রানা। আড়াআড়ি দু'জন খুব ধীরে চলল গাছের দিকে। ঝোপ এখনও নিথর। 'ওটাকে দেখতে পেয়েছি,' কাঁপা গলায় ফিসফিস করল লাবনী। রোদ ও ছায়ার কিছু জায়গায় সোনালি রং ও কালো ডোরা। ঝোপের পেছনে এসে নিচু হয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছে বাঘ। পরিষ্কার দেখা গেল হলদে দুই নিষ্পলক চোখ। রানা-লাবনী ভাল করেই জানে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার একাকী শিকারি। খুব সাবধানে পিছু নেয় শিকারের। তারপর অসহায় জন্তুটা আর পালাতে পারবে না নিশ্চিত হলেই ছিটকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটার ওপর। এই বাঘও তা-ই করছে। একবার রানাকে দেখল লাবনী। ভয়ে বুক কাঁপছে ওর, ফিসফিস করল, 'রানা, স্পষ্ট দেখছি ওটাকে!'

'আমিও দেখেছি,' বলল রানা। মাত্র পাঁচ ফুট যেতে পারলে গাছের কাছে পৌঁছুবে ওরা। কিন্তু চাইলে এক লাফে মাঝের দূরত্ব পেরোতে পারে বাঘ। খুব আস্তে করে মাথা তুলল ওটা, প্রায় শুয়ে পড়েছে মাটিতে। নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক নাড়ছে লেজ। বুঝে নিচ্ছে শিকারের দূরত্ব ও মতিগতি। মাথা আরও নিচু করল। হামলার জন্যে তৈরি।

'গাছের পেছনে সরলে সরাসরি হামলা করতে পারবে না,' লাবনীকে বলল রানা। 'দেরি করবে না ডাল বেয়ে উঠে যেতে।'

'তোমার কী হবে, রানা?'

'আমি হব বিকেলের রকেট! চিন্তা কোরো না!' সামান গাছের পাশে পৌঁছে গেছে ওরা। লাবনী গাছের পেছনে যেতেই রানা বলল, 'মইয়ের মত ওপরে উঠবে, থামবে না। ...রেডি?'

শক্তিশালী চার পায়ে ভর করে সামান্য পিছিয়ে গেল বাঘ। এবার প্রচণ্ড এক লাফে পড়বে শিকারের ওপর। বুঝে গেছে, ওকে দেখে ফেলেছে শিকার। এ-ও বুঝতে পারছে, বাধা দিতে পারবে না দুর্বল জন্তুটা। ওদের পালাবার উপায় নেই!

'লাবনী, গাছ বাইতে শুরু করো!' ফিসফিস করল রানা।

মোটা সব ডাল বেয়ে উঠতে লাগল লাবনী। বাঘের হলদে চোখে স্থির ওর চোখ। মাথার ওপরের ডাল ধরল রানা, নিজেকে তুলে নেবে নিরাপদ দূরত্বে।

পিছিয়ে গেল বাঘের লালচে ঠোঁট, যেন চওড়া হাসি দিচ্ছে! বেরিয়ে এসেছে তিন ইঞ্চি দীর্ঘ দুই শ্বদন্ত। পরক্ষণে ছিটকে এল সোনালি-কালো দীর্ঘ এক রেখা!

কিন্তু পরক্ষণে স্কিড করে থেমে গেল। ঝট্ করে ঘুরে চেয়েছে পেছনে। মাধুরীকে ভালভাবে সব দেখাবার জন্যে অনেক কাছে ড্রোন নিয়ে এসেছে অনুপম মঙ্গেলকার। ওটার ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছে বাঘ। ওই আওয়াজ মানেই ব্যথা আর বন্দি জীবন! প্রচণ্ড

রাগে গর্জে উঠে পিছিয়ে গেল বাঘ। দেরি না করে ওপরের দিকে উঠল ড্রোন। কিন্তু সে সুযোগে গাছের দশ ফুট ওপরে উঠে পড়েছে লাবনী ও রানা। থেমে নেই, জানের ভয়ে উঠে চলেছে আরও ওপরের ডালে।

হলদে রাগী চোখে ওদেরকে দেখছে বাঘ।

রানার কাছে জানতে চাইল লাবনী, 'গাছে উঠতে পারে বাঘ?'

রানা জবাব দেয়ার আগেই এক লাফে এসে নিচের দুই ডাল বেয়ে উঠতে শুরু করল জীবন্ত, সোনালি আতঙ্ক। পেছনের থাবা দিয়ে চিরে দিচ্ছে গাছের পুরু বাকল।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল রানা। চট্ করে দু'পা টেনে নিয়েছে বুকের কাছে। কিন্তু তার আগেই ওর বুটের সোলের শেষ অংশ থাবা মেরে ছুটিয়ে নিয়েছে বাঘমামা। ভয়ঙ্কর এক গর্জন ছেড়ে শিকারকে বাগে পেতে উঠতে লাগল ওপরের ডালে।

গাছের যে শাখাডালে লাবনী, ওটা থেকে লাফিয়ে রানার দিকের ডালে গেল সোনালি মামা। যে ডাল ধরে নিজেকে সামলে রেখেছে লাবনী, ওটা গেল মট্ করে ভেঙে। কাত হয়ে পড়ে যেতে গিয়েও টিকে রইল ও ভাঙা ডালের গোড়া ধরে। গলা চিরে বেরোল আর্তচিৎকার। দুলন্ত ডাল থেকে অর্ধেক ঝুলছে। ওর ওজনে বাঁকা হয়ে ঝুঁকে গেল ডাল। তখনই লাবনী দেখল, একটু দূরের আরেক সামান গাছের মোটা ডাল। আশপাশের সব ডাল ধরে এগিয়ে চাপতে হবে ওই গাছে। নিরাপদ জায়গায় গেলে হাত বাড়িয়ে দেবে রানার দিকে। 'রানা! এদিকে! নতুন ডাল বেয়ে উঠতে পারবে না বাঘ! ওজন বেশি ওটার!'

'সমস্যা ওই ওজনই, আমিও পারব না!' পাল্টা চেঁচাল রানা। লাবনীর চেয়ে অন্তত চল্লিশ পাউণ্ড বেশি ভারী ও। নতুন গাছের ওই ডালে চড়লে, যদি পিছু নেয় বাঘ, সবাইকে নিয়ে ভেঙে পড়বে শাখা ডাল।

‘ওখানে না গিয়ে উপায় নেই, রানা! আসছে খেয়ে ফেলবে!’ নতুন ডালের খুব কাছে পৌঁছে গেছে লাবনী। কামুক পুরুষের মত ওর কোমরের কাছে ছোঁক-ছোঁক করছে ড্রোন।

নিচে তাকাল রানা, ঠিকই বলেছে লাবনী।

ব্যগ্র হয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসছে বাঘ। পেছনের দুই থাবা দিয়ে চিরে দিচ্ছে শক্ত বাকল।

দু'হাতে একটা ডাল ধরে নিজেকে ওপরে তুলল রানা। আর তখনই সামনের থাবা দিয়ে ঝাপটা দিল বাঘ। এক ইঞ্চির জন্যে পেল না বুট পরা পা। ওপরের ডাল ধরে বাঁদরের মত ঝুলছে রানা। ভাবছে, সামনে এগিয়ে নামবে পাশের গাছের ডালে।

নতুন গাছে মোটা এক ডালে চলে গেছে লাবনী।

পাশের গাছে ভীষণ দুলে উঠল পরিত্যক্ত ডাল, ধেড়ে বাঁদরের মত ঝুপ্ করে আরেক ডালে নেমেই পিছলে ঝুলে গেল রানা। চারপাশে ছিটে গেল অজস্র ছেঁড়া পাতা। বাদামি ও সবুজ পাতার বিস্ফোরণে আটকা পড়েছে মঙ্গেলকারের ড্রোন। মোটরের মৃদু গুঞ্জন হলো কর্কশ। পাতা কচকচ করে কাটছে ব্লেড। একের পর এক হোঁচট খেয়ে নানান দিকে সরছে ড্রোন, ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়তে গিয়েও সামলে নিল তাল।

ওটাকে দেখে বুদ্ধি এল রানার মগজে, কিন্তু যেখানে আছে, সেখান থেকে কিছুই করতে পারবে না।

ওদিকে গাছের ডালের গোড়ার দিকে চলেছে লাবনী।

এদিকে পাশের গাছের ডাল দু'হাতে ধরে টারজানের মত ঝুলতে ঝুলতে এগোচ্ছে রানা।

প্রকাণ্ড বাঘ ঠিক করেছে, এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে একটু দূরে রানার ডালে। সেক্ষেত্রে সহজেই বাগে পাবে শিকার।

‘আয়!’ মোটা ডালের গোড়ায় পৌঁছে চিৎকার ছাড়ল লাবনী।

পাশের গাছের ডালের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে রানা। তখনই

ধড়মড় করে উঠেই ওর ডালে ঝাঁপ দিল বাঘ!

এক মুহূর্ত আগে পেণ্ডুলামের মত দু'বার দুলেই নতুন গাছে গিয়ে নেমেছে রানা, একহাতে খপ্ করে ধরেছে পুরু ডাল। এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, ওখানে হামলে পড়ল বাঘ। থরথর করে কেঁপে উঠল গাছ। ওজনের কারণে তীক্ষ্ণ কড়াৎ শব্দে গাছের গা থেকে পুরু চল্টা তুলে প্রায় আলাদা হয়ে গেল মোটা ডাল। ফলে হঠাৎ আতঙ্কে দু'থাবা দিয়ে ডাল জাপটে ধরল বাঘ। ঝুলে গেছে ডাল, শেষমাথা মাটি থেকে কমপক্ষে পনেরো ফুট ওপরে।

নতুন গাছে নিচের শাখাডালে পা রাখল রানা। ওর দেখাদেখি নেমে এল লাবনীও।

আগের ফাটা ডালে ভীষণ ভয়ে পিছাতে চাইছে বাঘমামা। তখনই রানা দেখল, ওটা বাঘমামা নয়, সোনালি মামী! খুব ভয় তার মনে, বেকায়দাভাবে নিচে পড়লে মট করে ভাঙবে কোমরের হাড়। নিজের ওজনে আর পিছাতে পারছে না।

'বদমাশ বেটি আটকে গেছে!' খুশি হয়ে বলল লাবনী।

'চলো, নেমে ভাগি!' তাড়া দিল রানা। বাঘিনীর উদ্দেশে বলল, 'বীরাঙ্গনা, অত ভয় কীসের?'

ওর পর পর মাটিতে নামল লাবনী। দু'পাশের গাছের মাঝ দিয়ে ছুট লাগাল ওরা, আর তখনই পেছন থেকে দ্বিতীয়বারের মত ওয়ালথার থেকে গুলি ছুঁড়ল ড্রোন। রিকয়েলের কারণে আবারও হোঁচট খেয়ে পিছাল, কিন্তু এবার তৈরি ছিল অনুপম মঙ্গেলকার, সামলে নিল কয়েক সেকেণ্ডে।

ততক্ষণে প্রাণপণে পালিয়ে যাচ্ছে রানা ও লাবনী। ওদের পায়ের নিচে ভেজা মাটি ছপছপ আওয়াজ তুলছে। ওরা পৌঁছে গেছে মাঝের ওই লেকের কাছে। লাবনীর হাত ধরে থেমে গেল রানা। অন্যহাতের তর্জনী তাক করল একদিকে। 'ওদিকে বাঙ্কার আছে।'

একবার ঘুরে দেখল লাবনী। ধাওয়া করছে না বাঘিনী, গাছের উঁচু ডালে আটকা পড়েছে, বা প্রাণভয়ে ভাগছে গুলির শব্দে। কিন্তু ছোট জেট বিমানের মত বোঁ-বোঁ শব্দ তুলে আসছে মঙ্গেলকারদের ড্রোন। পৌঁছে গেছে খুব কাছে।

'রানা, তোমার পিস্তলে আর কয়টা গুলি?'

'আর আছে পাঁচটা।'

'কী করবে এবার? মেরে ফেলবে তো!'

'একটা বুদ্ধি এসেছে, কিন্তু সেজন্যে আলাদা হতে হবে।'

'মরেও শান্তি পাব না?'

'মরোনি এখনও, কিন্তু দেরি করলে মেরে ফেলবে!' চট্ করে রানা জানাল কী করবে। কথাটা বলতে না বলতেই ওর পাশের গাছের কাণ্ডে দেখা দিল পিরিচের মত দগদগে হলদে ক্ষত। আধ সেকেণ্ড পর বুম্ গর্জন ছাড়ল ওয়ালথার।

'যে যার পথে!' চেঁচিয়ে উঠেই ঝেড়ে দৌড় দিল লাবনী।

'একটু পরে আসছি,' পেছন থেকে বলল রানা, 'নিচু ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোও!'

রানার পরিকল্পনা সহজ।

সামান্য বাঁক নিয়ে ছুটে চলেছে লাবনী।

সোজা দৌড় শুরু করে রানা একবার দেখে নিল, পেছনেই আসছে ড্রোন। চারপাশের ঝোপঝাড়ের ডাল এসে আছড়ে পড়ছে ওর মুখে। মাঝারি এক ঝোপ পেরোল মস্ত এক লাফে।

রানা ও লাবনীকে খুঁজতে গিয়ে অনেকটা ওপরে উঠল ড্রোন। আবারও বুম্ করে উঠল ওয়ালথার। এবার রানার মাথার পাশ কাটিয়ে বুলেট বিঁধল একটু দূরের ভেজা মাটিতে।

শব্দ শুনে রানা বুঝল, আপাতত ঝোপ ভেঙে সমান্তরাল পথেই ছুটছে লাবনী। সামনে দেখা গেল আরও বড় একটা ঝুঁকে পড়া সামান গাছ। ছাতির মত নেমে এসেছে ডালগুলো।

চিৎকার করে ডাকল রানা, 'লাবনী!' আশা করল এতেই মেয়েটা বুঝবে কী করতে হবে।

পেছন থেকে তেড়ে আসছে কার্বন-ফাইবারের বোলতা, সঙ্গে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হুল। ওটায় রয়ে গেছে আরও তিনটে বুলেট। সাতটার চারটে খরচ হয়ে গেছে। জঙ্গলের কিনারায় ঝোপ পেরোতে গিয়ে অনেক নেমে এসেছে ড্রোন, আর সেজন্যেই অধীর অপেক্ষা করছে রানা।

ধেয়ে আসছে ওর দিকে ড্রোন। ওই একই সময়ে লাফিয়ে উঠে ওটার ওপর ঝোপের ডাল টেনে নামাল লাবনী। এবার শুধু পাতা কাটলে হবে না, আরও কঠিন কিছুও ঢুকে গেছে প্রপেলার ব্লেডের ভেতর। ডাক্টে ঢুকল কড়ে আঙুলের মত মোটা ডাল। খ্যার-খ্যার আওয়াজ তুলছে ব্লেড। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলে মাটিতে পড়ল ড্রোন। আবারও গুলি বেরোল ওয়ালথার থেকে। কিন্তু কাউকে ভেদ না করে দূরের মাটিতে বিঁধল বুলেট। ড্রোনের কোমরে কষে লাথি দিল লাবনী, পরক্ষণে ঝুঁকে ওয়ালথারের সঙ্গে সংযুক্ত ফায়ারিং লিভার ছুটিয়ে দিল।

এক সেকেণ্ড পর খট্ করে টান পড়ল লিভারে।

এক দৌড়ে ড্রোনের পাশে পৌঁছে ওয়ালথার খুলে নিল রানা। ক্যামেরার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমরা আসছি!' প্রতিজ্ঞার মত শোনাল ওর কণ্ঠ। ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি। পিস্তলের বাঁটের বাড়ি দিয়ে চুরমার করল ক্যামেরার লেন্স।

'কয়টা বুলেট আছে?' জানতে চাইল লাবনী।

পরীক্ষা করে দেখল রানা। 'দুটো।'

'তাতে কাজ হবে?'

'হতে হবে। নইলে আগামীকাল বাঘের আস্তানা থেকে সরিয়ে ফেলবে রক্তাক্ত, ভাঙা হাড়। চলো, যেতে হবে বাঙ্কারে।' জগিঙের গতি তুলে জঙ্গল থেকে রোদে বেরোল ওরা। বামেই লেক। ওটার

নিচেই মস্ত এক ঘরে আছে নানান দেশের গুরুত্বপূর্ণ আর্টিফ্যাক্ট। পানির ধারে জন্মেছে দীর্ঘ সব নলখাগড়া। 'ওই পথে চলো,' বলল রানা। তীর ধরে দৌড়ে চলেছে ওরা। কাদা ভরা বৃত্তাকার এক গর্ত পেরিয়ে গেল রানা। 'সাবধান, লাবনী!'

'তুমিও সাবধান হও!' বলল লাবনী। এইমাত্র জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পানিতে নেমেছে আরেকটা বাঘ! নলখাগড়া পেরিয়ে হাজির হওয়ার উদগ্র আগ্রহ দেখা গেল তার মধ্যে। ওয়ালথারের নল তাক করল রানা, একটু নামিয়ে নিল নল, তারপর গুলি করল। বুলেটের বিকট শব্দে চমকে গেছে বাঘ। মুখেও ছলকে লেগেছে একগাদা কাদা। মারাত্মক ভয় পেল বাঘমামা, ঘুরেই লেজ আকাশে তুলে ছিটকে গিয়ে ঢুকল জঙ্গলে।

'ওটাকে গুলি করে মারলে না কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'এমনিতেই বহু মানুষ খুন হয়েছে, এবার দুর্লভ জন্তু খুন হলে হুতাশ করবে ওঅর্ল্ড ওয়াইল্ড ফাণ্ড, তাই।' ওয়ালথার নামিয়ে নিল রানা। আগেই দেখে নিয়েছে, আশপাশে বাঘ নেই। 'বেরোতে হলে এবার চাই কোনও বাঙ্কার।'

আবারও ঝোপে ঢুকে ওরা আবছা দেখল অস্পষ্ট হাঁটাপথের চিহ্ন।

'ওই যে, দূরে বাঙ্কার আর ক্যামেরার খুঁটি,' একটু পর বলল লাবনী। 'কিন্তু ওখানে লুকিয়ে হাজির হওয়ার উপায় নেই।'

'একদৌড়ে পৌঁছব,' লাবনীকে দেখল রানা, 'তৈরি হলেই বলবে।'

চট্ করে চারপাশ দেখল লাবনী। না, এদিকে বাঘ নেই। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'তা হলে চলো!'

এক ছুটে খোলা জমিতে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের দিকে ঘুরে গেল ক্যামেরা।

'আমাদের দেখে ফেলেছে!' আঁৎকে উঠল লাবনী।

উঁচু করে রাখা প্ল্যাটফর্মের পাশের জানালায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে শেষ গুলিটা খরচ করল রানা। খুব শক্ত কাঁচ দিয়ে তৈরি জানালা .৩৮ বুলেটের আঘাতে চুর-চুর হলো হাজার টুকরোয়। ভেতরে উঁকি দিল রানা। বাঙ্কারে কেউ নেই। প্রথম বাঙ্কারের মতই ডেস্কে কমপিউটার ও ফোন।

সরু জানালা দিয়ে নিজে ঢুকতে পারবে না, কিন্তু অনায়াসেই লাবনীকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারল রানা। বেচারির কোমরে ও উরুতে প্যান্ট চিরে গেল, রক্ত লাগল কাঁচে। ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলেছে লাবনী, কিন্তু খুশি যে ঢুকতে পেরেছে ঘরে। সাবধানে চলে গেল এলিভেটর কন্ট্রোলের সামনে। বাটন টিপতেই বাইরে নামতে লাগল ধাতব প্ল্যাটফর্ম।

মাত্র বিশ সেকেণ্ড পর ওটাতে চেপে ঘরে নেমে এল রানা। 'আওয়াজটা কীসের?' পাতাল-পথের দিকে তাকাল। প্রতিধ্বনি তুলছে ওই শব্দ।

'ছাগল,' জবাবে বলল লাবনী, 'এখানে বোধহয় বাঘের জন্যে ওগুলোকে আটকে রেখেছে এরা। দ্য হিউম্যান সোসাইটি জানলে নির্ঘাৎ কেস করবে!'

ফোনের কাছে গেল রানা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রিসিভার। 'দেখা যাক।' মউরোসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে এল বিদঘুটে শব্দ। রিসিভার নামিয়ে বলল, 'ইন্টারনাল সিস্টেম।'

'বাইরে কল যাবে এমন ফোন লাগবে,' তাড়া দিল লাবনী, 'নাইন...'

মাথা নাড়ল রানা। 'এটা ইণ্ডিয়া, আমেরিকা নয়। পালাতে হলে নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে নিজের পথ।' লাবনীর কোমরের কাটা অংশ দেখল। 'হাঁটতে পারবে, লাবনী?'

'ব্যথা লাগছে, কিন্তু পারব।'

'তো চলো।' পাতাল-পথে প্রায় নিঃশব্দে এগোল ওরা। দেখল না, পেছনে ভাঙা জানালায় নাক রেখে রক্তের গন্ধ শুঁকছে সোনালি কে যেন!

সে অভয়ারণ্যের তৃতীয় বাঘ। সবচেয়ে বড় ও সতর্ক।

সরু করিডোর ধরে বাঁক নিল রানা ও লাবনী, সামনেই পড়ল নিচু, ধাতব গেটওয়ালা খোঁয়াড়। করিডোরের মাঝে করুণ চেহারার কমপক্ষে বিশটা ছাগল, রানা ও লাবনীকে দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে ম্যা-ম্যা করে উঠল। মাঝ দিয়ে যাবে ভেবেও থামল রানা। ওর মতই চমকে গেছে লাবনী।

খট-মট আওয়াজ তুলে বুট পায়ে আসছে একদল লোক!

লাবনীর দিকে তাকাল রানা। মন খারাপ হয়ে গেছে। সশস্ত্র লোক এড়াতে হলে আবারও গিয়ে ঢুকতে হবে বাঘের আস্তানায়!

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে খোঁয়াড়ে ঢুকে ওয়ালথার ব্যবহার করল রানা। ওটার নলের গুঁতো খেয়ে আর ওটার নাচুনি দেখে ভয়ে পাগল হয়ে উঠল ছাগলের দল। একটা আরেকটাকে টপকে হুড়মুড় করে ছুটল সংকীর্ণ করিডোরের দূরে। পেছন থেকে দু'হাত বাড়িয়ে ধাওয়া দিল রানা: 'হৈ-রে-রে-রে!'

তাতে ঝড়ের গতি তুলল ছাগলের দল।

'এবার কী?' রানাকে দেখল লাবনী।

'ওদের দেয়া নিরাপত্তা নিয়ে বেরিয়ে যাব!' একবার লাবনীকে দেখে নিয়ে পা বাড়াল রানা। 'এসো!'

ছাগলের সম্মিলিত ক্ষুর খুট-খুট শব্দ তুলছে কংক্রিটের করিডোরে, দূর থেকে ফিরছে প্রতিধ্বনি। পেছনের এক ছাগল গুঁতো দেয়ার আগেই সরল লাবনী, মুচকি হেসে পিছু নিল পলায়নরত রানার।

আতঙ্কিত ছাগলের দলের সঙ্গে তাল রেখে ছুটছে ওরা। রানার ধাওয়া খেয়ে সরু করিডোরে গতি বাড়াচ্ছে জন্তুগুলো। সামনেই

বাঁক, ওদিকেই বুটের পদশব্দ...

তিন সেকেণ্ড পর বাঁক নিয়ে এদিকে এল মঙ্গেলকারের ছুটন্ত দুই গার্ড— ছাগলের স্ট্যাম্পিডের ধাক্কায় পড়ে গেল মেঝেতে। একজনের পেটে গাঁথল খেপা এক ছাগলের চোখা দুই শিং। গভীর ক্ষত থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। অন্যজন দু'হাতে ঢাকল মুখ। তাকে মাড়িয়ে ছুটছে ছাগলের দল।

আহত লোকটার হাতে এখনও অস্ত্র, কষে তার মাথায় লাথি মারল রানা। হঠাৎ থেমে গেল চিৎকার। কিন্তু অন্য লোকটা অস্ত্র হাতে উঠে বসেই দেখল, সামনে লাবনী। অস্ত্র তাক করল সে, কিন্তু তখনই ওয়ালথারের বুলেট চুরমার করল তার মাথার তালু। কাত হয়ে পড়ল লাশ।

জ্যাকেটের পকেটে ওয়ালথার রেখে দিয়ে মেঝে থেকে লোক দু'জনের হেকলার অ্যাণ্ড কচ ইউএসপি সাবমেশিন গান কুড়িয়ে নিল রানা। প্রথম গার্ডের অস্ত্রটা লাবনীর দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এটা ধরো।'

ইউএসপি নিল লাবনী, রানার সঙ্গে করিডোরে বাঁক নিয়ে দেখে নিল সামনের দিক। দূরের আরেক বাঁকে হারিয়ে গেছে ছাগলের দল। 'মনে হয় না ওদিকে কেউ আছে,' বলল লাবনী।

'আরও লোক থাকতে পারে, পেছনে এসো,' বলল রানা।

করিডোর ধরে সাবধানে এগোল ওরা। সামনের বাঁকে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক ছায়া— অস্ত্র হাতে বাঁক ঘুরল সন্ত্রস্ত রানা।

সামনে চৌরাস্তার মত, একটু দূরেই কংক্রিটের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছাগল! জায়গাটা গুদামের মত। একদিকে জানোয়ারের খাবারের ক্রেট ও বস্তা দিয়ে ভরা। ওখানেই থেমে গেছে ছাগলের দল। আর এগোবার ইচ্ছে নেই।

আরেকটু গেলেই ধাতব এক দরজা। আপাতত খোলা। ওটা পেরোলে ওঠার সিঁড়ি। এখানেই প্রথমে আনা হয়েছিল রানা ও

লাবনীকে। এটা বাঘের অভয়ারণ্যের প্রথম বাঙ্কার।

হাতের ইশারা করে এগোল রানা, পেছনে লাবনী। অস্ত্র হাতে সিঁড়ির দিকে চলেছে রানা। ওকে দেখে পিছিয়ে যেতে লাগল ছাগলের দল, তারপর থমকে গেল।

দরজার ওদিকে কী যেন, ভয় পাচ্ছে ছাগলগুলো।

আরও সতর্ক হলো রানা। রসদের ক্রেট ও বস্তা পাশ কাটিয়ে দেখল, আক্রমণ করার মত কেউ নেই।

তবুও ভয় কেন ছাগলের?

'কেউ নেই, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাব,' বলল রানা।

ঘরের মাঝে এসেই বরফের মূর্তি হয়ে গেল লাবনী। দূরের ক্রেট থেকে এসেছে মড়-মড় আওয়াজ। 'রানা!'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রানা, পরক্ষণে শব্দের দিকে।

উঁচু করে রাখা ক্রেটের ওপর থেকে লাফিয়ে মেঝেতে নামল হাঙর-দেঁতো সন্তোষ ব্যাপারী।

নানাদিকে ছিটকে গেল ছাগলের দল। ওগুলোর একটা আরেকটু হলে পটকান খাওয়াত লাবনীকে। কোনওমতে সামলে নিয়েই লোকটার দিকে অস্ত্র তাক করতে গেল ও। কিন্তু গুলি এড়াতে রানাকে আপন ভাইয়ের মত জাপ্টে ধরল সন্তোষ। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল দু'জন। রানার গায়ে গুলি লাগবে সে ভয়ে ট্রিগার টিপতে পারল না লাবনী।

রানার বুকে পড়ে অস্ত্রধরা হাত খামচে ধরেছে সন্তোষ। কিন্তু ঝটকা দিয়ে কবজি ছুটিয়ে গুলি করল রানা। ইউএসপির মাযলের কমলা আগুনে পুড়ল ব্যাপারীর ঘাড়ের রোম ও ত্বক। গুলিটা কানের পাশ দিয়ে গিয়ে লেগেছে দূরের দেয়ালে। করুণ আর্তনাদ ছাড়ল সন্তোষ, পরক্ষণে মাথা নিচু করেই কামড়ে ধরল রানার হাত।

চিমসে হাঙরের চোখা দাঁত হাতের মাংসে বসতেই খেপে

গেল রানা। 'দাঁড়া, শালা!' মুখে বলল বটে, কিন্তু তীব্র ব্যথায় হাত থেকে পড়ে গেছে সাবমেশিন গান। ঠং-ঠঙাৎ শব্দে একটু দূরের মেঝেতে পড়েছে ওটা। অস্ত্রটা তুলে নিতে চাইল সন্তোষ, কিন্তু রানার হাতের কামড় ছেড়ে না ঝুঁকলে নাগালে পাবে না ওটা। রানার জোরালো ঘুষি ঠেকিয়ে দিল দু'হাতে। পিরানহার মত মুখ খুলল, চিবুকের কশ বেয়ে নামছে রক্ত। আরেকবার থাবা দিল ইউএসপি বাগে পেতে।

অক্ষত হাতে আবারও তার বুকে ঘুষি মারল রানা। কিন্তু হুঁশিয়ার লোক চিমসে হাঙর, রানার বাহুতে নতুন কামড় বসিয়ে প্রায় উঠে বসল। ধরেও ফেলল ইউএসপির বাঁট। কিন্তু সামনে বেড়ে লাথি মেরে অস্ত্রটা সরিয়ে দিল লাবনী। তাতে রেগে গিয়ে ওর দু'পা ধরে হ্যাঁচকা টানে মেঝেতে ফেলতে চাইল সন্তোষ। এড়িয়ে গেল রানার আরেকটা ঘুষি।

এদিকে বেসুরো কণ্ঠে বলল লাবনী, 'রানা! হায়, আল্লা! এখন কী হবে?'

জখমি হাতের ব্যথা সামলে প্রায় ধমক দিল ধরাশায়ী রানা, 'আরে, গুলি করো, বোকা মেয়ে!'

'যদি তোমার গায়ে লাগে?'

'গা আর আছে নাকি, কামড়ে তো শেষ করে দিচ্ছে সব!' কোমরের জোরে ধড়মড় করে আধবসা হয়েই কাঁধের সব জোর দিয়ে চিমসের পাঁজরে ঘুষি বসাল রানা। ভাবল, লাবনী গুলি করছে না কেন?

কিন্তু আশপাশে কোথাও নেই লাবনী।

নাকের কাছে শত্রুর হাঁ-করা মুখের বোটকা দুর্গন্ধে দম আটকে এল ওর। টের পেল পচা রক্ত ও বাসি মাংসের ভয়ানক বোটকা বদবু!

আঠারো

ঝট করে ঘুরে তাকাল রানা।

আর তখনই থাবা মেরে সন্তোষের গলা ছিঁড়ে দিল অভয়ারণ্যের সবচেয়ে বড় মামা! একবার চিৎকারেরও সুযোগ পেল না, সন্তোষ জানলও না, ওর ঘাড় কামড়ে ধরে ঘরের আরেক দিকে টেনে নিয়ে চলেছে সন্তুষ্ট শিকারি। তীব্র যন্ত্রণায় বারবার ঝটকা খাচ্ছে সন্তোষের দেহ। ডান থাবা দিয়ে ওর পেট চিরে দিল বাঘটা।

মস্তবড় বাঘ দেখে ভীষণ ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেছে লাবনী, কিন্তু যখন দেখেছে সন্তোষ ব্যাপারীকে নিয়ে আরেক দিকে চলেছে করাল দানব, দেরিও করেনি ফিরতে।

'রানা! পালাও! বা-বা-বাঘ!'

চট্ করে রক্তাক্ত লোকটার ছেঁড়াখোঁড়া লাশ দেখল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাবমেশিন গানটা কই?'

'এই যে,' কাঁধ থেকে ফিতে নামিয়ে অস্ত্রটা ওর হাতে দিল লাবনী।

গুলি করে বাঘকে সঠিক দিকে তাড়িয়ে নেবে ভাবছে রানা, এমন সময় সিঁড়ির ওপর থেকে হিন্দি ভাষায় চিৎকার করে উঠল কে যেন!

'কান চেপে রাখো!' বলল রানা। একপাশে সরিয়ে দিল

লাবনীকে। এখনও টিকটিকির ছিঁড়ে পড়া লেজের মত থরথর করে কাঁপছে প্রায়-মৃত ব্যাপারীর দেহ। একবার স্থির হলদে চোখে ওদের দু'জনকে দেখল বাঘমামা, আবার মন দিল খাবারে। রানা-লাবনী বুঝে গেল, পরের শিকার ওরাই। কিন্তু আপাতত হামলার আগ্রহ নেই মামার।

দু'হাতে দু'কান চেপে ধরেছে লাবনী। এদিকে অস্ত্র তাক করেছে রানা। তবে বাঘের দিকে নয়, একটু দূরের মেঝে লক্ষ্য করে। বুম-বুম-বুম-বুম আওয়াজে বেরোল একঝাঁক বুলেট। সব লাগল মেঝেতে। কংক্রিটের তীব্রগতি ভাঙা টুকরো লাগছে বাঘের পেছনের পায়ে। ভীষণ রেগে গিয়ে ঘুরে রানা ও লাবনীকে দেখল বিরক্ত ও আতঙ্কিত বাঘ।

আবার গুলি করল রানা। আবারও। প্রতিটি বুলেট তৈরি করছে মেঝেতে ছোট সব ডোবা। কংক্রিটের টুকরো ছিটকে লাগছে বাঘের গায়ে। বিকট আওয়াজ ও অচেনা পতঙ্গের হামলায় দিশেহারা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঘুরেই ঝেড়ে দৌড় দিল।

চলেছে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে!

সিঁড়িতে হিন্দি বোল তুলছে কে বা কারা, হঠাৎ রানা ও লাবনী শুনল ভীষণ ভয়ের চিৎকার শুরু করেছে তারা!

'ওরা দেখি বেশ ব্যস্ত,' লাবনীকে বলল রানা, 'ওপরে চলো। কেউ বাধা দিলে গুলি করবে তাকে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। কেউ একজন গুলি করল। কিন্তু সেই গুলি বাঘের উদ্দেশে। পাল্টা জবাবে ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার ছাড়ল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক এক পিশাচী: মাধুরী মঙ্গেলকার! কর্কশ চিৎকার জুড়েছে সে। ধুম-ধাম শব্দে ওপর থেকে পড়ল কী সব।

একতলায় উঠে এসে রানা দেখল, এইমাত্র এক গার্ডের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঘ। ধাক্কা দিয়ে উল্টে ফেলে দিয়েছে এক

টেবিল। আশপাশের সবাই লেজ তুলে ভাগছে ওপরে যাওয়ার দরজা লক্ষ্য করে। তাদের সবার আগে অনুপম মঙ্গেলকার। মনেই নেই পেছনে রয়ে গেছে তার স্ত্রী। একটা ওঅর্ক বেঞ্চের আড়াল থেকে রানাকে দেখেছে এক সাহসী গার্ড। অস্ত্র তাক করল সে, কিন্তু তার আগেই রানার ইউএসপির একটা বুলেট খতম করল তাকে। কপালের মাঝে গোল রক্তাক্ত গর্ত নিয়ে মেঝেতে পড়ল লোকটা।

উঠে এসেই ওপরে যাওয়ার দরজার ওদিকে সিঁড়ির মাঝে মাধুরী মঙ্গেলকারকে দেখল লাবনী। ইঁদুরের মত কিঁচ-কিঁচ করে কীসব নির্দেশ দিচ্ছে মহিলা। সিঁড়ির আরও ওপর থেকে চরম বিশৃঙ্খলা দেখছে অনুপম মঙ্গেলকার— চেহারায় অবিশ্বাস। কিন্তু লাবনী তার দিকে অস্ত্র তাক করতেই আত্মা কেঁপে গেল তার।

ওদিকে লাবনী ভাবছে, সত্যিই কি গুলি করতে পারব?

কিন্তু ওই মেয়ে বুলেট ছুঁড়তে পারে, ধরে নিয়েছে অনুপম মঙ্গেলকার। ঘুরেই ঝড়ের গতি তুলে সিঁড়ি পেরিয়ে স্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে গেল সে।

'লাবনী!' সদর দরজার দিক দেখাল রানা। 'রওনা হও!' ওর গুলি বুকে নিয়ে খুন হলো আরেক গার্ড। সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠে এসে দেখল, চারপাশে সূর্যের ঝকঝকে সোনালি রোদ। লাবনী কিছু বলার আগেই এক ছুটে একটু দূরের গল্ফ্ কার্টের পাশে পৌঁছল ও।

'এটা নিয়ে পালাতে পারব?' অবাক হয়ে বলল লাবনী।

'আপাতত এটাই ভরসা।'

'গাড়ি পেলে ভাল হতো,' বলল লাবনী।

'এতেই আগে ওঠো তো!' ধমক দিল রানা। 'আপাতত এই রকেট শিপের চালক তুমি। আমি গানার।'

এবার ড্রাইভারের সিটে লাফিয়ে উঠে পড়ল লাবনী। ওর

পাশে উঠে বসল রানা। দেহ ঘুরিয়ে অস্ত্র তাক করল সদর দরজার দিকে। অবশ্য, ওই দালানের ভেতর নানান সব আর্তনাদ, ভয় ও অভিশাপের চিৎকার শুনে বুঝল, আপাতত এদিকে নজর দেয়ার কেউ নেই। বাঘমামা ব্যস্ত রেখেছে ভাগ্নে-ভাগ্নিদেরকে।

গল্‌ফ্ কার্টের মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরল লাবনী। হোঁচট খেয়ে রওনা হলো গাড়ি। টপ স্পিডে গুন গুন আওয়াজ তুলছে মোটর। সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় বিশ মাইল। 'এটা ঠিক ফেরারি নয়, তাই না?' রানাকে বলল লাবনী।

'তবে দৌড়ে যাওয়ার চেয়ে ভাল,' বলল রানা।

রাস্তা ধরে প্রাসাদের দিকে চলেছে গল্‌ফ্ কার্ট। গন্তব্যে পৌঁছুতে লাগল বড়জোর একমিনিট। একপাশে খুলে রাখা হয়েছে র‍্যাম্পের গেট। কিন্তু ওদিকে না গিয়ে প্রকাণ্ড প্রাসাদের এক দরজার দিকে চলেছে লাবনী।

'কোথায় চললে?' জানতে চাইল রানা।

'ওই কোডেক্স... ওটা লাগবে।'

'মরুক শালার কোডেক্স!'

'আমি জানি ওটা কোথায় রেখেছে,' আপত্তির সুরে বলল লাবনী। একটা দরজার পাশে থামিয়ে ফেলল কার্ট। ওর আগেই গাড়ি থেকে নেমে কষে একটা লাথি মেরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। হাতে উদ্যত সাবমেশিন গান।

হলওয়ে ফাঁকা। দ্রুত হাঁটতে শুরু করে জানতে চাইল রানা, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, লাবনী?'

'ইনফোট্যারিয়ামে।'

'ওটা আবার কী?'

'ওই জায়গার নাম দিয়েছে অনুপম মঙ্গেলকার, আমি নই।'

নির্দিষ্ট দরজার সামনে পৌঁছে অস্ত্র হাতে ঘরে ঢুকল রানা, কয়েক সেকেণ্ডে চারপাশ নিরাপদ বুঝে নিয়ে মাথার ইশারা করল।

ঘরে ঢুকল লাবনী।

ঘরে আবছা আলো। একের পর এক স্ক্রিনে বিশেষ সব ক্লাউড। একদৌড়ে ডেস্কের সামনে পৌঁছুল লাবনী। ওখানে খোলা একটা কেস-এ রাখা স্টাডা কোডেক্স। কেসটা দুপ শব্দে বন্ধ করল ও, ওটা গুঁজে নিল বগলের নিচে। 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

লাবনী ঘুরে রওনা হয়েছে, কিন্তু লেসার স্ক্যানারের পাশে আরেকটা ইকুইপমেন্ট দেখে থামল রানা। ওটা প্রোটোটাইপার... ভেতরে কিছু আছে। ওই একই জিনিস দিয়ে ইউএন ভল্টের কোডেক্স সরিয়ে নিয়েছিল ও। ভেতরের জিনিসটা চেনা চেনা লাগল ওর।

থেমে গেছে লাবনী। ঘুরে বলল, 'ওটা কোডেক্সের মলাট। ওটাই নাকি শিবের গুহায় ঢোকার চাবি।'

মনোযোগ দিল রানা। জিনিসটা ভারী। প্লাস্টিকের। পরিষ্কার দেখল পাঁচ দেবীর মুখ। মাঝখানে শিবের। এদিকে ফিরে এসে অরিচালকাম প্রচ্ছদের সঙ্গে প্লাস্টিকের ছাপ মিলিয়ে দেখল লাবনী। 'ওটা নষ্ট করে ফেলতে হবে

প্রোটোটাইপার থেকে জিনিসটা বের করল রানা, ভাঁজ করতেই মট্ করে ভাঙল। মেঝেতে ফেলে কয়েকবার মাড়িয়ে দিল, চুরচুর হলো জিনিসটা। তখনই শুনল বাইরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। 'লাবনী, এবার যেতে হয়, নইলে খুন হব!'

কাছে চলে এসেছে পদশব্দ। দরজার দিকে সাবমেশিন গান তাক করল রানা। চোখের কোণে দেখল, টেবিলে রয়েছে শিবের গুহার চাবির আরেকটা নকল প্লাস্টিকের ছাপ। ওটা চলে গেল ওর জ্যাকেটের পকেটে।

ওই একই সময়ে এমপিফাইভকে হাতে ভেতরে ঢুকল এক লোক, বুকে দুটো বুলেট নিয়ে লাশ হয়ে পিছলে পড়ল মেঝেতে।

এক ছুটে তার পাশে পৌঁছুল রানা, ইউএসপি পকেটে রেখে তুলে নিল এমপিফাইভকে-টা। কেবিনেটে রাখা মঙ্গেলকারের প্রথম কমপিউটারের ওপর পড়ল চোখ। 'স্পেকট্রাম?' অস্ত্রের বাঁট দিয়ে কাঁচ ভাঙল ও। পরক্ষণে চুরমার করে দিল প্রাচীন কমপিউটার।

কাঁচ ভাঙার আওয়াজে চমকে গেছে লাবনী। জানতে চাইল, 'আদ্যি কালের কমপিউটার ভাঙলে কেন?'

মুচকি হাসল রানা। 'একটু প্রতিশোধ নিলাম... এবার দেখাও কোথায় গ্যারাজ।'

ইনফোট্যারিয়াম থেকে বেরিয়ে রানাকে নিয়ে এলিভেটরের দিকে চলল লাবনী। তখনই করিডোরের কোনা থেকে তেড়ে এল আরেক গার্ড। এমপিফাইভকে-র একঝাঁক গুলি বুকে নিয়ে চিত হয়ে পড়ল সে। হৈ-চৈ শুনতে পেল ওরা পেছনে। আরও লোক ছুটে আসছে ধরতে।

খাটো প্যাসেজ ওদেরকে নিয়ে এল এলিভেটরের সামনে। কল বাটন টিপে অপেক্ষা করল লাবনী। কিন্তু ওটা কখন আসবে সেজন্যে বসে থাকল না রানা, পাশের দরজার কবাট এক লাথিতে খুলে নিচের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। পিছু নিল লাবনী। রানার মতই একেকবারে তিনটে করে ধাপ নামছে। ওর কোমরে ধুপ-ধাপ লাগছে ভারী কোডেক্সের কেস। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে বেসমেন্টে নেমে এল ওরা।

রানার চোখ দেখে লাবনী বুঝল, দামি সব গাড়ি দেখে খুশি বাঙালি গুপ্তচর। প্রায় সব নামকরা গাড়ি সাজিয়ে রেখেছে অনুপম মঙ্গেলকার তার গ্যারাজে। 'প্রায় লোভিস ডেনিয়েলসনের সেই গ্যারাজের কালেকশনের মতই।'

মৃত বিলিয়নেয়ার আর জীবিত বিলিয়নেয়ারের মাঝে তুলনার মানসিকতা এখন নেই লাবনীর, সোজা জানতে চাইল, 'কোন্ গাড়ি নেবে, যেটা চেপে বেরোতে পারব?'

দ্বিধায় পড়ল রানা। তিন সেকেণ্ড পর দেখাল কালচে ধূসর রঙের বুগাটি ভেরন। 'বর্তমানের সবচেয়ে দ্রুতগামী গাড়ি।'

'গিনেসের ওঅর্ল্ড রেকর্ড বাদ দাও, চালু করো ওটাকে!' ভীষণ ভয় লাগছে লাবনীর। ধরা পড়লে খুন হবে।

এলিভেটরের পাশের দেয়ালে কাঁচের কেবিনেটে নানান চাবি। প্রতিটি চাবির সঙ্গে প্রস্তুতকারক কোম্পানির চাবির রিং ও লোগো। বুগাটির জন্যে ইবি লোগো খুঁজল রানা। ওটা দেখে এমপিফাইভকে-র বাঁটের গুঁতো মেরে কাঁচ ভাঙল, তুলে নিল চাবি। ওটা দিয়ে দিল লাবনীর হাতে। 'ড্রাইভ করছ তুমি।'

'আমি? কিন্তু...'

'নইলে গুলি করতে হবে তোমাকে।'

'ড্রাইভিং অনেক সোজা,' একদৌড়ে ভেরনের পাশে পৌঁছল লাবনী। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে রেখে দিল কোডেক্সের কেস ও অস্ত্র, তারপর বসে পড়ল নিচু গাড়িটার ড্রাইভিং সিটে।

সুপার কার ঘুরে দরজা খুলে প্যাসেঞ্জার সিটে বসে অস্ত্র তৈরি রাখল রানা। ওদিকে গুঞ্জন তুলেছে এলিভেটর। ওটার দরজা পুরো খুলে যাওয়ার আগেই ওদিকে গুলি পাঠাল ও। বেরিয়ে আসতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ল এক গার্ড। পেছনে ছিল চাঞ্চাল আধিকারী, কিন্তু রানার গুলি স্পর্শ করল না তাকে। দেয়াল ঘেঁষে ভেতরে রয়ে গেল সে। তাকে খতম করে আসবে কি না ভাবল রানা, কিন্তু তখনই গর্জন ছাড়ল ভেরনের ষোলো সিলিণ্ডারের ইঞ্জিন। সিটে হেলান দিয়ে বলল ও, 'রওনা হও!'

লাবনী অ্যাক্সেলারেটর চেপে ধরতেই কর্কশ আওয়াজ ছাড়ল গাড়ির চার চাকা, পিছনে ছিটকে গেল রাবারের পোড়া ধোঁয়া। 'এই গিয়ার স্টিক দিয়ে কী করতে হয়?' ভয় পেয়ে জানতে চাইল লাবনী। চেষ্টা করে দেখেছে, সেকেণ্ড গিয়ার দেয়া যায় না।'

'সিকুয়েনশাল, গিয়ার সামনে দিলে বাড়তে থাকবে,' রানা

দরজা দিয়ে অর্ধেক দেহ বের করে দিয়ে দেখল, এলিভেটর থেকে বেরিয়ে একটা ম্যাকলেরানের আড়াল নিয়েছে চাঞ্চাল আধিকারী।

বুঝে গেছে লাবনী, কীভাবে গিয়ার ফেলতে হবে। এত জোরে সামনে বাড়ল ভেরন, অস্ত্রের তাক নড়ে গেল রানার। চুরমার হলো ম্যাকলেরানের উইণ্ডশিল্ড। আরেক পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্শাল আর্টিস্ট। বিরক্ত হয়ে নিজেও গাড়ির ভেতরে ফিরল রানা। আরও নিচু করে নিল জানালার কাঁচ। তুমুল বেগে র‍্যাম্প লক্ষ্য করে চলেছে গাড়ি।

গতি আরও বাড়াচ্ছে লাবনী, গাড়ির পেছনে জোরালো গর্জন ছাড়ছে ইঞ্জিন। সামনের এয়ার ড্যাম কর্কশ আওয়াজে র‍্যাম্পে ঘষা লাগতেই এক লাফে গ্যারাজের মুখে চৌকো সোনালি রোদে পৌঁছল ভেরন। ওই একই সময়ে গ্যারাজের মুখে থেমেছে এক রেঞ্জ রোভার, ঠেকিয়ে দেবে যে-কোনও গাড়ির পলায়ন।

লাবনীর মনে হলো ব্রেক করা উচিত, কিন্তু চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর। শক্ত হয়ে বসেছে ওরা সিটে।

র‍্যাম্পের শেষে চিতার মত ছিটকে বেরোতেই ভেরনের নিচের অংশ লাগল রেঞ্জ রোভারের জানালার উচ্চতায়। উড়িয়ে নিয়ে গেল জিপের ভাঙা কাঁচ ও দুমড়ে যাওয়া ধাতু। ঠিক সময়ে মাথা নিচু করে নিয়েছে ড্রাইভার, নইলে মাথা উড়ে যেত তার। মাত্র এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে গেল সুপার কার।

তিন সেকেণ্ড পর রাস্তায় নামল গাড়িটা। জোরালো ফট্-ফট্ আওয়াজ তুলে খুলে গেছে এয়ার ব্যাগ, সিটের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে লাবনী ও রানাকে।

ভীষণ চমকে গেছে লাবনী, সোজা হয়ে বসতে চাইল। তারই ভেতর বুঝল, আর নতুন কোনও স্পিড রেকর্ড ভাঙবে না বুগাটি। মুচড়ে গেছে সাসপেনশন, খুলে গেছে পেছনের এক চাকা, লাগছে বডির পাশে ধুপ-ধাপ আওয়াজে। মস্ত ক্ষতি হয়েছে দামি গাড়ির,

তবুও ওটাকে নিয়ে এস্টেটের গেটের দিকে চলল লাবনী।

সোজা হয়ে বসে অস্ত্র তৈরি রাখল রানা। টার্গেট পেলেই গুলি করবে। দানব নরেশ শর্মা আর আরেক লোক মিলে গলফ কার্টে চেপে প্রাসাদের দিকে আসছে। পেছনের সিটে অনুপম মঙ্গেলকার ও তার স্ত্রী। তাদের দিকে গুলি পাঠাল রানা। কার্টের মেঝেতে শুয়ে পড়ল বিলিয়নেয়ার দম্পতি। অবশ্য তাদের গার্ড লোকটা লাশ হয়ে পড়ে গেল রাস্তার পাশে। মাথা নিচু করে নিয়ে গল্ফ্ কার্ট নিয়ে আরেক দিকে চলেছে নরেশ শর্মা। আড়াল দিতে চাইছে মনিবদেরকে।

দীর্ঘ রাস্তা ধরে ছুটে চলল লাবনী। কিন্তু দূরে দেখা গেল ব্যারিয়ারের আগে রাখা হয়েছে আরেকটা রেঞ্জ রোভার। ওটাকে পাশ কাটাতে পারবে না সুপার কার ভেরন, ওটাকে শেষ করে দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত সাসপেনশন।

'লাবনী, রানওয়ের দিকে চলো!' তাড়া দিল রানা।

কষে ব্রেক করে গাড়ি ঘুরিয়ে রানওয়ের দিকে চলল লাবনী। চট্ করে পেছনের গল্ফ্ কার্ট দেখল রানা। মৃত গার্ডের কাছ থেকে এমপিফাইভকে সংগ্রহ করেছে মাধুরী মঙ্গেলকার। অস্ত্র তাক করছে ভেরনের দিকে। 'নিচু হয়ে বোসো!' নির্দেশ দিল রানা।

বুগাটির বডিতে খটা-খট শব্দে বিঁধল মাধুরী মঙ্গেলকারের এমপিফাইভকে-র বুলেট। অবশ্য গাড়ির পেছনে ইঞ্জিন, ভেতরে ঢুকল না গুলি। কামানের গোলা এলেও সহজে সামনে আসবে না। কিন্তু পেছনে রেডিয়েটর থেকে এল তীক্ষ্ণ হিসহিস আওয়াজ, ফুটো হয়ে গেছে ওটা।

স্কিড করে জেট বিমান পেরোল লাবনী, সামান্য দূরেই কন্টেইনারে ছোট এয়ারক্রাফট। সোজা রানওয়ের শেষমাথার দিকে চলেছে গাড়ি। ভেরন ফোর-হুইল ড্রাইভ, এক চাকা খুলে

গেলেও গতি এখনও তুমুল। আয়নায় রানা দেখল, গতির কারণে মুহূর্তে গল্‌ফ্‌ কার্ট চলে গেছে বহু পেছনে। আসলে মাত্র চার সেকেণ্ডে বুগাটি পৌঁচেছে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে। পরের দু'তিন সেকেণ্ডে পেয়েছে ঘণ্টায় এক শ' মাইল গতি।

'আরেবাপরে!' বিড়বিড় করল লাবনী।

সোজা হয়ে সিটে বসল রানা। 'তুমি দেখি গ্রাঁ প্রি চ্যাম্পিয়ন ড্রাইভারদেরকে হারাতে চাইছ!'

চুনের মত সাদা লাবনীর মুখ। থরথর করে কাঁপছে ভেরনের ক্ষতিগ্রস্ত সাসপেনশন। ঘুরে যেতে চাইছে স্টিয়ারিং হুইল। গতি যত বাড়ছে, কঠিন হচ্ছে ওটা নিয়ন্ত্রণে রাখা। ড্যাশবোর্ড ওয়ার্নিং লাইট দেখাচ্ছেঃ শুধু রেডিয়েটর নয়, আরও ক্ষতি হয়েছে গাড়ির। স্পিডোমিটারের কাঁটা উঠল এক শ' মাইলেরও বেশি, তারপর আবার নামল নিচে। 'পরেরবার এই গাড়ির শুধু অয়েল চেঞ্জ নয়, আরও কিছু ঠিক করাতে হবে,' কাঁপা সুরে বলল লাবনী।

পেছনে ঘুরে তাকাল রানা। এখন ইঞ্জিন থেকে ভকভক করে সাদা বাষ্প উঠছে না, তার বদলে তেলতেলে কালো ধোঁয়া। ওদের পেছনে ধেয়ে আসছে দ্বিতীয় রেঞ্জ রোভার। 'আর একটু গেলেই মেইন গেট উড়িয়ে বেরিয়ে যাব,' বলল রানা।

এদিকে গতি কমছে ভেরনের। ফুরিয়ে আসছে রানওয়ে। শেষ হলো ল্যাণ্ডিং বাতি। সামান্য দূরে এস্টেটের উঁচু দেয়াল। থরথর করে কাঁপছে স্টিয়ারিং হুইল, ওটাকে ঘুরিয়ে সোজা রাস্তার দিকে ছুটল লাবনী। আর সামান্য গেলেই মেইন গেটের কাছে পৌঁছুবে ওরা।

কিন্তু গতি কমছে বলে গেট ভাঙতে পারবে না ভেরন।

ভেতরে জমছে ইঞ্জিনের কুচকুচে কালো ধোঁয়া। মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটর চেপে রেখেছে লাবনী, তবু কমছে গতি। বেগ এখন ষাট মাইল... পঞ্চাশ...

রাস্তায় পৌঁছে গাড়ি সোজা করে নিল লাবনী। সরাসরি সামনে গেট। ব্যারিয়ারের দিকে ছুটে এল কয়েকজন গার্ড, বাধা দেবে। প্রত্যেকে সশস্ত্র।

'ব্যারিয়ার উড়িয়ে বেরোতে হবে!' বলল রানা, পরক্ষণে মাথা নাড়ল। 'কিন্তু গতি কই?'

বেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। আরও কমছে। অ্যাক্সেলারেটর চেপে ইঞ্জিন থেকে শক্তি আদায় করতে চাইল লাবনী। আগের চেয়েও বেশি কাঁপছে ভাঙা চাকা। বাঁক নিতে চাইছে গাড়ির পেছন দিক।

'আর এগোবে না এই গাড়ি!'

গতি এখন তিরিশ মাইল...

তখনই ধাতব বিকট আওয়াজ শুনল ওরা। অ্যাক্সেল থেকে খুলে এল ভাঙা চাকা, যাওয়ার পথে নিল পেছনের কোয়ার্টার প্যানেল। এমনিতেই সুপার কার অনেক নিচু, এবার রাস্তা স্পর্শ করে কর্কশ শব্দ তুলে কয়েক সেকেণ্ডে থামল জগদ্দল পাথরের মত।

অস্ত্র হাতে ছুটে আসতে গিয়ে পরক্ষণে চরকির মত ঘুরে দেখল গার্ডরা, ধাতব সংঘর্ষের বিকট শব্দ তুলে আঙিনায় ঢুকে পড়েছে অন্য এক গাড়ি!

মেইন গেটের একদিকের কবাট উড়িয়ে ব্যারিয়ার ভেঙে হাজির হয়েছেন ইণ্টারপোল এজেন্ট অঙ্কুর রায়। গাড়ির গুঁতো খেয়ে ব্যারিয়ারের কয়েক টুকরো কাঠ ছিটকে গেল নানান দিকে। তার একটা লাগল এক গার্ডের পেটে, গার্ড-কুটিরের জানালা ভেঙে ভেতরে ছিটকে পড়ল সে। অন্য দুই গার্ড মস্ত লাফে সরে গেল গাড়ির সামনে থেকে। ঘুরেই তাক করল অস্ত্র...

বনবন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়েই হ্যাণ্ড ব্রেক টানলেন অঙ্কুর রায়। ফলে পিছলে ঘুরল গাড়ির পেছন অংশ— ধুম করে

ধাতব ভোঁতা শব্দ তুলে উড়িয়ে দিল এক গার্ডকে। অন্য লোকটা একেবারে শেষ সময়ে ঝাঁপ দিয়ে সরে গেল। কয়েক গড়ান দিয়ে উঠেই কুঁজো হয়ে অস্ত্র তাক করল গাড়ির আরোহীর দিকে।

একই সময়ে লাথি মেরে প্যাসেঞ্জার দরজা খুলল মউরোস। গুলি করার আগেই গার্ডের পেটে লাগল দরজার কোনা। অস্ত্র ফেলে পেট চেপে ধরল সে। ঠং করে পড়েছে সাবমেশিন গান রাস্তায়। ঝাঁকি লেগে পর পর কয়েকটা গুলি বেরিয়ে ছিন্নভিন্ন করল অস্ত্রের মালিকের হাঁটুর বাটি। শেয়ালের মত হুক্কা-হুক্কা বিলাপ জুড়ল লোকটা।

গাড়ি থেকে নেমে অস্ত্রটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল মউরোস। ভাঙা ভেরনে বসে আছে রানা-লাবনী, ওদেরকে হাতের ইশারা করল ও। 'জলদি এসো! ভেবেছ সারাদিন এখানে বসে থাকবে?'

উনিশ

সেলফোন পকেটে রাখলেন অঙ্কুর রায়, সদা হাসিখুশি মুখটা এখন থমথম করছে। 'আসলে ঠিক পথে গেল না ব্যাপারটা... তবে, এর চেয়েও অনেক খারাপ হতে পারত।'

'কী বললেন আপনার ইমিডিয়েট বস্?' জানতে চাইল রানা, 'মঙ্গেলকারদেরকে গ্রেফতার করা হবে, বা তদন্ত করা হবে?'

'না, তেমন কিছুই না। আগে জোগাড় করতে হবে আরও প্রমাণ।'

'প্রমাণ আর কীসের?' বলল লাবনী। হাত তুলে দেখিয়ে দিল টেবিলে রাখা লালচে-সোনালি স্টাডা কোডেক্স। 'আর কী জানতে হবে?'

ওরা আছে দিল্লিতে ইন্টারপোল এজেন্ট অঙ্কুর রায়ের ছোট্ট, আধুনিক অ্যাপার্টমেন্টে। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফেরার সময় সবার জন্যে সরকারী ট্র্যান্সপোর্ট বিমানের ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

'ওদের প্রাসাদে ছিল কোডেক্স,' বলল মউরোস, 'তবুও ওখানে অ্যাকশনে যেতে ইন্টারপোলের এত দ্বিধা কেন?'

'ইন্টারপোল বলছে, আমাদের কথার বিরুদ্ধে তাদের কথা, তাই কোনও পক্ষ কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। যদি কোডেক্সে অনুপম মঙ্গেলকার বা তার স্ত্রীর আঙুলের ছাপ থাকত, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো।' কাঁধ ঝাঁকালেন অঙ্কুর রায়। 'এদিকে এরই ভেতর ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মঙ্গেলকাররা। বড় সব জায়গায় বন্ধু-বান্ধব। গত কয়েক ঘণ্টায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে তারা। রাজনীতিক, উকিল, বিচারপতি, সরকারী সব আমলা... কাজেই জোরালো কোনও প্রমাণ না পেলে কিছুই করতে পারবে না ইন্টারপোল।'

'তার মানে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা করতে পারব না?' অবাক সুরে বলল লাবনী। 'কিন্তু এটাকে কী বলবে ইন্টারপোল... আমি এখন ভারতে। কিডন্যাপ করা হয়েছিল আমাকে!'

'সেদিকটা দেখেছি। কিন্তু আসলে দুর্ভাগ্যজনক, আপনি কখন কীভাবে এসেছেন তার পুরো রিপোর্ট আছে ইমিগ্রেশনে। কয়েক দিন আগে আমেরিকা থেকে ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে নামেন।'

'মিথ্যা! বিমানে করে সোজা নিয়ে গেছে ওদের এয়ারফিল্ডে!'

'ঠিক আছে, কিন্তু ভুলে গেলে, ইমিগ্রেশনের জন্যে কাদের কোম্পানি তৈরি করে কমপিউটার সফটওয়্যার?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল

রানা।

'তার মানে স্টেলমেট,' বলল মউরোস। 'আপাতত হামলা করতে পারবে না, নইলে সন্দেহ পড়বে ওদের ওপর। এদিকে আমরাও আইনের সাহায্য নিতে পারব না।'

'ভাল দিক বলতে একটাই,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'মিস্টার রানা কোডেক্স ফিরিয়ে এনেছেন, তা জানিয়ে দিয়েছি নিউ ইয়র্ক পুলিশ, ইণ্টারপোল আর ইউএনকে। আশা করা যায়, জিনিসটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলে রানাকে আর গ্রেফতার করবে না কেউ।'

'কোডেক্সের মলাটের কপি বোধহয় আছে মঙ্গেলকারদের হাতে,' বলল রানা, 'সেক্ষেত্রে কোডেক্স আর লাগবে না ওদের।'

'তার মানে খুঁজে বের করবে শিবের গুহা?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'আমরা দেরি করলে, পেয়েও যেতে পারে,' বলল রানা। লাবনীর দিকে তাকাল। 'তোমার কী ধারণা... কোথায় আছে ওই গুহা?'

কাঁধ ঝাঁকাল লাবনী। 'কেউ জানে না। কোডেক্সের অনুবাদ আছে ওদের হাতে। আন্দাজ করছে অনেক কিছুই। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, আসল জায়গা চিনে গেছে।'

'কী ভাবছে তারা?' জানতে চাইল মউরোস।

ব্যাঙ্গালোরের ওই প্রাসাদে অনুপম মঙ্গেলকারের কথাগুলো মনে পড়ল লাবনীর। 'লোকটাকে বলেছি, সহজ হবে না কোডেক্স ঘেঁটে শিবের গুহা বের করা।'

'কিন্তু পেয়েও যেতে পারে, এই তো?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'আমাদের উচিত আগেই আসল জায়গায় পৌঁছে যাওয়া,' বলল লাবনী।

‘সে সুযোগ আছে?’ ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ‘জানব কী করে ওটা কোথায় আছে!’

‘মঙ্গেলকাররা কোডেক্স ঘাঁটলেও জানে না জায়গাটা আসলে কোথায়। ওই যে বললাম, আঁচ করছে তারা। তাদের ধারণা, ওই গুহা থাকবে কৈলাস পর্বতে। ওদিকেই শিবের বাড়ি।’

‘পবিত্র পর্বত,’ মাথা দোলালেন অঙ্কুর রায়। ‘যুক্তি আছে কথায়।’

‘আগে কখনও ওখানে গেছেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘না।’ মৃদু হাসলেন মিস্টার রায়। ‘তীর্থযাত্রীর সঙ্গে ঠিক মেলে না আমার কাজের ধরন। কোনও দিন হয়তো প্রায় ন্যাংটো হয়ে হাজির হব ওখানে।’

‘আপনার এখানে অ্যাটলাস আছে?’ জানতে চাইল রানা।

পাশের ঘর থেকে বড় একটা বই নিয়ে ফিরলেন অঙ্কুর রায়। টেবিলে রেখে খুললেন। ভারতের উত্তর দিকের মানচিত্র দেখল রানা। ধূসর ও লালচে রঙে দেখানো হয়েছে হিমালয়। নিচে ভারতের অন্য অংশ সবুজ ও বাদামি রঙের। পৃষ্ঠার একেবারে ওপরে চিনের তিব্বত। ওটা আর ভারতের মাঝে স্যাণ্ডউইচ হয়েছে নেপাল।

‘এদিকে দেখুন,’ আঙুল তাক করে নেপালের উত্তর-পশ্চিম দিক দেখালেন অঙ্কুর রায়। ওদিকেই ভারত ও চিনের বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা। ‘এদিকেই মানস সরোবর ও রাক্ষস তাল—অত্যন্ত পবিত্র দুই হ্রদ। বলা হয় মানস সরোবর থেকে এক ঢোক পানি খেলে এক শ’ জন্মের সব পাপ মুছে যায়।’

‘সুযোগ পেলে এক বালতি শেষ করতাম,’ হাসল মউরোস।

‘দুই হ্রদ থেকে উত্তরে কৈলাস পর্বত,’ বললেন রায়। ‘ওরই চূড়ায় বসে ধ্যান করতেন শিব।’

‘যাতে মানব-সভ্যতা শেষ করা যায়, মঙ্গেলকারদের কথা

অনুযায়ী,' মন্তব্য করল লাবনী।

'যাতে নতুন করে সব শুরু করা যায়,' বললেন রায়।

'কিন্তু আপাতত প্রায় কেউ চাইছি না তেমন কিছু হোক,' বলল লাবনী।

'অনুপম মঙ্গেলকার খুলে বলেছে, কীভাবে শেষ করবে মানব সভ্যতা?' জানতে চাইল মউরোস।

রানা জানে, বলেছে লাবনী।

ভারত সরকারের অন্তত একহাজার পদস্থ কর্মকর্তা বিক্রি হয়ে গেছে অনুপম মঙ্গেলকারের কাছে। তারা যোগাযোগ রাখছে প্রায় প্রতিটি দেশের বিক্ষুব্ধ সরকারী বড় কর্মকর্তার সঙ্গে। নিয়মিত মোটা অঙ্কের টাকা পাচ্ছে তারা। গড়ে তোলা হয়েছে দাতব্য সব সংগঠন। ঝামেলা হলে বহু মানুষকে সহায়তা দেবে তারা। এদিকে দিল্লিতে মাত্র একবার অনুপম মঙ্গেলকার ইঙ্গিত দিলেই, মিটিঙের সময় বোমার হামলায় বিধ্বস্ত হবে জি-২০ সামিট সম্মেলন কক্ষ, খুন হবেন বিশজন বিশ্বনেতা। দুনিয়া জুড়ে শুরু হবে পরস্পরকে দোষারোপ। বড় ভূমিকা নেবে দ্য কোয়েশ্চেন সার্চ ইঞ্জিন। যুদ্ধ আরম্ভ হবে ভারত-পাকিস্তান ও আরও অনেকগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশে। তা ছড়িয়ে পড়বে আরও অন্যান্য দেশে। আণবিক বোমার বিস্ফোরণে বেশিরভাগ দেশের সর্বনাশ হলে তখন শিবের বেদ হাতে কাজে নামবে অনুপম মঙ্গেলকার। পাশে থাকবে তার স্ত্রী ও অনুগত সাধুরা। দুর্যোগের সময় খাবার ও অন্যান্য দরকারী সাহায্য পেলে একদল মানুষ মেনে নেবে অনুপম মঙ্গেলকারের নেতৃত্ব।

সংক্ষেপে মউরোস ও অঙ্কুর রায়কে সব খুলে বলল লাবনী।

সামান্য দুয়েকটা দিক ভুলে গিয়েছিল বলে সেসব যোগ করল রানা।

মাথা দোলাল মউরোস। 'পাকিস্তান-ভারত দু'দেশেরই আছে

আণবিক বোমা। এরা আণবিক লড়াইয়ে জড়ালে অন্যান্য দেশগুলোও বসে থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে যুদ্ধ।'

'কিন্তু এসব থেকে কী পাবে মঙ্গেলকাররা?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'পরের পর্যায় বা সত্য যুগ চাইছে ওরা,' বলল লাবনী, 'ওটাই নাকি সোনালি যুগ।'

'তাই?' অবাক হয়েছেন অঙ্কুর রায়। 'কলি যুগ চলার কথা চার লাখ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তারপর সেটা শেষ করবেন শিব, কোনও মানুষ নয়। অনুপম মঙ্গেলকার কি বদ্ধ-উন্মাদ?'

'তাই তো মনে হয়!' তিক্ত হাসল লাবনী। 'তার ধারণা, একবার শিবের গুহা থেকে বেদ পেলে দুনিয়ার মালিক হবে সে। বেদের সেই শিক্ষার কারণে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করবে সাধারণ মানুষ। নইলে নাকি নর্দমায় পড়ে থাকবে সবাই।'

'কিন্তু বেদ খুঁজে না পেলে?' জানতে চাইল মউরোস।

'বেদ পাবে আশা করছে, নইলে কোনও কাজেই নামবে না।'

'অর্থাৎ, আমরা বেদ পেয়ে গেলে তার আর কিছুই করার থাকবে না,' বললেন অঙ্কুর রায়।

মাথা দোলাল লাবনী। 'কিন্তু জানিই তো না কোথায় আছে শিবের গুহা।' দেখল মানচিত্রে মন দিয়েছে রানা, কুঁচকে রয়েছে ভুরু। নিজেও ডুব দিল লাবনী মনের ভেতর। স্টাডা কোডেক্সের তথ্য থেকে ওই গুহা খুঁজে পেলে দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়বে। আসলে এখন চাই কোডেক্সের অনুবাদ। ওটা থেকে হয়তো বেরোবে জরুরি তথ্য। আনমনে বলল লাবনী, 'মঙ্গেলকাররা কী করবে, জানি না। কিন্তু খচ-খচ করছে মন। কী যেন ভুলে গেছি। রানা, স্টাডা যখন কোডেক্সে লিখলেন ট্যাকটিকাল রিপোর্ট, তখন কী যেন...' চুপ হয়ে গেল ও।

ওর দিকে চেয়ে আছে রানা।

ম্যাপে আঙুল ঠুকল লাবনী। 'স্টাডার অভিযানে কী যেন অস্বাভাবিক কিছু আছে। মন্দিরে গিয়ে দেখা করলেন হিন্দু সাধুদের সঙ্গে। তারা দেখাল শিবের গুহার তালার চাবি।' রানার ছিনতাই করা প্লাস্টিকের চাবি বা ছাপ চোখের সামনে ধরল। মাঝখানে শিবের মুখ, চারপাশে পাঁচ দেবী। 'স্টাডা লিখেছেন, ওই মন্দির থেকে গুহায় যেতে লাগে পুরো একদিন। অথচ ফিরতে মাত্র একঘণ্টা।'

'তা সম্ভব কী করে?' জানতে চাইল মউরোস।

'অনুপম মঙ্গেলকার ভাবছে, গুহা থেকে ফেরার সময় ব্যবহার করা হতো নদীপথ। নৌকো করে ফিরত।' হিমালয়ের বুকে সরু সব নীল আঁকাবাঁকা রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে নদী, সব নেমে এসেছে হাজার হাজার ফুট ওপরের গ্লেসিয়ার থেকে। তাতে সহজ হবে না শিবের গুহা খুঁজে বের করা। লাখ মাইল জুড়ে পাহাড় ও নদী। 'কিন্তু স্টাডা লিখেছেন, নদী থেকে সরে ওঠেন ওই পাহাড়ি মন্দিরে...' তুড়ি বাজাল লাবনী। 'বুঝতে পেরেছি! স্টাডা উত্তর দিকে গিয়ে শেষপর্যন্ত পৌঁছে যান গোল্ডেন পিক বা সোনালি চূড়ায়।'

'গোল্ডেন পিক?' একটু ঝুঁকে বসলেন অঙ্কুর রায়।

'ওখানে ছিল আটলাণ্টিয়ানদের বসতি।'

অবাক হয়েছেন ইন্টারপোল এজেন্ট। 'ওখানে? তিব্বতে? আগে কখনও শুনিনি আটলাণ্টিয়ানরা ওদিকে গেছে।'

একবার অসহায় দৃষ্টিতে চট্ করে রানাকে দেখল লাবনী। ওরা স্থির করেছিল কখনও কাউকে বলবে না গোল্ডেন পিকের কথা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, 'ইয়ে... হ্যাঁ, জরুরি কারণে ওই বসতির কথা রিপোর্টে উল্লেখ করিনি আমরা।' অঙ্কুর রায়ের দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'বুঝতে পেরেছি, কিছু গোপন কথা নিজেদের কাছেই রাখতে

হয়,’ বললেন অঙ্কুর রায়। ‘ইণ্টারপোলেরও আছে।’

ম্যাপে আঙুল ঠুকল মউরোস। ‘এই যে কৈলাস পর্বত। তার উত্তর দিকে গোল্ডেন পিক। এদিকে।’

‘উত্তর-পশ্চিমের ওই পবিত্র পাহাড় পেরিয়ে স্টাডা চলে যান উত্তর-পুবে,’ বলল লাবনী।

‘অনুবাদ করতে গিয়ে কোনও ভুল হয়নি তো?’ জানতে চাইল মউরোস।

‘না, ভুল হয়নি— এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে শিবের গুহা কৈলাস পাহাড়ে নেই,’ ম্যাপের স্কেল দেখল লাবনী। ‘এখান থেকে পুরো এক শ’ মাইলেরও বেশি দূরে উত্তর-পশ্চিমে গোল্ডেন পিক। তাঁর সময়ে সেরা অভিযাত্রী ছিলেন স্টাডা, কাজেই ধরে নিতে পারি, এত বড় ন্যাভিগেশনাল ভুল তিনি করবেন না। কিন্তু এ কথা জানে না অনুপম মঙ্গেলকার। সে দ্য কোয়েশ্চেন থেকে পেয়েছে সব তথ্য। সবই ইণ্টারনেটের জিনিস। আগে কখনও গোল্ডেন পিক সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ করা হয়নি ইণ্টারনেট বা অন্য কোথাও।’ মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। ‘দেখা যাচ্ছে, কমপিউটার সবসময় সবকিছু জানাতে পারে না!’

‘ওই গুহা যদি ওদিকে না থাকে, তো আছে কোথায়?’ ম্যাপের বুকে তর্জনী রেখে এগোল রানা। ‘স্টাডা গেলেন উত্তর-পুবে। পৌঁছে গেলেন গোল্ডেন পিকে। তা হলে ধরে নিতে হবে শিবের গুহা আছে ওই সোনালি চূড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে।’

‘হ্যাঁ... কিন্তু কোডেক্সে লিখেছেন, পবিত্র এক পাহাড়ের মন্দিরে হিন্দু সাধুদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। মিস্টার রায়, বলুন তো ওদিকে আর কোনও...’

‘কেদারনাথ,’ আগে মনে পড়েনি বলে কপাল চাপড়ে নিলেন ইণ্টারপোল এজেণ্ট। ‘অবশ্যই কেদারনাথ! এই যে এদিকে!’ ভারতের বিতর্কিত সীমান্তের এক জায়গায় নির্দিষ্ট একটা চুড়ো

দেখালেন তিনি। 'কথা ঠিক, প্রভু শিব বাস করতেন পবিত্র কৈলাসে, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি ছিল কেদারনাথ পাহাড়ে।'

'ও, গ্রীষ্মের বিলাসভবন?' মাথা দোলাল মউরোস। 'আমি হলে সাগরের কাছে বাড়ি করতাম। কিন্তু দুঃখের কথা, আমি দেবতা নই। অত পয়সাও নেই যে...'

'কেদারনাথের ব্যাপারটা কী?' অঙ্কুর রায়ের দিকে তাকাল লাবনী।

'আসলে ওখানে তিনটে আছে,' বললেন মিস্টার রায়। 'হিন্দু ধর্মের বইয়ে একই গল্প কয়েক রকম বা একই জিনিসের নানান বর্ণনা আছে। তেমনই এক গল্পে আছে: শিবের দুই অনুসারী নর ও নারায়ণ আক্ষেপ করেছিল শিবলিঙ্গের সামনে... ওটাও দেবতার অংশ। তাই শিব খুশি হয়ে তাদেরকে বর দিলেন। তারা তখন বলল, আপনার বর পেয়ে আমরা খুশি। এবার, প্রভু, দয়া করে কৈলাস পর্বত থেকে দূরে আমাদের বসতির কাছে বাস করুন, আমরা তাতে আপনাকে অনেক কাছে পাব। প্রভু তখন রাজি হলেন। অন্য এক গল্পে আছে: পাঁচ ভাই বা পাণ্ডবরা খুন করেন তাঁদের জ্ঞাতি ভাইদেরকে, আর সেই পাপ থেকে রক্ষা পেতে অনুসরণ করছিলেন শিবের। তাঁর কাছে মাফ চান। তখন শিব সন্তুষ্ট হলে জানান, পাণ্ডবদের মঙ্গল হবে, সেদিকে তিনি নজর দেবেন।'

'তৃতীয় গল্পটা কী?' জানতে চাইল মউরোস।

'শিবের স্ত্রী পার্বতীর মনে হলো, আসলে বহু দূরে কৈলাস। অথচ যাদেরকে ভালবাসেন, সবাই তারা বাস করে ভারতে। তাই স্বামীকে অনুরোধ করে বললেন ওদিকে আরেকটা বাড়ি তৈরি করতে। শিবও রাজি হলেন, স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কেদারনাথ পর্বতে তা গড়লেন।'

'কেদারনাথ সম্পর্কে আরও কিছু?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'আর খুব বেশি কিছু জানি না। কখনও ওদিকে যাইনি। কিন্তু ওখানে একটা মন্দির আছে। ওটা ভারতের সবচেয়ে পুরনো আর পবিত্র। ওই মন্দির শিবের।'

'কত পুরনো?' জানতে চাইল মউরোস।

'আমার জানা নেই। তবে অনেক অনেক পুরনো।'

'স্টাডার সে সময়েও ওটা ছিল,' চিন্তিত চেহারায় বিড়বিড় করল লাবনী। 'তা হলে সবই মিলে যায়। স্টাডা ধারণা করেন, শিব আসলে পসেইডন। হাতে তো ত্রিশূল আছেই। গোল্ডেন পিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ওই মন্দির। ধরে নেয়া হয়েছে ওই পাহাড় পবিত্র এবং স্রষ্টার বাড়ি।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'তার মানে. ভুল জায়গায় খুঁজছে অনুপম মঙ্গেলকার। কোডেক্স থেকে ধরে নিয়েছে, ওই পবিত্র পাহাড় কৈলাস জানে না গোল্ডেন পিকের কথা। জানবেই বা কী করে? তার পণ্ডিতি তো দ্য কোশ্চেন সার্চ ইঞ্জিনের ওপর নির্ভরশীল।'

'তো ভাবছেন শিবের ওই গুহা আছে কেদারনাথ পাহাড়ে?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

এখন তো তাই মনে হচ্ছে

'সেক্ষেত্রে এতকাল ওই গুহা কেন বের করে ফেলল না কেউ?' বললেন অঙ্কুর রায়, 'কৈলাস পর্বতের মত দুর্গম নয় কেদারনাথ। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ওখানে যায়। শুধু তাই নয়, ভারতে ওটা টুরিস্টদের অন্যতম আকর্ষণ।'

'হয়তো ভাল করেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওই গুহা। ঢুকতে হলে খুঁজে বের করতে হবে কোনও পাহাড়ি ফাটল। সবাই তো আর প্রতিটা পাহাড়ের চূড়া বা গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেনি।'

'তবুও সহজ হবে না গুহা বের করা,' মন্তব্য করল রানা।

'জানি। কিন্তু কোডেক্সের অনুবাদ পেলে... একমিনিট! আমি আস্ত গাধী!' অঙ্কুর রায়ের ল্যাপটপের ওপর চোখ পড়েছে

লাবনীর। 'কোডেক্সের অনুবাদ পেয়ে যাওয়া কঠিন নয়! মিস্টার রায়, আপনার ল্যাপটপ আর ফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!'

দশ মিনিট পর ইউএন অফিসে লিপি গোমেজের কাছ থেকে স্টাডা কোডেক্সের অনুবাদ পেল লাবনী। টেক্সট্ ঘাঁটতে গিয়ে বলল, 'সারাজীবন কমপিউটার ঘেঁটে লেখাপড়া করলাম, অথচ ঠিক সময়ে মনেই পড়েনি ওই যন্ত্রের কথা।' নির্দিষ্ট একটা প্যারা হাইলাইট করল লাবনী। 'স্টাডা লিখেছেন, সাধুরা বলেছিলেন পাহাড়ের মাঝে আছে ওই গুহা। ওখানে যেতে হলে উঠতে হবে উঁচু এক শৈলশিরায়। খুব কঠিন পথ। সেখানে আছে ভাঙাচোরা এক ফাটল। এখানে এসে আবারও মিলিটারি টার্ম ব্যবহার করেছেন স্টাডা।'

'এসব থেকে শিবের গুহা খুঁজে পাব আমরা?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'পাবার তো কথা। এরই ভেতর জেনে গেছি আসল মন্দির কোন্‌টা। আপনার ল্যাপটপে গুগল আর্থ বা ওই ধরনের কোনও প্রোগ্রাম আছে?'

মাথা দোলালেন অঙ্কুর রায়। দু'মিনিট পর স্ক্রিনে দেখা গেল ওপর থেকে কেদারনাথ পাহাড়ের দৃশ্য। পাহাড়ের গায়ে ওই একই নামের গ্রাম। উত্তর-পুবে সত্যিই আছে খাড়া শৈলশিরা। এত ওপর থেকে ক্যামেরা তাক করা হয়েছে, ভালভাবে ওটাকে বোঝা গেল না।

'ওই গ্রাম থেকে তিন বা চার মাইল দূরে ওই শৈলশিরা,' বলল লাবনী। 'ওপরের দিকে কোথাও আছে ওই গুহা।'

আরও ভাল এরিয়াল দৃশ্য দেখতে ক্যামেরা আরও ওপরে নিল রানা। 'গ্রাম আছে আন্দাজ এগারো হাজার ফুট ওপরে। কিন্তু ওই শৈলশিরা...' স্ক্রিনের ওপর দিয়ে কার্সার নিল। 'সর্বনাশ!

জায়গায় জায়গায় ওটার উচ্চতা কমপক্ষে বিশ হাজার ফুট!'

'খাড়াই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে হবে,' বলল মউরোস। 'নইলে আল্টিচ্যুড সিকনেস ধরে বসবে।'

'এ থেকে বোঝা যায়, কেন ওখানে পৌঁছুতে পুরো একদিন লাগত সাধুদের,' বলল লাবনী, 'তাদের আধুনিক মাউন্টেনিয়ারিং গিয়ারও ছিল না। পায়ে হেঁটে উঠতে হয়েছে। হয়তো ব্যবহার করেছে শৈলশিরার কোনও ফাটল।'

মাথা দোলাল রানা। 'শৈলশিরার গায়ে ফাটল দেখছি। কিন্তু সেটা পঞ্চাশ ফুট না পাঁচ শ' ফুট চওড়া, বোঝা কঠিন। নিজ চোখে দেখতে হবে জায়গাটা কেমন।'

'আমরা কি যেতে পারব ওখানে?' অঙ্কুর রায়ের দিকে তাকাল লাবনী। 'আইনী কোনও বাধা নেই তো?'

'আপনারা সত্যিই যেতে চান কেদারনাথে?' কুঁচকে গেল ইন্টারপোল এজেন্টের ভুরু। 'যাওয়া কি ঠিক হবে? মঙ্গেলকারের লোকদের হামলা হতে পারে।'

লাবনীর দিকে তাকাল রানা। ওর চোখে চোখ রেখে মাথা দোলাল লাবনী।

'ঠিক আছে, আমরা যাব,' বলল রানা। 'মঙ্গেলকাররা অধৈর্য হয়েছে কোডেক্সের জন্যে। কারণটাও জানা আছে আমাদের। জি-২০ সম্মেলনে হামলা করবে। তার আগে চাই শিবের বেদ। অনুপম মঙ্গেলকার বা তার স্ত্রী বোকা নয়। আর্কিওলজিস্ট নয়, কিন্তু যে-কোনও সময়ে বুঝবে, আসলে শিবের গুহা খুঁজতে হলে যেতে হবে কেদারনাথে। ওদের আগেই ওখানে পৌঁছে যেতে চাই।'

'ডিসেম্বরের ভর শীতে হিমালয়ে চড়বে?' গম্ভীর হয়ে গেল মউরোস।

'ব্যস্ত হয়ে উঠেছে অনুপম মঙ্গেলকার, তার চাই ওই বেদ,'

বলল রানা, 'কিন্তু আমরা ওটা পেলে মস্ত বাধা পড়বে তার কাজে। আর্কিওলজিস্ট হিসেবে নামও হবে লাবনীর।'

আস্তে করে মেঝেতে আহত পা ঠুকল মউরোস। 'তোমরা হিমালয়ে গেলে তাতে আমার কোনও ভূমিকা থাকবে না। সেক্ষেত্রে দিল্লিতে রয়ে যাব। ফ্রান্সের ইন্টেলিজেন্সে যোগাযোগ করব। জি-২০ সম্মেলনে আসছেন ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট। তাঁর নিরাপত্তা দেখার দায়িত্ব তাদের। আমি আমার সাধ্যমত করব।'

'গুড,' বলল রানা, 'আমিও ওই একই কাজ করেছি, যোগাযোগ করে জানিয়ে দিয়েছি ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের অনিল চট্টোপাধ্যায়কে। ওদের দায়িত্ব জি-২০ সম্মেলনে হামলা ঠেকিয়ে দেয়া। এরই ভেতর কাজে নেমে পড়েছে। নতুন কোনও তথ্য পেলে জানাবে বলেছে।'

'মঙ্গেলকাররা যত ক্ষমতাশালীই হোক, সহজ হবে না জি-২০ সম্মেলনে ঝামেলা করা,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'শহরের অর্ধেক জায়গা পুলিশ ও আর্মি দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে।'

'অনুপম মঙ্গেলকার কোনও না কোনও গোপন পরিকল্পনা করেছে,' বলল রানা, 'মাসের পর মাস প্ল্যান করার সুযোগ পেয়েছে। নানান দেশ থেকে সরিয়ে নিয়েছে সাংস্কৃতিক আর্টিফ্যাক্ট। যে কারণেই হোক, তার ধারণা, শিবের ওই বেদ পেলেই এক সময়ে দুনিয়ার রাজা হয়ে উঠবে সে। পারুক বা না পারুক, আমাদের কাজ তাকে বাধা দেয়া। সেটা আমরা করব। চেষ্টা করব তার আগে শিবের গুহায় পৌঁছুতে।'

'আমরা মাত্র দু'জন,' বলল লাবনী। 'পারব আমরা?'

'আমি একাই যেতে চাই,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল লাবনী। 'অসম্ভব! আমিও যাচ্ছি।'

'সঙ্গে আমিও আছি,' সবাইকে অবাক করে বললেন অঙ্কুর রায়। 'বাদ পড়ব কেন? হয়তো কোনও সাহায্যে আসতে পারব।'

‘এরই ভেতর অনেক সাহায্য করেছেন, মিস্টার রায়,’ বলল রানা। ‘জীবনের ঝুঁকি নেবেন কেন? দরকার তো নেই।’

‘আমি ভারতীয়, আমার দায়িত্ব এ দেশে মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট পেলে সেটা রক্ষা করা,’ বললেন অঙ্কুর রায়, ‘আমি আপনাদের অন্য কাজেও আসব। ওদিকের হিন্দি ভালই বুঝি।’

রানা বলল না, ইংরেজির মতই ভাল করেই জানে ও হিন্দি বা উর্দু।

‘আমাদের সঙ্গে ভারতের হিন্দু দেবতা বা প্রভুর গুহা খুঁজতে গেলে আপনার বস্ আপত্তি তুলবেন না?’ জানতে চাইল লাবনী।

মাথা নাড়লেন অঙ্কুর রায়। ‘আমার কাজ শুধু চোরাই আর্টিফ্যাক্ট ট্র্যাক করা নয়, সেসব সরিয়ে নিয়ে আসাও। ভাবা যায়, সত্যিই হয়তো পাব প্রভু শিবের লিখিত বেদ!’

‘ওগুলো টেকনিকালি এখনও চুরি হয়নি,’ বলল মউরোস।

মৃদু হাসলেন অঙ্কুর রায়। ‘সেক্ষেত্রে ধরে নিন, চুরির আগেই তা ঠেকিয়ে দেব আমরা।’

‘আপনি ক্লাইমিং সম্পর্কে কতটুকু জানেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘খারাপ করব না,’ বললেন অঙ্কুর রায়। ‘তিনজনের জন্যে জোগাড় করে ফেলব ক্লোদিং আর ইকুইপমেন্ট।’

‘তো তিনজন যাচ্ছি,’ বলল লাবনী।

মোবাইল ফোন বের করে কল করলেন অঙ্কুর রায়। ‘লিয়নে যোগাযোগ করছি।’ গোপনে আলাপ করতে উঠে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে কেদারনাথ পাহাড় দেখল রানা। ‘তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো ওখানে শিবের গুহা আছে, লাবনী?’

মৃদু মাথা দোলাল আর্কিওলজিস্ট। ‘হ্যাঁ, আমরা হয়তো হব হাজার বছরের ভেতর প্রথম মানুষ, যারা ওই গুহা খুলে ভেতরে

পা রাখব। অন্তর থেকে বুঝতে পারছি, মঙ্গেলকারদের আগেই ওখানে পৌঁছুতে হবে।'

সামনে ঝুঁকল মউরোস। 'মনে রাখবেন, লাবনী, বছরের এ সময়ে পাহাড়ের ওদিকের পরিবেশ ভয়ঙ্কর খারাপ। সার্ভাইভাল ট্রেনিং আছে রানার, কিন্তু তার পরেও সামান্য ভুল হলে মরতে হবে। আবারও একবার ভেবে দেখুন যাবেন কি না।'

লাবনীর দিকে তাকাল রানাও।

স্মিত হাসল লাবনী। 'এরই ভেতর মঙ্গেলকারদের প্রাসাদে বেশ ক'বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছি। দ্বিধা করব না পাহাড়ে যেতে। বিশেষ করে যখন পেতে পারি শিবের বেদ।'

'ঝুঁকি যতটা পারো এড়িয়ে চলবে,' বলল রানা। গম্ভীর চেহারায় আবার দেখল ল্যাপটপে কেদারনাথ পর্বত।

বিশ

'অথচ ভেবেছি এদিকে হৈ-চৈ থাকবে না,' রানার পর বাস থেকে নেমে পড়ল লাবনী। হিমালয় সম্পর্কে যেসব বই পড়েছে, তাতে ওর ধারণা হয়েছে, কেদারনাথ যাওয়ার পথে গৌরিকুণ্ড বড়জোর ছোট্ট একটা স্টপেজ। ভীষণ শীতল পরিবেশ। হু-হু করে বইছে হাওয়া। ছোট বড় সব দালানের ছাতে ও ছাউনিতে জমে আছে বরফ। সরু সব পথ যেন শত রঙের নদী। বাজার তৈরি করেছে স্থানীয়রা। শত মানুষের ভিড়।

'এঁদের বেশিরভাগই নানান দেশের তীর্থযাত্রী,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'কেদারনাথ শীতে বন্ধ থাকে। সাধুরা সবাই নেমে আসেন গৌরিকুণ্ডে।'

'পুরো গ্রাম পরিত্যক্ত হয়েছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লাবনী। দেখল বাসের পেট থেকে মস্ত এক রাকস্যাক নিয়ে পিঠে ঝোলাল রানা। 'তা হলে ওপরে উঠে হোটেল পাব না?'

'না, পাবেন না,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'এখান থেকেই হাঁটতে হবে। এখানেই রাস্তার শেষ। এখান থেকে চোদ্দ কিলোমিটার দূরে কেদারনাথ।'

অনেক ওপরে উপত্যকা ও ধূসর সব মেঘ দেখল রানা। থম মেরে ঝুঁকে আছে প্রকাণ্ড, কালো কেদারনাথ পর্বত। সবচেয়ে বড় চূড়া এখান থেকে পুরো তিন মাইল ওপরে।

'পরিবেশ সুবিধের লাগছে না,' একবার ঢোক গিলল লাবনী।

চারপাশ দেখছে রানা। গ্রামে নানান বয়সের মানুষ, পরনে বিচিত্র সব পোশাক। কারও আছে ভারী ওভারকোট, আবার কেউ পরেছে ভারতীয় কমলা আঙরাখা। মনে হলো না শীতে কষ্ট পাচ্ছে কেউ।

'সবাই কি শিবের কাছে প্রার্থনা করতে এসেছে?' জানতে চাইল লাবনী।

'সবাই নয়,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'অন্য দেবতার জন্যেও পবিত্র গৌরিকুণ্ড দেখতে আসে অনেকে। এখানে আছে উষ্ণ এক ঝর্না। ওখানেই প্রথমবারের মত পার্বতীকে ভালবাসার কথা বলেন শিব। ওই ঝর্নায় স্নান করতে আসে অনেকে। আবার ওখানেই জন্ম নেন শিব ও পার্বতীর সন্তান গণেশ।'

'হাতির মাথাটা পরে অন্য জায়গা থেকে?' মৃদু হাসল লাবনী।

মাথা দোলালেন অঙ্কুর রায়।

'আসল মাথা থাকল কই,' বলল রানা। 'গরম ঝর্নায় গোসল

করছিলেন পার্বতী, আর মাকে পাহারা দিচ্ছিলেন গণেশ। এমন সময় অনেক কাল পর ফিরলেন শিব। নিজের ছেলেকে চিনলেন না। পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ছেলে বাধা দিলেন। সেই রাগে গণেশের মাথা কেটে ফেললেন শিব।'

'এটা একটা কাজ হলো, ছিহ্,' বলে ফেলে চট্ করে চারপাশ দেখে নিল লাবনী।

'পার্বতীরও ভাল লাগেনি,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'কঠিন দাবি জানালেন, তাঁর ছেলেকে সুস্থ করে দিতে হবে। কিন্তু কোথায় যে ফেলে দিয়েছেন ছিন্ন মাথা, সেটা আর মনে করতে পারলেন না শিব। তখন আর উপায় না দেখে ছোট এক বাচ্চা হাতির মাথা কেটে বসিয়ে দিলেন গণেশের ঘাড়ে। অবশ্য, এটা গল্পগুলোর একটা। এরকম আরও অনেক গল্প আছে।'

অবাক হয়ে বলল লাবনী, 'একই গল্প নানানরকম হয়েছে? তা হলে হিন্দুরা বুঝবেন কী করে কোন্ গল্পটা আসলে সত্যি?'

'যে গল্পটা আপনার বেশি ভাল লাগবে, সেটা বিশ্বাস করলেই মিটে গেল ঝামেলা,' কাঁধ ঝাঁকালেন রায়, 'আসলে এভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে চলছে হিন্দুদের এসব ধর্মীয় গল্প।'

'মঙ্গেলকাররা যে গল্প শুনে বিশ্বাস এনেছে, ওটা ঠেকাতে হবে, নইলে মস্ত ক্ষতি হবে মানব সভ্যতার,' বলল লাবনী। পাহাড়ের দিকে ফিরে দেখল। 'কেদারনাথ কী করে যাব?'

'উপত্যকা ধরে উঠতে হবে,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'কারও সাহায্য চাইব।' চারপাশ দেখলেন। চড়া গলায় হিন্দিতে জিজ্ঞেস করতেই যা শুনলেন, হতবাক হলেন। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে জবাবে হাসল কয়েকজন। তাদের চেহারা দেখে মনে হলো, রানা, লাবনী আর অঙ্কুর রায়কে পাগল বলে মনে করছে তারা।

'ধরে নিলাম, যাত্রা আরও কঠিন,' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে পাহাড় দেখল লাবনী। এমনসময় শুনল ধস্তাধস্তির আওয়াজ। তীর্থযাত্রীরা

ছিটকে সরতেই নাচতে নাচতে ছুটে এল বুনো চোখের এক পাগলাটে বুড়ো। জট পড়া দাড়ি ও চুল ধূসর, পরনে শুধু সামান্য কমলা আঙরাখা। তুষারের ভেতর পায়ে পাতলা চটি স্যাণ্ডেল। খেপা চেহারা দেখে মনে হলো আশপাশে কেউ এলেই তার মাথায় হাঁকিয়ে দেবে হাতের পোক্ত লাঠি।

'বরফের ভেতর খুন হয়ে যাবে তো!' বলে ফেলল লাবনী।

'যোগী, পবিত্র মনের মানুষ,' বললেন অঙ্কুর রায়, 'সব ফেলে ভারতময় ঘুরে বেড়ান ধর্মের বা স্রষ্টার জ্ঞান লাভের আশায়।'

'আমি হলে শীত কম এমন কোথাও যেতাম,' বলল রানা।

নাচতে নাচতে এলেও বুড়োর প্রতি কমল না তীর্থযাত্রীদের শ্রদ্ধা। কোনও কারণ ছাড়াই মাঝে মাঝে যে-কারও দিকে চেয়ে হাসছেন তিনি। আসতে আসতে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল লাবনীর ওপর। মাথা কাত করে কৌতূহলী চোখে দেখলেন ওকে, তারপর প্রায় ছুটে সামনে এলেন।

'ইয়ে, হ্যালো,' একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল লাবনী। কাউকে বিব্রত করতে চাইছে না। কিন্তু খুব খুশি হতো যোগী উষ্ণ ঝর্নায় একবার গোসল করে এলে। গায়ে বড্ড দুর্গন্ধ।

জ্বলন্ত চোখে লাবনীকে দেখলেন তিনি। ভীষণ কঠোর হয়ে গেল দৃষ্টি। ভাঙা কণ্ঠে ইংরেজি বললেন, 'জানি তুমি কে! কেন এসেছ, তা-ও জানি! তুমি লাবনী আলম!'

অবাক হয়ে গেল লাবনী। 'আপনি... আমার নাম জানলেন কীভাবে?'

'যেখানে আছি, সেখান থেকে দেখতে পাই পুরো দুনিয়া,' মন্ত্র আবৃত্তির সুরে বললেন তিনি।

'এটা কোনও মন্ত্র?' জানতে চাইল অবাক লাবনী।

'না।' চওড়া হাসি দিলেন বৃদ্ধ। লাঠি তাক করে দেখিয়ে দিলেন একটু দূরের এক বাড়ির ছাতে স্যাটেলাইট ডিশ। 'হু-হু-

হু-হু-হা-হা-হা! এর মানে এখানে ডিশ লাইন আছে!' নাচতে শুরু করে লাথি মেরে ছিটিয়ে দিলেন পাতলা তুষার। 'আমি দেখেছি তোমাকে মিশরে! পাশেই স্ফিংস্! কী করে বেড়াচ্ছ তুমি, অ্যাঁ? ভাল করেই জানি কেন এসেছ এখানে!' আবার আগের সেই তুমুল হাসি ছেড়েই দু'হাতে খপ্ করে চেপে ধরলেন লাবনীর দুই সুডৌল স্তন।

'আরে!' ভীষণ চমকে দু'পা পিছিয়ে গেল লাবনী।

'খবরদার! হাত সরান!' লম্পট বুড়োর নাক ফাটিয়ে দিতে ডানহাতি ঘুষি তুলল রানা।

'সাবধান, দাঁড়ান-দাঁড়ান, মিস্টার রানা!' দু'জনের মাঝে পৌঁছে গেলেন অঙ্কুর রায়। বিকট আওয়াজে হাসছেন বুড়ো পাগল। 'ইনি পশুপতি যোগী।'

'তাতে কী?' লাবনীর অপমানে ভীষণ রেগে গেছে রানা। 'এই ব্যাটা যা খুশি করলেই হলো?'

'না, ঠিক আছে, রানা,' লজ্জায় লাল লাবনী বলল, 'কোনও ক্ষতি করেননি। ইয়ে... পাগল মানুষ!' আরও ভাল শব্দ খুঁজতে শুরু করে বলল, 'একসেণ্ট্রিক।'

কর্কশ গলায় হাসলেন বুড়ো যোগী। 'না-না-না! বড়লোকরা একসেণ্ট্রিক হয়! আমি পাগল!'

'ইনি পাগল নন,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'শিবের ভক্তদের একটা শাখা পশুপতি— অনেকে বলেন এঁরা চাঁদের প্রভাবে পাগলাটে হন। উন্মাদের আচরণ করেন, যাতে নিজ সুবিধা আদায় করতে তাঁদের কাছ থেকে বর চাইতে না পারে লোভী লোক।' বৃদ্ধের দিকে ফিরলেন তিনি। 'যান, বাবা, নিজ পথে যান।'

'একমিনিট,' বাধা দিল লাবনী। 'ইনি জানেন আমরা কারা!'

'কারণ টিভিতে তোমাকে দেখেছে,' বলল রানা।

'আরও আছে, কেন এসেছি বলতে শুরু করেন...' যোগীর

দিকে তাকাল লাবনী। 'বলুন তো কেন এসেছি আমরা?'

'তোমরা চাও শিবের গুহায় যেতে।' হাসতে হাসতে আরেকটু নেচে নিলেন পাগলা যোগী। নিজের কানা-খোঁড়া মেয়েকে বিশাল বড়লোক যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে এমন বেদম খুশি হবে কোনও চতুর শ্বশুর।

পরস্পর তাকাল রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়।

'আপনি জানলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'আর কী কারণেই বা আসবে? তুমি বিখ্যাত লাবনী আলম, দুনিয়ার পুরনো সব জায়গা ঘুরে আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করো, মানুষকে জানাও কী পেয়েছ। আমাদের এই পাহাড়ে আছে দেবী পার্বতীর ঝর্না, শিবলিঙ্গম... কিন্তু এসব তো আগেই জেনে গেছে সবাই। কাজেই কেন এসেছ বুঝতে দেরি হবে কেন? তুমি যেতে চাও শিবের গুহায়।'

'শিবের গুহার কথা কারও জানার কথা নয়,' বললেন অঙ্কুর রায়, 'মাত্র ক'দিন আগে ওটা সম্বন্ধে জেনেছেন ডক্টর আলম।'

অপমানিত লালচে চেহারা হলো যোগীর। 'আমি জানি! এই এলাকার সবাই জানে!' গলা নিচু করে টিটকারির সুরে বললেন, 'কিন্তু বাইরের কাউকে কিছুই বলবে না ওরা। কারণ ওটা আসলে আমাদের বিরাট এক গোপন রহস্য।'

'আপনি তা হলে আমাদেরকে বলছেন কেন?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ আমি যে পাগল!' আবারও লাবনীর স্তনের দিকে হাত বাড়িয়েও লক্ষ্যবস্তু নাগালের বাইরে দেখে বললেন, 'কিন্তু তুমি শিবের গুহার খোঁজ পাবে না, ডক্টর আলম!'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নিশ্চিত আপনি,' বলল লাবনী। নিজের বুক রক্ষায় আরেকটু পিছিয়ে দাঁড়াল।

'শিবের গুহার অস্তিত্ব নেই! কিংবদন্তী আসলে কখনও কখনও

মিথ্যা হয়! বোকা মেয়ে, এদেরকে নিয়ে ফিরে যাও!'

'শিবের গুহা না পেলে চলবে না আমাদের। খারাপ একটা দল ওখানে গিয়ে পৃথিবীর বারোটা বাজাতে চাইছে।'

কৌতূহলী হয়ে লাবনীকে দেখলেন বৃদ্ধ। 'বিশেষ কেউ? তার নাম কী?'

'নাম বলতে পারব না, সরি।'

যোগীর চোখে বুদ্ধির ছাপ দেখল রানা। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর চেহারায় ফিরল পাগলামি। 'সবারই গোপন কথা! হু-হু-হু-হু-হা-হা-হা! ...কী দুঃখের কথা! গোপন কিছু পেটে রেখে জ্ঞানের পথে হেঁটে বা স্বর্গীয় পথে কিছুই পাবে না কেউ!'

'আমরা জ্ঞান বা স্বর্গীয় পথ নিয়ে ভাবছি না,' বলল বিরক্ত রানা, 'শুধু জানতে চাইছি, কোন্ পথে কেদারনাথ যাব। ওই পথ আপনি চেনেন?'

'অবশ্যই! এই পাহাড়ি অঞ্চলে জন্ম নিয়েছি। বিয়েও করেছি এখানে।' উদাস হয়ে গেলেন বৃদ্ধ যোগী। কী এক বিষাদময় স্মৃতি যেন ভর করল চোখে। একটু পর ঘুরে দেখলেন লাবনীকে। 'ওখানে কিছুই পাবে না জেনেও যেতে চাও কেদারনাথে?'

'জী,' ছোট্ট করে বলল লাবনী।

'এই বাজে আবহাওয়ায়?' ঘন কালো মেঘে ঢাকা পাহাড় দেখালেন যোগী।

'জী।'

মাথা নেড়ে হিন্দি ভাষায় কী সব বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ। মাথা দোলালেন। 'বেশ! পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব তোমাদের।'

'আপনার অনেক দয়া, তবে নিজেরাই পথ জেনে নেব,' বলল রানা।

'না, যেতে চাই তোমাদের সঙ্গে,' জোর দিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'পথ-প্রদর্শক লাগবে। সামনে মস্তবড় বিপদ। তার চেয়েও বড়

কথা, খুঁজে দেব কেদারনাথে উষ্ণ জায়গা।'

'আমি তো জানতাম এখন ওখানে কেউ নেই,' বললেন অঙ্কুর রায়।

'নেই তো! কিন্তু শীতে থাকতে পারবে এমন জায়গা চিনি। এসো, ওই যে ওদিকে কেদারনাথ।' রাস্তার দূরে লাঠি তাক করলেন যোগী।

'কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে মাইলের পর মাইল পাহাড়ি পথে হাঁটতে হবে, এত কষ্ট কেন করবেন?' জানতে চাইল লাবনী।

জবাবে যোগী বললেন, 'কারণ ওটাই যুক্তিসঙ্গত। তোমাদের সাহায্য লাগবে। আমি এসেছি বিপদ থেকে তোমাদেরকে সরিয়ে রাখতে। ...অন্য কোনও কারণে আসব কেন? এসো, রওনা হই কেদারনাথের পথে।'

'আমরা সঙ্গে নেব এঁকে?' লাবনীর দিকে তাকালেন অঙ্কুর রায়।

রানার দিকে তাকাল লাবনী। কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠেকাতে তো পারব না। নইলে বেঁধে রাখতে হবে। তা যখন সম্ভব নয়, আসুক আমাদের সঙ্গে।' সামান্য বিরতির পর বলল, 'কিন্তু বুড়ো হাইপোথারমিয়ায় জমে গেলে কাঁধে তুলে ওই খাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে আসতে পারব না।'

'পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেছে, আমরা চাই বা না চাই,' বলল লাবনী। তুলে নিল নিজের প্যাক। 'ঠিক আছে, চলুন। আপনার নাম তো জানলাম না...'

'রঞ্জন মিত্র,' মাথা দুলিয়ে বললেন বৃদ্ধ, 'খুব খুশি হলাম তোমাদের কাজে আসতে পেরে। আশা করি পায়ে ভাল জুতো আছে?' বার কয়েক লাফিয়ে নেচে নিলেন তিনি। দূরে সরে গেল ভীড় করা তীর্থযাত্রীরা। সামান্য দ্বিধা নিয়ে রঞ্জন মিত্রের পিছু নিল

রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়।

ওরা দেখছে, বৃদ্ধের কাণ্ড দেখে এখনও বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে অনেকে। অন্যরা স্থানীয়, সহজভাবেই নিয়েছে এসব। বুড়োর পাশে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রানা, 'বলুন তো, জ্ঞান বা স্বর্গের পথে কত দিন ধরে হাঁটছেন?'

'বলা মুশকিল, পথের শেষ না পেলে কেউ জানবে না কত দিন ধরে হেঁটেছে,' বললেন রঞ্জন মিত্র।

'বুঝলাম। কিন্তু আমি জানতে চেয়েছি...'

'কী জানতে চেয়েছ, তা বুঝতে পেরেছি। আমরা যে পথে হাঁটছি, সেটা ভাল করেই চিনি।' লাল রঙের ইঁটের আর্চ করা গেট দেখালেন। ওখান থেকেই শুরু খাড়াই পথ। 'ওদিক দিয়েই যেতে হবে কেদারনাথে। ঠিক জানো তো, যেতে চাও ওখানে?'

পেছন থেকে বলল লাবনী, 'হ্যাঁ, অবশ্যই যেতে চাই।'

'আমিও তাই ভেবেছি— ভাল!' হাততালি দিলেন বৃদ্ধ। 'তো চলো যাওয়া যাক!'

সাড়ে আট মাইল তুষারের ভেতর হেঁটে বেদম হাঁফিয়ে গেছে লাবনী। এমনকী মরুভূমিতেও কখনও এমন কষ্ট হয়নি। গৌরিকুণ্ড থেকে এক মাইল যেতে না যেতেই চড়াই পথে হাঁটতে গিয়ে খিঁচ ধরে গেল কাফ মাসলে। তারপর থেকে প্রয়োজনে ওকে প্রায় কোলে তুলে টেনে এনেছে রানা। ওর মত বিধ্বস্ত হয়ে না গেলেও হতক্লান্ত অঙ্কুর রায়। সব চেয়ে বড় প্যাক বহন করছে রানা, সঙ্গে রয়েছে লাবনীকে সাহায্য করা। সবমিলে ও-ও স্বস্তির ভেতর নেই।

মনে হচ্ছে খাড়াই পথে চলতে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম হচ্ছে না রঞ্জন মিত্রের। হাঁটার পথে গুনগুন করে কী এক গান গাইছেন। রানার সন্দেহ, ওটা মুম্বাইয়ের প্রথম আশিকি সিনেমার কাওয়ালি

গানটা। কখনও কখনও পিছিয়ে এসে ওদের পাশে হাঁটছেন। ঢালু পথের ওপর থেকে শিস তুলে ধেয়ে আসছে বরফ-ঠাণ্ডা হাওয়া, হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে যোগীর কমলা আঙরাখায়।

'বুড়ো মানুষটা এত বরফের ভেতর বাঁচবে কী করে?' রানার সাহায্য নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল লাবনী। ওর পরনে হুডওয়ালা ভারী জ্যাকেট ও ওয়েদারপ্রুফ প্যান্ট। 'আর, রানা, তুমিও কি ওই লোকের মত ধ্যান-ট্যান করে ঠাণ্ডাকে বশ করে রেখেছ?'

কাছেই ছিলেন, মাথা নাড়লেন রঞ্জন মিত্র। 'আমি ধ্যানের মত কিছুই করছি না। শীত ঠিকই লাগছে। বলতে পারো, কষ্টটা প্রকাশ করছি না।'

চাপা স্বরে বললেন অঙ্কুর রায়, 'কিন্তু, যোগী বাবা, ফ্রস্ট বাইটের ঝুঁকি নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এটা কেন করছেন? দুনিয়ার সবই ত্যাগ করেছেন তা বুঝলাম, কিন্তু শিব তো আর আপনাকে বলে দেননি নিজেকে কষ্ট দিতে হবে!'

'নিজ পাপ মোচন করতে বেছে নিয়েছি এই পথ,' জবাবে বললেন বৃদ্ধ যোগী। মনে হলো নিজের ওপর তাঁর রাগ আছে।

'পাপ মোচন কীসের জন্যে?' জানতে চাইল লাবনী।

'এমন এক পাপ, যার মাফ হয় না। প্রভু শিব মাফ না করে দিলে কখনও আমার ওপর স্বর্গীয় আলোকসম্পাত হবে না। ফলাফল: কোটি কোটি বছর ধরে কষ্ট পাব নরকে।'

'আপনি ক্যাথোলিক হলেই ভাল ছিল,' বলল লাবনী, 'চট্ করে যাজককে মনের কথা বলে হালকা হয়ে যেতেন। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যেতেন মাফ।'

কিছু না বলে আবারও গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন রঞ্জন মিত্র। উপত্যকার এত ওপরে এসেও বরফ প্রান্তরে একটা-দুটো গাছ দেখছে ওরা। বাড়ছে ভীষণ শীতের হাওয়ার বেগ। আসার পথে কিছু ছোট বসতি দেখেছে ওরা। এক জায়গায়

কখনওই তিন-চারটের বেশি কুটির ছিল না। এবার সামনে পড়ল যেটা, তারও ছাত নেই। রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায় প্রথমে ভেবেছিল, এসব বাড়ি পরিত্যক্ত। কিন্তু তারপর রঞ্জন মিত্র খুলে বললেন, পাহাড়ে শীতের সময় খুলে রাখা হয় এসব বাড়ির ছাত, নইলে জমা বরফের ওজনে ধসে পড়ত সব। তা ছাড়া, এখন এদিকে থাকবে কে? বন্ধ হয়ে গেছে কেদারনাথ। আপাতত এদিকে আসবে না তীর্থযাত্রী বা ট্যুরিস্টরা। সব ব্যবসা স্থগিত।

উপত্যকার আকাশে অনেক নিচে নেমে এসেছে কালচে মেঘ। বেশি দূরে চোখ যাচ্ছে না ধূসর কুয়াশায়। একটু পর এক জায়গায় হিন্দি ভাষায় সাইনবোর্ড দেখে থামলেন অঙ্কুর রায়। লেখা পড়ে বললেন, 'আরও চার কিলোমিটার যেতে হবে!'

একটু বিশ্রামের জন্যে ওখানে থামল ওরা।

'ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইলের পর মাইল যে পেরোলাম, তার কী হবে?' তুষারে বসে পড়ে বলল লাবনী। 'আমার তো মনে হচ্ছে পেরিয়ে এসেছি ষাট মাইল!'

বিশ মিনিট বিশ্রামের পর আবারও এগোল ওরা। আরও খাড়া ও পাথুরে হয়ে উঠেছে সামনের পথ। নিচে ফেলে এসেছে গাছের সারি। এখন সবুজের দেখা পাওয়া কঠিন। সফেদ বরফের প্রান্তরে মাথা তুলেছে মাত্র ছোট কিছু ঝোপঝাড়। ভীষণ শীত লাগছে চারপাশের জলবিন্দু ভরা মেঘের কারণে। লাবনী পুরু কম্বল দিতে চাইল রঞ্জন মিত্রকে, কিন্তু না শোনার ভান করে দলের অনেকটা সামনে চলে গেলেন বৃদ্ধ যোগী।

একটু পর দেখা গেল সাইন বোর্ড। আরও কিছুক্ষণ পর আরেকটা। পাহাড়ি পথ আরও খাড়া হয়নি, কিন্তু সমস্যা করছে এত ওপরের হালকা বাতাস, একটুতেই হাঁপিয়ে উঠছে ওরা। থামতে হচ্ছে বারবার। শেষ সাইন বোর্ডের কাছে পৌঁছে বুঝল, মাত্র আধ মাইল দূরে গন্তব্য। খাড়া পথে হাঁটতে লাগল ওরা।

একটু পর সামনে পড়ল অদ্ভুত এক দৃশ্য।

'সত্যিই অবাক করা সুন্দর!' উত্তর ভারতের উত্তরখণ্ডে এসে এমন দৃশ্য দেখে দম আটকে ফেলল লাবনী। শীতের সূর্যের লালচে আলোয় পরিষ্কার দেখল ওরা ধূসর-কালো কুয়াশার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে রাজকীয়, থমথমে, নীল, প্রকাণ্ড হিমালয়! নিচের অংশ বহু দূরের ছায়ার মত, অশুভ। এখানে-ওখানে অস্পষ্ট সব কালচে মেঘ। বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে আকাশের বুকে পেরেকের মত চোখা সব চূড়া নিয়ে কেদারনাথ পর্বত। পশ্চিমে দ্বিতীয় উঁচু চূড়া। নানাদিক আড়াল করে রেখেছে এই উপত্যকা, তবুও দেখা গেল দ্বিতীয় চূড়ার ওদিকে বরফ-ঢাকা অন্য সব চূড়া। আগেও হিমালয়ে এসেছে রানা-লাবনী, কিন্তু তখন বুঝতে পারেনি এর সত্যিকারের মাহাত্ম্য। প্রকাণ্ড এই পর্বতসারি আসলে দুনিয়ার সব পর্বতের সম্রাট।

উত্তর-পুবে দূরে অঙ্কুর রায়ের ল্যাপটপের সেই শৈলশিরা দেখল রানা। ক্যামেরা লাগল না, পরিষ্কার বুঝল ওই শৈলশ্রেণী বিশাল ও এবড়োখেবড়ো। আশপাশের পাহাড় ওটার কাছে শিশু। নিচু স্বরে বলল ও, 'এবার উঠতে হবে ওখানে।'

'ওই যে ফাটল,' পাহাড়ের দূরে আঙুল তাক করলেন অঙ্কুর রায়। খাড়া প্রাচীরের মত পাহাড়ের মাঝে ভি শেপের ফাঁক। কিন্তু ওরা এখন যেখানে, তার চেয়েও ওপরে ওই ফাটলের মেঝে।

দিগন্তে ঢলে পড়া সূর্য থেকে মুখ সরিয়ে শৈলশিরা দেখলেন রঞ্জন মিত্র। 'তোমাদের ধারণা ওদিকে আছে শিবের গুহা?'

'জী,' বলল লাবনী।

'পাহাড়ের খুব বিপজ্জনক জায়গা ওটা। অনেকেই গেছে। ফিরেছে খুব কম মানুষ। তোমরা কি মৃত্যুর জন্যে তৈরি?'

'প্রয়োজনে মরতেও আপত্তি করব না,' বলল লাবনী।

'আমার আপত্তি থাকবে,' বিড়বিড় করল রানা।

'আমি তো তোমাদেরকে বাধা দেয়ার কেউ নই, কিন্তু দায়িত্ব বোধ থেকে সাবধান করলাম,' বললেন রঞ্জন মিত্র। 'বেশ, চলো, এবার এগোনো যাক। সামনেই গ্রাম।'

কিছু দূর হাঁটার পর উঁচু এক সমতল জায়গায় উঠে এল ওরা। পথের পাশেই ছোট কুঁড়েঘরের সারি। ওগুলো পেরোলে মূল গ্রাম। পাহাড়ে ওঠার সময় যেমন দেখেছে, এখানেও খুলে রাখা হয়েছে প্রতিটি কুটিরের ছাত। গ্রামে পৌঁছুলে দেখল, সরু উপত্যকার মাঝে ঠাসাঠাসি করে ইঁট ও পাথরের সব পোক্ত বাড়ি। কেউ নেই। থমথম করছে চারপাশ। ভুতুড়ে। গ্রাম যেন মস্ত কোনও ভালুক, ঘুমিয়ে পড়েছে শীতে, আবারও জেগে উঠবে বসন্তে।

'তীর্থযাত্রীরা এখানে থাকেন,' বললেন রঞ্জন মিত্র। লাঠি তুলে দেখালেন একসারি কুঁড়েঘর। 'ট্যুরিস্টদের টাকা আছে, তাই তারা থাকে হোটেলে।'

'আপনি কি আমাদেরকে কোনও হোটেলে নেবেন?' জানতে চাইল লাবনী।

'না, ছিহ্! ওগুলো তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অন্যের বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকলে তোমাদের সঙ্গের পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করবে!' আঙুল তুলে অঙ্কুর রায়কে দেখিয়ে হাসলেন যোগী। 'না, এর চেয়ে অনেক ভাল জায়গা আছে।'

সারি সারি কুঁড়েঘর পেরোবার পর দেখা গেল গভীর, সরু খাদের ওপর ছোট্ট এক সেতু। ওটা পেরিয়ে ওরা প্রবেশ করল মূল কেদারনাথ এলাকায়। এঁকেবেঁকে ওপরে গেছে পাহাড়ি সদর রাস্তা। দু'পাশে বাড়ি। দরজার সামনে বালির বস্তার তৈরি বাঁধ, ঠেকাবে তুষার বা ঝরে পড়া পানি। শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে দরজার তালা। দূরে গ্রামের সবচেয়ে উঁচু পাথরের তৈরি চওড়া দরদালান, সঙ্গে

চৌকো, উঁচু টাওয়ার।

'ওটা কি মন্দির?' রঞ্জন মিত্রের কাছে জানতে চাইল লাবনী।

'হ্যাঁ। বারো জয়টিরলিঙ্গমের একটি— হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরের অন্যতম। এখানেই দেখা দিতেন প্রভু শিব। ওখানেই তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি।'

কঠোর চোখে রঞ্জন মিত্রের চোখে তাকালেন অঙ্কুর রায়। 'আপনি খুলবেন ওই পবিত্র মন্দির?'

'আমি শিবের সামান্য ভক্ত এবং ভৃত্য। বহুবার এখানে এসে থেকেছি। আশ্রয়হীন মানুষের জন্যে রাতে খুব ভাল জায়গা ওটা। তার চেয়েও বড় কথা...' মুচকি হাসলেন যোগী। 'আমি ভাল করেই জানি চাবি কোথায় লুকিয়ে রাখেন পুরোহিতরা।'

অখুশি হয়ে চুপ থাকলেন অঙ্কুর রায়। মন্দিরের দিকে চলল ওরা। দূর থেকেও মনে হয়েছে ওটা প্রকাণ্ড, সামনে যাওয়ার পর বুঝতে দেরি হলো না, অদ্ভুত সুন্দর কারুকাজ করা পাথরের তৈরি মন্দির। একেকটা স্ল্যাব বিশাল, তৈরি হয়েছে হাজার হাজার বছর টিকে থাকার জন্যে। রঙচঙে প্রবেশপথের চারদিকের অ্যালকোভে খোদাই করা মূর্তি। দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে বিশাল এক ষাঁড়ের মূর্তি।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারে না গিয়ে ছোট এক গেট দিয়ে লাবনী, রানা ও অঙ্কুর রায়কে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন রঞ্জন মিত্র। চলে গেলেন দালানের কোনায় তুষারে ঢাকা ছোট্ট এক স্তূপ ইঁটের সামনে। হাত ভরে দিলেন তুষারের ভেতর, ঘেঁটে দেখছেন নিচের ইঁট। কয়েক মুহূর্ত পর সোজা হয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলেন। হাত তুলে দেখালেন পিতলের বড় এক চাবি। 'বলেছি না এখানে রাখে!' দালানের সদর দরজার সামনে গেলেন। তালার ওপরের কাপড় খুলে ফুটোয় ঢোকালেন চাবি। খুট্ শব্দে তুলে খুলে গেল ভারী কুলুপ। 'চলো, ভেতরে যাওয়া যাক!' স্যাণ্ডেল খুলে ওগুলো

হাতে নিয়ে বালির বস্তা পেরিয়ে ঢুকলেন মন্দিরে।

একবার মন্দিরের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে নমস্কার দিলেন অঙ্কুর রায়, তারপর বুট খুলে ঢুকলেন মন্দিরে। তাঁর মতই জুতো হাতে ভেতরে গেল রানা ও লাবনী। পাথুরে ঘরে কোনও আলো নেই। থাকার কথাও নয়। সবাই শীতের প্রকোপে ছেড়ে গেছে গ্রাম। এদিকে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে ফ্ল্যাশলাইট বের করবে রানা, এমন সময় করিডোরে জ্বলে উঠল নরম লালচে আলো। লণ্ঠন জ্বেলেছেন রঞ্জন মিত্র। অন্ধকার কেটে যেতেই দেখা গেল দেয়ালে দেয়ালে পাথরের মূর্তি। রানাদের পেছন দেয়ালে পৌরাণিক রঙিন চিত্র। বৃদ্ধ যোগী মৃদু হেসে বললেন, 'দয়া করে আতিথেয়তা গ্রহণ করো প্রভু শিবের।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল লাবনী। চকচকে চোখে দেখতে লাগল প্রাচীন সব মূর্তি। 'দুর্দান্ত সুন্দর তো! এঁরা কারা?'

'পাণ্ডব ভ্রাতা,' বললেন বৃদ্ধ যোগী, 'ওঁদের জন্যেই লেখা হয়েছে মহাভারত। দেহত্যাগের আগে এই মন্দিরে এসে প্রভু শিবের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন তাঁরা। যুদ্ধে জ্ঞাতি ভাইদের খুন করে পাপ করেন, কিন্তু মাফ করতে চাইলেন না প্রভু। পাণ্ডবদেরকে ফিরিয়ে দিতে মস্ত এক ষাঁড়ের রূপ নিয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পালানো অত সহজ নয়। খুঁজে বের করে ফেললেন পাণ্ডবরা। তখন ষাঁড়ের রূপ ধরে রেখে জমির ভেতর তলিয়ে যেতে লাগলেন প্রভু। কিন্তু মাটির নিচে পুরো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই খপ্ করে প্রভুর কুঁজ ধরে ফেললেন পাঁচ ভাই মিলে। ওই কুঁজ হয়ে গেল পাথরের। যেটাকে আমরা বলি শিবলিঙ্গম। ওটাকে ঘিরেই তৈরি এই মন্দির।' পরের ঘরের দিকে চেয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত জড়ো করলেন বৃদ্ধ।

রানা খেয়াল করল, 'এখন পাগল যোগীর ভঙ্গি নেই মানুষটার ভেতর। বৃদ্ধ মাথা সোজা করে দাঁড়ানোর পর ও বলল, 'আপনি

তো পৌঁছে দিলেন আমাদেরকে। এবার কী করবেন?'

'অবশ্যই প্রভু শিবের কাছে সবার ভালর জন্যে প্রার্থনা করব। অনুরোধ করব, যেন তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তিনি।' মেঝে দেখালেন। 'তিনি হয়তো হাসছেন তোমাদের কাণ্ড দেখে। তাঁর রসিকতা অন্যরকম। অনেকে বলেন, তাঁর হাসি থেকেই তৈরি গণেশ। যাক সেসব, তোমরা গরম থাকার জন্যে সঙ্গে ল্যাম্প জাতীয় কিছু আনোনি?' মাথা দোলাল লাবনী। 'তা হলে বের করো। একটু পর ফিরে আসব।'

'যাচ্ছেন যখন,' বলল রানা, 'ওঁকে একটু অনুরোধ করবেন ভল্টের দিকনির্দেশ করে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিতে?'

মুচকি হেসে অন্ধকার ঘরের দিকে চলে গেলেন বৃদ্ধ যোগী।

ব্যাকপ্যাক থেকে কম্বাইণ্ড প্যারাফিন-হিটার ও চুলো বের করে আগুন জ্বেলে নিল রানা।

'তাঁবুতে রাত কাটাবার চেয়ে ভাল,' বলল লাবনী। রানার দিকে তাকাল। 'আমরা এবার কী করব, রানা?'

'রাতে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। আমাদের উচিত হবে ভোরে ওই শৈলশিরার দিকে রওনা হওয়া। আশা করি রাত নামার আগেই পৌঁছব ওখানে। তারপর খুঁজে বের করব কোন্ পথে ওপরে ওঠা যায়।'

'প্রথম কথা নিরাপদ পথ পাওয়া,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'মিত্র যোগী যা বললেন, মনে হচ্ছে উচিত ছিল আরও ক্লাইমিং গিয়ার সঙ্গে আনা।'

'যা আছে তাতেই চলবে,' বলল রানা। নাড়া দিতেই ব্যাকপ্যাকের ভেতর টুং-টাং আওয়াজ তুলল ধাতব কীসব যেন। 'দেয়ালের মত খাড়া ক্লিফ বেয়ে উঠতে না হলে এতেই চলবে। আশা করি খেপে উঠবে না আবহাওয়া।'

'আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকবে ভাবছ?' জানতে চাইল লাবনী।

'নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, পাঁচ মিনিটে পাল্টে যেতে পারে এদিকের আবহাওয়া। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। তৈরি থাকব সবকিছুর জন্যে।' অন্যদের প্যাকের দিকে তাকাল রানা। 'এবার বলে ফেলো, কার ব্যাগে খাবার?'

দরকারী সব মালপত্র বের করার পর, হিটারকে ঘিরে পেতে নেয়া হলো স্লিপিং ব্যাগ। খাবার তৈরির কাজে নামলেন অঙ্কুর রায়। কোনও বিপদ আছে কি না বুঝতে মন্দিরের বাইরে গেল রানা। পাশের ঘরে চলে এল লাবনী। নিচু স্বরে ডাকল, 'মিস্টার মিত্র? আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?' জবাব দিল না কেউ। বিড়বিড় করল লাবনী, 'দেখা উচিত মানুষটার কী হলো।' চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তুষার ঢাকা জমিতে প্রায় খালি পায়ে শীতের ভেতর মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন বুড়ো মানুষটা, হয়তো এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

পরের ঘর প্রকাণ্ড, প্রায় অন্ধকার। কিন্তু মন্দিরের জানালাহীন দেয়ালে পড়ছে সামান্য কমলা আভা। ওই আলো অনুসরণ করে নীরবে এগোল লাবনী। কিছুদূরে একটা পর্দার ওপাশে জ্বলছে মোমবাতি। শুনল রঞ্জন মিত্রের নিচু গলার প্রার্থনা। হিন্দি ভাষায় কথা বলছেন। পর্দা সরিয়ে ছোট্ট এক কুঠরিতে ঢুকল লাবনী। 'মিস্টার মিত্র? আপনি ঠিক আছেন তো?'

ছোট এক বেদির সামনে পাথরের মেঝেতে দু'পা ভাঁজ করে বসে আছেন বৃদ্ধ যোগী। আগুনের লাল আলো পড়েছে ফিরোজা রঙের দেয়ালে। ঘুরে দেখলেন তিনি। চমকে গেছেন। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার উচিত হয়নি এখানে আসা!'

'সরি,' একটু ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে গেল লাবনী, 'আসলে জানতে চাইছিলাম আপনি সুস্থ আছেন কি না।'

নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা নিচু করলেন বৃদ্ধ যোগী। 'না,

আসলে আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আগেই বলে দিলে জানতে কেন এখানে এসেছি। সেক্ষেত্রে কেউ বিব্রত হতো না। দোষটা আমার।'

মানুষটাকে বিরক্ত করেছে জেনেও কৌতূহল দমাতে পারল না লাবনী। ওর চোখ বেদির ওপর। 'ওটা কি...'

'হ্যাঁ, শিবলিঙ্গম।' সাধারণ লিঙ্গম পুরুষাঙ্গের মত, কিন্তু চকচকে কালো পাথরের পিরামিডের মত ত্রিকোণ ছোট আকারের এই মন্দিরেরটা। গায়ে লাল সব রেখা আঁকা। 'যাঁরা সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের জন্যে সৃষ্টিসংক্রান্ত সব আলো ও শান্তির ব্যবস্থা করেন প্রভু শিব।'

'আপনি...'

'না,' দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়লেন হতাশ রঞ্জন মিত্র। 'আমার সৌভাগ্য হয়নি। আসলে এত বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করি, অন্য দিকে মন দিতে পারি না।' একহাতে মোমবাতি তুলে নিলেন তিনি, অন্যহাতে আলতো করে লাবনীর হাত ধরলেও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই দেখালেন ফেরার পথ। সহজ হয়ে উঠল কণ্ঠ: 'হ্যাঁ, চলো, তুমি না খাবারের কথা বলছিলে?'

একুশ

মন্দিরের নিরাপদ জায়গায় স্লিপিং ব্যাগের ভেতর কয়েকটা গরম পোশাক পরে শুয়েছিল লাবনী, কিন্তু তার পরেও থরথর করা

শীতের কাঁপুনিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। ব্যাগ থেকে মুখ বের করে দেখল, এরই ভেতর জেগে গেছে রানা। সামনের চুলোয় পটভরা গরম পানি। 'গুড মর্নিং।'

হাই চাপল লাবনী। 'মর্নিং। ক'টা বাজে?'

'সোয়া সাতটা। একটু পর সূর্য উঠবে। তখনই রওনা হব। তুষারের ভেতর হাঁটতে হবে কয়েক মাইল।'

'শুনে খুশি লাগছে,' উঠে বসল লাবনী। চোখ পড়ল দরজার ওপর। ওটা সামান্য খোলা। ওই পথে আসছে ভোরের মৃদু ধূসর আলো। 'মিস্টার রায় বা মিত্র যোগী কোথায় গেলেন?'

'রায় হালকা হতে গেছেন, আর বুড়ো যোগী কোথায় জানি না। বিশ মিনিট আগে বেরিয়ে গেছেন। হয়তো আরও ভারী কিছু পেট থেকে ফেলতে...'

'বুঝতে পেরেছি,' করুণ চেহারা করল লাবনী। 'এত ভোরে আমার মনে দারুণ চিত্র আঁকলে, তোমাকে ভাল না বেসে পারছি না!' স্লিপিং ব্যাগ আনযিপ করল। 'একটু অপেক্ষা করো, মুখ-হাত ধুয়ে নাস্তা তৈরি করছি।'

'দরকার নেই, সবই তৈরি করে ফেলেছি,' বলল রানা। 'প্রথমে পেটে দেবে কফি। তারপর নাস্তা। সবই হাই ক্যালোরির খাবার। সেরিয়্যাল, পরিয ইত্যাদি। পরে কাজে আসবে।'

'দারুণ খাবার, এখনই মনে হচ্ছে আমার বয়স এক শ',' মুখ বিকৃত করল লাবনী।

'একটা রুটও তৈরি করেছি। দেখতে চাও? বুড়ো যোগীর মনে হয়েছে, ওই পথে গেলে বিপদ কমবে।' লাবনী পাশে বসে পড়তেই রানা বলল, 'আমার ধারণা, ওই লোক আগেও শীতের সময় এখান থেকে ঘুরে গেছেন।'

মাথা দোলাল লাবনী। 'হতে পারে, শিবলিঙ্গম পুজো করতে। খুব কষ্টে আছেন মানুষটা। কী করেছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁর

ধারণা কোনও দিনও ক্ষমা পাবেন না।'

মন্দিরে এসে অঙ্কুর রায় ঢুকতেই ঘুরে তাকাল ওরা।

'মর্নিং, মিস্টার রায়,' বলল লাবনী। 'মিস্টার মিত্র এখনও বাইরে রয়ে গেছেন?'

হাতের ঠাণ্ডা আঙুল ঘষতে ঘষতে বললেন ইণ্টারপোল এজেন্ট, 'হ্যাঁ, বললেন সূর্যোদয় দেখে ফিরবেন।'

'নিশ্চয়ই ভীষণ শীতের ভেতর কষ্ট হচ্ছে তাঁর?'

'তাই তো মনে হয়।'

'কিন্তু নিজেকে মাফ করতে না পারলে স্রষ্টা কি মাফ করবেন?' আনমনে মাথা নাড়ল লাবনী।

'এ নিয়ে মোটেও ভাববে না,' বললেন বৃদ্ধ যোগী। এইমাত্র সদর দরজার বালির বস্তা পেরিয়ে ঘরে ঢুকেছেন। ওর কথা শুনে ফেলেছেন বলে লজ্জায় লাল হলো লাবনী। 'সত্যিই তোমাদের জন্যে কষ্ট লাগছে আমার। আসলেই পাবে না শিবের গুহা। ওদিকে ওই জিনিস নেই। তার চেয়ে এই বুড়োকে খুশি করে দাও, চল ফিরে যাই গৌরিকুণ্ডে। কেন ভুল কিংবদন্তীর জন্যে নিজেদের জীবন দেবে?'

'ঝুঁকি নেয়া আসলে আমাদের কাজ,' মৃদু হাসল রানা।

'আর তোমরা বলো আমি পাগল?'

হাসল লাবনী। 'আমাদের জন্যে ভেবেছেন, সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মিত্র। আসলে একবার ওদিক থেকে ঘুরে না এলে মনে স্বস্তি পাব না।'

'বাধা দেয়ার সাধ্য আমার নেই। তোমরা রওনা হয়ে যাওয়ার সময় প্রার্থনা করব, যাতে মঙ্গল হয় তোমাদের।'

'বসে পড়ুন, নাস্তা তৈরি,' বলল রানা।

হাসলেন বৃদ্ধ যোগী। 'এই বসে পড়ছি। আমি পাগল, বোকা তো নই!'

ওরা মন্দির থেকে বেরোবার আগেই আকাশে মুখ তুলেছে লাল ফুটবলের মত সুয্যিমামা, নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে টুকরো টুকরো অসংখ্য মেঘখণ্ড। সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে নরম সুরে বললেন যোগী রঞ্জন মিত্র, 'তোমরা চলো, আমার সঙ্গে নেমে যাবে গৌরিকুণ্ডে। পরিষ্কার বুঝছি, আজ তুষারপাত হবে।'

'আমরা ভালই থাকব, এত সাহায্য করেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ,' বলল লাবনী। ওর নাক-মুখ দিয়ে ভুসভুস করে বেরিয়ে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাচ্ছে তপ্ত শ্বাস।

ভদ্রতা দেখিয়ে মাথা নিচু করলেন যোগী। 'যা উচিত, ঠিক তাই করেছি, এর বেশি কিছুই নয়। তবে প্রভু শিবের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা যাতে রক্ষা পাও।'

'আমিও তাই প্রার্থনা করি,' দুর্গম শৈলশিরা দেখলেন অঙ্কুর রায়।

'আশা করি সুস্থ দেহে ফিরবে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এখানেই। ভাল থেকো, মিস্টার রানা, রায় আর ডক্টর আলম।'

'আপনিও ভাল থাকুন,' বলল লাবনী। 'নিরাপদে নেমে যেতে পারবেন তো গৌরিকুণ্ডে?'

হাসলেন বৃদ্ধ যোগী। 'অনায়াসে, নাচতে নাচতে। আবার তোমরা ফিরলে দেখবে পাখির মত উড়ে এসেছি।' তুষারের ভেতর একটু নেচে নিলেন তিনি।

মনে মনে বলল রানা, বুড়ো বাবা, ভাল করেই জানি, আপনি মোটেও পাগল নন। মুখে বলল, 'আমরাও প্রার্থনা করি, যা অন্তর থেকে চান, সেটা যেন আপনি পান।'

একবার ওকে দেখে নিয়ে ফিরতি পথ ধরলেন বৃদ্ধ যোগী।

নিজেদের গন্তব্যের দিকে ফিরল রানা। 'ঠিক আছে, আমার ভুল না হয়ে থাকলে ওই শৈলশিরার ফাটল একটু ওপরে। এখান

থেকে মোটামুটি তিন মাইল দূরে। চলুন, রওনা হই।'

ওর কণ্ঠে একটু অন্য সুর টের পেয়ে বলল লাবনী, 'এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় অপারেশনে গেলে কঠোর হয়ে ওঠে বাংলাদেশ আর্মির সদস্যরা?'

'তাই তো মনে হয়,' বলল রানা। 'সঙ্গে থাকে পাহাড়ে ওঠার দরকারী সব গিয়ার ও অস্ত্র। সূর্য ওঠার আগেই রওনা হয়।'

'অস্ত্রের কথা যখন উঠল,' ওকে দেখল লাবনী। 'তুমি কি...'

'অবশ্যই,' কোটের চেইন খুলে ওয়ালথারটা দেখাল রানা। 'কাজে আসতে পারে।'

কপাল চাপড়ে মাথা নাড়ল লাবনী। 'হায়, আল্লা, ওটা দিয়ে কী করবে? ইয়েতি মারবে?'

'বলা যায় না, পেয়েও যেতে পারি রেঞ্জে।'

'তখনই খবরের কাগজে লেখা হবে: দুর্ধর্ষ, মাথাখারাপ, বাঙালি অভিযাত্রী শ্রীমান মাসুদ রানা উড়িয়ে দিয়েছেন হিমালয়ের অবিশ্বাস্য সেই কাল্পনিক দানবের মাথা!'

'তাও ভাল,' মৃদু হাসল রানা। 'এর বদলে খবরের কাগজে যদি লেখে: নিরীহ, মার্কিন মহিলা আর্কিওলজিস্টকে তৃপ্তির সঙ্গে কচমচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে তুষার দানব ইয়েতি— সেটা ভাল হবে?' চড়াই পথে রওনা হলো ও। 'ব্যস, কথা কম, কাজ বেশি। দেরি না করে চলো। নিজ থেকে কাছে আসবে না শিবের গুহা! আরেকটা কথা, লাবনী, আমার আবার কখন মাথা খারাপ হলো? কী বলতে চাও, নাদান, ধবধবে ফর্সা, মার্কিন বালিকা?'

শিশুদের মত দু'জনের ঝগড়া দেখে হাসছেন অঙ্কুর রায়। রানার কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ পিছু নিল লাবনী, মনে মনে বলল, 'মাথাখারাপই তো! কোনদিন বুঝতে পারলে আমার মন?'

ওপরে ওঠার সময় প্রথমে বড় কোনও সমস্যার মুখে পড়ল না ওরা। কিন্তু একটু পর বেশ খাড়া হলো পাহাড়, বাধ্য হয়ে কাজে

লাগাতে হলো অ্যালিউমিনিয়ামের ক্লাইমিং পোল, কখনও উঠছে দু'হাত ব্যবহার করে। মাটির পাতলা স্তরে জন্মানো সবুজ ঘাস চাপা পড়েছে তুষারের নিচে। তার মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচেই নিরেট পাথর।

পাহাড়ে উঠতে গিয়ে বারবার থেমে সেরা পথ খুঁজছে রানা। ওর অভিজ্ঞতা অন্য দু'জনের চেয়ে বেশি, কিন্তু কয়েকবার ফিরে নতুন করে অন্য জায়গা খুঁজতে হলো। এমনই খাড়া, যেখানে ক্লাইমিঙের জরুরি যন্ত্রপাতি না পেলে ওঠা অসম্ভব। রানা খেয়াল রাখছে, যাতে কম সময়ে এগোতে পারে। শৈলশিরার দিকে যেতে গিয়ে ফস্কা পাথুরে জমিতে পৌঁছে খুব সতর্ক হলো ওরা। বর্ষার সময় এদিক দিয়ে হড়হড় করে নামে পানি।

অনেক কমে গেছে চলার গতি।

দম পাওয়ার জন্যে বারবার থেমে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে।

'হায়, আল্লা, খুনই হয়ে গেছি!' একটা বোল্ডারের ওপর বসে বলল লাবনী। ডানহাতে খুলে ফেলল বামহাতের গ্লাভ। খস-খস করে চুলকে নিল মাথার দীর্ঘ চুলের গোড়া।

ওর দিকে তাকাল রানা। 'মাথাব্যথা শুরু হয়েছে?'

'সামান্য,' বলল লাবনী, 'একটু বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।'

'ভোরে তোমার ব্যাগে আল্টিচ্যুড সিকনেস মেডিকেশন দেখেছি, ওগুলো আছে না?'

'হ্যাঁ, আছে। তবে আমার লাগবে না। ঠিক আছি। মিস্টার রায়, আপনার কী অবস্থা?'

ধীরে ধীরে গভীরভাবে দম ফেলছেন অঙ্কুর রায়। 'বোধহয় ঠিকই আছি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে ক্লান্তিকর মিশন। আর্টিফ্যাক্ট চোররা তো আর হিমালয়ে এসে লুকায় না।'

মাথা দোলাল লাবনী। নিউ ইয়র্কে লিপি গোমেজের সঙ্গে কথা বলতে বের করল স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন। বিদ্যুৎ ভরা

পাহাড়ি মেঘ বা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির কারণে কোনও সিগনাল নেই। মুখ বিকৃত করে আবার রেখে দিল যন্ত্রটা। চাইলেও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না।

লাবনীর ব্যর্থতা দেখে নিয়ে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল রানা। অনেক নিচের দৃশ্য হারিয়ে গেছে ঘন ধূসর কুয়াশার ওপারে। ওপরে বলকে উঠছে কুণ্ডলী পাকানো সব কালচে মেঘ, উঠে আসছে পাহাড় বেয়ে। শৈলশিরার ওপরে তাকাল ও। চূড়ার দিকেও ধূসর ঘন মেঘের সারি। কেদারনাথ থেকে রওনা হওয়ার সময় যেমন ছিল পরিবেশ, তার চেয়েও অনেক ঘন কুয়াশা চারপাশে। গম্ভীর রানা বলল, 'রঞ্জন মিত্রের কথাই ঠিক। যে-কোনও সময়ে তুষারপাত হবে।'

শুকনো মুখে চারদিকের মেঘ দেখল লাবনী। 'ব্লিযার্ড শুরু হবে না তো?'

জবাব এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'মাথাব্যথা কমেছে?'

'হ্যাঁ, একটু কম।'

'তবুও আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেব আমরা,' সিদ্ধান্ত নিল রানা। চারপাশ আবারও দেখতে লাগল। টের পেল, মাটিতে পড়া তুষারের নিচে রয়েছে একের পর এক সিঁড়ির মত ধাপ। বা বলা যায় চওড়া সব বারান্দা। 'আগে কখনও এমন দেখেছ, লাবনী? মনে হচ্ছে এদিকে চাষবাস হতো।'

'এত ওপরে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল লাবনী। 'এদিকে তো ঘাসও জন্মায় না!'

'একসময় অন্যরকম ছিল এদিকের পরিবেশ।'

মাথা দোলাল লাবনী। 'তা ঠিক। অ্যাণ্টার্কটিকা জুড়ে ছিল ঘন অরণ্য। হ্যাঁ, হয়তো কেদারনাথের পুরোহিতরা সে আমলে এদিকে চাষাবাদ করতেন। তখনই এখানে আসেন স্টাডা। অথবা, যারা শিবের গুহার খুব কাছে বাস করে, তারাই পাহাড়কে খেত হিসেবে

ব্যবহার করত। কোথাও না কোথাও থেকে তো খাবার জোগাড় করতেই হবে।'

'ভূমিকম্পের কারণেও পাথুরে জমিন এমন হতে পারে,' বললেন অঙ্কুর রায়।

মাথা নাড়ল লাবনী। 'না, রানার কথাই ঠিক। এদিকের জমি অনেক ক্ষয় হয়েছে। বহু বছর আগে চাষ হতো। এখন সব শেষ।'

আরও কিছুক্ষণ পর লাবনীর মাথাব্যথা বিদায় নিলে আবারও রওনা হলো ওরা। মাথার দিকে ঝুঁকে এসেছে কালচে শৈলশিরা। খাড়া, পাথুরে কালো দেয়াল বললেও ভুল হবে না। দূর থেকে মনে হলো, গভীর ফাটল আসলে কোনও গিরিপথ। বিনকিউলার চোখে দিয়ে ওদিকটা ভাল করে দেখল রানা। 'ওঠার পথ খুব খাড়া। আঁকাবাঁকা। তবে দড়ি ব্যবহার না করেও হয়তো উঠে যেতে পারব।'

'তুষারপাতের আগেই পৌঁছুতে পারব ভাবছেন?' জানতে চাইল ইন্টারপোল এজেন্ট।

চট্ করে আকাশ দেখল রানা। আরও ঘন হয়ে উঠছে কালো মেঘ। 'মনে হয় না। তবে ভারী তুষারপাত না-ও হতে পারে। এখন সব নির্ভর করছে হাওয়ার ওপর। আপাতত ওটা জোরালো নয়।'

'এমনই থাকুক, আল্লা,' বিড়বিড় করল লাবনী।

আঁকাবাঁকা, সরু, খাড়া পথে গিরিখাতের দিকে চলেছে ওরা। আধ মাইল এগিয়ে থামল খাওয়া সেরে নেয়ার জন্যে। দুপুর হয়ে গেছে। পাঁচ ঘণ্টা পর সূর্যাস্ত। খাবার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবারও রওনা হলো ওরা। আধঘণ্টা পর পৌঁছল শৈলশিরার কাছে।

কালো ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। কমে গেছে

তাপমাত্রা। ওপর থেকে চেপে আসছে মেঘের দল। ঢাকা পড়েছে কেদারনাথের চূড়া। ধূসর হয়ে হারিয়ে গেছে গিরিপথের ওপরের অংশ। চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে নেমে এল হালকা তুলার মত প্রথম তুষারের কয়েকটা কণা। কয়েক সেকেণ্ড পর নামল আরও কিছু। তারপর আরও।

'সর্বনাশ,' বিড়বিড় করল রানা। পরক্ষণে ঝরঝর করে পড়ল হালকা তুষার। শৈলশিরায় যাওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে ওপরে তাকাল ও। 'আরও তিন শ' ফুট উঠতে হবে, তার আগে কোথাও আশ্রয় নেই। ঝড় এলে মস্ত বিপদে পড়ব। হয় নিরাপদ কোথাও ফিরতে হবে, নইলে উঠে যেতে হবে গিরিপথে। লাবনী, কোন্‌টা করতে চাও?'

'আমরা ওপরে উঠে যেতে পারব?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'জানি না।' ঘন কালো মেঘ দেখল রানা। 'ঝোড়ো হাওয়া না এলে পারব। কিন্তু...'

'হাতে বাড়তি সময় নেই,' বলল লাবনী, 'মঙ্গেলকাররা যে-কোনও সময় বুঝবে কেদারনাথ আসল জায়গা। এদিকেই আছে শিবের গুহা। সেক্ষেত্রে দেরি না করে হাজির হবে হেলিকপ্টারে চেপে।'

'খারাপ আবহাওয়ায় হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবে না,' বলল রানা। 'আমরা যদি উঠতে না পারি, ওরাও পারবে না।'

'কিন্তু মেঘ-ঝড়-বৃষ্টি সরলেই আসবে,' আঁকাবাঁকা, সরু, ওপরের গিরিপথ দেখল লাবনী। কাঁধ ঝাঁকাল। 'রানা, যদি মনে করো বেশি ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে, তো আবহাওয়া ঠিক হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করব। আবার, তোমার যদি মনে হয় মস্তবড় ভুল করছি না, সেক্ষেত্রে দেরি না করাই ভাল। আমার ধারণা, ওপরে গেলে পাব শিবের-গুহা। হয়তো পরের শৈলশিরাতেই।'

তার মানে, সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে, ভাবল

রানা। আরও সতর্ক চোখে দেখল গিরিপথ। 'ঠিক আছে, আমরা উঠে যাওয়ার চেষ্টা করব। আপনি তৈরি তো, রায়?'

'মনে হয় পারব,' হাসলেন ইন্টারপোল এজেন্ট। 'তা ছাড়া, আপনার ওপর ভরসা আছে আমার। না জেনেবুঝে কিছু করেন না আপনি।'

'নিজের ওপর আমার এমন ভরসা থাকলে ভাল হতো,' বলল রানা। 'বেশ, চলুন রওনা হই। সবাই সতর্ক থাকবেন।'

প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে থেমে তুষারের নিচে কী ধরনের পাথর, সেটা অ্যালিউমিনিয়াম পোল দিয়ে খুঁচিয়ে দেখে দেখে এগোল রানা। এরই ভেতর নানান দিকে ছুটে যাচ্ছে পুরু সব পেঁজা তুলোর মত সাদা তুষার। বাড়ছে হাওয়ার বেগ। শৈলশিরায় বাড়ি খেয়ে হামলে পড়ছে মুখে।

আরও ওপরে উঠতে সরু হলো খাড়া পথ। ঢুকে পড়েছে ওরা শৈলশিরা এলাকায়। আগেই পেরিয়ে গেছে দুপুর, নিচে যেন সন্ধ্যার কালো মেঘ, অথচ বিকেল হয়নি এখনও। ধূসর এক সাগরের মত কিছু ঢেকে দিয়েছে নিচের সব দৃশ্য। বাড়ছে তুষারপাত। আবছা দেখা যাচ্ছে ওপরের গিরিপথ। ঝরঝর করে পড়ছে তুষারকণা।

নীরবে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে চলেছে ওরা। একটু পর কাজে এল না ক্লাইম্বিং পোল। দু'হাতে পাথর খামচে ধরে উঠতে হচ্ছে। খানিক পর ওরা পৌঁছল শৈলশিরার আরেক অংশে। থেমে তুযারপাতের ভেতর চারপাশে চোখ বোলাল রানা। 'এভাবে আর বেশি ওপরে যেতে পারব না। শৈলশিরার পথ আরও সরু হলে বাধ্য হয়েই গজাল ও দড়ি ব্যবহার করতে হবে।' কেদারনাথের দিকে চেয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর। 'সর্বনাশ! জলদি! গিরিপথে ঢুকতে হবে!'

বিস্ময় নিয়ে ওকে দেখল লাবনী। 'কেন? কী হয়েছে?'

কেদারনাথের চূড়ার দিকে চোখ গেল। ঘুরপাক খাচ্ছে কালো মেঘ। পর্বতের গা বেয়ে উঠে আসছে শৈলশিরার দিকে। ওটার আকৃতি নাযি স্যালিউটের মত।

'ঝড়! ওটাকে বলে ফ্ল্যাগ ক্লাউড! ওভাবে উঠলে বুঝতে হয়, ওখানে আছে প্রচণ্ড বেগের হাওয়া!'

'কতটা গতি, মিস্টার রানা?' নার্ভাস হয়ে জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'সত্তর, আশি বা এক শ' মাইল— আসলে ব্লিযার্ড! আসছে সরাসরি আমাদের দিকে!'

'উঠছি আমি!' হিমময় গিরিপথে উঠতে রওনা হলো লাবনী। পেছনেই অঙ্কুর রায়। হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ বাঁশির মত বইতে লাগল তুমুল হাওয়া। কানে তালা লাগিয়ে দিল। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল ওদের।

দানবের শ্বাসের মত জোরালো শুঁই-শুঁই শব্দে কালো পাথুরে শৈলশিরার দিকে এল ঝড়, যেন পিষে দেবে অসহায় তিন বেয়াদবকে। অন্য দু'জনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে রানা, পেরোতে লাগল গিরিপথে ওঠার আগের ফস্কা পাথুরে জমি। তখনই পায়ের তলা থেকে সরল একটা পাথর, অ্যাড্রেনালিনের কারণে ধক্ করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। ভারসাম্য সামলে নিতে চাইল, পরক্ষণে পায়ের নিচে পেল গিরিপথে ঢোকার আগের পিচ্ছিল কয়েকটি পাথর। চিৎকার করে অন্য দু'জনকে সতর্ক করল রানা।

হাঁটার গতি কম বলে পিছিয়ে পড়েছে লাবনী ও অঙ্কুর রায়। লাবনী আগে পৌঁছল শৈলশিরা থেকে গিরিপথে ওঠার মাঝের পাথুরে জমিতে। যে-কোনও সময়ে শৈলশিরায় আছড়ে পড়বে তুমুল ঝোড়ো হাওয়া। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তেড়ে আসছে পোলার ভালুকের মত শ্বেত ব্লিযার্ড। ভীষণ ঠাণ্ডায় বুক আঁকড়ে

এল লাবনীর। পৌঁছল গিরিপথের একটু আগে। প্রচণ্ড গর্জন তুলছে হাওয়া, যেন ছিঁড়ে নেবে পোশাক। কয়েক ফুট পেছনে পাথুরে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাতে চাইছেন অঙ্কুর রায়, যেন উড়ে যাবেন আকাশে।

গিরিপথের কাছে অন্য দু'জনের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর মাঝের পিচ্ছিল সব পাথর পেরোল লাবনী, পৌঁছে গেল গিরিপথের খুব কাছে। ওর দিকে হাত বাড়াল রানা। 'রায়! আসুন!'

মানুষটা শুনলেন বলে মনে হলো না। ছুটে এলেন তিনিও। আর ওই একই সময়ে পেছন থেকে হামলে পড়ল ঝড়।

হাতুড়ির মত প্রচণ্ড হাওয়ার বাড়ি খেল ওরা। এক পলকে আঁধার হলো চারপাশ। তিন ইঞ্চি দূরেও কিছু দেখা গেল না। লাবনীর হাত ধরে গিরিপথে ঢুকতে চাইল রানা। ওদিকে লাবনী খামচে ধরেছে অঙ্কুর রায়ের জ্যাকেটের হাতা। গায়ের জোরে টান দিল নিজের দিকে। এদিকে পাথুরে দেয়াল ধরে এগোচ্ছেন অঙ্কুর রায়। পেছন থেকে বেদম ধাক্কা দিল ঝড়। ব্যাকপ্যাকের ভারী ওজনে পিছলে গেলেন, কোনও মতে সামলে নিলেন। হাওয়ার হুঙ্কারের ভেতর শুনলেন নিজের চিৎকার: 'হারব না!'

রানার সাহায্য পেয়ে অঙ্কুর রায়কে টেনে নিয়ে চলেছে লাবনী। ভয়ে কাঁপছে সবার বুক। গিরিপথের মুখ পিচ্ছিল বরফে ঢাকা, পা পিছলে গেলে পড়বে গিয়ে অনেক নিচে। পায়ে পায়ে গিরিপথের মুখের দিকে চলেছে ওরা।

শৈলশিরার গায়ে জমে আছে তুষার, ধরতে পারবে না কিছুই। নিজেকে ভারী নৌকার গুণ-টানা মজুর মনে হলো রানার। নিয়ে চলেছে লাবনী ও অঙ্কুর রায়কে। বরফমোড়া পাথরে পিছলে যাচ্ছে বুটের সোল। টের পেল, শীতে অবশ হয়ে এসেছে হাতের আঙুল। বামহাত বাড়াল, সুযোগ পেলে ধরবে গিরিপথের দেয়াল।

পেয়েও গেল নিরেট কী যেন।

বুঝল, সৌভাগ্যক্রমে ওরা পৌঁছে গেছে গিরিপথে!

ফাটলের মুখ বড়জোর আট ফুট প্রশস্ত। ওটার বুকে ঢুকছে ঝড়ের ভয়ঙ্কর ঝাপটা। শীতল হাওয়ায় হ্রাস পেয়েছে তাপমাত্রা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ওদের জ্যাকেটের পিঠে জমল তুষার ও বরফ। গায়ের ভারী পোশাক উড়তে চাইছে হারিকেনে পড়া পতাকার মত।

'এগিয়ে চলো!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা।

বরফ-ঝড়ের ভেতর আর কিছুক্ষণ থাকলে শীতে জমে মরবে ওরা, তুমুল হাওয়ায় তাঁবু খাটিয়ে আশ্রয় তৈরি করা অসম্ভব। বামহাতে মুখ আড়াল করে, ডানহাতে লাবনীকে টেনে নিয়ে চলল রানা। মেয়েটার ব্যাকপ্যাক ধরে পিছু নিয়েছেন অঙ্কুর রায়।

হাড়ে হাড়ে ওরা বুঝছে, পাহাড়ের এদিকটাকে কেন বলা হয় বিপজ্জনক! গিরিপথ আসলে শর্টকাট, হঠাৎ আবহাওয়া বিরূপ হলে এটা হয় নারকীয় মৃত্যুফাঁদ।

জানা নেই গিরিপথ কত দীর্ঘ। মুখের সামনে থেকে হাত সরাতেই প্রচণ্ড শীতের হাওয়া কামড় বসাল রানার চোখে। চারপাশে প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়ছে কোটি কোটি তুষারকণা।

চিৎকার করে লাভ হবে না, লাবনীর হাতে চাপ দিল রানা। নীরবে বোঝাতে চাইল, যেন এগোয় মেয়েটা। টলতে টলতে চলল রানা। সামনে দুধসাদা তুষারকণা ছাড়া আর কিছুই দেখছে না। বুঝল, বরফ জমে বুজে আসছে ওর দু'চোখের পাপড়ি।

কনুই ব্যবহার করে পাশের দেয়াল খুঁজল রানা। মনে আশা, আশপাশে কোথাও তাক বা ফাটল থাকবে। অথবা এমন কোনও বড়সড় বোল্ডার বা ছোট গুহা, যেটার কারণে বাঁচবে ওরা। এখন খুব জরুরি ছোট হলেও কোনও আশ্রয়। যেভাবে হোক পার করতে হবে ঝড়ের সময়টা। কিন্তু আঙুলের ডগায় শক্ত কিছু

ঠেকল না।

কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে গেছে ঝড়ের হাওয়া— এখন পেছন থেকে ধাক্কা না দিয়ে একপাশ থেকে আসছে। নানান দিকে ছিটকে যাচ্ছে লাখো তুষারকণা। জোর করে বরফ জমা পাপড়ি খুলে এদিক ওদিক দেখল রানা। গিরিপথের অন্য সব জায়গার মতই এদিকটাতেও পাথুরে দেয়াল।

সেক্ষেত্রে পাল্টে গেল কেন হাওয়ার গতিপথ?

বাধা পড়েছে।

তা হলে কি কাছেই আছে কোনও আশ্রয়?

কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না...

মুখ তুলে ওপরে তাকাল রানা। পেয়েও গেল যা খুঁজছে।

সাত ফুট ওপরে পুবের পাথুরে দেয়ালে সমান্তরাল ফাটল। গুহামুখের উচ্চতা বড়জোর পাঁচ ফুট। যথেষ্ট গভীর, নইলে ভেতরে থাকত না কালো ছায়া। একবার ওখানে ঢুকতে পারলে ঝড়ের কবল থেকে বাঁচবে ওঁরা।

ঘুরে তুষার ঝড়ের ঝাপটা মুখে নিল রানা। চিৎকার করে লাবনী ও অঙ্কুর রায়কে বলল, 'গুহা! ওপরে! ওপরে ওঠো!'

মাথার হুড রানার হুডের সঙ্গে মিশিয়ে ঘনিষ্ঠ হলো লাবনী। কিন্তু এত কাছ থেকেও ওর কথা প্রায় শুনলই না রানা। 'হাত! অবশ হয়ে... গেছে!'

'বাঁচার এটাই উপায়! এসো!' প্রায় ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের কাছে লাবনীকে নিল রানা। 'অঙ্কুর! ঠেলে তুলুন ওকে!'

দু'জন মিলে ওপরে তুলে দিল ওরা লাবনীকে। 'গুহার ভেতর ঢোকো, লাবনী!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে রানা। 'ভেতরে সরে যাও!'

গুহার মেঝেতে আড়ষ্ট হাত রাখল লাবনী। নিচ থেকে ঠেলে ওকে আরও তুলে দিল রানা ও অঙ্কুর রায়। প্রায় বেহুঁশ লাবনী

কাত হয়ে পড়ল গুহার ভেতর। বুঝল, অনেক কমে গেছে ঝোড়ো হাওয়া। তুষারকণাও কম। হামাগুড়ি দিয়ে গুহার গভীরে সরল ও।

'এবার আপনি!' অঙ্কুর রায়কে বলল রানা। জবাবে কী যেন বললেন ইণ্টারপোল এজেণ্ট। তুমুল হাওয়ায় কিছুই শুনতে পেল না রানা। হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত এক করে সামনে বাড়িয়ে দিল। ওর প্রায় অবশ হাতে বুট পরা পায়ে উঠলেন অঙ্কুর রায়। গুহার কিনারা ধরে কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে উঠে পড়লেন মেঝেতে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

অঙ্কুর রায়ের পর লাফিয়ে গুহার কিনারা ধরতে চাইল রানা, কিন্তু ওটার মুখের কাছের মেঝে বরফে ঢাকা, পিছলে গেল হাত। মরা সাপের মত থলথল করছে ওর অবশ হাত। খপ্ করে ধরতে পারবে না কিনারা। প্রতি মুহূর্তে জীবনী শক্তি শুঁষে নিচ্ছে শীতল ঝড়। বড়জোর কয়েক মিনিট, তারপর কোনও আশ্রয় না পেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, আর কখনও ফিরবে না জ্ঞান।

গুহার মুখে আবারও দেখা দিলেন অঙ্কুর রায়। দু'হাত নিচে নামিয়ে দিলেন তিনি। রানা হাত ওপরে তুলতেই ওর দুই কবজি ধরে ওপরে টেনে নিলেন ইণ্টারপোল এজেণ্ট। ওই একই সময়ে দেয়াল বেয়ে উঠে যেতে শরীরের শেষ শক্তি ব্যয় করল রানা। ওর বুট ঘষা খেল দেয়ালে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আছড়েপাছড়ে ফাটল পেরিয়ে শুয়ে পড়ল ও। ওর শরীরের ধাক্কা খেয়ে গুহার ভেতরে গিয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন অঙ্কুর রায়। একটু পর রানা টের পেল, যা ভেবেছে, তার চেয়েও গভীর এই সংকীর্ণ গুহা। তুষারকণার অত্যাচার থেকে বাঁচতে অন্ধকারে আরও ভেতরে সরল ওরা। খেপা ঝড় যেন বুঝেছে, খপ্পর থেকে বেরিয়ে গেছে অসহায় তিন শিকার। আপাতত আর কিছুই করতে পারবে না সে।

‘অনেক ধন্যবাদ,’ অঙ্কুর রায়কে বলল রানা।

জবাবে উনি বললেন, ‘তুমিও আমার জন্যে কম করোনি।’

‘লাবনী, হাত লাগাও, হিটার জ্বালতে হবে,’ বলল রানা।

ওর ব্যাকপ্যাক খুলতে সাহায্য করল লাবনী। একমিনিট পর গুহার ভেতর জ্বলে উঠল প্যারাফিন হিটার। ওরা ব্যাকপ্যাক রেখে প্রায় বুজে দিল গুহার মুখ। কমে গেল বাতাসের দাপট। হিটার ঘিরে বসল ওরা। লাবনী হাত থেকে গ্লাভ্‌স্ খুললে বলল রানা, ‘চট্ করে হাত গরম করতে যেয়ো না, আগে ফিরুক রক্ত-চলাচল।’

চিন্তিত হয়ে বলল লাবনী, ‘আমাদের কি ফ্রস্ট বাইট হবে?’

‘মনে হয় না, তবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। তোমরা কি পুরো শরীরের সাড় পাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ,’ প্রায় একই সঙ্গে বলল দু’জন।

‘পিনের খোঁচা খাওয়ার মত ব্যথা?’ জানতে চাইল রানা।

‘হুঁ।’

‘হ্যাঁ, পাগল করে দিচ্ছে!’ নালিশ করল লাবনী।

‘বাহ্, তা হলে তোমরা ঠিকই আছ।’

‘এখন থেকে আমাকে অঙ্কুর বলে ডাকলে খুশি হব, রানা,’ আন্তরিক স্বরে বললেন ইণ্টারপোল এজেণ্ট।

মাথা দোলাল রানা। ‘বেশ, আপত্তি নেই। একটু আগেই টের পেলাম, রানা বলে ডাকছ।’

ফ্ল্যাশলাইট হাতে উঠে দাঁড়াল লাবনী। ‘চলো, ওদিকটা ঘুরে আসি। চারপাশ দেখে নেয়া উচিত।’

উজ্জ্বল আলোয় চোখ কুঁচকে ফেলল ওরা। রওনা হয়ে গেল সরু গুহার শেষমাথা দেখতে। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর বলল লাবনী, ‘এরই ভেতর চল্লিশ ফুট পেরিয়ে গেছি, দেখা যাক কতটা গভীর।’

'ঝড় থেকে বাঁচতে হলে জায়গাটা কিন্তু ভাল,' বললেন অঙ্কুর রায়।

গুহার মেঝের দিকে তাকাল রানা। ওখানে ছোট ছোট পাথর ও ধুলো। 'পাললিক,' মন্তব্য করল লাবনী। 'বসন্তের সময় এদিক দিয়ে বয়ে যায় পানি।'

'জানতাম না আপনি জিয়োলজিস্টও,' বললেন অঙ্কুর রায়।

'আর্কিওলজিস্টদের ওই জ্ঞান কাজে আসে, আমরা বুঝতে পারি আসল জিনিস কত গভীরে আছে,' রানার হাতে ফ্ল্যাশলাইট দিতেই দেয়ালে আলো ফেলল ও। 'কিন্তু ওই পানি আসবে কোন্ দিক দিয়ে? গুহার আরেকটা মুখ থাকার কথা।'

তদন্তের ঝোঁক চেপে বসেছে লাবনীর। কিন্তু ওকে বলল রানা, 'আগে ভালভাবে শরীরটা গরম হোক, পেটে খাবার যাক, তারপর দেখব কী আছে ওদিকে।'

'তাই তো!' অবাক হলো লাবনী, 'টেরই পাইনি খিদে লেগেছে!'

আবার গুহা-মুখে ফিরে এসে সাপ্লাই ঘাঁটতে লাগল লাবনী। আধঘণ্টার মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে উঠল ওরা। এখন আর শীতে থরথর করে কাঁপছে না। ভর পেট খাবার খেয়ে আবারও গুহার শেষমাথা দেখতে চলল ওরা। সামনে চলেছে রানা, হাতে ফ্ল্যাশলাইট।

বাঁক নিল গুহা। রানার পাশে পৌঁছে জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়, 'আন্দাজ কত গভীর গুহা?'

'জানি না, তবে চওড়া হচ্ছে,' বলল রানা।

লাবনী পিছিয়ে পড়েছে বলে হাঁটার গতি কমালেন অঙ্কুর রায়। সামনে দ্বিতীয়বার বাঁক নিল গুহা। ওদিকে চলে গেল রানা। পায়ের আওয়াজ শুনে অন্য দু'জন বুঝল, থেমে গেছে ও।

'থামলে যে? গুহার শেষে পৌঁছে গেছ?' লাবনী বাঁক নিয়ে

চোখের সামনে যা দেখল; তাতে চুপ হয়ে গেল।

'আমার মনে হয়...' অবাক চোখে সব দেখছেন অঙ্কুর রায়।

'দারুণ কপাল কাকে বলে!' বিড়বিড় করল লাবনী।

'এসো!' পা বাড়াল রানা।

গুহার শেষ বিশফুট পেরোলেই সামনে উপত্যকায় দেখা গেল সূর্যের দুর্বল আলো, বইছে হালকা হাওয়া।

নীরবে রানার পিছু নিয়ে উপত্যকার বুকে বেরিয়ে এল অঙ্কুর রায় ও লাবনী। একটু দূরের দৃশ্য দেখে থমকে গেল ওরা।

ফিসফিস করল লাবনী, 'সত্যি! পেয়ে গেছি শিবের বাড়ি!'

বাইশ

কালো শৈলশিরার বুকে গেঁথে আছে সরু উপত্যকা। শত কোটি বৃষ্টিফোঁটার মত ঝরঝর ঝরছে তুষারকণা। চারপাশের উঁচু পাথুরে দেয়াল রুখে দিয়েছে ওদিকের ঝড়, তার বিন্দুমাত্র আলামত নেই এখানে। আকাশ অবশ্য এখনও ধূসর ও কালচে।

আবহাওয়ার কথা ভুলে গেছে অভিযাত্রীরা।

একটু দূরে উপত্যকার মেঝে থেকে শুরু হয়েছে ভাঙা, উঁচু সিঁড়ি। তাতে কারুকাজ করা সব মূর্তি, কলাম ও কুলুঙ্গি। পাহাড় ও ওদের মাঝে অন্তত একডজন ফটক, শেষ হয়েছে গিয়ে পাহাড়ি, পাথুরে এক দালানে। স্থাপত্য দেখে যে-কেউ বুঝবে, প্রাচীন হিন্দু আমলের। নানান দেয়ালে হাজার হাজার বছর আগের

দেবতাদের মূর্তি, ক্ষয়ে গেছে নিয়ত আবহাওয়ার অত্যাচারে, ভেঙে পড়েছে নানান অংশ। জায়গায় জায়গায় ধসে গেছে ধাপ। উপত্যকার মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙা সব দালান, সিঁড়ি ও জঞ্জাল।

'হায়, আল্লা!' তুষারপাত ভুলে অবাক হয়ে বলল লাবনী।

উপত্যকার শেষমাথায় কালচে ছায়া ও ধূসর কুয়াশা। কারও বুঝতে দেরি হলো না, কত বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছে ওরা। রানা গুনল দু'পাশে সিঁড়ির মত সাতটা ধাপ, গেঁথে আছে পাথুরে প্রাচীরের মত পাহাড়ে। এসব ধাপের ওপর অংশ কমপক্ষে সত্তর ফুট উঁচু। 'হাজার হাজার বছর আগের।'

রানার কথায় সায় দিল লাবনী, 'হ্যাঁ, স্টাডার কথা ঠিক হলে অন্তত এগারো হাজার বছর!'

অঙ্কুর রায় বিস্মিত সুরে বললেন, 'অবাক লাগছে, এতকাল মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে! ভারতের পবিত্র মন্দির থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আছি আমরা। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ দেখেছে?'

'আকাশ পথে না গেলে কারও চোখে পড়ার কথা নয়,' বলল রানা, 'আমরা আছি শৈলশিরার উত্তরদিকে, এখানে সরাসরি রোদ পড়ে না।' সবচেয়ে ওপরের ধাপ দেখল। 'ওদিকে ধাপের ওপর ঝুঁকে আছে পাহাড়ের কাঁধ। ওপর থেকে কেউ দেখলেও চট্ করে বুঝবে না এখানে উপত্যকা আছে।'

'এখানেই কোথাও আছে শিবের গুহা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লাবনী। 'জানা দরকার উপত্যকা কতটা লম্বা।'

'সেক্ষেত্রে চলো রওনা হই,' দূরের কালচে ছায়া ও কুয়াশায় আঙুল তাক করল রানা।

সরু উপত্যকা ধরে চলল ওরা। মাথার অনেক ওপরে আহত পশুর মত করুণ বিলাপ করছে দমকা হাওয়া। হাঁটতে হাঁটতে

নানান দিকে ঝুলন্ত দড়ি দেখছে ওরা। ওগুলোর মাধ্যমে সংযোগ দেয়া হয়েছে নানান ধাপের। আছে তুষারের নিচ থেকে বেরোনো দড়ি বা ঝুলন্ত সেতু। কোনও কোনওটার রয়েছে হাতে ধরার মত দড়ির রেলিং।

জোরালো হাওয়ায় দুলছে সেতুগুলো। সন্দেহ নিয়ে ওদিকে তাকাল লাবনী। 'এটা অসম্ভব যে এগারো হাজার বছর ধরে এসব ঝুলছে। অনেক আগেই নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা!'

'কেউ না কেউ এখানে আসে,' বললেন অঙ্কুর রায়।

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা, থেমেছে ধনুকের মত খিলানওয়ালা এক দরজার সামনে। পরখ করে দেখল দেয়ালে খোদাই করা মূর্তি, তারপর ঘরের ভেতরে পাঠাল ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

'এসবই বৈদিক সংস্কৃত...' বিড়বিড় করল লাবনী, 'কিছু আছে ক্লাসিক সংস্কৃত। কিন্তু পরেরগুলো এসেছে যিশু খ্রিস্টের চার শ' বছর আগে!'

রানার সঙ্গে সামনের ঘরে ঢুকল অন্য দু'জন। ভেতরে জমে আছে শত শত বছরের জঞ্জাল। প্রথমতলার ঘরের মেঝে তলিয়ে যাওয়ার কথা বর্ষার পানির নিচে, কাজেই এখানে মূল্যবান কিছু রাখত না উপত্যকার অধিবাসীরা। রানার ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল পচে যাওয়া আবর্জনা। তখনই ঘরের দেয়ালের কাছে ঝিলিক দিল কী যেন।

'আরে, জিনিসটা কী!' অবাক হয়েছে লাবনী।

'সিমিটার,' আবর্জনা থেকে তলোয়ারটা বের করল রানা। জং-ধরা হাতলে চোখ বোলাল। 'ভাষাটা আরবি। তেরো শ' শতাব্দীর দিকে ভারত দখল করতে আসে মুসলিমরা। তার পরের জিনিস এটা।'

'আমার মনে হয় না মুসলিমরা হিমালয়ের এত গভীরে

এসেছে,' বললেন অঙ্কুর রায়।

'হয়তো কোনও এক্সপিডিশন, জানতে চেয়েছিল কোন্ পথে চিন যাবে,' বলল লাবনী, 'অথবা, কে জানে, হয়তো খুঁজছিল শিবেরই গুহা! অন্তত এ পর্যন্ত এসেছে তারা।'

জং-ভরা তলোয়ার আবর্জনায় ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। হাজারো বছরের ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদির নিয়ত অত্যাচারে পাথরের ধাপের সিঁড়ি ভেঙে পড়লে, যোগাযোগ পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে উপত্যকার নানাদিকে ঝুলন্ত সেতু ও দড়ি। ওদের ধারণা, এখনও এসব ব্যবহার করে কেউ না কেউ। অন্তত এমন কোনও প্রমাণ নেই, পরিত্যক্ত হয়েছে এই উপত্যকা।

অবশ্য, এই চিন্তায় বেশিক্ষণ মগ্ন থাকল না ওরা। উপত্যকার শেষমাথায় কালচে রঙের পাথরের খাড়া এক দেয়াল। উচ্চতা তিন শ' ফুট। হাজার হাজার বছর আগে বিশাল পাথুরে সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল ওপরে। সিঁড়ির প্রায় সবই এখন ধসে পড়ে তৈরি করেছে মস্ত এক পাথরের আবর্জনা বা জঞ্জাল। শুধু একেবারে ওপরে মাত্র কয়েকটি প্রকাণ্ড ধাপ এখনও আস্ত।

উপত্যকার মেঝে ও প্রাচীর থেকে নানান দিকে গেছে দড়ির মই বা সেতু। ওগুলো দিয়ে ওঠা যাবে পরের ধাপে। সব যেন বিধ্বস্ত, ত্রিমাত্রার গোলকধাঁধা। একবার ওপরের কোনও ধাপ থেকে পড়লে সোজা পতন হবে উপত্যকার মেঝেতে।

সবচেয়ে ওপরের ধাপে চোখ পড়তেই ওরা বুঝল, মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া যায়। ওখানে রয়েছে দুর্দান্ত, বিস্ময়কর...

'ওই যে শিব মূর্তি!' বিড়বিড় করল লাবনী।

পাহাড়ের কাঁধের নিচে প্রকাণ্ড সিঁড়ির শেষে চওড়া উঠানের ওদিকে বিশাল আকারের প্রভু শিব। দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন, চার হাত নেড়ে নাচতে গিয়েও যেন থমকে গেছেন। পাথুরে পাহাড়ের গা কুঁদে তৈরি ওই মস্ত শিবমূর্তি দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে

ষাট ফুট। ঘাড় কাত করে দেখছেন নিচের উপত্যকা, ঠোঁটে আবছা কৌতুকের হাসি— তিনি এমন কিছু জানেন, যা জানে না মানুষ। নীরবে যেন আহ্বান করছেন, সাধ্য থাকলে জেনে নাও কী জানি!

দানবীয় শিব মূর্তির উদ্দেশে মাথা নিচু করে প্রণাম জানিয়ে বললেন অঙ্কুর রায়, 'যেজন্যে এসেছি, তা পেয়ে গেছি আমরা।'

বসে পড়ে ব্যাকপ্যাক খুলে কী যেন খুঁজতে লাগল লাবনী। 'আরে... গেল কোথায়... এই যে!' শিবের গুহার নকল চাবি বের করে দেখাল। 'এই যে, একেবারে সেই মুখ! একই মুখোভঙ্গি! সত্যিই এটা শিবের গুহার চাবি! এবার ওপরে উঠতে হবে।'

জরাজীর্ণ ধাপ দেখে বলল রানা, 'সত্যিই দড়ি ব্যবহার করে উঠতে গিয়ে ওপর থেকে পড়ার ঝুঁকি নেবে?'

'অন্য পথ আছে হয়তো, আমরা চিনি না,' বিধ্বস্ত এক স্টেয়ারওয়ে দেখাল লাবনী। 'ওদিক দিয়ে দ্বিতীয় ধাপে উঠতে পারব। তারপর খোদাই করা মূর্তি ধরে উঠব তৃতীয় ধাপে।'

'কিন্তু তারপর যদি সব ভেঙে হুড়মুড় করে নামে?' জানতে চাইল রানা।

'আশা করি রঞ্জন মিত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন ভগবান, জানে মারবেন না আমাদেরকে,' বলল লাবনী।

'কালো-ধূসর মেঘ দেখে তেমন মনে হচ্ছে না,' বিড়বিড় করল রানা। ঘন মেঘ থেকে ঝরছে অবিরাম সাদা তুষার। 'হাতে মাত্র একঘণ্টা, তারপরই রাত নামবে।'

'সেজন্যে বসে থাকব?' অধৈর্য সুরে বলল লাবনী। 'অন্তত দেখে আসি কীভাবে ওঠা যায়। আঁধার নামার আগেই আবারও নেমে আসব। তখন ক্যাম্প করা যাবে।'

'বেশ,' রাজি হলো রানা।

বিশাল উঁচু বিধ্বস্ত সিঁড়ির দিকে চলল ওরা।

আগে আগে চলেছে রানা। সিঁড়ির পাশে এক ঘরের কাছে থেমে বলল, 'এই ঘরে রাকস্যাক রাখব, বাড়তি ওজন বয়ে নেয়ার দরকার নেই।'

কোটের পকেটে শিবের গুহার চাবি রাখল লাবনী।

ঘরে মালপত্র রেখে ভাঙা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। কয়েক মিনিটে দ্বিতীয় ধাপের কিনারায় হাতি ও ষাঁড়ের খোদাই করা জাফরির কাছে পৌঁছল।

'এসব মূর্তির মাথায় পা রেখে ওঠা ঠিক হবে, নাকি খেপবেন প্রভু শিব?' অঙ্কুর রায়ের দিকে তাকাল লাবনী।

ফার-এর হুড সরিয়ে হেসে ফেললেন ইন্টারপোল এজেন্ট। 'আমরা এমন এক কাজে নেমেছি, যেজন্যে রাগ তো করবেনই না, বরং খুশি হবেন।'

'ভাল,' পাথরে খোদাইকৃত এক ষাঁড়ের মাথা থেকে বরফ সরিয়ে ওটার মাথায় উঠল সতর্ক রানা। পরের স্তরে উঠে বলল, 'এদিকের সব দেবতার মাথা নিরেট, ভেঙে পড়ার ভয় নেই।'

মূর্তির ওপর পা দিয়ে উঠছে লাবনী, পরিশ্রমের কারণে ভারী শ্বাস। ওপরের ধাপে উঠতে ওকে সাহায্য করল রানা।

লাবনীর পর উঠে এলেন অঙ্কুর রায়।

'এবার কোন্ দিক?' জানতে চাইল লাবনী। পরের ধাপে উঠতে চাইলে যেতে হবে একটু দূরের সিঁড়িতে। কিন্তু এ দিকের সিঁড়ি আর ওদিকেরটার মাঝে ধসে গেছে পাথরের মেঝে। লাফিয়ে মাঝের অংশ পেরোনো অসম্ভব। অবশ্য দেয়ালে খোদাইকৃত মূর্তি ধরে হয়তো যেতে পারবে দূরের ঝুলন্ত এক দড়ির কাছে।

ঠেলে ও টান দিয়ে খোদাই করা মূর্তি দেখছে রানা। সাবধানে ধসে যাওয়া সিঁড়ির পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে এগোল। কয়েক পা যাওয়ার পর কুড়মুড় আওয়াজ তুলে গুঁড়ো হতে লাগল পাথুরে

এক ষাঁড়ের মাথা। দেরি না করে আরেক মূর্তির কাঁধে ভর দিয়ে এগোল রানা। মূর্তিটার দুর্বল অংশ এড়িয়ে ওর পিছু নিল লাবনী ও অঙ্কুর রায়। গন্তব্যে পৌঁছে দেখল, একটু দূরে একটা দড়ি টেনেটুনে পরখ করছে রানা।

'ছিঁড়ে পড়বে না তো?' জানতে চাইল লাবনী।

'মনে তো হয় না,' বলল রানা।

'আপনাদের কি মনে হয়, কিছু দিনের ভেতর কেউ এসেছে?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'দু'এক বছরের ভেতর।'

'তার মানে হচ্ছে, কেউ না কেউ চেনে এই উপত্যকা,' বলল লাবনী।

'রঞ্জন মিত্র!' নিচু স্বরে বলল রানা, 'এজন্যেই বারবার আমাদেরকে ফেরাতে চেয়েছেন, ভয় পাচ্ছিলেন সব জেনে যাব।'

'অসম্ভব নয়,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'কেদারনাথ বা গৌরিকুণ্ডে যারাই আসে, তাদের ওপর নজর রাখতে পারেন তিনি। কেউ ধারণাও করবে না চোখ রাখছে কোনও যোগী।'

'বাধা দেয়ার চেষ্টা করেননি,' বলল রানা, 'ইচ্ছে হলে মন্দিরে ঘুমের ভেতর শেষ করে দিতে পারতেন।' আবারও দড়ি ধরে টেনে দেখল। 'হয়তো সতর্ক করতে চেয়েছেন।'

'কিন্তু কী বিষয়ে?' ভুরু কুঁচকে ওকে দেখল লাবনী। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে।

'আমার জানা নেই,' বলল রানা। 'এসব দেয়াল বা দড়ি ধরে উঠতে হবে, এটাই যথেষ্ট বড় বিপদ।'

রানা উঠতে শুরু করলে পিছু নিল লাবনী।

পরের ধাপে উঠে পাহাড়ের বুকে খোদাই করা এক ঘর পেল ওরা। ওটার খিলানযুক্ত দরজার সামনে মূর্তি। ঘরের ভেতরে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল রানা। প্রথমতলার ওই ঘরের চেয়ে

এটা বড়। দরজার কাছ থেকে শুরু হয়েছে বাণ্ডিল করা গাদাগাদা শুকনো কাঠ। ঘরের শেষমাথায় দরজা দেখে ওদিকে আলো পাঠিয়ে মেঝেতে চেনা জিনিসগুলো দেখে চমকে গেল।

কাঠের সব বাক্স।

ঘরে ঢুকে মেঝে মাড়িয়ে ওদিকে চলল রানা। পায়ের নিচে খট-মট শব্দে ভাঙছে কাঠের বাকল। দরজার ওদিকের সব বাক্স বহু পুরনো। রুক্ষ কাঠ দিয়ে তৈরি। জ্বলে গেছে রঙ। খুব কাছ থেকে দেখতে ঝুঁকল রানা। ডালায় স্টেনসিল করা ইংরেজি শব্দ।

'এসবের ভেতর কী, রানা?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'ভাবিনি এখানে এরকম কিছু থাকতে পারে,' বলল রানা, '.৫৭৭/৪৫০ মার্টিনি-হেনরি।'

'এ থেকে কী বুঝব?'

'অ্যামিউনিশন,' বলল রানা, 'পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন ক্যালিবার সঙ্গে ফোরটি-ফিফটি ক্যালিবারের রাউণ্ড। অনেক পুরনো আমলের রাইফেল।'

'কত আগের? কে ব্যবহার করত?'

'ব্রিটিশ এম্পায়ারের সৈনিকরা।'

রানার পেছনে সোজা হয়ে দাঁড়াল লাবনী। 'তার মানে, কলোনিয়াল ব্রিটিশরাও এই জায়গা খুঁজে বের করেছিল।'

'যদি এখান থেকে বেরোতে পারত, কোথাও না কোথাও রেকর্ড রাখত,' বলল রানা, 'তা হয়নি।'

'অর্থাৎ, কেউ বা কিছু শেষ করে দিয়েছে তাদেরকে?' গলা শুকিয়ে গেছে লাবনীর।

'তাই তো মনে হয়,' লাবনীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা।

তাকের মত জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অঙ্কুর রায়।

'ব্রিটিশদেরকে শেষ করল কারা, রানা?' আবারও বলল লাবনী। 'তারা এখান থেকে চলে গেল কেন?'

বাতাসের গোঙানির ওপর দিয়ে ওরা শুনল অস্পষ্ট এক শব্দ। যেন ফিসফিস করছে কারা, তারই প্রতিধ্বনি।

বাড়ছে ওই আওয়াজ।

জোরালো হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ। গাইছে কোরাস গান। শব্দটা আসছে চারপাশ থেকে। পাথরে কর্কশ শব্দে ঘষা খাচ্ছে ধাতব কিছু।

'কী হচ্ছে, রানা?' মুখ শুকিয়ে গেল লাবনীর।

ঝরঝর ঝরছে তুষার, তারই ভেতর উপত্যকার কালচে সব দালান ও ঘর থেকে বেরিয়ে জড় হচ্ছে একদল লোক। দেখা গেল, সবার মাথা নেড়া, পরনে গাঢ় নীল আঙরাখা।

ধাপের কিনারা থেকে উঁকি দিল রানা। 'দলে অনেক ভারী।'

সামান্য কেঁপে গেল অঙ্কুর রায়ের কণ্ঠ, 'সর্বনাশ! এরা কারা?'

'প্রহরী,' চাপা স্বরে বলল রানা, 'রক্ষা করে শিবের গুহা। আমার ভুল না হলে হাজার হাজার বছর ধরেই এ কাজ করছে।'

'কথা বলে দেখতে পারি।' হিন্দি ভাষায় গলা ছাড়লেন অঙ্কুর রায়: 'ভাইয়োঁ! হাম লোগ আয়ে আপকে মাদাত কারনে! হাম পুলিসকে লোগ...'

মনে হলো না পাত্তা দিল কেউ। নানান ঘর থেকে বেরোচ্ছে আরও পুরোহিত।

'কী বুঝছেন, মিস্টার রায়?' ঢোক গিলল লাবনী।

'মনে তো হচ্ছে না এরা কোনও কথা শুনবে,' বিড়বিড় করলেন অঙ্কুর রায়।

'শুয়ে পড়ো!' বলেই প্রায় ধাক্কা দিয়ে লাবনীকে মেঝেতে শুইয়ে দিল রানা।

উপত্যকা থেকে ঝিলিক দিয়ে ওপরের পাথরের খোদাইয়ে ঠুং

শব্দে লাগল কী যেন! ঝুপ্ করে মেঝেতে বসলেন অঙ্কুর রায়। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে গেছে ওটা, ঠনাৎ করে দেয়ালে লেগে পড়ল রানার পাশে তুষারময় মেঝেতে। নয় ইঞ্চি বৃত্তাকার জিনিসটা পাতলা ডিস্কের মত। এটাকে বলে চক্রাম, গায়ে সংস্কৃতে কীসব লেখা। তুলে নিতে গিয়ে আঙুল কাটার ভয়ে ছেড়ে দিল রানা। জিনিসটার বাইরের অংশ ক্ষুরের মতই ধারালো।

মাথার ওপর দিয়ে গেল আরেক চক্রাম। আগেরটা দেখেই সতর্ক হয়েছে রানা। ওদের অগ্রগতি ঠেকাবার জন্যে বের করল ওয়ালথার। হামলাকারীরা বুঝে গেল কী অস্ত্র ওর হাতে। চিৎকার করে কী যেন বলল ক'জন, তারপর দেরি না করে সরে গেল নানান আড়ালে। একতলায় নড়ার শব্দ পেয়ে কিনারা থেকে ওয়ালথার তাক করল রানা, কিন্তু দৌড়ে হাওয়া হলো আঙরাখা পরা এক পুরোহিত।

'এবার?' জানতে চাইল লাবনী। চোখ পড়ল দূরের দেয়ালে। ওদিকের এণ্ট্র্যান্সের ছায়া থেকে ওদেরকে নীরবে দেখছে একদল দেবতা মূর্তি।

কাছের ঘরে বেরোবার দ্বিতীয় দরজা নেই। কাজেই ওখানে লুকিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বুঝে গেছে রানা। মৃত্যুফাঁদে আটকা পড়লে মরবে নিশ্চিত।

'গুলি করে কয়েকজনকে ফেলে দিয়েও লাভ হবে না,' বলল রানা। তখনই দেখল খিলানওয়ালা এক দরজায় চেহারা দেখিয়েই আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল এক পুরোহিত।

'রানা!' গুঙিয়ে উঠল লাবনী। ত্রিশ ফুট দূরে ভাঙা ধাপের পাশে দড়ি বেয়ে উঠেছে এক পুরোহিত। ঘুরেই তার দিকে ওয়ালথার তাক করল রানা। কিন্তু তখনই প্রচণ্ড জোরে ওর মাথায় লাগল কী যেন। তীব্র ব্যথায় অন্ধ হলো রানা। অবশ হয়ে গেছে অস্ত্র ধরা হাত।

ঠং করে মেঝেতে পড়েই কাছের কিনারা থেকে খসে পড়ল ওয়ালথার। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলে ওটার পতন দেখল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর চোখ স্থির হলো পায়ের কাছে পড়ে থাকা অস্ত্রটার ওপর। ওটা ডামবেলের মত। ধাতুর তৈরি, দৈর্ঘ্যে এক ফুট। মাথার পুরু দিকটা বাল্‌বের মত গোল। হাতলে কারুকাজ করা। বজ্র— প্রাচীন ভারতীয় অস্ত্র। গদার মত, আবার প্রয়োজনে ছুঁড়ে মেরে ঘায়েল করা হত শত্রু।

দড়ি বেয়ে ওঠার সময় রানাকে নিরস্ত্র দেখেছে পুরোহিত, হাত পেছনে নিয়ে খাপ থেকে সড়াৎ করে বের করল তলোয়ার।

'আমাদের বোধহয় অনেক আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল,' বিড়বিড় করল লাবনী। ধরে রেখেছে রানার শার্টের আস্তিন।

'কিন্তু যাব কোথায়?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'একমাত্র কাজ উঠে যাওয়া!' কোমর ধরে লাবনীকে ঘুরিয়ে দিল রানা। 'সোজা দেয়াল বেয়ে উঠবে!'

খোদাই করা মূর্তির মাথা মাড়িয়ে উঠতে লাগল লাবনী, পেছনেই ফ্যাকাসে মুখে অঙ্কুর রায়। উঠছে ওরা পাঁচতলা ধাপের দিকে। নিচের উপত্যকায় চোখ বোলাল রানা। আগ্নেয়াস্ত্র নেই দেখে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে উঠছে পুরোহিতরা। যে-লোক বজ্র ছুঁড়েছে, উঠনের মত জায়গাটা পেরিয়ে ওর দিকে ছুটে এল সে। হাতে নাঙ্গা তলোয়ার।

খপ্ করে মেঝে থেকে বজ্র তুলেই গায়ের জোরে ছুঁড়ল রানা। ছুটন্ত লোকটার মুখে সরাসরি লাগল ভারী অস্ত্র। রক্তাক্ত মুখে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল সে, অজ্ঞান।

দৌড়ে গিয়ে তলোয়ার তুলে নেবে ভাবল রানা, কিন্তু তখনই উপত্যকার আরেকদিক থেকে এল এক সারি ধাতব চক্রাম। বসে পড়ল ও। মাথার ওপর দিয়ে গেল কয়েকটা ধাতব ডিস্ক। শুধু তাই নয়, ওকে পাশ কাটাল মুঠো সমান কিছু পাথর। আর ঝুঁকি

না নিয়ে দেয়াল বেয়ে মরিয়া হয়ে উঠতে লাগল রানাও।

ব্যস্ত হয়ে পরের ধাপে উঠে বলল লাবনী, 'এদিক দিয়ে, রানা!' পেয়েছে দড়ির সেতু, বসানো আছে ফাঁক ফাঁক করে কাঠের তক্তা। সেগুলোতে স্তূপ হয়ে জমে আছে তুষার।

'কিন্তু এদিকে...' পরের ধাপে রানাকে টেনে তুললেন অঙ্কুর রায়। 'এ পথে কোথায় যাব?' চুপ হয়ে গেলেন।

গম্ভীর রানা দেখল, ওরা যেখানে আছে, তার পরে ধসে গেছে মেঝে। আবার কিছুটা দূরে ওদিকের মেঝে। মাঝের ফাঁক দিয়ে নিচে পড়লে খুন হবে যে-কেউ। উপত্যকার মেঝের দিকে তাকাল ও। সুবিধা পাচ্ছে স্থানীয়রা। ভাল করেই চেনে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যেতে হবে। দেরি না করে উঠে আসছে। দূরে আরেকটা সিঁড়ি, ওদিক দিয়ে সরাসরি ওঠা যায় ষষ্ঠতলায়। একবার ওখানে গেলে হয়তো পৌঁছবে ষাট ফুটি শিবের পায়ের কাছে। 'লাবনী! ওই যে চাবি... ওটা দিয়ে খুলতে পারব গুহার দরজা?'

'জানি না!' অবাক হয়েছে লাবনী। 'কেন?'

নৃত্যরত পাথুরে শিবের মূর্তি দেখাল রানা। 'যদি গুহায় ঢুকতে পারি, দরজা বন্ধ করে দেব। তাতে আপাতত নিরাপদে থাকব।'

'তাদের কাছেও চাবি থাকার কথা!'

'ভারী কিছু দিয়ে আটকে দেব দরজা। চলো, নড়বড়ে সেতু পেরিয়ে ওদিকে! সিঁড়ি বেয়ে উঠব ওপরের তলায়!'

সেতুর প্রথম তক্তায় পা রেখে দ্বিধা করল লাবনী। 'মনে তো হচ্ছে না এটা নিরাপদ...'

'ওরা পারলে আমরাও পারব, জলদি, লাবনী!' তাড়া দিল রানা। দূর থেকে সাঁই-সাঁই করে এল একরাশ পাথর। পাশের দেয়ালে লেগে পড়ল মেঝেতে। একটা তুলে নিয়ে পাল্টা ছুঁড়ল রানা। পাথরটা লাগল এক পুরোহিতের মাথায়। করুণ আর্তনাদ ছেড়ে নিচের ধাপে পড়ল সে। 'জলদি, লাবনী, অঙ্কুর!'

দ্বিতীয় তক্তায় লাবনী পা রাখলে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ছাড়লেও ধসে গেল না সেতু। দু'হাতে রেলিঙের দড়ি ধরে নিজেকে সামলে নিল লাবনী। খুব দুলছে সেতু। আরেক পা রাখল তৃতীয় তক্তায়। তারপর পরের তক্তায়। কুড়কুড় শব্দ তুলে পায়ের নিচে ভাঙছে জমাট বরফ।

'এরপর তুমি,' আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে অঙ্কুর রায়কে বলল রানা।

লাবনীকে যে-কারণেই হোক আক্রমণ করতে দ্বিধা করছে পুরোহিতরা। তাদের হামলার লক্ষ্য রানা আর অঙ্কুর রায়। কে জানে, হয়তো ভাবছে ক্ষতি হবে তাদের সেতুর। মাথা নিচু করে পাথরের একটা টুকরো এড়াল রানা, পরক্ষণে নিচে দেখল। মাত্র দু'তলা নিচেই পৌঁছে গেছে পুরোহিতদের কয়েকজন। দড়ি বেয়ে উঠছে তারা।

দড়ির সেতুর মাঝে পৌঁচেছে লাবনী, চেহারায় ভীষণ ভয়। এক পা এক পা করে চলেছে। সেতুর সব তক্তা নেই। পায়ের দিকে চোখ রেখে এগোতে হচ্ছে। খুব দুলছে সেতু। পঞ্চাশ ফুট নিচে খটখটে বরফ-জমিন। ওর পেরোতে হবে আর মাত্র পনেরো ফুট, তারপর...

ঘন তুষারপাতের ভেতর দেখা গেল, দড়ি বেয়ে চতুর্থতলায় উঠেছে পুরোহিতরা। আর একতলা উঠলেই পাবে রানাদেরকে।

আগের চেয়ে জোরে পা চালাল লাবনী। প্রতিটি তক্তায় পা রাখার সময় বিড়বিড় করছে, 'আল্লা! আল্লা! আল্লা!' পৌঁছল সেতুর শেষের তৃতীয় তক্তায়। দ্বিতীয় তক্তা পেরিয়ে পা রাখল শেষটায়। উঠে পড়ল পাথুরে কিনারায়। ঘুরে তাকাল। উপত্যকার আরেক দিক থেকে উঠছে পুরোহিতরা। গলা শুকিয়ে গেল ওর। সংখ্যায় তারা অনেক। কাছে চলে এসেছে। সবার সঙ্গে নানান অস্ত্র। আঙরাখা পরা পুরোহিতদের দিকে আঙুল তাক করে

চিৎকার জুড়ল লাবনী, 'রানা! ওরা তোমার পেছনে!'

'রওনা হও!' অঙ্কুর রায়কে বলল রানা। ইন্টারপোল এজেন্ট কয়েক ধাপ এগোবার পর নিজেও সেতুতে চাপল ও। বাড়তি ওজনে খুব কাঁপছে দড়ির সেতু। মেঝে থেকে ভেঙে বহু নিচে খসে পড়ছে বরফের টুকরো, একেকটা যেন বিস্ফোরিত গ্রেনেড। 'লাবনী, শিবের ওই মূর্তির পায়ের কাছে পৌঁছাও!'

লাবনীকে লক্ষ্য করে ফ্রিসবির মত ঘুরন্ত চক্রাম ছুঁড়ল এক পুরোহিত। বসে পড়তেই লাবনীর মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে একটু দূরের দেয়ালে লেগে ঠুং করে মেঝেতে পড়ল অস্ত্রটা। উঠে দাঁড়িয়েই ওপরে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে ছুটল ও। ধাপের বুকে গল্‌ফ্ বলের মত সব গর্ত। কিছুই পাত্তা না দিয়ে দৌড়ে উঠতে হবে মস্ত মূর্তির কাছে।

দড়ির সেতুর মাঝে পৌঁছে গেছেন অঙ্কুর রায়, একটু পেছনেই রানা। ইন্টারপোল এজেন্ট পা দিতেই ভীষণ কট-কট শব্দ তুলল পরের দুর্বল তক্তা। চমকে গেলেন তিনি, ভর দিলেন পাশের দড়ির রেলিঙে।

এদিক-ওদিক দুলছে সেতু। তক্তা থেকে পা পিছলে যেতেই শক্ত হাতে পাশের দড়ি আঁকড়ে ধরল রানা। কাত হয়ে গেছে তক্তা, ছিলে দিল ওর কাফ মাসলের মাংস। বিপদ বুঝে ঘুরে দেখলেন অঙ্কুর রায়। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা স্বরে বলল রানা, 'এগোও!' নিজে আবারও পা তুলল সেতুর মেঝেতে।

অঙ্কুর রায় শেষ তক্তায় পা রাখতেই নিজেও এগোল রানা। গিটারের বাঁধা তারের মত টানটান হয়েছে সেতুর দড়ি। প্রায় ওপাশে পৌঁছে গেছে, এমনসময় খটাং শব্দে খুলে গেল পায়ের নিচের তক্তা।

রেলিঙের দড়ি ধরার আগেই পড়তে লাগল রানা। বহু নিচে বরফ-জমা উপত্যকার কঠিন মেঝে। ঢেউয়ের মত দুলছে সেতু।

পড়তে গিয়েও বাম পায়ে দড়ি জড়িয়ে ঝুলে গেল ও।

শেষ তক্তা পেরিয়ে পেছনে চেয়ে চমকে গেছেন অঙ্কুর রায়। ঘুরেই আবার রওনা হলেন রানাকে বাঁচাতে।

'না! লাবনীর পেছনে যাও!' চিৎকার করল রানা, কিন্তু জান থাকতে বন্ধুকে ত্যাগ করবেন না বলে আবারও ফিরতে লাগলেন ইন্টারপোল এজেন্ট।

দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা কিছু পাথরের ব্লক সামান্য আড়াল করেছে সিঁড়ি, ওখানে পৌঁছে গেল লাবনী, এবার দৌড়ে উঠবে ষষ্ঠতলায়— এমন সময় দেখল সেতু থেকে ঝুলছে অসহায় রানা। ওদিকে ছুটে যেতে চাইল, কিন্তু তখনই চোখের কোণে দেখল নড়াচড়া।

ওই লোক ঝুলছে ষষ্ঠতলার কাছে। পা দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে দড়ি। যে-কোনও সময়ে উঠবে মেঝেতে। অন্যান্য দড়ি বেয়ে উঠে আসছে আরও কয়েকজন পুরোহিত। তারা একবার উঠে এলে, রানা, অঙ্কুর রায় আর ওর বাঁচার উপায় থাকবে না।

ঝড়ের গতি তুলে ষষ্ঠতলায় উঠে এল লাবনী। চোখ খুঁজছে পরের ধাপে ওঠার সিঁড়ি।

রানার কাছে পৌঁছে গেছেন অঙ্কুর রায়। এক বাহুতে জড়িয়ে নিলেন রেলিঙের দড়ি, অন্যহাত বাড়ালেন রানাকে তুলে নিতে। ধোয়া কাপড় দড়িতে টাঙিয়ে দেয়া অবস্থা রানার। দড়িতে এক পা বেধে গেছে বলেই এখনও ঝুলছে। কোমর ভাঁজ করে উঠে এল ও, প্রথম সুযোগে খপ্ করে ধরল কম্পমান দড়ি।

এদিক ওদিক দুলছে দড়ির সেতু। অঙ্কুর রায়ের পায়ের নিচে কড়াৎ আওয়াজ তুলল একটা তক্তা। বাঁকা হয়ে ভাঙছে...

মরিয়া হয়ে হাত বাড়িয়ে অঙ্কুর রায়ের হাত ধরল রানা।

এক টানে ওকে মেঝেতে তুললেন ইণ্টারপোল এজেন্ট। দু'জনের ওজনে গুঙিয়ে ফাটছে তক্তা। দু'পাশের দড়ির একটাতে পা রাখল রানা, এবার সহজে ফস্কে পড়বে না। 'অঙ্কুর, পেরিয়ে যাও!'

সেতুর ওদিকে যেতে রওনা হলেন অঙ্কুর রায়।

রানা দেখল সিঁড়ি বেয়ে প্রায় ষষ্ঠতলায় উঠে গেছে লাবনী। কিন্তু... ওপরের মেঝের কাছে দড়ি ধরে ঝুলছে এক পুরোহিত। লাবনীর আগেই ওপরে উঠবে সে।

সেতু পেরিয়ে অপেক্ষা করলেন অঙ্কুর রায়।

সাবধানে এগোতে শুরু করে বলল রানা, 'গিয়ে লাবনীকে সাহায্য করো! নইলে ওরা ধরে ফেলবে ওকে!'

দড়িতে ঝুলন্ত পুরোহিতকে দেখলেন অঙ্কুর রায়। দেরি না করে ঝেড়ে দৌড় দিলেন ষষ্ঠতলায় উঠতে।

ষষ্ঠতলায় উঠল লাবনী, এবার বিধ্বস্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই পৌঁছবে প্রকাণ্ড শিব মূর্তির পেছনে। কিন্তু সামনেই নিচে ধসে গেছে মেঝের বড় এক অংশ। মাঝের ফাঁকটা লাফিয়ে পেরোতে হবে। ওর মনে হলো না জায়গাটা পেরোনো সম্ভব।

দৌড়ে মাঝের ফাঁক পেরোবে, ঠিক করল লাবনী। এদিকে খুব কাছে চলে এসেছে ঝুলন্ত পুরোহিত। দেরি না করে ছুটতে শুরু করল ও। কিনারা থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে নীল আঙরাখা পরনে পুরোহিত, দড়ি বেয়ে বাঁদরের মত তরতর করে উঠছে। দৌড়ের গতি আরও বাড়াল লাবনী। পায়ের নিচে পিছলে যাচ্ছে তুষার। যে-কোনও সময়ে কিনারায় উঠবে লোকটা। তাকে পাশ কাটিয়ে ওদিকে যেতে হবে ওকে।

দড়িতে দোল দিয়ে কিনারায় উঠল পুরোহিত, পিঠের খাপে তলোয়ার। তাকে পাশ কাটাতে হলে আরও কয়েক গজ পেরোতে

হবে, কাজেই লাবনী চাইল বাঁকা পথে ওদিকে যেতে। কিন্তু খাপ থেকে তলোয়ার বের করল লোকটা। ফলা বাড়িয়ে আটকে দিল যাওয়ার পথ।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল লাবনী। পেছনেও উঠে এসেছে কেউ। ফাঁদে আটকা পড়ছে ও। কিন্তু মাত্র কয়েক ফুট পেছনে খিলানযুক্ত এক ঘর। ঘুরেই দৌড়ে ঘরে ঢুকল লাবনী। এই ঘর অন্যগুলোর চেয়ে গভীর, ঢুকে গেছে পাহাড়ের বুকে। ভেতরে কোথাও হয়তো অন্যদিকে যাওয়ার করিডোর থাকবে। সেক্ষেত্রে পালাতে পারবে ও।

কিন্তু ঘরের পেছনে ছোট্ট এক ঘরের পাথুরে দেয়ালে কোনও দরজা নেই। এটাও গুদাম। স্তূপ করে রাখা আছে বহু কিছু।

ঘুরে দেখল লাবনী। খিলানযুক্ত দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে তলোয়ার হাতে যুবক পুরোহিত।

বুটের ধুপ-ধাপ আওয়াজ তুলে ষষ্ঠতলায় উঠে এলেন অঙ্কুর রায়। তাঁর চোখ খুঁজছে লাবনীকে। পেরিয়ে গেলেন টানটান এক দড়ি। ওটায় চেপে অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে এক পুরোহিত। ওদিকে সেতু থেকে নেমে পড়েছে রানা। মুখ ফিরিয়ে নিতেই চোখের কোণে দেখল, ওপরতলা থেকে কী যেন ফেলছে এক লোক।

ঠেলে ফেলা জিনিসটা ভারী এক মূর্তি। বোমার মত পড়ল ওটা অঙ্কুর রায়ের পায়ের সামনে। দৌড়ে যাওয়ায় ওটার একদিক বেধে গেল তাঁর বুটের সোলে। বেকায়দা ভঙ্গিতে আছাড় খেয়ে সড়াৎ করে পিছলে গেলেন তুষারের ভেতর... এবার ওপর থেকে পড়বেন অনেক নিচে!

পঞ্চমতলায় উঠে কারও আর্তচিৎকার শুনল রানা। ঘুরেই দেখল, ওপরতলার কিনারা থেকে ভারী কাপড়ের বাণ্ডিলের মত পড়ছেন

অঙ্কুর রায়।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল ও।

ওদিকে অঙ্কুর রায়ের পায়ে জড়িয়ে গেছে একগাদা দড়ি। বাঁধা মোরগের মত মাথা নিচু, পা ওপরে রেখে ঝুলতে লাগলেন তিনি। চল্লিশ ফুট নিচে পাথুরে জমিন। দড়ির সেতু ধরে আসছে কয়েকজন পুরোহিত!

মাত্র এক সেকেণ্ডে দ্বিধা ঝেড়ে ফিরতি পথে ছুটল রানা।

'অঙ্কুর! টিকে থাকো, আসছি!'

বাধ্য হয়েই ছোট্ট ঘরে ঢুকেছে লাবনী। মেঝে ও দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা নানান জিনিস। বহুকাল আগে জগৎ থেকে হারিয়ে যাওয়া উপত্যকার প্রহরীরা এসব কেড়ে নিয়েছে পরবর্তী কালের অভিযাত্রীদের কাছ থেকে। সাদা ছাতা পড়া পোশাক, পচা চামড়ার ব্যাগ, কাঠ, ধাতব বাক্স... কিন্তু এসব কোনও কাজে আসবে না ওর।

বড় ঘরটায় ঢুকেছে পুরোহিত, চেহারা দেখে তাকে রাগী মনে হলো না। বিজয়ের ছাপও নেই চোখে-মুখে। স্রেফ যেন পালন করছে দায়িত্ব। মাথার ওপর তুলল তলোয়ার।

মালপত্রের ভেতর পুরনো একটা রাইফেল দেখে ওটা তুলে নিল লাবনী, ঘুরেই টিপে দিল ট্রিগার।

ধাতব খট্ আওয়াজ হলো। চেম্বারে গুলি নেই। থাকলেও কোনও কাজ হতো না, নলের ভেতর জমে আছে প্রচুর জং। ব্যারেল বিস্ফোরিত হলে মারা না গেলেও মারাত্মক আহত হতো নিজেই।

গুলি না বেরোলেও ভীষণ চমকে বরফের মূর্তি হয়ে গেছে পুরোহিত। তার গলা থেকে মাত্র দু'ইঞ্চি দূরে মাযল। স্বস্তির হাসি ফুটল তার ঠোঁটে, পরক্ষণে ওই হাসি হলো তিক্ত। শক্ত হাতে

তলোয়ারের বাঁট ধরল সে। এবার...

পুরোহিতের গলায় রাইফেলের মাযল দিয়ে বেদম জোরে গুঁতো লাগিয়ে দিল লাবনী। চোখের সামনে দেখল পিং-পং বলের মত বড় হয়ে গেছে লোকটার দুই চোখ। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল পুরোহিত। আটকে গেছে দম। রাইফেল ঘুরিয়ে নিয়েই বাঁট দিয়ে তার মাথায় কষে বাড়ি লাগিয়ে দিল লাবনী। পুরনো আমলের অস্ত্রের কাঠের বাঁট মড়াৎ করে ভেঙে গেল। যে খটাস্ আওয়াজ হলো, তাতে মনে বড় শান্তি পেল ও। গাদা করে রাখা কিছু কাপড়ের ভেতর গিয়ে স্থির হলো পুরোহিতের অবশ দেহ।

আর কিছু দেখতে গেল না লাবনী, এক দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। একটু আগে যে পুরোহিত মূর্তি ফেলেছে নিচে, সে দেখে ফেলেছে ওকে। অন্যান্য পুরোহিতকে লক্ষ্য করে কর্কশ গলায় ধমকে উঠল সে।

এদিকে রানা বা অঙ্কুর রায়ের দেখা নেই। উঠনের কিনারা লক্ষ্য করে ছুট দিল লাবনী। ফাটল ধরা ষষ্ঠতলার মাঝের ব্যবধান লাফিয়ে পেরোলেই পাবে বিধ্বস্ত সিঁড়ির শেষ কয়েক ধাপ। ওপরে মস্ত শিব মূর্তির পায়ের মাঝে বিশাল এক পাথরের দরজা, নিচে বৃত্তাকার কী যেন!

ওটা কি তালা?

লাবনীর মনে পড়ল, ওটার নকল চাবি আছে ওর কাছে।

তেড়ে আসছে শিবের পুরোহিতরা। প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করে দুই কিনারার মাঝের গহ্বর দেখল লাবনী। কোনাকুনি পেরোলে কমবে মাঝের দূরত্ব। হিসেব কষতে ভুল হলে নিশ্চিত মৃত্যু!

ছুটতে ছুটতে ডান পা বাড়িয়ে লাফ দিল লাবনী। সত্তর ফুট নিচে পিছাতে লাগল উপত্যকা! সামনের সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে পা পড়তেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। তুষারের কারণে পিছলে গেল

বুট। আর্তচিৎকার ছেড়েও ভয়ে থমকে গেল। দেহের নিচে টের পেল চোখা সব পাথরের টুকরো। প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে সরসর করে পিছলে নামছে। পায়ের ধাক্কায় নিচে তৈরি হয়েছে ছোট্ট এক অ্যাভালাঞ্চ। পড়ছে গিয়ে শেষ ধাপ পেরিয়ে শূন্যে...

মরিয়া হয়ে সিঁড়ির ধাপ খামচে ধরতে চাইল লাবনী। উপড়ে এল আলগা তুষার ও ভাঙা পাথরের টুকরো। কড়াৎ আওয়াজ তুলে খুলে গেল পাথরের এক স্ল্যাব। ওখানেই ডান হাতের আঙুল গুঁজে দিল লাবনী। হঠাৎ করেই থেমে গেল ওর পতন। পা দুটো ঝুলছে শূন্যে। অন্যহাতে একটা গর্ত পেয়ে হাত ওখানে ভরে উঠে আসতে লাগল। নিচতলায় দৌড়ে চলেছে বেশ কয়েকজন পুরোহিত। যে-কোনও সময়ে উঠে আসবে।

সামান্য টলতে টলতে কিনারায় উঠে এল লাবনী। চলে এল গুহার দরজার সামনে। এবার খুলতে হবে পাথরের কবাট। ওটার বুকে গভীর খোদাই করা চিহ্ন।

ঠিক নকল চাবির মতই।

কোটের পকেট থেকে প্লাস্টিকের চাবি বের করল লাবনী। ওই একই সময়ে পেছনে ধুপ্ আওয়াজ পেল। ষষ্ঠতলার মাঝের গহ্বর পেরিয়ে এদিকের সিঁড়িতে নেমেছে কয়েকজন পুরোহিত। দৌড়ে আসছে ওর দিকেই!

অঙ্কুর রায়ের পাশে পৌঁছে খপ্ করে দড়ি ধরল রানা। 'স্থির থাকার চেষ্টা করো, অঙ্কুর!'

'চেষ্টা তো করছি!' চেঁচালেন ইণ্টারপোল এজেণ্ট। 'কিন্তু, রানা, ওরা প্রায় পেরিয়ে এসেছে দড়ির সেতু!'

মাত্র কয়েক পা ফেললেই সামনের পুরোহিত উঠবে এদিকে। মুখ তুলে লাবনীকে দেখল রানা, প্রকাণ্ড মূর্তির দিকে ছুটে চলেছে মেয়েটা। পেছনে ধাওয়া করছে আঙরাখা পরা এক লোক। আরও

শক্ত করে অঙ্কুর রায়কে ঝুলিয়ে রাখা দড়ি ধরল রানা।

বয়স ও বিরূপ পরিবেশের কারণে মট্ করে ছিঁড়ল একটা দড়ি। জোর ঝাঁকি খেয়ে একফুট নেমে ভয়ে গুঙিয়ে উঠলেন ইন্টারপোল এজেন্ট। অন্যান্য দড়ি জড়িয়ে আছে গোড়ালিতে।

দড়ির সেতু থেকে নেমে পড়েছে প্রথম পুরোহিত, কোমর থেকে বের করল ভয়ঙ্কর চেহারার মস্ত এক ছোরা। তার পেছনের লোকটার হাতে তলোয়ার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে আরেক দল পুরোহিত। ঘিরে ফেলবে দুই অভিযাত্রীকে। রানা ও অঙ্কুর রায় মুক্ত থাকতে চাইলে ওদের একমাত্র কাজ হবে দড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া। কিন্তু তা করতে হলে আগে ইন্টারপোল এজেন্টকে ছুটিয়ে নিতে হবে। কয়েকটা দড়ি ধরে তাকে টেনে তুলতে লাগল রানা। চিৎকার করে বলল, 'শক্ত করে কিনারা ধরো!' কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে দুই হাতে শীতল পাথর ধরতে চাইল অঙ্কুর রায়। 'আরেকটু চেষ্টা করো! প্রায় ধরে ফেলেছ!'

খোদাই করা এক মূর্তির কান চেপে ধরেছেন অঙ্কুর রায়। এবার হাত থেকে দড়ি ছেড়ে ওর কবজি ধরল রানা, মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে টেনে তুলল এদিকের কিনারায়।

কিন্তু ধন্যবাদ দেয়ারও সময় নেই অঙ্কুর রায়ের।

কাছে পৌঁছে গেছে সামনের পুরোহিত, ছোরার ডগা গাঁথতে চাইল রানার বুকে। ঝট্ করে একপাশে সরে গেল বিসিআই এজেন্ট। চিরে গেল জ্যাকেটের প্যাড ভরা হাতা। একহাতে ধাক্কা দিয়ে ছোরা সরিয়েই অন্যহাতে লোকটার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাল রানা। ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল পুরোহিত। হাঁ করা দাঁত-ভাঙা মুখ থেকে গল-গল করে বেরোচ্ছে রক্ত।

দড়ি থেকে পা ছুটিয়ে নিয়েছেন অঙ্কুর রায়। উঠে দাঁড়িয়ে রানার পিঠে পিঠ রেখে তৈরি হলেন মারপিট করতে। 'এবার কী, রানা?'

'দড়ি বেয়ে নেমে যাব।'

'সে সময় পাব না!'

'পাবে! আমি আটকে রাখব ওদেরকে।' মেঝেতে পড়ে থাকা ছোরা তুলে নিল রানা। নিচের কিনারায় নামতে মোটা একটা দড়ি ধরে ঝুলে গেলেন অঙ্কুর রায়। কয়েকবার দুলে নামতে লাগলেন। তারই ফাঁকে বললেন, 'সর্বনাশ! রানা! নিচে তলোয়ার হাতে আমার শালার এক সম্বন্ধীর ছেলের নাতি!'

জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোরা হাতে একটু দুলছে রানা। কী করবে বুঝতে চাইছে সামনের পুরোহিত, হাতে রানার ছোরার তিন গুণ বড় এক তলোয়ার!

পেছন থেকে রানাকে ঘিরে ফেলেছে অন্যরা।

'রানা...' ডাকলেন অঙ্কুর রায়, 'মনে তো হচ্ছে খেলা খতম!'

শিবের গুহার দরজায় পৌঁছে গেছে লাবনী। দূর থেকে ভেবেছিল পাথরের কবাটে খোদাই করা কিছু, কিন্তু তা নয়, পাথরের বুকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে আলাদা সব বড় ধাতব চাকা। পাঁচটা মিলে তৈরি করেছে বৃত্তাকার তালা। চারপাশে ছোট ছোট চাকতি। প্রতিটির গায়ে ডজন খানেক সংস্কৃত শব্দ। এই তালা আসলে কী, বোঝারও সময় নেই লাবনীর। চট্ করে প্লাস্টিকের চাবি তালায় লাগিয়ে আশা করল তাতেই কিছু হবে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না।

ঠিকভাবেই বসেছে তালায় চাবি। কিন্তু কোথাও নেই কোনও পিন বা লিভার। গর্তেও মেকানিযম নেই। আতঙ্কিত, হতবাক লাবনী বুঝল, এই চাবি সাঙ্কেতিক জিনিস। এখানে লাগিয়ে দিয়েই আশা করলে হবে না, খুলে যাবে তালা! ছোট সব চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিবের দিকে তাক করতে হবে দেবীদের মুখ, তাতে যদি কিছু ঘটে। এটা এক ধরনের কমবিনেশন লক!

কিন্তু ওর জানা নেই কমবিনেশন!

চাবি হাতে ঘুরে দেখল লাবনী, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক পুরোহিত। মাথার ওপর তুলেছে তলোয়ার। ভয়ে করুণ এক আর্তচিৎকার বেরোল ওর কণ্ঠ চিরে।

সাঁই করে নামল না তলোয়ারের ফলা, বদলে ওর গলায় ডগা ঠেকিয়ে দিল লোকটা। অস্ত্র সরিয়ে আরেক হাতে লাবনীকে ঠেলে নিয়ে গেল সিঁড়ির মুখে। বেচারি পুরো হতাশ। ধরা পড়েছে রানা ও অঙ্কুর রায়। ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে অন্তত এক ডজন সশস্ত্র পুরোহিত।

যার হাতে বন্দি হয়েছে লাবনী, সেই যুবকই পুরোহিতদের নেতা। হিন্দি ভাষায় গমগমে কণ্ঠে কিছু নির্দেশ দিলেই মেনে নেয়া হলো তা। রানা ও অঙ্কুর রায়কে ঠেলে কিনারায় নিল পুরোহিতরা। গায়ের জোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল রানা। কিন্তু তাতে ওর মাথার পেছনে ছোরার বাঁট দিয়ে কষে বাড়ি দিল এক পুরোহিত।

কিনারার কাছে নেয়া হয়েছে লাবনীকেও। একই অবস্থা রানা ও অঙ্কুর রায়ের। এবার ধাক্কা দিয়ে অনেক ওপর থেকে ফেলা হবে জমাট বরফে।

ওরা দেখল, বড় করে দম নিল প্রধান পুরোহিত, নির্দেশ দেবে খুন করতে!

তেইশ

'না! শীর্ষেন্দু, না! দোহাই লাগে তোর, নারায়ণ!'

লাবনীর পেছনের যুবক পুরোহিতের চিৎকার নয় ওটা। ওই কণ্ঠ এসেছে উপত্যকার মেঝে থেকে। চারপাশের পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ওরা ঘুরে দেখল, বিধ্বস্ত সিঁড়ির পায়ের কাছে এক লোক, পরনে কমলা আঙরাখা।

রঞ্জন মিত্র।

বন্দিদের ঠেলে ফেলার নির্দেশ দেবে কি না তা ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় পড়েছে প্রধান পুরোহিত। রাগী কণ্ঠে চিৎকার করে নিচের লোকটাকে বলল, 'এখানে কী চাই!' মুখে যা-ই বলুক, রাগের সঙ্গে মিশে আছে শ্রদ্ধা।

জবাবে পাগলাটে কিছু না বলে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন রঞ্জন মিত্র, 'তোমরা মস্ত ভুল করছ। ওদেরকে খুন করতে যেয়ো না। শিব তা চান না।'

ঘোঁৎ করে উঠল প্রধান পুরোহিত। লাবনীর কাঁধ চেপে ধরে পিছিয়ে নিল। তলোয়ারের ডগা ঠেকিয়ে দিল গলায়। তার নির্দেশে কিনারা থেকে সরিয়ে নেয়া হলো রানা ও অঙ্কুর রায়কে। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে বলল প্রধান পুরোহিত, 'ঠিক আছে, ওদিকে চলো।'

পাহাড়ে খোদাই করা এক ঘরে বন্দি হয়েছে রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়। এই ঘর অন্যসব ঘরের চেয়ে অনেক বড়। খিলানযুক্ত দরজা পেরিয়ে বেশ কিছু করিডোর পার হয়ে এখানে আসতে হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি ঠেকাতে কবাটের ওপর ঝুলছে অদ্ভুত কোনও প্রাণীর নীল চামড়া। দেয়ালের অ্যালকোভে জ্বলছে আগুন। সব ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে ওপরের কয়েকটা ফাটল দিয়ে।

এরই ভেতর অন্তত বিশজন পুরোহিতকে দেখেছে রানা। সবাই পুরুষ। কিশোর থেকে শুরু করে মাঝবয়সী। সবার পরনে গাঢ় নীল আঙরাখা। সন্তদের মত মাথা ন্যাড়া। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আত্মিক উন্নয়নের জন্যে লালায়িত নয়। এরা যোদ্ধা, এই উপত্যকা নিরাপদ রাখতে গিয়ে জীবন দিতেও দ্বিধা করবে না।

দু'পুরোহিত নিয়ে এল রঞ্জন মিত্রকে। উপস্থিত পুরোহিতদের কেউ কেউ রাগান্বিত দৃষ্টিতে দেখছে তাঁকে। কারও চোখে শ্রদ্ধা। মৃদু হেসে একবার রানাদের দেখলেন বৃদ্ধ যোগী, তারপর অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলতে লাগলেন প্রধান পুরোহিতের উদ্দেশে। শুনতে শুনতে আরও গম্ভীর হয়ে গেল যুবক।

'সবই জানতেন, সতর্ক করেননি,' রানার কানে বললেন অঙ্কুর রায়।

'চেষ্টা করেছেন, শুনিনি আমরা,' বলল রানা। 'মুখে বলতে পারেননি শিবের উপত্যকায় এলে বিপদে পড়ব।'

'কিন্তু এরা কারা?' বিড়বিড় করল লাবনী। 'রঞ্জন মিত্রের সঙ্গে কীসের সম্পর্ক এদের?'

ওদেরকে দেখে নিয়ে বললেন রঞ্জন মিত্র, 'শীঘ্রি জানিয়ে দেব এসব প্রশ্নের জবাব। তার আগে ওদেরকে রাজি করাতে হবে, যাতে তোমাদেরকে মেরে না ফেলে। কাজেই একটু ধৈর্য

ধরো।'

'যত খুশি সময় নিন,' নার্ভাস চোখে কঠোর মুখগুলো দেখছে লাবনী।

রঞ্জন মিত্র ও প্রধান পুরোহিতের মাঝে চলল কয়েক মিনিট বাদানুবাদ। বোঝা গেল বৃদ্ধ যোগী হাজির হওয়ায় অখুশি যুবক। দু'জনের কথা শেষ হলে রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়ের সামনে এসে দাঁড়াল প্রধান পুরোহিত। বয়স তার পঁচিশ, দীর্ঘকায়, পেশিবহুল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমার নাম শীর্ষেন্দু। উনি বলছেন তোমরা এসেছ প্রভু শিবের গুহা রক্ষা করতে। কথাটা কি ঠিক?'

'ঠিকই বলেছেন উনি,' বলল রানা।

'আমি ডক্টর লাবনী আলম, ইউএন-এর ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ এজেন্সির ডিরেক্টর,' বলল লাবনী। মাথা দোলাল প্রধান পুরোহিত। মনে হলো না কথাটা বুঝতে পেরেছে। 'আমার কাজ ঐতিহাসিক কীর্তিগুলো খুঁজে বের করে দুনিয়ার মানুষকে তা জানিয়ে দেয়া। যাতে চোরের হাতে না পড়ে মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট, এটা দেখাও আমাদের কাজ।'

'তোমাদেরকে কী প্রয়োজন আমাদের?' ভারী কণ্ঠে বলল শীর্ষেন্দু। 'চোরের হাত থেকে প্রভু শিবের গুহা রক্ষা করতে আমরাই যথেষ্ট!'

'শুধু আমরাই যে শিবের গুহা খুঁজছি, তা নয়, একদল লোক চাইছে তাঁর বেদ চুরি করতে,' বলল লাবনী, 'ওটা পেতে এরই ভেতর অনেক মানুষকে খুন করেছে। তাদেরকে ঠেকাতে গেলে, আপনাদেরকেও মেরে ফেলবে।'

শিবের বেদের কথা শুনে গুঞ্জন উঠেছে পুরোহিতদের ভেতর। 'তোমরা কীভাবে জানলে প্রভু শিবের বেদের কথা?' কড়া কণ্ঠে জানতে চাইল প্রধান পুরোহিত শীর্ষেন্দু।

'আমরা জানতে পেরেছি স্টাডা নামের এক লোকের কারণে। হাজার হাজার বছর আগে কেদারনাথ ঘুরে গিয়েছিলেন তিনি। সাধুরা তখন তাঁকে গুহার কথা বলেন। দেখান গুহার চাবি।' ওদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া সব জিনিসের ভেতর থেকে নকল চাবিটা দেখিয়ে দিল লাবনী।

চাবি তুলে নিয়ে আগুনের আলোয় পাঁচ দেবী ও শিবের মুখ দেখল প্রধান পুরোহিত। 'এই জিনিস কী করে পেলে?' কথাটা বলা হয়েছে অভিযোগের সুরে। যেন চুরি করা হয়েছে ব্যক্তিগত জিনিস।

সহজ কথায় খুলে বলতে চাইল লাবনী। 'স্টাডা আসল চাবি চেপে ধরেন নরম সোনার ভেতর। এভাবেই তৈরি করা হয় নকল চাবি।'

'নকল চাবি?' পুরু প্লাস্টিকের চাবিতে টোকা দিল শীর্ষেন্দু। 'তার মানে এটা আসল চাবি নয়?'

'না। কিন্তু... একমিনিট! আপনাদের কাছে আসল চাবিটা নেই?' অবাক হয়ে গেছে লাবনী।

'হাজার বছর আগে হারিয়ে গেছে,' দোষটা যেন লাবনীর, রাগতদৃষ্টিতে ওকে দেখল যুবক পুরোহিত।

'তার মানে, আপনারা গুহা পাহারা দিচ্ছেন, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছেন না?' বলল রানা। ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'তা হলে জানবেন কী করে যে সত্যিই ওখানে কিছু আছে কি না!'

'চাবি না পেলে কেউ ঢুকতে পারবে না গুহার ভেতর,' কর্কশ কণ্ঠে রাগ ঝাড়ল শীর্ষেন্দু। 'এক হাজার বছরেরও বেশি আগে থেকেই বন্ধ ওই দরজা। বাইরের কেউ এসে এখান থেকে জান হাতে নিয়ে বেরোতে পারেনি।'

'কিন্তু এখন আপনাদের হাতে নকল চাবি আছে, পারবেন তালা খুলতে?' জানতে চাইল লাবনী।

লজ্জায় আরক্ত হলো প্রধান পুরোহিতের মুখ। 'ওই গোপন নিয়ম... ওটাও হারিয়ে গেছে।'

'অর্থাৎ অনুপম মঙ্গেলকারের লোক এলে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে পাথরের কবাট,' বলল রানা।

'আমরা রক্ষা করব প্রভুর গুহা,' জোর দিয়ে বলল শীর্ষেন্দু। 'তাই করছি তাঁর আমল থেকেই। সবই ঠিকভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। পরে লাগলে যে-কোনও কিছু বের করবেন প্রভু।'

'আপনারা এত হাজার বছর ধরে এখানে রয়ে গেলেন কী করে?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর। 'এদিকে তো কিছুই জন্মায় না। জন্তু-জানোয়ারও নেই যে মেরে খাবেন। জীবন পার করেন কী করে?'

'শপথ অনুযায়ী এই উপত্যকা থেকে পারতপক্ষে বেরোয় না ওরা,' বললেন রঞ্জন মিত্র। লাঠির ওপর ভর দিলেন। 'পাহাড়ের আশপাশের গ্রাম থেকে আসে পুরোহিত। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় গোপন শক্তি।' অদ্ভুত ভাষায় ধমকের সুরে কী যেন বলল শীর্ষেন্দু। কিন্তু তা পাত্তা না দিয়ে বললেন যোগী, 'গুহার কথা সবাই জানে, তা-ও নয়। বিশ্বাস করা হয় কয়েকটি পরিবারকে। তাদের ছেলেদেরকেই গ্রাম থেকে এনে লড়াকু জীবন কাটাবার সম্মান দেয়া হয়। আমরা পুরনো পুরোহিতরা লড়তে শেখাই। প্রভু শিবের গুহা পাহারা দিলে নিশ্চিত স্বর্গ লাভ হবে।'

'আপনি বললেন: "আমরা পুরনো পুরোহিত", তা হলে কি আপনিও এদের একজন?' জানতে চাইল রানা।

'আগে ছিলাম। এখন আর নই।'

'এখন আর নন কেন?' জানতে চাইল লাবনী।

'মস্ত ভুল করি। তখন ভেবেছি ঠিক কাজই করেছি... কিন্তু...' বিমর্ষ চেহারায় আস্তে করে মাথা দোলালেন বৃদ্ধ যোগী।

'যাকে ভালবাসতাম, কষ্ট দিয়ে ফেলি ওকে। ওর কাছ থেকে কেড়ে নিই এমন এক জিনিস...' বারবার মাফ চেয়েছি পরে। কিন্তু কখনও মাফ করবে না ও। এ জন্যেই কেদারনাথ আর গৌরিকুণ্ডের মাঝে পাগলের বেশে ঘুরি। এমন একজন, কোথাও যার কোনও মূল্য নেই। সবাই অপমান করুক না আমাকে!'

'নিজেই এই শাস্তি দিয়েছেন,' বুঝতে পেরে অবাক হয়েছে লাবনী। 'কিন্তু সে শাস্তি নিলেন কেন?'

প্রধান পুরোহিত শীর্ষেন্দুর বাহুতে হাত রাখলেন রঞ্জন মিত্র। 'ওর জন্যে নিয়েছি, ডক্টর আলম। শীর্ষেন্দুর আসল নাম নারায়ণ। নারায়ণ মিত্র। ও আমার একমাত্র সন্তান।'

বিশাল চরাচরে নেমেছে রাতের ঘুটঘুটে আঁধার। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে তুষারঝড়ের গর্জন। ছেলেকে বুঝিয়ে শান্ত করেছেন রঞ্জন মিত্র। মেরে ফেলা হবে না রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়কে।

তবে তা অস্থায়ী ব্যবস্থা।

খেতে বসেছে ওরা। সর্বক্ষণ সন্দেহের চোখে ওদেরকে দেখছে পুরোহিতরা। জানিয়ে দিয়েছে, একবার নির্দেশ পেলেই খুন করবে রানাদেরকে।

'এঁরা কোথা থেকে খাবার পান?' রঞ্জন মিত্রের কাছে জানতে চাইল লাবনী। 'পাহাড়ে ওঠার সময় দেখলাম, এক সময় ওদিকে চাষ হতো। কিন্তু সেটা তো শত শত বছর আগের কথা।'

'গ্রামবাসীরা খাবারের ব্যবস্থা করে,' বললেন যোগী। 'প্রতি বছর কয়েকবার শিবের সাধুরা এখান থেকে বেরিয়ে কেদারনাথে গিয়ে খাবার নিয়ে আসে। পরনে থাকে তীর্থযাত্রীদের পোশাক।'

'খাবার খুব সাধারণ,' মন্তব্য করলেন অঙ্কুর রায়। সবজির তরকারী ও ভাত। 'আবহাওয়া খারাপ হলে কী করে? তখন তো

আর পাহাড় বেয়ে নেমে যেতে পারে না।'

'প্রভু শিব আমাদের শক্তি দেন, যাতে খারাপ সময় পার করে দিতে পারি,' গম্ভীর সুরে বলল নারায়ণ মিত্র।

'বলেছিলেন একজনের মনে কষ্ট দেন আপনি, তিনি বোধহয় নারায়ণের মা?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলালেন বৃদ্ধ, ঠোঁটে তিক্ত হাসি। 'ভেবেছি শিবের গুহার কথা ওকে বললে তা গোপন রাখতে পারবে। আর সত্যিই সব নিজের পেটেই রেখেছিল ও। কিন্তু ভুল করে ফেললাম...' ছেলেকে দেখলেন। 'আমার উচিত ছিল না নারায়ণকে বলা। আমাদের একমাত্র সন্তান। কিশোর বয়স, মাথা গরম। ওর মনে হলো, গ্রামে পচে মরার চেয়ে অনেক ভাল প্রভু শিবের যোদ্ধা হিসেবে সারাজীবন পার করে দেয়া।'

'আসলেই তাই,' জোর দিয়ে বলল নারায়ণ। 'প্রভুর সেবা না করে পাহাড়ে ট্যুরিস্টদের বয়ে নিয়ে যাওয়া কোনও কাজ হতেই পারে না।'

'অন্যকে সাহায্য করা লজ্জার কিছু নয়,' ছেলেকে বললেন রঞ্জন মিত্র। ফিরলেন রানার দিকে। 'মনস্থির করে ফেলল ও। যখন তরুণ হলো, রাজি হলাম, যোদ্ধা হিসেবে প্রভুর বাহিনীতে ওকে ভর্তি করিয়ে দেব। লেখাপড়া ফেলে এখানে এসে লড়াই শিখবে। প্রথমে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু একজন খুব অখুশি হলো।'

'আপনার স্ত্রী,' নরম সুরে বলল লাবনী।

মুখ নিচু করে নিলেন রঞ্জন মিত্র। 'হ্যাঁ, এই বাহিনিতে নারায়ণের যোগ দেয়ার আগে ওর সঙ্গে কোনও আলাপ করিনি। ভেবেছি, আমার মতই খুশি হবে। কত বড় সম্মানের কাজ করছে ছেলে! কত বড় ভুলই না ভেবেছি!'

'ছেলে হারিয়ে বসলেন তিনি।' আস্তে করে মাথা নাড়ল

লাবনী।

'হ্যাঁ। ওর মনে জন্ম নিল আমার প্রতি ঘৃণা। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ কেড়ে নিয়েছি। বুঝিনি কত কষ্ট পাবে। নারায়ণকে এখানে রেখে বাড়ি ফিরে দেখি ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে ওর লাশ।' আগুনের আলোয় চকচক করছে বৃদ্ধের চোখের কোণে অশ্রু। 'কখনও ভাবিনি এত কষ্ট দিয়ে বসব। এর মাফ হয় না। ছেলে হারিয়ে বুক ভরা দুঃখ নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল ও। ক্ষমা পেলাম না ওর কাছ থেকে। বুঝে গেলাম, যে কাজ করেছি, কোনও দেবতাও ক্ষমা করবেন না আমাকে। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতাম আমার স্ত্রীকে। ওর দেহ সৎকার করে ঠিক করলাম আর থাকব না এই সংসারে। তারপর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি কেদারনাথ আর গৌরিকুণ্ডের রাস্তায় রাস্তায়।'

গম্ভীর নারায়ণ মিত্র বলল, 'মা বুঝতে চাননি, প্রভু শিবের জন্যে কাজ করলে মনে কত শান্তি থাকে। মনের দিক থেকে মা খুব দুর্বল ছিলেন।'

'বাজে কথা বলবে না, নারায়ণ!' ধমকে উঠলেন রঞ্জন মিত্র। বুড়ো যোগী দলনেতাকে ধমক দেয়ায় বিস্মিত পুরোহিতরা। বাবার কণ্ঠে রাগ দেখে চুপ করে থাকল নারায়ণ। বড় করে দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করে বললেন রঞ্জন মিত্র, 'আমি দুঃখিত। উচিত নয় ধমক দেয়া। তুমি তোমার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আমি আমারটা। তফাৎ হচ্ছে... সেজন্যে দুঃখিত নও তুমি।'

'না, নই,' রাগী চোখে রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়কে দেখল পুরোহিতদের নেতা। 'এবার সিদ্ধান্ত নেব আমরা কী করব তোমাদেরকে নিয়ে। আমার বাবা বলেছেন, তোমাদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু কেন সন্দেহ করব না?'

'কারণ, আমাদের কাজের অংশ হচ্ছে, জরুরি তথ্য চেপে রাখা,' বলল লাবনী, 'কিছু দিন আগে উন্মাদ এক বিলিয়নেয়ার

মেরে ফেলতে চেয়েছিল পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষকে। তাকে ঠেকিয়ে দিয়েছি আমরা। গোপন করেছি, কী করতে গিয়েছিল। ওই তথ্য প্রচার হলে ভয়ে পাগল হয়ে যেত কোটি কোটি মানুষ।'

'ওই লোকের মতই ভারতীয় একজন ধনকুবের অনুপম মঙ্গেলকার ও তার দল চাইছে কলি যুগ শেষ করতে,' বলল রানা, 'শিবের গুহা থেকে বেদ পেলে কাজে নামবে।'

'তাই যদি হয় প্রভু শিবের ইচ্ছে, তা ঠেকাবার আমরা কে?' বলল নারায়ণ মিত্র।

'ওটা প্রভু শিবের ইচ্ছে নয়,' বলল রানা, 'মঙ্গেলকারদের ইচ্ছে। কলি যুগ চলার কথা চার লাখ বছর ধরে। কিন্তু দেশে দেশে যুদ্ধ লাগিয়ে দেবে ওরা। যুদ্ধ শেষে হলে পৃথিবীর সেরা ক্ষমতাশালী লোক হবে সে। কোনও দেবতার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।'

আস্তে করে মাথা দোলাল নারায়ণ মিত্র। 'তোমাদের কথা ঠিক হলে, বলো, আমরা কীভাবে ঠেকাব তাদেরকে?'

'প্রায় কিছুই করার নেই,' বলল রানা, 'কোথায় আছে শিবের গুহা, তা জানলে এখানে আসবে একদল নিষ্ঠুর মার্সেনারি, সঙ্গে আধুনিক সব অস্ত্র।'

রানার কথা হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করে অনুচরদেরকে জানাল নারায়ণ মিত্র। শুরু হলো আলোচনা। কখনও কখনও রেগে গেল কেউ কেউ।

'এরা কী বলছে, রানা?' জানতে চাইল লাবনী। 'তুমি হিন্দি বোঝো?'

'আমাদের বিশ্বাস করবে, না মেরে ফেলবে, তাই নিয়ে আলাপ হচ্ছে,' বলল রানা, 'এ ছাড়া, কথা চলছে, কীভাবে ঠেকাবে মঙ্গেলকারদেরকে। কয়েকজন চাইছে দেরি না করে

আমাদেরকে খুন করতে।'

লাবনী দেখল, রাইফেল দিয়ে যার গলায় গুঁতো দিয়েছে, সেই লোক কঠোর চেহারায় ওকে দেখছে। লাল হয়ে আছে কণ্ঠনালী। 'বুঝলাম। আমাদের কপাল ভাল, কাউকে খুন করে ফেলিনি।'

বৃদ্ধ যোগী গলা নিচু করে বললেন; 'আমার মনে হয় বাঁচতে দেবে ও।'

'বুঝলেন কী করে?'

'আমারই তো ছেলে। আশা করি ঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।'

তর্ক শুনছে রানা। পুরোহিতদের কাউকেই নরম-সরম মনে হলো না ওর। বিড়বিড় করল, 'আশা করি ভাল শিক্ষা দিয়েছেন ছেলেকে।'

আরও কিছুক্ষণ তর্কের পর সিদ্ধান্ত নিল নারায়ণ মিত্র। ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল কয়েকজনকে। রানার দিকে ফিরল। 'বাঁচতে দেব, কিন্তু বদলে কী দেবে তোমরা?'

জবাবটা দিল লাবনী, 'আমাদের প্রথম কাজ হবে ভারতীয় সরকার আর ইউএনকে জানিয়ে দেয়া, এই উপত্যকায় আছে শিবের গুহা। গোপন করা হবে এসব তথ্য।' প্রধান পুরোহিতের চেহারা কঠোর হয়ে গেছে দেখে জানাল, 'সাধারণ মানুষকে কিছুই জানানো হবে না। কিন্তু ভারত সরকার বা ইউএন এখন থেকে পাহারা দেবে এই উপত্যকা।'

অনিশ্চিত প্রধান পুরোহিত জানতে চাইল, 'আর কী করবে?'

'আপনারা চাইলে চেষ্টা করে দেখব গুহার দরজা খোলা যায় কি না,' একটু দূরে ওদের মালপত্রের ভেতর নকল চাবি দেখাল রানা।

অবিশ্বাস নিয়ে হাসল নারায়ণ মিত্র। 'তুমি কি পাগল? আশা করছ গুহার দরজা খুলতে সাহায্য করবে প্রভুর সেবকরা?'

'মঙ্গেলকাররা চাইছে শিবের বেদ,' বলল রানা। 'ওটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা জরুরি। যদি এখানে না থাকে, ওরা বুঝবে আসলেই পাবে না। সেক্ষেত্রে এখানে এসে খুনোখুনি করবে না। তখন হয়তো নিরাপদে থাকবে গুহার অন্য সব সম্পদ।'

'কিন্তু কেন বিশ্বাস করব তোমাদেরকে? বাস্তবে হয়তো অনুপম মঙ্গেলকার বলে কোনও লোকই নেই!'

'আছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন,' বলল রানা।

'তাদের চাই পৃথিবীর ক্ষমতা,' বলল লাবনী। 'কিন্তু শিবের বেদ সবাই পড়তে পারলে, মঙ্গেলকারদের বাড়তি ক্ষমতা থাকবে না। ওই বেদ কাজে লাগিয়ে পৃথিবী শাসন করতে চায় সে।'

'মেয়েটা ঠিকই বলেছে,' বললেন রঞ্জন মিত্র। 'খুব নামকরা মেয়ে ও। এমন কী কেদারনাথেরও অনেকে ওকে চেনে।'

'আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব, যদি সুযোগ দেন,' জোর দিয়ে বলল লাবনী।

গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেছে প্রধান পুরোহিত। বেশ কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিক আছে, আগামীকাল সূর্য ওঠার পর গুহার দরজা খোলার সুযোগ দেব।'

'কিন্তু আমরা যদি ভেতরে ঢুকতে না পারি?' জানতে চাইল রানা।

নারায়ণ মিত্রের পাতলা ঠোঁটে ফুটল হাসি। 'সেক্ষেত্রে মরবে।'

রানার বাহুতে হাত রাখল উদ্বিগ্ন লাবনী।

ও কিছু বলার আগেই টিটকারির সুরে বলল রানা, 'এ তো খুব খুশির খবর!'

ওকে পাত্তা দিল না প্রধান পুরোহিত। 'কেউ এলে বরাবরের মতই গুহাটা পাহারা দিয়ে রাখব আমরা। ভেবো না, শুধু তলোয়ারই আছে। দরকার হলে অন্য অস্ত্রও ব্যবহার করব।'

সংগ্রহ করা অস্ত্রের ভেতর ওর ওয়ালথারটা দেখল রানা। এরা ভালই চেনে আগ্নেয়াস্ত্র। সরিয়ে রেখেছে ম্যাগাযিন। চেম্বারেও গুলি নেই।

'একটা-দুটো অস্ত্র দিয়ে চলবে না,' বলল রানা।

'অন্য কিছুও থাকতে পারে,' বলল প্রধান পুরোহিত। 'কিন্তু তোমরা গুহার দরজা খুলতে পারলে আর কিছুই লাগবে না।' সে নির্দেশ দিতেই উঠে রানাদেরকে ঘিরে ফেলল বেশ কয়েকজন। 'তোমাদেরকে বাস করার মত একটা ঘরে নেবে ওরা।' শীতল হাসি নারায়ণের ঠোঁটে। 'আরামে থাকো প্রভু শিবের আশ্রয়ে।'

গতকাল ছিল মেঘলা দিন, সেই সঙ্গে তুষারঝড়, কিন্তু আজ ভোরে উঠেছে ঝকঝকে সূর্য। রোদ পড়েছে উপত্যকার দেয়ালে, দেখতে লাগছে গাঢ় নীল। তুষারে পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে সোনালি আলো। কিন্তু বাইরের আলো ও তাপ মোটেও পা রাখতে পারেনি সরু উপত্যকায়। পাহাড়ের কাঁধের নিচে বরাবরের মতই ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে শিবের প্রকাণ্ড মূর্তি।

রানা, লাবনী, অঙ্কুর রায়কে ঘিরে রেখেছে অন্তত ছয়জন পুরোহিত। পাশেই আছেন রঞ্জন মিত্র ও তাঁর ছেলে। সবাই মিলে উঠে এল শিবের পায়ের কাছে চওড়া উঠানে। নকল চাবি এখন লাবনীর হাতে। এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটা আর্কিওলজিকাল যন্ত্রপাতি। ওরা এখনও ভেবে পায়নি, কী করে খুলবে প্রাচীন ওই তালা। এটা বুঝেছে, এমন জিনিস নয় যে সহজেই খুলতে পারবে।

মূর্তির আশপাশে ছায়া থাকলেও একেবারে আলো নেই তা নয়, ভালই দেখা গেল বৃত্তাকার তালা। লাবনী যতটা ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক জটিল। চাবি ঢোকাবার জন্যে মাঝে গোল ফুটো। চারপাশে পাঁচটি বড় চাকা, সবমিলে যেন কোনও ফুল।

মাঝে ছোট সব গোল চাকা, সংখ্যায় বিশটা। প্রতিটার সঙ্গে যুক্ত বড় চাকা। ভেতরের চাকা ঘড়ির খাঁজকাটা বেয়ারিং-এর মত।

এতেই শেষ নয় জটিলতা। প্রতিটি ছোট চাকায় তিনটি করে টুকরো। চোখের মত দুই অংশ স্পর্শ করছে বড় চাকার গা। অন্য অংশ বালিঘড়ির মত ধরেছে বাকি দু'অংশকে। প্রতিটি চোখের টুকরোয় খোদাই করা বেদের দশটি সংস্কৃত শব্দ। বালিঘড়ির গায়ে পাঁচটি। প্রতিটি ছোট চাকায় সব মিলে ত্রিশটি শব্দ। বিশটি চাকায় আছে মোট ছয় শ' শব্দ।

কোনও অচেনা এক নিয়ম মেনে তৈরি কমবিনেশন। কিন্তু অক্ষরগুলো কী হবে, সে সম্পর্কে সামান্য ধারণাও নেই ওদের।

বড় একটা চাকা ছুঁয়ে দেখল লাবনী। প্রধান পুরোহিতের সম্মতি নিয়ে ঘোরাল চাকা। দরজার পেছনে ধাতব কিছু ঘষা খেল পাথরে। ভেতরে আছে কোনও রানার সিস্টেম। ওটাই তুলে রেখেছে তালা। বাইরের দিকে ঘোরে ছোট সব চাকা। তখন বড় চাকা থেকে ওপরে উঠে আবার বসে পরের ঘাটে। ছোট চাকা এক শ' আশি ডিগ্রি ঘোরালে নড়ে বড় চাকা। এদিক ওদিক চলে প্রতিটি চোখ। সরানো যায় তালার যে-কোনও অংশে। জীবনেও এত জটিল তালা দেখেনি ওরা। অত্যন্ত বুদ্ধিমান কেউ তৈরি করেছিল। দেখার মত ইঞ্জিনিয়ারিং।

'আমার ধারণা, বুঝতে পেরেছি কী করতে হবে,' বলল লাবনী।

'শুনে স্বস্তি পেলাম,' বলল রানা। বোঝা গেল ওর কথা বিশ্বাস করেনি রানা।

'অত কঠিন না,' ঠিক জায়গায় নকল চাবি বসাল লাবনী। 'বুঝলে না? পাঁচ দেবী। পাঁচটি করে ছোট চাকা আর পাঁচটি বড় চাকার একটা করে তাদের জন্যে। এবার, সব চাকা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলেই খুলবে তালা। এখন শুধু এসব শব্দের

সঠিক কমবিনেশন পেলেই কাজ খতম।'

'খুব ভাল!' উদাস হয়ে নিচের জমিন দেখল রানা।

'কতগুলো কমবিনেশন আছে?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়।

'ইয়ে... দাঁড়ান। ছয় শ' শব্দ তো? গৌণিক ছয় শ'...'

কাছে এসে তালা দেখল নারায়ণ মিত্র। 'গৌণিক মানে কী?'

'গৌণিক? অনেক জিনিসের সংখ্যা বা শব্দ কত হতে পারে সেটাই বের করা হয় গৌণিক দিয়ে। যেমন ধরুন চার। গৌণিক হবে চার গুণ তিন গুণ দুই গুণ এক— মানে চব্বিশ। আবার পাঁচ হলে পাঁচ গুণ চার গুণ তিন গুণ ইত্যাদি ইত্যাদি... মানে এক শ' বিশটি।'

ভয়ঙ্করভাবে ভুরু কুঁচকে শিবের মূর্তি দেখল রানা। বিড়বিড় করল, 'তার মানে ছয় শ' গুণ পাঁচ শ' নিরানব্বুই গুণন... পাঁচ শ' আটানব্বুই গুণন... ওহ্...' হঠাৎ কেমন যেন মাথা ঘুরে উঠল ওর। 'তুমিই অঙ্ক করো, লাবনী!'

পাটিগণিতে মাথা খেলে লাবনীর। 'ছয় শ' গুণন পাঁচ নিরানব্বুই মানেই তিন লক্ষ ঊনষাট হাজার চার শ' ওটাকে পাঁচ শ' আটানব্বুই দিয়ে গুণ দিলে...' মনে মনে কী সব অঙ্ক কষতে লাগল মেয়েটা। একটু পর বলল, 'দাঁড়াও, লিখে রাখি।'

ব্যাকপ্যাক থেকে নোটবুক ও কলম নিয়ে কাজে নেমে একটু পর হার মানল। 'ঠিক আছে, ধরে নেয়া যাক, কেউ যদি বলে ট্রিলিয়ন...'

'ট্রিলিয়ন?!' করুণ চোখে রানাকে দেখলেন অঙ্কুর রায়।

'অঙ্ক তো এখনও শেষ করিনি,' বলল লাবনী, 'ধরি ট্রিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, ট্রিলিয়ন, তারপর আরও বহু ট্রিলিয়ন এক শ' বার বললে বা লিখলেও শেষ হবে না এই তালার কমবিনেশন। আমরা যদি প্রতি সেকেণ্ডে একটা করে কমবিনেশন ব্যবহার করি, তাও পাঁচ বিলিয়ন বছর পর সূর্য বিস্ফোরিত হলেও শেষ

হবে না গণনা। পৃথিবী-সূর্য শেষ, কিন্তু সঠিক কমবিনেশন না-ও পেতে পারি।'

'তোমাকে অত সময় দিচ্ছে কে?' বলল বেরসিক রানা। 'একটু পর ওপর থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে!'

'আহা, ভাবছ কেন?' রানাকে দেখল লাবনী, 'গোপন কোনও কৌশল আছে। হাজার কোটি বছর লাগবে না।'

'কথা ঠিক,' সায় দিলেন অঙ্কুর রায়। 'কেউ না কেউ তো তৈরি করেছে এই মাল। সে নিশ্চয়ই চায়নি তালা খুলতে গিয়ে হাজার বছর পেরিয়ে যাক।'

নারায়ণ মিত্রের দিকে তাকাল লাবনী। 'কখনও তালা খুলতে চেষ্টা করেছেন?'

'দু'চার বার,' বলল যুবক পুরোহিত, 'কিন্তু চাবি হারিয়ে গেছে, তার ওপর গোপন নিয়মও আমরা জানি না।'

ছোট আর বড় চাকা দেখছে লাবনী। একটু পর চাবির গর্তটা পরীক্ষা করে দেখল। 'তার মানে চাবি ছিল।'

'আমারও তাই মনে হয়,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অঙ্কুর রায়।

'একটা ব্যাপার দেখেছেন?' বলল লাবনী, 'চাবির দেবীরা ঠিকভাবে বসবে তালার দেবীদের গায়ে। এটা নিশ্চয়ই কোনও সূত্র? এতেই হয়তো বোঝা যাবে সব কিছু। এমন হতে পারে না, একেক দেবীর জন্যে রাখা হয়েছে একটি করে শব্দ? আর তাতেই খুলবে তালা।'

ছোট এক চাকার ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ পড়তে লাগলেন রঞ্জন মিত্র। 'অনেক কিছুই লিখেছে। "চাঁদ, জলপ্রপাত, বিষাদ, কুকুর, অভিযাত্রা, অজয়, অচেনা লোক, হলদে..."'

'যা খুশি লিখেছে,' রানার চোখে চোখ রেখে নালিশ করলেন অঙ্কুর রায়। 'এটা হলো কিছু?'

'হয়তো একটা বাক্য তৈরি করতে হবে,' বলল রানা।

'মনে হয় না শিব নিজের গুহার তালা সামান্য কোনও ম্যাড লিবের খেলার মত রেখেছেন,' বলল লাবনী। 'আরও সহজ কিছু হবে। দেবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু।' এক পা পিছিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই তালার দেবীরা কারা?'

এক এক করে আঙুল গুনল প্রধান পুরোহিত। 'পার্বতী, উমা, দুর্গা, কালী, আর শেষে শক্তি।'

'শিবের পাঁচ স্ত্রী। কিন্তু আপনি যদি এককথায় তাঁদেরকে বোঝাতে চান, তা হলে?' আবারও তালার ওপর ঝুঁকে গেল লাবনী। উত্তেজিত সুরে বলল, 'এসব চাকার ভেতর দেবীদের সম্পর্কে কিছু লিখেছে?'

'দুর্গা অপরাজেয় যোদ্ধা-মা,' বললেন রঞ্জন মিত্র।

বাবাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে চাকার সামনে এল নারায়ণ মিত্র। মন দিয়ে দেখল তারা। 'শব্দ! হ্যাঁ! আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সঠিক শব্দ!'

'ভুল ভেবেছিলেন স্টাডা,' বলল লাবনী, 'কোডেক্সে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। অনুবাদও ভুল করেছি আমরা। বুঝেছি, শিবের ভালবাসা জানলে তখন পারব গুহার দরজা খুলতে। বা ঠিকভাবে বললে, শিবের ভালবাসার দেবীদের ভালভাবে চিনলে! কেউ যদি না জানে তাদের গল্প, কখনও খুঁজে পাবে না সঠিক কমবিনেশন।' চট্ করে নোটবুকের নতুন পাতা বের করল ও। 'শব্দগুলো লিখে নিতে হবে। একটাও বাদ পড়লে চলবে না।'

'ছয় শ' শব্দ?' বললেন অঙ্কুর রায়। 'অনেক সময় লাগবে।'

'আপনার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?' বাঁকা চোখে তাঁকে দেখল লাবনী। ব্যস্ত হয়ে শব্দ লিখতে শুরু করল। এক এক করে শব্দ আউড়াতে শুরু করেছেন রঞ্জন মিত্র।

'ইঁদুর।'

'ইঁদুর,' মুখে একবার বলে নিয়ে নোটবুকে লিখল লাবনী।

'ধুলো।'

আরও তিরিশ মিনিট পর আধাআধি হলো লিস্ট। খাটুনির কাজ, প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গেছে সবার। শিবের মূর্তির পায়ের কাছে বসে পড়েছে বেশিরভাগ পুরোহিত। সবাই অপেক্ষা করছে নিজ কাজ শেষ করবেন রঞ্জন মিত্র। পুরু কোটের ভেতর আধ ঘুমে সময় পার করছেন অঙ্কুর রায়। কিনারার কাছে পায়চারি করছে রানা। বাবার কাজ দেখতে দেখতে চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ পড়েছে প্রধান পুরোহিত শীর্ষেন্দুর।

'হাস্যরতা।'

'হাস্যরতা।'

'ইয়ে... কী যে বলা উচিত,' কপাল চুলকে নিলেন বৃদ্ধ যোগী। বিশেষ এক শব্দের ওপর চোখ। 'কোনও ধরনের পাখি। হতে পারে শকুন। আবার হতে পারে...'

'হেলিকপ্টার,' বলল রানা।

'বাজে কথা বলবে না,' কড়া চোখে ওকে দেখল লাবনী। 'সে আমলে...'

'আমি এই আমলের কথা বলছি,' বলল রানা, 'কাছে চলে আসছে হেলিকপ্টার।'

কান পাতল লাবনী। সবাইকে নীরব হতে ইশারা করল শীর্ষেন্দু। ভেসে এল হেলিকপ্টারের রোটরের আবছা ডুব-ডুব আওয়াজ। 'ওরা কি মঙ্গেলকাররা?' রানার দিকে তাকাল লাবনী।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। আন্দাজে কিছু বলবে না।

দূরে উপত্যকার উঁচু প্রাচীরের মত অংশে চেয়ে আছেন অঙ্কুর

রায়। এদিকে হেলিকপ্টার আসা কাকতালীয় ঘটনা নয়। আগে কখনও গোপন এই উপত্যকার আকাশে দেখা দেয়নি কোনও আকাশযান।

ক্রমেই কাছে আসছে আওয়াজ। পাখার ডুব-ডুব আওয়াজের ওপর দিয়ে এল ভারী ইঞ্জিনের গম্ভীর গর্জন। সূর্যের আলোয় একদিকের উঁচু দেয়ালে পড়ল ছায়া। মাথার ওপর দিয়ে গেল হেলিকপ্টার। একটু পর দূর থেকে দূরে হারাল আওয়াজ।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে রানাকে দেখল লাবনী।

কিন্তু আরও গম্ভীর হয়ে গেছে রানা।

আবার ফিরছে হেলিকপ্টার। পাল্টে গেছে ইঞ্জিনের শব্দ। এবার সরাসরি যাবে ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

'সবাই কাভার নিন!' পুরোহিত দলকে ছায়ায় সরতে ইশারা করল রানা।

বাড়ছে রোটরের ডুব-ডুব শব্দ, নামছে যান্ত্রিক ফড়িং। পাহাড়ের দেয়ালে ধীর অগ্রসরমাণ ছায়া। ওদের মাথার ওপরে হাজির হয়েছে হেলিকপ্টার। বাতাসের ঝাপটা খেয়ে ওপরের পাহাড় থেকে ঝরঝর করে ঝরল গুঁড়ো তুষারকণা।

গহ্বরের দু'পাশের কিনারায় পড়ছে ক্রিস্টালের মত স্বচ্ছ বরফ। শুকনো গলায় বলল রানা, 'উপত্যকা দেখছে।' ছাউনির মত অংশ থেকে বেরিয়ে আকাশে চোখ রাখল। 'নেমে আসছে, সবাই আড়ালে সরে যান।'

নিজে পাহাড়ের গায়ের কাছে সরল রানা। উপত্যকার দূরে অলস ভঙ্গিতে ঘুরতে ঘুরতে নামছে হেলিকপ্টার। লাল ও সাদা রঙ দেখে বোঝা গেল, ওটা অসামরিক আকাশযান। ফিউজেলাজ বাল্বের মত গোল। পেটমোটা বেঁটে পাখির মত। হয়তো নতুন, আধুনিক সামরিক কোনও হেলিকপ্টার।

রানা বুঝে গেল, ওটার মালিক মঙ্গেলকার। একদিকে বড়

করে আঁকা দ্য কোয়েশ্চেনের লোগো।

উপত্যকার পাহাড়ের ওদিকে নামছে হেলিকপ্টার। এক জানালায় মুখ দেখল রানা। চোখে তুলেছে ক্যামেরা। সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিল লেন্স। পাহাড়ের প্রাচীরের ওপাশে হারিয়ে গেল হেলিকপ্টার, নানাদিকে ছিটাল রাশি রাশি তুষারকণা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ইঞ্জিনকে শক্তি দেয়ায় উড়ে গেল হেলিকপ্টার দক্ষিণ দিকে।

চেয়ে থাকল লাবনী, কিন্তু ততক্ষণে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে যান্ত্রিক ফড়িং। 'ওরা কি শিবের মূর্তি দেখেছে?'

'ওদের তোলা আশপাশের ছবির ভেতর থাকবে,' বলল গম্ভীর রানা। 'কয়েক মিনিট ফোটোশপ ব্যবহার করলেই বাড়িয়ে নিতে পারবে আলো, তখন পরিষ্কার দেখবে সব। তার আগেই...'

'এবার দলবল নিয়ে ফিরবে,' প্রায় ছুটে গুহার দরজার সামনে পৌঁছুল লাবনী। নারায়ণকে বলল, 'হাতে সময় নেই। দেরি না করে বের করতে হবে কমবিনেশন।'

নতুন করে কাজে নেমে গেল লাবনী ও রঞ্জন মিত্র। এক এক করে লেখা হচ্ছে শব্দ। কাজ শেষ হলে মাত্র বিশ মিনিট লাগল সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে। 'হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে,' নোটবুকের পাতা ওল্টাল লাবনী, 'আমাদের পাঁচ দেবী। আর ছয় শ' শব্দ। এ থেকে বের করতে হবে সেরা শব্দ। সেসব হবে সংক্ষিপ্ত।'

ক্লান্তিকর কাজ। পাঁচ দেবীর কোন্ দিকটা বেশি পছন্দ করে, অনুগতদের কাছে জানতে চাইল নারায়ণ। বিশেষ কোনও দেবীকে পছন্দ করে তারা। অবশ্য প্রায় সবাই ব্যবহার করল কয়েকটি শব্দ। যেমন কালী, তিনি কালো রঙের, মৃত্যু ডেকে আনেন, ভীতিকর, সন্তানকে রক্ষা করেন, প্রচণ্ড রাগী এবং

নিয়ন্ত্রণহীন। অন্য চার দেবীরও রয়েছে নানান গুণ, কাজেই একেক দেবীর গুণের জন্যে তৈরি করতে হলো লিস্ট।

পাঁচটি লিস্ট তৈরি হলে দরজার সামনে ওগুলো রাখল লাবনী। 'ঠিক আছে, এবার কাজ শুরু। তার আগে... রানা, তোমার কী মনে হয়, কতক্ষণ পর ফিরবে হেলিকপ্টার?'

'নির্ভর করে কত দূরে যাবে। ধরে নাও তৈরি হয়ে মার্সেনারিদের দল সঙ্গে নিয়ে আসবে মঙ্গেলকাররা।'

'যদি দিল্লি থেকে উড়ে আসতে হয়, তাতে লাগবে কমপক্ষে একঘণ্টা,' বললেন অঙ্কুর রায়। 'বোধহয় ওখানেই আছে তারা। দল গুছিয়ে নিতে জায়গাটা ভাল।'

'সেক্ষেত্রে দেরি না করে তালা খোলা উচিত,' বলল লাবনী। 'ঠিক আছে, পাঁচ দেবীর প্রত্যেকের আছে কয়েকটি অতি ব্যবহৃত বিশেষণ। কিন্তু সেগুলোর ভেতর সেরা কোন্‌টা? যেমন কালীর কথাই ধরি। তাঁর কথা ভাবলে প্রথমেই কী মনে আসে?'

'মৃত্যু,' নির্দ্বিধায় বলল রানা।

'ঠিক,' সায় দিল শীর্ষেন্দু, 'কালী মৃত্যুর দেবী। অশুভ যে-কোনও কিছু ধ্বংস করেন।'

'তিনি অহম ধ্বংস করেন,' ছেলের ভুল শুধরে দিলেন বৃদ্ধ যোগী। 'তিনি মায়ের মত। বাচ্চার ভুল বা খারাপ কিছু দেখলে সেসব বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলেন। কেউ অপরাধ করলে, বা মন পরিষ্কার না থাকলে, বা দোষের কারণে কালীকে ভয় পেলে, এবং ক্ষমা না চাইলে, অবশ্যই তাকে শেষ করে দেন কালী।'

'কপাল ভাল, আমার মা তেমন নন,' বিড়বিড় করলেন অঙ্কুর রায়।

'তা হলে, মৃত্যুকে প্রতিনিধিত্ব করেন কালী,' বলল লাবনী। 'ঠিক আছে, দেবীর পাশের চাকার কাছে নেব মৃত্যু শব্দটা, সেটা যাতে স্পর্শ করে কালীর চাকাকে। দেখা যাক...'

নির্দিষ্ট ছোট চাকা ঘুরিয়ে বড় চাকার ঠিক জায়গায় নিল লাবনী। তাতে স্পর্শ করল দুই বড় ও ছোট চাকা। ছোট চাকা খানিক ঘোরাতেই নতুন জায়গায় বসল চোখের মত অংশ। ওটা ঘুরিয়ে নেয়ায় ঠেকে গেল তৃতীয় বড় চাকার গায়ে। তৃতীয়বার বালিঘড়ির মত চোখ ঘোরাতেই 'মৃত্যু' শব্দ বসল চাবির পাশে। ছোট চাকা ঘুরিয়ে অন্য প্রয়োজনীয় শব্দ বসাতে লাগল লাবনী। কিছুক্ষণ পর কাঙ্ক্ষিত সব শব্দ ঠিক বসিয়ে দেয়ায় দম আটকে ফেলল সবাই। ড্যাব-ড্যাব করে লাবনীকে দেখছে পুরোহিতরা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ফোঁস করে শ্বাস ফেলল।

কই, কিছুই তো হচ্ছে না!

'বড় বেশি আশা করছি, ভাবাই উচিত হয়নি যে খটাক্ করে টাম্বলার পড়বে,' বলল লাবনী। 'এবার পরের সব শব্দ।'

চলল কয়েক মিনিট তর্ক-বিতর্ক। তারপর স্থির হলো, প্রেমের প্রতিনিধিত্ব করেন পার্বতী দেবী। আবার উমা দেবীর ব্যাপারেও কেউ কেউ ভোট দিল। সঠিক শব্দ খুঁজে বের করা কঠিন কাজ, কারণ পার্বতী বা শক্তি দেবীর মত একই গুণ আছে উমা দেবীর। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উমা দেবীর জন্যে স্থির হলো মাতৃত্ব শব্দটা। শক্তি দেবীর জন্যে নারীত্ব। যদিও মিষ্টি হেসে রঞ্জন মিত্র বললেন, ওই নারীত্বের বদলে অনেকেই শক্তি দেবীর যৌন আবেদনকে বাড়তি গুরুত্ব দেন। সব শেষে নির্ভীক যোদ্ধা দুর্গা দেবী, যাঁকে হারাতে পারবে না কেউ।

আগেই তালার কমবিনেশনে রাখা হয়েছে কালী দেবীর জন্যে স্থির করা শব্দ। এবার এক এক করে অন্য দেবীর জন্যে বরাদ্দ শব্দ ঠিক জায়গায় বসাতে হবে। এক পা পিছিয়ে গেল লাবনী। ভাল করে দেখল তালা। সবই সঠিক জায়গায় বসাতে হবে। কাজটা খুব কঠিন। অনেকটা রুবিক্স কিউবের মত। রীতিমত পরিকল্পনা করে কাজে নামতে হবে। লাবনী কাজে ব্যস্ত

হয়ে টের পেল, একটা শব্দ ঠিক জায়গায় বসাতে গেলে সরছে অন্য শব্দ।

অবশ্যই পারব, মনে মনে জেদ ধরল লাবনী।

নানান কায়দা করে চাকা ঘুরিয়ে বা সরিয়ে দেবীর পাশে সঠিক শব্দ নিতে লাগল, তাতে লাগছে অনেক সময়। একসময় বুঝল, কাজটা করতে গিয়ে ভাল লাগছে ওর। যেন খেলছে শব্দ-ফাঁদ নিয়ে। এসবে আগ্রহী নয় শীর্ষেন্দু এবং তার দলের কেউ। মনে দুশ্চিন্তা, যে-কোনও সময়ে হেলিকপ্টারে করে হাজির হবে একদল সশস্ত্র লোক। তা ছাড়া, কঠিন তালা খোলার বিষয়টি বুদ্ধির কাজ, পুরোহিতদের দিনের বেশিরভাগ পেরোয় প্রার্থনা করে, মাথা খাটাতে হয় না।

আরও পাঁচ মিনিট পর শেষ চাকা ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় নিল লাবনী। নিচু স্বরে বলল, 'ব্যস, কাজ প্রায় শেষ!' পাঁচ বড় চাকা এখন বসে গেছে জায়গামত। নতুন কোনও শব্দ দেবার উপায় নেই। কালীর চাকায় ঠেকে আছে মৃত্যু লেখা শব্দ, একইভাবে যে যার চাকায় ঠেকে গেছে শক্তি, উমা, দুর্গা ও পার্বতী দেবীর সঠিক সব বিশেষণ।

আবারও শ্বাস আটকে ফেলল সবাই।

কিন্তু এবারও কিছুই হলো না।

'কী মুশকিল না!' বিড়বিড় করল লাবনী।

দরজার সামনে পৌঁছে কবাট দেখল রানা। বুঝে গেছে, খুব আগ্রহ নিয়ে ওকে দেখছে পুরোহিতরা। কারও কারও চোখে স্পষ্ট খুনের নেশা। 'না, কোনও হ্যাণ্ডেল নেই।'

'না, নেই,' বলল শীর্ষেন্দু।

'অন্য কোনও কমবিনেশন দেখুন, লাবনী,' বললেন অঙ্কুর রায়। কণ্ঠে জরুরি তাগিদ। ঘিরে থাকা পুরোহিতদের মনোভাব সুবিধার লাগছে না তাঁর। 'শক্তি হতে পারেন মাতৃত্বের প্রতীক।

হয়তো উমা নন।'

'এতে কিছু যায় আসবে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল লাবনী। 'আমার সাধ্যমত করেছি। আর কিছু করার নেই।'

এদিকে ভুরু কুঁচকে কী যেন মনে করতে চাইছে রানা।

দরজা থেকে প্রায় খেদিয়ে লাবনীকে সরাল প্রধান পুরোহিত। 'তোমরা ব্যর্থ হয়েছ।'

'একমিনিট,' শীর্ষেন্দুর দিকে পা বাড়াল রানা। কিন্তু ওকে ঘিরে ফেলল ক'জন সশস্ত্র পুরোহিত। ধারালো বা চোখা সব অস্ত্রের ফলা ঠেকল ওর বুক-পেট-পিঠে।

একই অবস্থা অঙ্কুর রায়ের।

কর্কশ গলায় নির্দেশ দিল প্রধান পুরোহিত। কিনারার দিকে রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়কে নিয়ে গেল লোকগুলো। নরম সুরে আপত্তি তুললেন রঞ্জন মিত্র। কিন্তু এককথায় ধমক দিয়ে তাঁকে চুপ করিয়ে দিল রাগান্বিত সন্তান।

'আমাদেরকে খুন করলে মঙ্গেলকারদেরকে ঠেকাতে পারবেন না,' বলল ভীতা লাবনী।

'আগের কাজ আগে, তোমাদের খতম করে তারপর ভাবব ওদের কী করব,' জানাল শীর্ষেন্দু, 'আমাদের রক্ষা করবেন প্রভু শিব।'

'শিব...' বিড়বিড় করল রানা। 'তাই তো!' সর্বক্ষণ ওদের বা তালার দিকে মুখ রেখেছে শিব মূর্তি। 'লাবনী! ওটাই দরজা খোলার উপায়!'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল প্রধান পুরোহিত শীর্ষেন্দু: 'এবার কিনারা থেকে নিচে পড়ে নরকে যাবে!'

মুখ তুলে সরাসরি শিবের মূর্তির চোখে চোখ রেখেছে রানা। 'খেয়াল করো শিবের মাথা!'

রানার কণ্ঠে জরুরি ভাব শুনে দ্বিধা নিয়ে মূর্তির দিকে তাকাল

নারায়ণ। ধাক্কা দিয়ে রানাদেরকে ফেলে দেয়ার জন্যে ইশারা করতে গিয়েও থেমে গেছে। মস্তবড় মূর্তি দেখল। 'কই, কিছুই তো...'

'মাথা কাত হয়েছে, চোখে পড়ছে না আপনার?' বলল রানা।

'হ্যাঁ, মাথা কাত, তো কী?'

'তার মানে চাবি আছে ভুল পযিশনে! তালার চাবি ওপরের দিকে রেখেছে লাবনী। সবাই তাই করে। কিন্তু তালা ঘুরিয়ে মূর্তির দিকে তাক করলে?'

কঠোর চোখে রানাকে দেখল শীর্ষেন্দু। 'তাতে কী হবে?'

'তালা বা দেবীদের মুখ সরিয়ে দিলে প্রতিটি মুখ ঘুরবে শিবের মুখের দিকে।'

একবার মূর্তি দেখল প্রধান পুরোহিত। 'এ কথা বিশ্বাস করতে বলো? ভাবছ সময় নেবে? বাঁচার কিন্তু উপায় নেই!'

'ভুল বলে থাকলে যা খুশি করবেন, আপত্তি তুলব না,' বলল রানা।

'একবার চেষ্টা করতে তো দেবেন, নাকি?' বললেন অঙ্কুর রায়। 'আপনারা যা খুশি করলে প্রভু শিবও খুশি হবেন না।'

'তালা দেখতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না,' বলল রানা, 'ভুল হলে মরতে আপত্তি নেই। আসলে একটু পরেই ঢুকব আমরা শিবের গুহায়।'

'তোমার উচিত সুযোগ দেয়া,' ছেলেকে বললেন রঞ্জন মিত্র।

চোখে বিরক্তি ও অভিযোগ নিয়ে বাবাকে দেখল শীর্ষেন্দু, কড়া সুরে বলল রানাকে, 'ভুল হলে দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে না।'

ঘাড়ের কাছে তলোয়ার উঁচিয়ে রেখেছে ক'জন পুরোহিত, আবারও মূর্তির সামনে হাজির হলো রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়।

তালা থেকে চাবি খুলে নিল রানা, ঘুরিয়ে বড় চাকাগুলো নিচ্ছে শিবের মূর্তির মুখের দিকে। নতুন করে চাবি বসিয়ে মোচড় দিল পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মুখ তুলে দেখল মূর্তি। ওর দিকেই যেন চেয়ে মাথা কাত করে দেখছে শিবের পাথর চোখ। দেবতার ঠোঁটে মৃদু হাসি। আরেক ঘাট তালা ঘোরাল রানা। পাথরে ঘষ-ঘষ শব্দ তুলে সরল পাঁচ দেবীর মুখ। পরের তিন মিনিটে সঠিক শব্দ তালায় বসিয়ে পাঁচ দেবীর মুখ শিবের মুখের দিকে তাক করল।

ভালবাসা, মাতৃত্ব, দুর্ধর্ষ লড়াকু, নারীত্বের প্রতিভূ... মৃত্যু...

শিব মূর্তির মুখের দিকে তাকাল রানা।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

তারপর মৃদু শব্দ হলো: ক্লিক!

তালার চাকার পেছনে শত শত বছর পর নড়ছে বা ঘুরছে কী যেন!

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

বাড়তে লাগল আওয়াজ।

ঠং! ঠং! শব্দ তুলল বেশ কিছু চেইন। দরজার কিনারা থেকে ভুশ্ করে বেরোল একগাদা ধুলো। ভেতরের দিকে খুলে যেতে লাগল মস্তবড় দুই পাথরের কবাট!

হতবাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল পুরোহিতরা। হাঁটুর ওপর ভর করে বসে পড়েছে তারা। বড় বড় চোখ করে রানার দিকে চেয়ে আছে পুরোহিতদের নেতা নারায়ণ মিত্র। পুরো খুলতেই পাথরের মেঝেতে ঘ্যাস্ শব্দ তুলে আটকে গেল দরজা।

'তা, বাছা, আমার তো মনে হয় তোমার মাফ চাওয়া উচিত এদের কাছে,' ছেলেকে বললেন রঞ্জন মিত্র।

চোখ সরু করে বাবাকে দেখে নিয়ে বলল নারায়ণ, 'আগে

দেখব ভেতরে কী। এসব রক্ষার জন্যেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এখানে জীবন পার করছি আমরা।' কয়েক সেকেণ্ড পর একটু আপত্তি নিয়ে বলল, 'ডক্টর আলম, মিস্টার রানা আর মিস্টার রায়, আমার সঙ্গে চলুন গুহার ভেতরে।'

শীর্ষেন্দুর পেছনে শিবের গুহায় পা বাড়াল রানা, লাবনী ও অঙ্কুর রায়। অদ্ভুত এক অনুভূতি সবার মনে।

চব্বিশ

পাহাড়ের কোলে ষাট ফুটি পাথরের শিব-মূর্তি সত্যিই বিশাল। কিন্তু তার পায়ের কাছের গুহা, ওটা কত বড়, জানা নেই কারও। ভেতরে ঢুকে রানারা বুঝল, শুধু প্রকাণ্ড বললে সত্যিই খাটো করা হবে পাহাড়ি এই গুহাকে। বহু দূরে মিলিয়ে গেল ওদের পায়ের শব্দ, কোথাও বাড়ি খেয়ে ফিরল না কোনও প্রতিধ্বনি।

দু'কবাটের ভেতর অংশে কী যেন। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেয়ার পর ওরা দেখল, দু'পাশে বড় দুটো বোল্ডার— উচ্চতা পাঁচ ফুট, চওড়ায় তিন ফুট। বোঝা গেল, বোল্ডারের কাজ দরজা খুলে দেয়া বা বন্ধ করা। গুহার খানিক ভেতরে দুটো র‍্যাম্প— ওদিকটা খাড়া হয়ে তিরিশ ফুট উঠেছে, এদিক কোমর উচ্চতায়। রানার মনে হলো, দেখছে আধুনিক স্কি জাম্প। যদিও গুহার ভেতরে তুষার বা বরফ নেই।

সেক্ষেত্রে ওগুলো কীসের জন্যে?

গুহার আরও ভেতরে শীর্ষেন্দুর সঙ্গে ঢুকতেই জবাব পেল রানা। অন্যরা পিছু নিয়েছে ওদের। র‍্যাম্পের ওপর বসে আছে কী যেন। হালকা দুটো ডানা বেরিয়ে আছে দু'পাশ দিয়ে। রানা বুঝে গেল, জিনিসটা পাখির ডানার মত কিছু।

'গ্লাইডার!' বলল লাবনী, ভুলে গেছে হিংস্র পুরোহিতদের কথা। 'অনুপম মঙ্গেলকার বলেছিল প্রাচীন ভারতের কাহিনি। তখন উড়ুক্কু যানে চেপে নানাদিকে যেতেন দেবতারা। ভেবেছি, পুরনো আমলের মানুষ স্রেফ চাপা মেরেছে। এখন বুঝলাম, আসলে সত্যটা কী।'

'ভিমানা,' হাসলেন রঞ্জন মিত্র। 'যখন ছোট ছিলাম, আমার বাবাও ওই গল্প শোনাতেন। ওই একই গল্প বারবার শুনিয়েছি নারায়ণকে।'

'মনে আছে,' বিড়বিড় করে বলল প্রধান পুরোহিত।

লাবনীকে সাহায্য করে নিজেও র‍্যাম্পে উঠল রানা। কাছ থেকে দেখবে প্রাচীন গ্লাইডার।

'কোডেক্সে যা লিখেছেন স্টাডা, সবই মনে হচ্ছে বাস্তব,' বলল লাবনী। 'মাত্র এক দিনে এখানে এসে পরের ঘণ্টায় মন্দিরে হাজির হতেন সাধুরা।'

'টেনে রাখা গ্লাইডার ছেড়ে দিলেই, র‍্যাম্প বেয়ে নেমে স্কি জাম্পের মত সোজা সাঁই করে বেরোত গুহার দরজা দিয়ে,' বলল রানা। 'আকাশ চিরে পাহাড় পেরিয়ে যেত বহু দূরে।' পাথরের স্লাইড দেখল। খুব মসৃণ। বাইরের দিকে ছোট ধাতুর রানার, ওটাই নির্দেশ করত কোন্ দিকে যাবে গ্লাইডার। গুহার দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। বহু দূরে পাহাড়ের উঁচু প্রাচীর। 'প্রথম দিকে খাড়াভাবে না উঠলে পাহাড়ে লেগে বিধ্বস্ত হবে গ্লাইডার।'

ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে গ্লাইডার দেখল রানা। মৃদু বাঁকা, মসৃণ,

চকচকে কালো কাঠ দিয়ে তৈরি ডানা। অনেকটা দাঁড় বা মাস্তুলের মত। বিশেষ কোনও কায়দায় শক্ত করা হয়েছে জোড়া। হাজার হাজার বছর পরেও ঘুণ ধরেনি। দাঁড়ের গায়ের কাপড় এখনও টানটান। আঁচ করল, কালো কাপড়টা হালকা ওজনের কোনও দামি সিল্ক। হাজার বছর বয়সের কারণে ধুলোয় হলদে হয়ে গেছে।

'বিশ্বাস করা কঠিন,' রানা ও নারায়ণের পিছু নিল লাবনী। ওরা উঠছে দ্বিতীয় র‍্যাম্পে। 'সত্যিই প্রাচীন হিন্দুরা আকাশ জয় করেছিলেন। এমন কী গ্রিকরা ডেউডেলাসের গল্প তৈরিরও আগেই! ষোড়শ শতাব্দীতে বিমানের প্রথম ডিযাইন করেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। ওই ডিযাইন ছিল অনেকটা এমনই।'

গ্লাইডারের নিচে উঁকি দিল রানা। একই কাঠ দিয়ে তৈরি ডানার নিচে আরোহীদের শোয়ার চৌকো জায়গা বা প্ল্যাটফর্ম। নিচে স্কির মত ধাতব রানার। গুহার পরিবেশ শীতল ও শুকনো বলেই জং ধরেনি ধাতুর মাঝে। আকাশযানটা দেখে মনে হলো, বইতে পারবে দু'জন লোক।

মুচকি হেসে লাবনীকে বললেন রঞ্জন মিত্র, 'অনেকে বলেন, পৃথিবীর বেশিরভাগ আবিষ্কার করেছেন জ্ঞানী ভারতীয়রা।'

'তাই?' কাঁধ ঝাঁকাল লাবনী। 'হতে পারে!'

প্রাচীন বিমানের ফিউজেলাজে আলো ফেলল রানা। হালকা দেহের এয়ারক্রাফটের লেজটা পাখার মত। গ্লাইডারের ফ্রেম থেকে একটু দূরে, নিচে কী যেন যুক্ত করা। টিউবের মত জিনিসটা কালো রঙের। কয়েক সেকেণ্ড ওটা চিনল না রানা, তারপর টিউবের এদিকে সলতে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল। 'অন্য জাতির অনেক আগেই ভারতের বিজ্ঞানীরা আরও জরুরি একটা আবিষ্কার করেন— রকেট!'

'যাহ্!' মাথা নাড়ল লাবনী, 'আমি জানতাম ওটা আবিষ্কার

করেছে চিনা বিজ্ঞানীরা।'

'যখন জানবে বহু আগেই ওই জিনিস ভারতীয়দের হাতে ছিল, মন খারাপ হবে ওদের,' বলল রানা, 'আসলে চিনের বিজ্ঞানীরা নয় শতাব্দীর দিকে বের করেন গান পাউডার। কিন্তু আমাদের এখানকার বন্ধু ওই জিনিস ব্যবহার করেছেন হাজার হাজার বছর আগে। ভুল না হলে, এসব রকেট ব্যবহার করতেন গতি বাড়িয়ে আকাশে উঠতে।'

র‍্যাম্পের পাশে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন রঞ্জন মিত্র, 'এসে দেখে যাও!'

নেমে এসে তাঁর পাশে থামল রানা, হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ল সামনের মেঝেতে। ওখানে অনেকগুলো কালো টিউব। লাঠি দিয়ে গুঁতো দেবেন ভেবেছিলেন রঞ্জন মিত্র, কিন্তু সতর্ক করল রানা, 'সাবধান! অনেক আগের জিনিস, যখন-তখন বিস্ফোরিত হবে।'

'আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করলেন অঙ্কুর রায়। 'ঠিকভাবে গান পাউডার মেশাতে না পারলে পরে বালির মত খসে পড়ে, তখন আর কোনও কাজেই আসে না।'

'ঝুঁকি নেবে তুমি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন অঙ্কুর রায়। 'মরতে? শিবের মাল বলে কথা!'

'কেউ আগুন জ্বালবেন না,' বলল রানা। এরই ভেতর অল্প আলোয় চোখ সয়ে গেছে সবার।

কাঁধ ঝাঁকাল লাবনী। 'এখানে শুধু গ্লাইডার আছে, তা নয়, জায়গাটা আস্ত এক হ্যাঙার। ওদিকের অন্ধকারে কী যেন। চলো তো, গিয়ে দেখি ওগুলো কী।'

'এই ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সুবিধে হবে না,' বলল রানা, 'আরও আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আলো কোনও ব্যাপারই নয়,' বললেন রঞ্জন মিত্র। গুহার

সামান্য ভেতরে ঢুকে পেয়ে গেছেন পাথরের পেডেস্টালে রাখা ধাতব পাত্র। পাশে থেমে টর্চ মেরে ওটা আলোকিত করল রানা। পাত্রের তলার মেঝেতে অগভীর নালা গেছে বহু দূরে। ওটা অনুসরণ করে কিছুটা যাওয়ার পর দু'ভাগ হলো নালা। ওখানেই দ্বিতীয় পাত্র। এরপর নালা গেছে আরেক দূরের পাত্রে। নালার ভেতর তরল কী যেন। রানা বুঝল, জিনিসটা পানি নয়।

'তেলের কুপির চেয়ে ঢের ভাল,' বললেন রঞ্জন মিত্র।

তরলে আঙুল চুবিয়ে নাকের কাছে তুলল রানা। দাহ্য তেল। 'বুঝলাম, একবার আগুন দিলে জ্বলবে প্রতিটি পাত্র বা লণ্ঠন।'

'আগুন? শেষে পুড়ে মরব না কি!' আপত্তি তুলল লাবনী।

'আগুনে রকেট না পড়লে দুশ্চিন্তা নেই,' বলল রানা। গুহা থেকে বেরিয়ে ব্যাকপ্যাক নিয়ে ফিরল। এখন হাতে ওঅটারপ্রুফ সার্ভাইভাল ম্যাচ বক্স। 'এবার দেখা যাক কী হয়।'

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ঠেকাতেই অগভীর তেলের নালায় ধরল আগুন। আঁধারে অভ্যস্ত চোখ কুঁচকে ফেলল সবাই। লকলকে কমলা রেখা ছুটে গেল গুহার গভীরে। জায়গায় জায়গায় বাঁক নিয়েছে নালা, ওখানেই আছে সব লণ্ঠন, ভেতরে হিসহিস শব্দে পুড়ছে কী যেন! দশ গুণ আলো ছড়িয়ে পড়ল ছোট প্যাকেট করা গান পাউডারের কারণে। একই কারণে জ্বলে উঠল ওপরে রাখা শুকনো কাঠ-কয়লা। আগুনের কাঁপা-কাঁপা লাল-হলদে আলোয় দেখা গেল বিশাল গুহা।

কী নেই! একদিকে দেবতা, মানুষ ও জন্তুর সোনার তৈরি সব প্রমাণ আকৃতির মূর্তি। সূক্ষ্ম ডিযাইনের হাজারো গহনার ভেতর রয়েছে দামি সব পাথর ও ধাতুর কারুকাজ। দেয়ালে দেয়ালে প্রাচীন সব দুর্লভ চিত্র। পুরু সিল্কের অপূর্ব ডিযাইনে প্রভু শিব ও তাঁর পাঁচ স্ত্রীর দারুণ, অকল্পনীয় দৃশ্য। এসব আর্টিফ্যাক্টের মাঝে জায়গায় জায়গায় অদ্ভুত সব যন্ত্র— ছায়া

থেকে বেরিয়ে এসেছে লণ্ঠনের আলোয়। একপাশে মস্ত এক চাকা, রিম থেকে ঝুলছে কয়েক ডজন চামড়ার ঝুলি। আরেক পাশে কাঠের বিশাল ফ্রেমওঅর্ক থেকে উঁকি দিচ্ছে চকচকে শত শত তীরের ফলা। এক দিকে প্রকাণ্ড পাথরের রোলার, গা ভরা পুরু লোহার কাঁটা। র‍্যাম্প থেকে একটু দূরেই ছোট্ট এক প্রাসাদ, ওটার ছাতে সোনার দুই গম্বুজ। ও-দুটোর বৃত্তাকার রিং থেকে নেমেছে বিশাল এক চিমসে কাপড়ের ব্যাগ। এতই বড়, প্রায় পৌঁছে গেছে গুহার একপাশের দেয়ালের কাছে।

'শিবের মস্ত গ্যারাজ,' বিড়বিড় করল লাবনী, 'এসব আসলে কীসের জন্যে?'

খুদে প্রাসাদের কাছে পৌঁছুল ওরা। সামনের দেয়ালে দরজা। ওটা ঠেলতেই ভেতর দিকে খুলল কবাট। ঘরের মাঝে ঝুলছে লণ্ঠন। পাশের দেয়ালে দীর্ঘ ব্লেডের কিছু তলোয়ার।

'জিনিসটা পুতুলের বাড়ির মত,' মন্তব্য করল লাবনী।

'মায়াযন্ত্র,' বললেন রঞ্জন মিত্র। 'জাদুর মেশিন। বেদ-এ লেখা আছে: যুদ্ধের সময় এসব ব্যবহার করতেন দেবতারা।'

অন্যসব যন্ত্রের নিখুঁত নাম জানাল শীর্ষেন্দু: 'এটা আসলে সর্বতোভদ্র।' মস্ত চাকাটা দেখাল, দু'পাশে কাঠের রিম।

চামড়ার থলি তুলে ভেতরের ভারী, নরকরোটির সদৃশ পাথর দেখল রানা। ব্যাগের ডিযাইন অনেকটা স্লিংশটের মত। 'একেকবারে শত শত পাথর ছুঁড়ত এই অস্ত্র।'

'এখানে রাখা হয়েছে কেন?' জানতে চাইলেন অঙ্কুর রায়। 'এই উপত্যকার ওই সুড়ঙ্গের মাঝ দিয়ে এসব আনা অসম্ভব।'

'পরে এখানে বসে তৈরি করেছে,' বলল লাবনী। 'এ গুহার সবই দর্শকদের দেখাবার জন্যে।' শীর্ষেন্দুর দিকে তাকাল। 'হিন্দু মহাকাব্যে এসবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। উপত্যকার দেয়ালেও খোদাই করা ছবি আছে।' তীর

ছুঁড়তে পারে যে যন্ত্রটা ওটাকে দেখাল শীর্ষেন্দু। 'ওটা শর-যন্ত্র, একেকবারে এক শ'র বেশি তীর ছুঁড়ত। আবার প্রাসাদ বা কেল্লার দেয়াল ভাঙতে লাগত উদ্ঘাতিম— পাথুরে বেলন।'

প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র দেখছে রানা। চেইন দিয়ে পাথর বা ধাতুর ওজন পুলির মাধ্যমে অ্যাক্সেলে আটকে রেখেছে যন্ত্র। আগের আমলের এমন বেশকিছু যুদ্ধাস্ত্র আগেও দেখেছে ও।

'হয়তো দারুণ জিনিস, কিন্তু ভুলেও হাত দিয়ো না,' রানাকে সতর্ক করল লাবনী। আবারও দেখল খুদে প্রাসাদ। 'ওটা আসলে কীসের জন্যে?'

পরস্পরকে দেখলেন রঞ্জন মিত্র ও তাঁর ছেলে।

শীর্ষেন্দু বলল, 'উড়ন্ত প্রাসাদ।'

'লিখিত রামায়ণে আছে ওটার কথা, কিন্তু ওই জিনিস ছিল অনেক বড়,' একটু হতাশা নিয়েই বললেন রঞ্জন মিত্র।

প্রাসাদের ভেতরের জিনিসপত্র দেখছে রানা ও অঙ্কুর রায়।

'গরম হাওয়ার বেলুন উড়িয়ে নিত প্রাসাদকে,' বলল রানা। দেখাল বড় লণ্ঠন। 'আগুনের তাপে ফুলে উঠত বেলুন। কাপড়ের নিচের অংশ গোল করে কাটা।'

অবাক চোখে কাপড়ের বিশাল বেলুন দেখছে লাবনী। 'অবিশ্বাস্য। প্রথমে চিনা বিজ্ঞানীরা হারল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে, আর এখন ফ্রেঞ্চদের সর্বনাশ ঘটে গেল। বেলুন আসলে ওদের আবিষ্কার নয়। এই গুহার কথা ছড়িয়ে পড়লে রেগে ব্যোম হবে একদল শ্বেতাঙ্গ গবেষক।'

'এই গুহার কথা গোপন থাকবে,' কঠোর সুরে বলল প্রধান পুরোহিত। 'এসব জিনিস সামান্য খেলনা। প্রভু শিবের লিখিত বক্তব্যের ক্ষমতা এরচেয়ে বহু গুণ বেশি। আমাদের প্রথম কাজ হবে শিবের বেদ খুঁজে বের করা। এরপর ঠিক করব আপনাদের কী করা যায়।' রানাদেরকে 'আপনি' করে বলছে সে এখন।

'কোথায় থাকতে পারে শিবের বেদ?' আনমনে বললেন অঙ্কুর রায়।

'গুহার অনেক গভীরে,' বলল লাবনী। 'আসুন।'

রানা ও লাবনীর পিছু নিল সবাই। গুহার একেবারে শেষ দিকে টিপটিপ করে জ্বলছে অগভীর নালায় আগুন। যাওয়ার পথে আরও নানান যুদ্ধাস্ত্র দেখল ওরা। কোনও কোনওটা প্রকাণ্ড গুলতি, ওগুলো দিয়ে ছোঁড়া হতো বড় বড় পাথর। আরও রয়েছে, হাতি ও ছাগলের আকৃতির প্রকাণ্ড সব ব্যাটারিং র‍্যাম। ওই একই জিনিস আছে দুই র‍্যাম্পের কাছে। মস্ত গুহার পেছন-দেয়ালের কাছে পৌঁছল ওরা।

লাবনীর কথাই ঠিক। হামলার সম্ভাবনা থাকলে যে-কোনও সমরাস্ত্র বিশারদ সবচেয়ে দামি জিনিস রাখবেন গুহার এদিকে। দেয়ালের বুকে ঢুকেছে সরু এক প্যাসেজ, শেষমাথায় রয়েছেন বিশ ফুটি কালো এক ভয়াল নারীমূর্তি— পাহারা দিচ্ছেন!

ভীতিকর দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কের ছাপ পড়ল শীর্ষেন্দুর চোখে-মুখে। নিচু স্বরে বলল, 'মা কালী...'

কুচকুচে কালো মৃত্যু-দেবী সত্যি বিভীষিকাময়, যেন দুঃস্বপ্নে দেখা দেয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসী। রাগে বিকৃত মুখ। লকলকে জিভ ও বিস্ফারিত চোখদুটো টকটকে লাল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, গলায় ফুলের বদলে সত্যিকারের মানুষের করোটির মালা। সবচেয়ে বেশি মনোযোগ কাড়ল দেবীর হাত— পুরো দশটা! বেশিরভাগ হাতে মারাত্মক সব অস্ত্র। আগুনের কাঁপা আলোয় চকচক করছে ধারালো ফলা ও চোখা ডগা। কয়েকটা তলোয়ার, একটা ত্রিশূল, দু'মাথাওয়ালা গদা, বিশাল বজ্র, এমন কী ডিস্কের মত চক্রামও বাদ পড়েনি। মেঝেতে দৃঢ় এক পা রেখেছেন কালী, পাশেই নিচে, ছোট্ট দরজা। ওদিকে প্যাসেজ বা ঘর। দেবী অন্য পা তুলেছেন হুমকির ভঙ্গিতে, অনুমতি ছাড়া প্যাসেজে বা ওদিকের

ঘরে কেউ ঢুকতে চাইলে পিষে ফেলবেন।

শ্রদ্ধা ও ভীতি নিয়ে কালীকে দেখছে পুরোহিত দল ও যোগী। প্রভু শিবকে পূজা করলে, অন্য দেবতা বা দেবীকে পূজা করা চলবে না, তা নয়। শিবের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে রাগী দেবী হিসেবে সবার শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছেন কালী।

রানাও ভাবল, অস্বাভাবিক কিছু আছে কালী-মূর্তির ভেতর।

'মৃত্যু-দেবী দশ হাতে অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এলে পারবে কে!' নিচু স্বরে বলল লাবনী।

খুশি হয়ে বললেন রঞ্জন মিত্র, 'না-না. ভুল ভাবছ। কালী মৃত্যুর চেয়েও বেশি কিছু। দেখেছ? ওই যে দুটো হাত, ওগুলো কিন্তু খালি।'

'এ দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?' জানতে চাইল লাবনী।

লাঠি তুলে মূর্তির খালি হাত দেখালেন বৃদ্ধ যোগী। 'ওই দুই হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমাদেরকে রক্ষা করবেন তিনি। রাগ তাঁর প্রচণ্ড, কিন্তু ভালবাসেন মা'র মতই। সন্তানকে আড়াল করে রাখবেন সব বিপদ থেকে। অন্য অর্থে, ওই দুই হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে বিশ্বাস করলে ভয় বলতে কিছুই থাকবে না কারও।'

প্যাসেজের সামনে থেমে মূর্তি দেখলেন অঙ্কুর রায়। 'তার মানে, প্রভু শিব তাঁর গুহা পাহারায় রেখে গেছেন দেবী কালীকে?'

'আর কাকেই বা বিশ্বাস করতেন?' জোর দিয়ে বলল শীর্ষেন্দু। 'অন্যায়কারীদেরকে কঠোর শাস্তি দেন মা কালী।'

ভাল করে দেখার জন্যে মূর্তির দেহে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল লাবনী। নিচু স্বরে বলল, 'এখন কথা হচ্ছে... যারা সত্যিই কেড়ে নিতে চায় শিবের বেদ, তিনি কি ধ্বংস করবেন তাদেরকে?' প্রধান পুরোহিতের দিকে তাকাল। 'আপনি জানেন,

কী করে পাওয়া যাবে শিবের বেদ?'

'ওই জ্ঞান অনেক আগেই হারিয়ে গেছে।'

'বাহ্!' বিরক্ত হয়েছে লাবনী।

'আমাদেরই জেনে নিতে হবে কীভাবে শিবের বেদ পাওয়া যায়,' বলল রানা। মূর্তির অস্ত্রগুলো আলো ফেলে ফেলে দেখল। আরও ভাল করে দেখবে, কিন্তু একপাশ থেকে চেপে এলেন অঙ্কুর রায়। 'অঙ্কুর, দেখতে দাও।'

'ও, সরি,' সরতে গিয়ে প্যাসেজওয়েতে পা ফেললেন ইন্টারপোল এজেন্ট...

'অঙ্কুর!' সতর্ক করতে চাইল রানা।

ওই একই সময়ে বিপদ বুঝে বলল লাবনী, 'মিস্টার রায়!'

সত্যি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে কালী-মূর্তি!

আট হাতের অস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত হলেন দেবী। প্রাচীন মেকানিযম কাজ করছে মূর্তির ভেতর। সরু প্যাসেজে ছুটে এল তলোয়ার, ঘ্যাঁচ করে কোপ দিল অঙ্কুর রায়ের পায়ে। ভীষণ চমকে গিয়ে ছিটকে পিছিয়ে এলেন ইন্টারপোল এজেন্ট।

যথেষ্ট দ্রুত সরতে পারেননি। ধারালো তলোয়ারের ফলা কচ্ করে কেটে দিয়েছে কাফ মাসলের মাংস। দরদর করে বেরোল রক্ত। ব্যথায় মেঝেতে পড়ে গেলেন অঙ্কুর। একহাতে চেপে ধরেছেন ক্ষত। ক্রিঁচ-ক্রিঁচ শব্দ তুলে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে আগের জায়গায় ফিরল তলোয়ার ধরা হাত।

সবার আগে ঝুঁকি নিল রানা। সামনে বেড়েই প্যাসেজ থেকে টেনে বের করল অঙ্কুর রায়কে। 'দেখি, দেখতে দাও,' বলে সরিয়ে দিল বন্ধুর হাত। রক্তাক্ত কাটা প্যান্ট হাঁটুর ওপর তুলল। মাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আঘাত। কুকুরের চিবিয়ে দেয়া মাংসের মত বিক্ষত পেশি। 'গভীরভাবে কেটেছে। লাবনী, তোমার ব্যাকপ্যাকে ফার্স্ট-এইড দেখেছি। এখন আছে?'

তাড়াহুড়ো করে ফার্স্ট-এইড হাজির করল লাবনী। হাতে দুটো ভিনাইল গ্লাভ্‌স্‌ পরে ক্ষত পরিষ্কার করতে লাগল রানা। সতর্ক করার সুরে বলল, 'ব্যথা লাগবে, অঙ্কুর। সরি, কোনও অ্যানেসথেশিয়া নেই। যতটা পারি সাবধানে সেলাই করব।'

অঙ্কুর রায়ের হাতদুটো শক্ত করে ধরল লাবনী। 'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।'

'বলা সোজা, মানা কঠিন,' ব্যথা সহ্য করতে গিয়ে দাঁতে দাঁত পিষছেন ইন্টারপোল এজেন্ট। রেগে গিয়ে বললেন, 'সেই ছোটবেলা থেকে বাবা-মা বলতেন, খারাপ কিছু করলে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেবেন মা কালী। বড় হয়ে ভাবতে পারিনি, সত্যিই কখনও কষ্ট দেবেন!'

'আপনি খারাপ কিছু করেননি,' বলল লাবনী। 'এই প্যাসেজে ঢুকলে যে-কেউ বিপদে পড়বে।'

লাল চোখে রাগ নিয়ে চেয়ে আছেন দেবী। কালী-মূর্তি দেখে নিয়ে ভাবল রানা, সবচেয়ে দামি সম্পদ রক্ষা করতে ব্যবহার করা হয় বুবি ট্র্যাপ। কিন্তু ওই ফাঁদ এড়াবার কোনও উপায় আছে। যে সাধু হাজারো বছর আগে স্টাডাকে শিবের বেদ দেখান, তিনি ভাল করেই জানতেন কীভাবে ঢুকতে হয় মৃত্যু-প্যাসেজে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ও, 'ঠিক আছে, অঙ্কুর, এবার সেলাই করব। কেমন বোধ করছ?'

'মনে হচ্ছে পা কেটে নিয়েছেন কালী,' দাঁতে দাঁত চাপলেন আর্টিফ্যাক্ট গোয়েন্দা।

'সহজ করে দম নাও।' বাঁকা সুই মাংসে গাঁথল রানা। ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেল অঙ্কুর রায়ের দেহ।

ওদের পাশ কাটিয়ে ভয় নিয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখছে শীর্ষেন্দু ও তার বাবা। লাঠির ডগা দিয়ে প্যাসেজের মেঝের সবচেয়ে আগের স্ল্যাবে খোঁচা দিলেন বৃদ্ধ যোগী। ব্যস্ত হয়ে উঠল কালী-

মূর্তি। ছুটে এসে কোপ মেরে কাঠের লাঠির মাঝ অংশ কেটে নিল তলোয়ার। লাফিয়ে পিছিয়ে গেল পিতা-পুত্র। আগের জায়গায় ফিরল দেবীর হাত।

'খুব ভাল লাঠি ছিল,' দুঃখ করে বললেন রঞ্জন মিত্র। 'ওটার মোসলমানি করে দিয়েছে!'

সেলাইয়ে ব্যস্ত রানা বলল, 'প্যাসেজের দিকে এগোলেই চালু হচ্ছে ফাঁদ। মেঝে স্পর্শ না করে কেউ শেষমাথায় যদি নামে, সেক্ষেত্রে?' কালী দেবীর পাথরের ভারী পা দেখল। 'মেঝেতে ফেলে পিষবেন যে-কাউকে।'

'শিবের মত বুকে চেপে বসবে কালীর পা,' বললেন চিন্তিত রঞ্জন মিত্র।

'কী যেন বললেন?' নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এক দানব ছিল, নাম রক্তবীজ,' বললেন বৃদ্ধ যোগী, 'যুদ্ধে কখনও হারানো যেত না তাকে। কারণ গা থেকে রক্ত মাটিতে পড়লেই একইরকম দানব তৈরি হতো। তাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা ছিল শুধু কালী দেবীর। যুদ্ধের সময় রক্তবীজের দেহের সব রক্ত চুষে খান তিনি। আর যে ক'টা একইরকম দানব হলো, তাদেরকেও খেয়ে ফেললেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে, রক্ত খেয়ে খুশিতে মাতাল হয়ে গেলেন মা, যুদ্ধের ময়দান জুড়ে নাচতে নাচতে পিষে দিতে লাগলেন মৃত যোদ্ধাদেরকে। তখন তাঁকে থামাতে গিয়ে লাশের অভিনয় করলেন শিব। তারপর কালী যখন পা দিয়ে বসলেন স্বামীর বুকে, ভীষণ লজ্জায় জিভ কেটে খুব শান্ত হয়ে গেলেন।'

'শিবের বারোটা বাজল?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল লাবনী।

'না, শিবের বুকের পাঁজর ভাঙার আগেই হুঁশ হলো তাঁর।'

অঙ্কুর রায়ের ক্ষত সেলাই করেছে রানা। 'ওই পা পেরিয়েই

যেতে হবে ভেতরের ঘরে।'

'নিশ্চয়ই কোনও উপায় আছে,' জোর দিয়ে বলল লাবনী।

একটু দূরের যুদ্ধাস্ত্রের পাশে বর্শা দেখেছে রানা। 'শীর্ষেন্দু, ওটা এনে চেষ্টা করে দেখুন। হতে পারে, হাতের নাড়ার ভেতর ইঙ্গিত আছে, বা নিরাপদ কোনও পথ আছে।'

মেঝের স্ল্যাবে বর্শার ডগার খোঁচা দিল শীর্ষেন্দু। আবারও ঝিলিক তুলে এল কালীর হাতের তলোয়ার। রানা বা লাবনী বুঝে গেল, প্যাসেজ পেরোবার নিরাপদ উপায় নেই। নানান অস্ত্রের কারণে প্যাসেজে কোপ পড়ছে, কেটে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, সব শেষে তো আছেই কালীর ভীষণ ভারী পা। ছোট দরজার ওদিকের ঘরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব!

'বুঝলাম,' বলল লাবনী।

কাটা বর্শার গোড়া পিছিয়ে নিল শীর্ষেন্দু। কুঁচকে গেছে ভুরু। 'আপনারা ঠিকই বলেছেন, কোনও কৌশল আছে। খোদাই করা চিত্রে সূত্র আছে কি না, আলাপ করে দেখব সবার সঙ্গে।' আঙরাখা পরা পুরোহিতদের দিকে ফিরল সে।

মানুষগুলোর ফিসফিস থেকে রানা বুঝল, এদের কাছ থেকে কিছুই জানবে না। ব্যাণ্ডেজ করে দিল অঙ্কুর রায়ের কাফ মাসলে।

লাবনী বলল, 'এখন কী অবস্থা?'

'আজ আমার আনন্দের দিন,' ব্যথাযুক্ত স্বরে বললেন অঙ্কুর রায়।

'একটু সহ্য করো,' বলল রানা। 'এত পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছি শিবের গুহায়। আশা করি নিরাপদে যে যার বাড়ি ফিরতে পারব।' রঞ্জন মিত্রের দিকে তাকাল। 'কালী দেবীর বিষয়ে এমন কোনও কাহিনি জানেন, যেটার কারণে প্যাসেজে নিরাপদে ঢুকতে পারি?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ যোগী। 'দুঃখিত। তেমন কিছু মনে পড়ছে না।'

ভীষণ রাগী কালী-মূর্তির দিকে তাকাল রানা। হামলার সময় একেবারেই নড়েনি দুটো হাত। 'ওই দু'হাতে বোঝানো হয়েছে: ভয় পেয়ো না, রক্ষা করব তোমাকে। কিন্তু ওটা কী ধরনের বিপদ, যেটা থেকে ভীত মানুষকে রক্ষা করবেন তিনি?'

'স্বয়ং কালী থেকে,' জানাল লাবনী, 'উনিই তো সবচেয়ে বিপজ্জনক এলিমেন্ট।'

মাথা নাড়লেন রঞ্জন মিত্র। 'হলো না। যারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তিনি।'

'কিন্তু কী করে রক্ষা করবেন, যখন তিনি নিজেই হামলা করছেন?' মাথা নাড়ল লাবনী।

'যদি ধরি তিনি ক্ষতি করবেন না, সেক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে বিপদ আসবে না— এটা হতে পারে,' বলল রানা। অঙ্কুর রায়ের দিকে তাকাল। 'তুমি সাহস করে এগিয়ে যাওনি, নইলে হয়তো কাফ মাসল শিক কাবাব হতো না।'

রানার কথাটা শুনে চুপ করে থাকল সবাই।

'যোগী বাবা, দেখে রাখুন অঙ্কুরকে,' বলল রানা।

'একমিনিট! কী ভাবছ?' চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

আরেকটা বর্শা নিয়েছে রানা। 'একটা থিয়োরি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'পাগল নাকি!' আঁৎকে উঠল লাবনী। 'এটা কোনও থিসিস নাকি, যে পিএইচডি না পেলে আরও গবেষণা করবে— এটা তো জীবন নিয়ে বিপজ্জনক খেলা!'

লাবনীকে পাত্তা না দিয়ে প্যাসেজের মুখে দাঁড়াল রানা। এক ইঞ্চি এগোলে পা পড়বে বিপজ্জনক স্ল্যাবে। ওখানে পড়ে আছে

অঙ্কুর রায়ের রক্ত। ওসব ফোঁটা পার করে কয়েক ইঞ্চি দূরে বর্শার ফলা নামাল রানা। 'এবার দেখা যাক...'

স্ল্যাবের বুকে শক্ত করে চেপে রেখেছে বর্শার ডগা।

নতুন করে জীবন্ত হলো প্রাচীন মেশিন, নানান অস্ত্র হাতে ছুটে এল আট হাত। কিন্তু বর্শা দিয়ে স্ল্যাবের যেখানে ঠুকে রেখেছে রানা, তার আগেই থামল সব অস্ত্র। খটাক্ করে জোরালো আওয়াজ হলো মূর্তির ভেতর। হামলা করতে গিয়েও জমে গেছেন কালী।

মেঝে থেকে বর্শা তুলল না রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর সরসর করে মূর্তির কাছে ফিরল অস্ত্র সহ সব হাত।

প্রায় দৌড়ে এসে রানার কাছে জানতে চাইল শীর্ষেন্দু, 'কী করেছেন আপনি? মা শান্ত হলেন কী করে?'

'উনি ঠিক করেছেন, আমাকে রক্ষা করবেন,' বলল রানা। 'এবার দেখা যাক কী করেন।' নতুন করে মেঝেতে বর্শার ডগা ঠুকেই আবার তুলে নিল। ছিটকে এল দেবীর হাতের তলোয়ার। কাটা পড়ল বর্শার একফুট ওপরে। 'কালী দেবীকে ভয় করলে হামলা করবেন। লাফিয়ে পিছিয়ে যেতে চাইলে আহত বা নিহত না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু সাহস করে দাঁড়িয়ে থাকলে?' নতুন করে স্ল্যাবে বর্শা ঠুকে রাখল রানা। প্যাসেজের শেষমাথা থেকে এল তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্র, কিন্তু সবই থামল এক ইঞ্চি আগে। 'চুপ করে দাঁড়াতে হবে। মেশিনারি বুঝবে হামলা করা চলবে না। আসলে কালীর নিরস্ত্র দুই হাত বলে দিচ্ছে, মা হামলা করবেন না, যদি বিশ্বাস করা হয় তাঁকে। এ কারণেই শিবের পাঁজর ভাঙেনি।'

বিস্ফারিত চোখে কালী দেবীর হাত ভরা অস্ত্র দেখছে লাবনী। 'তাই বলে কালীর পায়ের নিচ দিয়ে ওই ঘরে ঢুকবে তুমি? যদি পিষে দেয়? ওই পায়ের ওজন অন্তত দশ টন!'

‘ওই ওজন গায়ে পড়বে কি না, বুঝতে হলে পরীক্ষা করতে হবে,’ বলল রানা।

‘অসম্ভব! তোমাকে এত বড় ঝুঁকি নিতে দেব না!’ রাগে ও ভয়ে লালচে হলো ফর্সা লাবনী। তর্জনী তাক করে শীর্ষেন্দুকে দেখাল। ‘এরা পুরোহিত। পরীক্ষা করুক না! ভুল হলে কালী দেবী ওদেরকে নরকে না নিয়ে স্বর্গেও পাঠাতে পারেন!’

লাবনীর কথা শুনে বিমর্ষ চেহারা হলো শীর্ষেন্দুর। মাথা নেড়ে বলল, ‘আপনি চান আপনাদের ওই থিয়োরির সত্যতা জানবার জন্যে জীবন দিই আমরা?’

‘আমাদের চেয়ে কম চান না আপনারা শিবের বেদ, নাকি?’ ঝগড়াটে সুরে জানতে চাইল লাবনী।

‘ওটা পেলাম কি পেলাম না, সেজন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নেব কেন?’ আপত্তি তুলল প্রধান পুরোহিত।

‘এদিকে যে-কোনও সময়ে হাজির হবে মঙ্গেলকাররা,’ হুমকির সুরে বলল লাবনী। ভুলে গেছে কালী-মূর্তির কথা। ‘ওরা আসার আগেই সরাতে হবে শিবের বেদ।’ কড়া চোখে শীর্ষেন্দুর চোখে তাকাল। ‘দেখুন, সাহস না হারালে প্যাসেজ পেরোতে পারবেন, ঢুকেও যাবেন পরের ঘরে। বের করতে পারবেন শিবের বেদ। আপনারা কিন্তু কাজে নামতে দেরি করছেন!’

মাথা নাড়ল শীর্ষেন্দু। ‘আমাদের কাজ পাহারা দেয়া।’ পুরোহিতদের দিকে তাকাল। ‘তোমরা কী বলো, আমাদের কাজ কি প্রভু শিবের বেদ সরিয়ে নেয়া?’

মাথা নাড়ল পুরোহিতরা।

ক’জন একই কথা বলল: ‘আমরা রক্ষা করব ওটা।’

‘যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে,’ বলল রানা। লাবনীকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই পা রাখল প্রথম স্ল্যাবের ওপর।

‘হায়, আল্লা!’ চমকে গেল লাবনী। কিন্তু একই সময়ে মূর্তি

থকে রওনা হয়েছে জীবননাশী সব ভয়ঙ্কর অস্ত্র।

সবচেয়ে বড় তলোয়ারটা হঠাৎ থমকে গেল রানার পেট থকে এক ইঞ্চি দূরে। বিড়বিড় করল রানা, 'বেঁচে আছি, সজন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব— দেবী কালী, না এই জিনিসের য়াত নির্মাতাকে?'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ, রানা!' বেসুরো কণ্ঠে বলল আতঙ্কিত াবনী। 'এবার স্রেফ খুন হবে!'

'যাতে খুন না হই, সে চেষ্টাই করছি,' বলল রানা, 'এবার ্খা যাক, পরের পদক্ষেপে কী হয়।' তাক করে থাকা তলোয়ার ড়িয়ে এক পা বাড়াল রানা। বুকে কেমন ভয় ও উত্তেজনা। ারশির করছে ঘাড়ের ছোট চুল সাধারণত বিসিআই-এর পজ্জনক মিশন পেলে এমন লাগে ওর। মাত্র এক পা যেতেই র দিকে ছুটে এল অন্য অস্ত্র গলা ভেদ করতে গিয়েও থামল ারালো সিমিটার। মনে হলো অদৃশ্য কোনও দেয়ালে বাধা পয়েছে আরেক পা বাড়ল রানা। এবার কিছুই হলো না। ঝের প্রতিটি স্ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত নয় ফাঁদ। পরের স্ল্যাবে পা াখল রানা।

ওর গায়ের খুব কাছে পৌঁছুল বজ্র। আরেকটু হলে চুরমার তো মাথা। চুলে টের পেল ওটার হাওয়া। পরের পদক্ষেপে এল ারেক তলোয়ার বুক চিরতে গিয়েও থামল। প্যাসেজের মাঝে পৌঁছেছে ও, কালীর হাতে এখনও চারটে অস্ত্র।

আরেক পা এগোল রানা...

হাত কাটতে ছুটে এল চক্রাম।

কনুইয়ের আস্তিনে কামড় বসাল ওটা।

মুখ হাঁ করে দেখছে লাবনী। রানাকে সাহায্য করতে দৌড়ে ত, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে চাপা স্বরে নিষেধ করল রানা। 'না! ামনে বাড়বে না! ওটা থেমে গেছে!' সামান্য কেটে গেছে

কনুই। যান্ত্রিক শব্দ তুলে ফিরল চক্রাম। জ্যাকেটের আস্তিন কেটে সামান্য ক্ষত তৈরি করেছে বাহুতে। সরু চেরা অংশে রক্তের দাগ দেখল রানা। অঙ্কুর রায়ের চেয়ে কপাল ওর ভাল, দু'একটা সেলাই দিলেই চলবে।

আপাতত ওই চিন্তা মন থেকে দূর করে প্যাসেজের শেষাংশে যেতে পা বাড়াল রানা। আরও তিনবার তিনটে ধারালো অস্ত্র এল ওকে শেষ করতে। মনে মনে স্বীকার করল রানা: মহা সব বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করছে কালী-মূর্তি!

অবশ্য, রয়ে গেছে সবচেয়ে বড় আতঙ্কজনক পরীক্ষা।

বিড়বিড় করল রানা, 'এবার? বাছা, চ্যাপটা হয়ে গেলে?'

কালী-মূর্তির উঁচু করে রাখা পায়ের নিচে ঢুকতে হবে ওকে। তখন বুকের মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে থাকবে ভারী পাথুরে পা।

'এবার কী করতে হবে আপনারা কেউ জানেন?' করুণ সুরে বলল লাবনী। অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজের বাইরে।

'প্রভু শিবের মতই পায়ের নিচে শুতে হবে,' বললেন রঞ্জন মিত্র। 'রানা শুলে ওকে রক্ষা করবেন দেবী।'

কিংবদন্তী অনুযায়ী ঝুঁকি নেয়া যায়, কিন্তু ভালবাসার মানুষ যে-কোনও সময়ে খুন হবে, সেটা ভাবতে গিয়ে বুক কাঁপছে লাবনীর। মিনতির সুরে বলল, 'রানা, ওই ঝুঁকি নিয়ো না!'

'পায়ের নিচে পড়ে থাকব না, প্রথম সুযোগে চলে যাব ওদিকের ঘরে,' আশ্বাসের সুরে বলল রানা।

'শক্ত কোনও কিছু দিয়ে পা আটকে রাখলে?' জানতে চাইল লাবনী। 'যাতে নামতে না পারে পা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'যে তৈরি করেছে, সে ভাল করেই জানত ওই চিন্তা করবে কেউ।' সামনের মেঝে ছোট ছোট সব মোযাইকের টাইল দিয়ে তৈরি। কতটা ওজন পড়ছে, সেটা মেপে নেবে মূর্তির মেশিন। 'রঞ্জন বাবু ঠিকই বলেছেন। মূর্তির পায়ের

নিচে চুপ করে অপেক্ষা করতে হবে, নড়তে গেলে পা নেমে শেষ করবে আমাকে। এই ফাঁদ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের খেলা। ভয় পেলে খুন হব।'

'তোমার ভয় লাগছে না?' কাঁপা স্বরে বলল লাবনী।

'মিথ্যা বলব না, লাগছে।' আধ শোয়া হয়ে ছেঁচড়ে মূর্তির পায়ের নিচে চলেছে রানা। 'তবে পায়ের চাপে খুন হওয়ার সময় অপমান লাগবে।' পায়ের নিচে শুয়ে পড়ল ও।

সামান্য নড়ে উঠল একটা টাইল, রানার ওজন চাপতেই চালু করল মেশিনটাকে। কর্কশ খ্যার-খ্যার শব্দে নামতে লাগল অন্তত দশ টনি পা।

রানার মন চাইল ছিটকে আরেক দিকে সরতে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। হালকা চাপ পড়ল বুকে। শান্ত থাকতে হবে, নিজেকে বলল ও। নামছে পা! সহজ ভঙ্গিতে শ্বাস নিল। কিন্তু চাপ বাড়তেই বুক থেকে ভুশ করে বেরিয়ে গেল দম। মনে মনে বলল রানা, 'সেরেছে! মস্ত ভুল হয়ে গেল! এখন আর চাইলেও পায়ের তলা থেকে বেরোতে পারব না!'

কোনও বিরতি নেই, কর্কশ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে নামছে পাথরের ভারী পা। পাঁজরের হাড়ে টনটনে ব্যথা লাগল রানার। মেঝের সঙ্গে সেঁটে আছে পিঠ। সরতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

পিষে ফেলবে কালী-মূর্তি ওকে!

শেষবার মাথা কাত করে তাকিয়ে দেখল অশ্রুভরা চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা। বুঝে গেছে, চোখের সামনে মারা যাচ্ছে রানা, অথচ কিছুই করতে পারবে না। 'রানা!' ডুকরে কেঁদে উঠল।

মস্তবড় ভুল হয়েছে ঝুঁকি নিয়ে। চাপ আরও বাড়ছে রানার বুকে। শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। কিন্তু তখনই থামল সব আওয়াজ।

পরক্ষণে ঘ্যাড়-ঘ্যাড় আওয়াজ তুলে উঠতে লাগল পা। আগের জায়গায় গিয়ে থামল। বড় করে দম নিল রানা। একটু বিশ্রাম নিয়ে ক্রল করে চলল ছোট্ট দরজার দিকে। ওদিকে চলে যেতে পেরে বলল, 'পৌঁছে গেছি!'

'আল্লাকে ধন্যবাদ,' আনন্দে কাঁদছে লাবনী। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'তাই তো মনে হয়, যদিও কিছুক্ষণ মনে হয়েছিল টুথপেস্টের চ্যাপটা টিউব হয়ে যাব।'

'ওদিকে কী দেখছ?'

চারপাশে চোখ বোলাল রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। 'মেঝেতে গড়িয়ে ফ্ল্যাশলাইট পাঠাও। কিছুই দেখছি না।'

মেঝেতে বসে বোওলিং বলের মত প্যাসেজে ফ্ল্যাশলাইট পাঠাল লাবনী। গড়াতে শুরু করে প্যাসেজ পেরিয়ে মূর্তির পায়ের সামনে থামল টর্চ। হাত বাড়িয়ে ওটা সংগ্রহ করে সুইচ জ্বেলে নিল রানা। যে ঘরে আছে, ওটা বেশ ছোট। কাঠ ও পাথরের দেয়ালে শিবের ছবি, সবই দক্ষ হাতে আঁকা বা খোদাই করা। প্রতিটি দৃশ্য রঙিন। জায়গায় জায়গায় শিবের বেদের সংস্কৃত বাণী। যেটা বেশি টানল রানাকে, ওটা একদিকের দেয়ালে।

মুক্তো ও অন্য দামি পাথর দিয়ে কারুকাজ করা হাতির দাঁতের ছোট এক সিন্দুক। চার পায়া নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরি, ঠিক যেন হাতির পা। সিন্দুকের গায়ে নানান রঙের চিত্র। ভগবান শিব বসে আছেন পদ্মাসনে, স্মিত হাসছেন, দৃষ্টি বহু দূরে, কী প্রশান্ত রাজকীয় মুখ!

'আর কিছু দেখলে?' বাইরে থেকে জানতে চাইল লাবনী।

'ছোট সিন্দুক আছে।' চারপাশে আলো ফেলল রানা। দেখল মূর্তির যান্ত্রিক কিছু পার্টস্। বেশ কয়েকটি ধাতব চাকা ও

কবজা। 'কালী-মূর্তিকে ঠেকাতে হলে জ্যাম করার মত কিছু লাগবে। পাথর, বা লোহার দণ্ড... এমন ধরনের কিছু পাঠাও।'

মাত্র দশ সেকেণ্ড পর শীর্ষেন্দুর লোকদের কাছ থেকে লাবনী পেল ধাতুর পুরু দণ্ড। ওটা এসেছে গুহার এক যুদ্ধাস্ত্র থেকে। প্যাসেজে গড়িয়ে দেয়ায় ঠঠং-ঠং আওয়াজ তুলে রানার হাতের কাছে পৌঁছে গেল।

তুলে নিয়ে দুটো চাকার দাঁতের ফাঁকে খেলালের মত দণ্ড আটকে দিল রানা। প্রায় বেরিয়ে এসে পরখ করল মূর্তির পায়ের নিচের মেঝে। চাকা বারবার ঘুরতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছে বলেই নামছে না মূর্তির পা। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও রিসেট হলো মেকানিযম। পায়ের তলা দিয়ে উঁকি মেরে ডাকল রানা, 'কেউ দেখতে চাও এদিকের ঘর?'

প্রথমে সবার আগে সাবধানে এল শীর্ষেন্দু, চোখে-মুখে দ্বিধা ও ভয়। ঝাঁকি খেল মূর্তির আট হাত, কিন্তু চাকার দাঁত জ্যাম করে দেয়ায় চালু হলো না মেশিন। শীর্ষেন্দুর পরে এল লাবনী।

শীর্ষেন্দু ও লাবনী ছোট্ট দরজা পেরোবার পর বলল রানা, 'ঘুরে দেখো।' আলো ফেলল সিন্দুকের ওপর। 'শিবের বেদ থাকলে আছে ওটার ভেতর।'

এতই হতবাক শীর্ষেন্দু, কোনও কথা বলতে পারল না। চলে গেল সিন্দুকের সামনে। হাত তুলে স্পর্শ করতে গিয়েও থামল। বুঝতে পারছে না ছুঁয়ে দেখবে কি না। লাবনীর দিকে ঘুরে তাকাল। প্রথমবারের মত তাকে অনিশ্চিত মনে হলো। 'আমার কী করা উচিত, বোন?'

চুপ করে রানাকে দেখছে লাবনী।

'খুলুন,' বলল রানা, 'ভেতরে বেদ আছে কি না তা জেনে নেয়া জরুরি। থাকলে স্থির করতে হবে কোথায় সরিয়ে দেয়া যায়।'

মৃদু মাথা দোলাল পুরোহিত। সিন্দুক স্পর্শ করতে গিয়েও আবারও থামল। মাথা নাড়ল। 'না, ছুঁতে পারব না। আমার সেই আত্মিক ক্ষমতা নেই।'

'দেখি আমার আছে কি না,' সিন্দুকের ডালার আংটা ধরে টেনে ওপরে তুলল রানা।

ভয়ে গাল কুঁচকে ফেলল শীর্ষেন্দু।

গরম চোখে রানাকে দেখল লাবনী।

'হাতে সময় নেই, দেখে নাও ভেতরে কী আছে,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে বলল রানা। আলো ফেলল সিন্দুকের ভেতর।

প্রথম দর্শনে মনে হলো, এত বড় সব বিপদ উৎরে এখানে এসে মূল্যবান কিছুই পেল না ওরা। কিন্তু সিন্দুকের ভেতরের অংশে ধাতুর র‍্যাকে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে পাথরের আধ ইঞ্চি পুরু সব ট্যাবলেট। প্রতিটির আকার হার্ডবাউণ্ড বইয়ের মত। সব মিলে হবে চল্লিশটা।

চুপচাপ ভাবছে লাবনী: বাইরের মস্তবড় পাহাড়ি গুহার প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট অকল্পনীয় আর্কিওলজিকাল সম্পদ, কিন্তু সেসবের চেয়ে হাজার গুণ বেশি মূল্যবান এই ছোট্ট সিন্দুকের ট্রেজার। এসব জ্ঞান বা লিখিত বক্তব্য সত্যি হয়তো কোনও দেবতার তৈরি নয়। তাতে কিছু আসে-যায়ও না, মূল কথা— আটলান্টিয়ানদের সমাজের মতই হাজারো বছর আগের হিন্দু সমাজের ছবি ফুটবে পরিষ্কারভাবে। জানা যাবে, জনপদে জনপদে কীভাবে পাল্টে এসেছে বর্তমানের হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সমাজ।

খুব সাবধানে একটা ট্যাবলেট তুলে নিল লাবনী। দু'দিকেই দেখল সংস্কৃত বেদ লেখা। এমন এক ভাষা, যেটা খুব ভাল করে জানে না ও। পাশ ফিরে শীর্ষেন্দুর কাছ জানতে চাইল, 'আপনি এই ভাষা পড়তে পারেন?'

বিস্মিত চেহারা করে বলল প্রধান পুরোহিত, 'হ্যাঁ! ওই যে আপনার হাতে প্রভুর বেদ! ওখানে লেখা আছে যুগ পরিবর্তনের বিষয়ে।'

খুব সাবধানে আগের জায়গায় ট্যাবলেট রাখল লাবনী।

ব্যস্ত হয়ে ইশারা করল শীর্ষেন্দু, যেন পড়া হয় আরেকটা ট্যাবলেট।

কিন্তু মাথা নাড়ল রানা। 'আগে ঠিক করুন এসব কোথায় রাখবেন। এতক্ষণে এই উপত্যকার সন্ধান জেনে গেছে অনুপম মঙ্গেলকার ও তার স্ত্রী। হাজির হবে। যেভাবে হোক, তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে শিবের বেদ। এমন কোনও জায়গা চেনেন, যেখানে এসব নিরাপদে থাকবে?'

'উত্তর-পুবে কিছু গুহা আছে,' বলল শীর্ষেন্দু, 'কিন্তু বেদ ওখানে নিরাপদ কি না, বলা কঠিন। খুব গভীর নয় ওসব গুহা।'

যুবকের বাহুতে হাত রাখল লাবনী। তাতে কেমন চমকে গেল শীর্ষেন্দু।

'জানি, আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না। সেজন্যে দোষও দেব না। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনারা সহায়তা করলে, মঙ্গেলকারদের ক্ষমতা হবে না স্পর্শ করবে বেদ। যোগাযোগ করব ভারতীয় সরকার ও ইউএন-এ। তারাই ঠিক করবে কোথায় রাখবে বেদ। নিশ্চিত থাকুন, তাতে মঙ্গল হবে গোটা পৃথিবীর মানুষের। সবাই দেখবে ওগুলো। আপনার বাবা আমাদেরকে বিশ্বাস করেছেন। আপনি কি তা করবেন?'

একবার লাবনীকে দেখল শীর্ষেন্দু, আবার দেখল সিন্দুক। কুঁচকে গেল ভুরু। মনে হলো সিদ্ধান্ত নেবে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ভাবছেন আমরা ওই লোকগুলোকে ঠেকাতে পারব না?'

'ওদের থাকবে আধুনিক অস্ত্র,' মুখ খুলল রানা, 'প্রয়োজনে খুন করবে সবাইকে। আপনারা কতজন? বিশ বা ত্রিশজন?

কতজন আসবে জানি না, কিন্তু তারা ব্যবহার করবে সাবমেশিন গান বা মেশিন গান।'

'প্লিয, ভারতীয় সরকার বা আইএইচএ রক্ষা করতে পারবে শিবের বেদ,' বলল লাবনী। 'আপনারা হয়তো কিছুক্ষণ ঠেকাতে পারবেন মঙ্গেলকারদের লোককে, কিন্তু শেষে মরতেই হবে।'

অহমে লেগেছে বলে নাক দিয়ে নিজের প্রতি তাচ্ছিল্যের আওয়াজ বের করল শীর্ষেন্দু। 'ঠিক আছে। নিরাপদ কোথাও বেদ সরিয়ে নেবেন আপনারা। কিন্তু সঙ্গে আমিও যাব।'

'প্রথম কাজ, কীভাবে এখান থেকে বেরোব আমরা, তা ঠিক করা,' বলল রানা।

ওর দিকে তাকাল লাবনী। 'তোমরা পারবে সিন্দুক বের করে আনতে?'

শীর্ষেন্দুকে একবার দেখে নিয়ে সিন্দুকের একদিক ধরল রানা। 'আসুন, ওদিক তুলুন। দেখা যাক বের করা যায় কি না।'

চোখে ভয় নিয়ে কাজে নামল প্রধান পুরোহিত।

সাবধানে দু'জন মিলে হাতির দাঁতের সিন্দুক ওপরে তুলল ওরা। নিয়ে এল ছোট্ট দরজার সামনে। কালীর মস্ত পায়ের তলা দিয়ে বের করতে হলে ওপরের দিকে থাকবে সামান্য জায়গা। লাবনীর পর প্যাসেজে বেরোল রানা ও শীর্ষেন্দু। সাবধানে টেনে আনতে লাগল সিন্দুক। চার পায়া ঘষা খেল মেঝেতে। মূর্তির তলা থেকে বের করে দু'জন মিলে তুলে নিল সিন্দুক। প্যাসেজ পেরোবার পর শীর্ষেন্দুর নির্দেশে হাত লাগাল শক্তিশালী দুই পুরোহিত। রানা ও প্রধান পুরোহিত হাত সরিয়ে নেয়ার পর খুব সতর্কভাবে গুহার ফটকের দিকে সিন্দুক নিয়ে চলল তারা। লাবনীকে বলল শীর্ষেন্দু, 'ওরা উপত্যকার মেঝেতে নামিয়ে দেবে।'

চারপাশের আর্টিফ্যাক্ট দেখাল লাবনী। 'এগুলোর কী হবে?'

‘গুহা বন্ধ করে দেব। এখন জানি, কীভাবে খুলতে হবে দরজা। পরে ভেবে দেখব কী করব। আপাতত আপনাদের সঙ্গে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাব।’

অঙ্কুর রায়ের পাশে থামল রানা। ‘পায়ের কী অবস্থা? হাঁটতে পারবে?’

‘মনে হয় না। শৈলশিরা অনেক বেশি খাড়া।’ মাথা নাড়লেন ইন্টারপোল এজেন্ট। ‘তবে গৌরিকুণ্ডের কাছে পৌঁছলে হয়তো ফোনের সিগনাল পাবে। তখন ইন্টারপোলে যোগাযোগ করলে ওরা আমার জন্যে হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দেবে।’

মাথা দোলাল রানা। ‘ঠিক আছে। ওই হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেব শিবের বেদ। এ ছাড়া কথা বলব ভারতীয় সরকারের কয়েকজনের সঙ্গে। তাঁরা বেদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবেন।’

‘খুব ভাল হয়,’ বলল লাবনী।

রানার পাশে থেমেছেন রঞ্জন মিত্র। ‘চলো, রানা, ছেলেটাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাই।’

মাথা দোলাল রানা। দু’জন মিলে অঙ্কুর রায়কে দাঁড় করাল ওরা। ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেললেন বেচারা। বিড়বিড় করে বললেন, ‘আমি ঠিক আছি।’ রানা ও রঞ্জন মিত্রের সাহায্য নিয়ে এগোলেন তিনি।

সামনে সিন্দুক বয়ে দরজার দিকে চলেছে শক্তপোক্ত দুই পুরোহিত।

‘রানা, আমার বসের ফোন নম্বর দেব,’ বললেন ইন্টারপোল এজেন্ট। ‘উনি সব ব্যবস্থা করবেন। তারপর...’

থমকে গিয়ে বিড়বিড় করল রানা, ‘সর্বনাশ!

‘কী হলো, থামলে কেন?’ জানতে চাইল লাবনী।

জবাব হয়ে এল রোটরের শক্তিশালী খ্যারখেরে আওয়াজ।

একটা হেলিকপ্টার নয়, বেশ কয়েকটা!

শিবের গুহার খুব কাছে পৌঁছে গেছে মঙ্গেলকার!

পঁচিশ

'অঙ্কুরের পাশে থাকুন!' রঞ্জন মিত্রকে বলেই গুহার দরজার দিকে ছুটল রানা।

একই কাজ করেছে শীর্ষেন্দু ও তার দলের পুরোহিতরা।

ওদের পেছনে দৌড়াল লাবনী। 'এবার কী করব আমরা? উপত্যকা থেকে সিন্দুক বের করতে হলে অনেক সময় লাগবে!'

'হয়তো সে সুযোগ পাব না!' সামনের পুরোহিতদের উদ্দেশে চিৎকার করল রানা, 'সবাই গুহার ভেতর অপেক্ষা করো!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। খুব কাছে হাজির হয়েছে সাবসনিক ডুব-ডুব আওয়াজ। তারই মাঝে রানা শুনল মৃত্যু ডেকে আনা কর্কশ শব্দ। থমকে গিয়ে লাবনীকে একটা যুদ্ধাস্ত্রের ওপাশে ঠেলে দিল রানা। চালু হয়েছে মেশিন গান। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ঝাঁক-ঝাঁক লালচে ট্রেসার বুলেট। শতচ্ছিদ্র হয়ে গেল সামনের পুরোহিতদের দেহ। চারপাশে ছিটকে গেল রক্তের ফোয়ারা। শিবের গুহায় নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে এনেছে গানার।

পাথরের মেঝেতে বুলেট লাগতেই থমকে গিয়ে একপাশে লাফিয়ে পড়েছে শীর্ষেন্দু। রানা ও লাবনীর পাশে ধাতুর কাঁটাযুক্ত উদ্ঘাতিমের পেছনে থেমে চাপা স্বরে বলল, 'ওই সিন্দুক! ওটা কোথায়?'

'ওদিকে!' দেখাল লাবনী। দরজার একটু দূরে র‍্যাম্পের পাশে সিন্দুক নামিয়ে লুকিয়ে পড়েছে দুই পুরোহিত।

রোটরের তুমুল বেগের কারণে গুহায় ঢুকছে ঝোড়ো, হিমশীতল হাওয়া। নামছে হেলিকপ্টার। উদ্ঘাতিম বা রোলারের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। আকাশযানটা চিনুক। প্রকাণ্ড এক টুইন-রোটর ট্র্যান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট। ভারী কার্গো বা সৈনিক বহন করতে ব্যবহার করা হয়। পেছনের র‍্যাম্প এখন খোলা। ওদের দিকে তাক করা। ওটার মেঝেতে পেটে ভর করে এম২৪৯ মেশিন গান থেকে বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়ছে গানার। তার পেছনে আছে অন্তত এক ডজন সশস্ত্র লোক। সবার পরনে কালো কমব্যাট গিয়ার, শরীরে আর্মার, হাতে এমপিফাইভকে।

আড়াল পেতে নানান দিকে ছুট দিয়েছে জীবিত পুরোহিতরা। কিন্তু অনায়াসেই তাদেরকে এক এক করে ফেলে দিচ্ছে গানার। ভাঙা সিঁড়ি থেকে ওপারের কিনারায় পৌঁছুতে ঝাঁপ দিল এক তরুণ পুরোহিত। উড়ন্ত অবস্থায় গুলির আঘাতে কিমা হলো তার দু'পা। করুণ চিৎকার ছেড়ে অনেক নিচের জমিতে পড়ে চিরকালের জন্যে চুপ হয়ে গেল।

থামল গুলির আওয়াজ। ইঞ্জিনের শক্তি বাড়াল চিনুক। ওপরে উঠতে শুরু করে চলে গেল চোখের আড়ালে। একটু দূরে রানা দেখল লাল-সাদা আগের সেই পেটমোটা হেলিকপ্টার। আকাশে আছে তৃতীয় আরও একটা। ওটা আঁটসাঁট চেহারার কালো-রুপালি এমডি ফাইভ হানড্রেড। ইউএস আর্মির এমএইচ-৬ লিটল বার্ড গানশিপের নকল। পাইলট বা আরোহীরা মিলিটারি সুবিধা পাবে। এখন ককপিটের দরজা খোলা, ওদিক দিয়ে নাক বের করেছে আরেকটা এম২৪৯। মাযল তাক করা হয়েছে উপত্যকার মেঝের দিকে।

যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে বসে পড়ল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

'বাইরে তিনটে হেলিকপ্টার। কতজন সঙ্গে এনেছে, জানি না। সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশিই হবে।'

'নিরাপদ কোথাও লুকাতে হবে বেদ,' চট্ করে সিন্দুক দেখল লাবনী। আপাতত ওটা আছে গুলির আওতার বাইরে র‍্যাম্পের আড়ালে।

'বাইরে নেয়া যাবে না,' বলল রানা। আরেকবার দেখল উদ্ঘাতিম। কী যেন বলতে গিয়েও তার বদলে বলল, 'এহ্হে!'

পাহাড়ি তাকের অনেক ওপরে চিনুক হেলিকপ্টার, ওটা থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে উঠানের কিনারায় বেশ কয়েকটা দড়ি। যে-কোনও সময়ে নামবে সশস্ত্র বাহিনী। উপত্যকার আকাশে ভাসছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড। কাভার ফায়ারের জন্যে তৈরি।

'ওরা আসছে,' শীর্ষেন্দুকে বলল রানা। কাঁপতে শুরু করেছে দড়ি, যেন জীবন্ত সাপ। নেমে আসছে মার্সেনারিরা। ওর হাতে ওয়ালথার থাকলে কিনারায় লোকগুলো নামার আগেই গুলি করে ফেলে দিতে পারত রানা। সেই আশার গুড়ে বালি। অস্ত্র বলতে ওদের আছে বড়জোর ছোরা ও তলোয়ার।

কিন্তু...

সামনেই পাথরের তৈরি দানবীয় উদ্ঘাতিমের দিকে তাকাল রানা। 'লাবনী, খেয়াল করেছ, এসব অস্ত্র ছোঁড়ার জন্যে তৈরি?'

মাথা দোলাল লাবনী। 'জানি না কীভাবে ব্যবহার করে। তোমার কিছু জানা আছে?'

'না, জানা নেই,' ব্যস্ত হয়ে যন্ত্রটা পরীক্ষা করতে লাগল রানা। একবার লিভার টানলে খুলবে চোক, চেইনের ভারী ওজন ধপ্ করে পড়বে— ফলে ঘুরবে স্প্রোকেট, তুমুল বেগে ঘুরিয়ে দেবে উদ্ঘাতিমকে।

কিন্তু দেয়াল ভাঙার রোলার দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের

ঠেকাতে পারবে না ওরা। ছোট ছোট চাকায় ভর করে এগোতে পারবে জিনিসটা, কিন্তু আপাতত দরজার দিকে তাক করা নেই। এমন কোনও উপায় দেখল না রানা, যে ওটাকে সরাতে পারবে।

'এটা দিয়ে কিছু হবে না,' বলল লাবনী। 'কিন্তু অন্য কিছু দিয়ে হয়তো বাধা দিতে পারবে। আগে বাছতে হবে কী দিয়ে...'

'সে সময় নেই,' বলল রানা। দড়ি বেয়ে কিনারায় নেমে আসছে কালো পোশাক পরা এক মার্সেনারি। অস্ত্র হাতে দৌড়ে এসে থামল দরজার পাশে।

তাকে চিনল রানা। জ্যাক রিচি।

কিনারায় নেমে এল আরও কয়েকজন মার্সেনারি। কবাটের পাশ থেকে ভেতরে উঁকি দিল জ্যাক রিচি। ইশারা করতেই তাকে কাভার দিল আরও দু'জন। সঙ্গে একজনকে নিয়ে ছুটে গুহায় ঢুকল মার্সেনারি নেতা।

'আমরা কী করব, রানা?' ফিসফিস করল লাবনী।

পিঠের খাপ থেকে তলোয়ার নিল শীর্ষেন্দু। 'লড়ব।'

'ওদের কাছে যাওয়ার আগেই খুন হবে,' ভদ্রতা ভুলে বলল রানা। আসলে কিছুই করার নেই ওদের। এগোতে শুরু করেছে মার্সেনারিরা।

মাত্র একটা কাজই করতে পারবে রানারা। আবারও ফেরা যায় গুহার পেছন দেয়ালের কাছে। সে সুযোগও কমে আসছে। একের পর এক মার্সেনারি নামছে বাইরের উঠানে।

কোনও উপায় না দেখে বলল রানা, 'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আপাতত আমাদের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত লুকিয়ে পড়া।'

'কিন্তু শিবের বেদ পেয়ে যাবে ওরা,' প্রতিবাদ করল লাবনী।

'চাইলেও ঠেকাতে পারব না, এসো, ফিরে যাই,' বলল রানা। আত্মহত্যা করতে তৈরি হচ্ছে শীর্ষেন্দু, সেটা টের পেয়ে

ধমক দিল, 'তুমিও এসো!'

কয়েক সেকেণ্ড রানাকে দেখল যুবক, তারপর মাথা দোলাল।

লাবনী ও শীর্ষেন্দুকে নিয়ে গুহার পেছন দিকে চলল রানা। মার্সেনারি আর উদ্ঘাতিমের মাঝে রেখেছে নিজেদের। এ কাভারটা ওদের খুবই দরকার। পুরোহিতদের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখছে মার্সেনারিরা। কেউ জীবিত থাকলে গুলি করে মেরে ফেলবে। খুদে প্রাসাদ পাশ কাটাল রানা, লাবনী ও শীর্ষেন্দু। এড়িয়ে গেল চুপসে থাকা বেলুনের মস্ত কাপড়। কোনাকুনিভাবে চলল কালী-মূর্তির দিকে। রানার ধারণা, ওদিকেই কোথাও পাবে রঞ্জন মিত্র ও অঙ্কুর রায়কে। অপেক্ষা করার কথা তাদের। কিন্তু মার্সেনারিদের চোখ এড়িয়ে ওদিকে যাওয়া কঠিন। আগের চেয়ে তপ্ত হয়ে বেশি আলো বিলাচ্ছে লণ্ঠন। তা ছাড়া, রয়েছে অগভীর নালার জ্বলন্ত তেল।

কাঠের এক যুদ্ধাস্ত্রের ফ্রেমের মাঝ দিয়ে চোখ রাখল রানা। সরে গেছে চিনুক হেলিকপ্টার। ওটার দড়িও ঝুলছে না। তার মানে, আপাতত গুহার ভেতর ঢুকবে না আরও মার্সেনারি। তাতে স্বস্তি পাওয়ার কারণ নেই। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় বেশি। তার চেয়েও বড় কথা, তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্র।

তিনজন করে দল বেঁধে ছড়িয়ে পড়ছে মার্সেনারিরা, সার্চ করে দেখবে গুহা। একটা হাতির মূর্তির আড়াল থেকে রঞ্জন মিত্রকে উঁকি দিতে দেখল রানা। ধারণা করল, বৃদ্ধ যোগীর সঙ্গেই আছে অঙ্কুর। রঞ্জন মিত্র এমন লোক নন যে আহত সঙ্গীকে ফেলে যাবেন।

'ঠিক আছে, রঞ্জন মিত্র আর অঙ্কুরের কাছে পৌঁছে কোনও যুদ্ধাস্ত্রের নিচে লুকিয়ে পড়ব আমরা,' ফিসফিস করে বলল রানা।

‘কিন্তু ওদের কাছে যাব কী করে?’ জানতে চাইল লাবনী।

ওদিকে গেলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে জ্বলন্ত তেলের নালা পেরোতে হবে। দরজা থেকে সরাসরি চোখে পড়বে ওই জায়গা।

‘ঠিক সময়ে কাজে নামতে হবে,’ বলল রানা।

ওদের সবচেয়ে কাছের উদ্ঘাতিমের কাছে পৌঁছেছে মার্সেনারি উপদল। উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দেখছে প্রকাণ্ড রোলার। ‘ওরা একবার ওদিকে গেলে...’

‘ব্যবস্থা করছি,’ বলল শীর্ষেন্দু।

রানা নিষেধ করার আগেই সোনার ছোট একটা গহনা তুলেই ছুঁড়ে মারল প্রধান পুরোহিত। উদ্ঘাতিমের কাছে টুং করে পড়ল ওটা। এদিকে ঘুরে গেল মার্সেনারিদের ফ্ল্যাশলাইটের আলো।

‘এটা কী হলো!’ রেগে গেল রানা। ‘তুমি বোকা নাকি! ওরা জেনে গেছে গুহায় জীবিত কেউ আছে!’ তদন্ত করতে চোখের আড়ালে সরল মার্সেনারি দলের দু’জন। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সন্দেহ নিয়ে চারপাশে আলো ফেলল তৃতীয়জন। ‘ঠিক আছে, ঝুঁকি না নিয়ে আর উপায় নেই। তৈরি হও। ওই লোক অন্যদিকে ঘুরে দেখলেই...’

ফ্ল্যাশলাইটের আলো আসছে দেখে লুকিয়ে পড়ল রানা। সরু পথে কয়েক সেকেণ্ড এদিকে দেখে রোলার বা উদ্ঘাতিমের দিকে আলো ফেলল লোকটা। ‘এবার যাও!’ লাবনীর কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিল রানা। মেয়েটার পর দৌড় দিল শীর্ষেন্দু। কিন্তু ওরা দু’জন অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই ওদের ওপর স্থির হলো আলো। কয়েক ফুট পেছনে রানা। ডাইভ দিয়ে পড়ল এক হাতির মূর্তির ওপাশে। একই সময়ে শুনল চিৎকার এবং পরক্ষণে অটোমেটিক অস্ত্রের গর্জন। ওর পেছনে পাথরের দেয়ালে লাগল বুলেট। গুহার অন্য জায়গা থেকে এল হৈ-চৈ। দৌড়ে আসছে একদল মার্সেনারি, প্রথম সুযোগে ঘিরবে এদিকটা।

একটু দূরেই লাল-হলদে আলোয় বৃদ্ধ যোগী রঞ্জন মিত্র আর অঙ্কুর রায়কে দেখল রানা।

ফ্যাকাসে মুখে চুপ করে আছেন ইন্টারপোল এজেন্ট। একবার চেষ্টা করে দেখলেন উঠে দাঁড়াতে পারবেন কি না। কিন্তু আহত পায়ে কাজটা একেবারেই অসম্ভব। বসে পড়লেন। ফুঁপিয়ে উঠলেন ব্যথায়। কোথাও যেতে হলে তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার মানেই সাহায্যকারী হয়ে উঠবে গুলির লক্ষ্য।

হাতির মূর্তির আরেক প্রান্তে লাবনী। পরিষ্কার দেখল গুহার মাঝ দিয়ে ছুটে আসছে কয়েকজন মার্সেনারি। 'রানা, ওরা আসছে!'

বাজে ফাঁদে পড়েছে ওরা। দু'পাশ থেকে গুলি করে ওদেরকে গেঁথে ফেলতে পারবে মার্সেনারিরা। আধুনিক কোনও অস্ত্রের জন্যে মরিয়া রানা, কিন্তু কোথাও যেতে গেলেই ওকে দেখবে শত্রুপক্ষ, ফলাফল ওর নিশ্চিত মৃত্যু।

কোথাও যাওয়ার নেই।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর এখানে পৌঁছুবে কাছের মার্সেনারি উপদল। হাতির মূর্তি ঘুরেই গুলি করবে ওদেরকে।

'জ্যাক রিচি!' লাবনী ও শীর্ষেন্দুকে অবাক করে দিয়ে চিৎকার করল রানা, 'রিচি! আমি মাসুদ রানা! শুনছ আমার কথা?'

জবাব নেই। বুটের ধুপ-ধাপ ছুটে আসছে ওদের দিকে। তারপর জ্যাক রিচির কণ্ঠ শুনল রানা। 'হোল্ড ইয়োর ফায়ার!'

হাতির মূর্তি ঘুরেই উদ্যত অস্ত্র হাতে রানাদের কাভার করল তিন মার্সেনারি। ট্রিগারে তর্জনী।

কিন্তু গুলি করা হলো না।

মূর্তির আরেক দিকে পৌঁছে গেছে আরেক দল মার্সেনারি।

রানাসহ দলের পাঁচজনকে ঘিরে ফেলল তারা। রানাদের বুক ও মাথায় তাক করেছে লেসার সাইটের সবুজ বিন্দু। এগিয়ে এল আরও কয়েকটি পায়ের আওয়াজ। এখন মার্চ করে আসছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা দিল জ্যাক রিচি। কৌতূহলী চোখে দেখল রানাকে। 'রানা! অবাক করলে!'

'আমিও অবাক হয়েছি,' মাথার ওপর হাত তুলল রানা, 'আমার ধারণা ছিল মঙ্গেলকাররা তোমাকে বিদায় করে দিয়েছে।'

'প্রায় তা-ই করেছিল। কিন্তু দক্ষ লোক দরকার ছিল এই অপারেশনের জন্যে। এমন কেউ, যে চট্ করে জড় করতে পারবে দক্ষ একদল মার্সেনারিকে।'

'জর্জ মাইকেল তোমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করলেও, বুঝতে পারছি নিজের কাজ ভালই বোঝো।'

'জর্জ মাইকেল?' ফিসফিস করল লাবনী, দ্বিধান্বিত। 'এটা কি মার্সেনারিদের রিইউনিয়ান?'

হাতের ইশারায় লাবনীকে চুপ করিয়ে দিল রানা। 'তো কোথায় ওই দুই বেঈমান বিলিয়নেয়ার?'

রানার কথায় আপত্তি তুলল না রিচি। 'হেলিকপ্টারের একটায় আছে। তোমাদেরকে দেখলে খুব অবাক হবে।' দলের ক'জন মার্সেনারিকে নির্দেশ দিল, গুহা সার্চ করবে তারা। অন্যদেরকে ইশারা করল, যেন আহত অঙ্কুর রায় ও অন্যদেরকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় দরজার সামনে।

সশস্ত্র মার্সেনারিরা পেছন থেকে তাড়া দিল রানা ও তার দলের সবাইকে। 'কী করবে এরা?' রানার কাছে জিজ্ঞেস করল লাবনী। তখনই চমকে গেল। 'আরে! এই হারামজাদাই তো কিডন্যাপ করেছিল! রানা, এদের সঙ্গে তোমার এত দহরম-মহরম কীসের?'

'খাতির না থাকলে এতক্ষণে আমরা খুন হতাম,' বলল রানা। 'ওকে কথা দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে, নইলে বাঁচব না।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল লাবনীর মুখ। 'তার মানে, তোমার কোনও পরিকল্পনা আছে, তাই না?'

'এখনও মাথায় কিছু আসেনি,' বিরস মুখে বলল রানা।

'ও...' ভেজা মুড়ির মত পুতিয়ে গেল লাবনী, 'আর ভেবেছি...'

র‍্যাম্পের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। রানা ও লাবনী, দু'জনই ভুলেও বেদ ভরা সিন্দুকের দিকে তাকাল না। মার্সেনারিদের জানার উপায় নেই ওটা কীসের। কিন্তু দেখলে ঠিকই চিনবে অনুপম মঙ্গেলকার। আপাতত জিনিসটা লুকাতে পারবে না ওরা।

র‍্যাম্পের শেষ অংশে রানা ও অন্যদেরকে নিয়ে এল জ্যাক রিচি। পাথুরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো অঙ্কুর রায়কে। অস্ত্রের মুখে রাখা হয়েছে রানার দলের সবাইকে। এদিকে গুহা সার্চ করছে অন্য মার্সেনারিরা। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এল তারা, দলনেতাকে জানিয়ে দিল, গুহায় জীবিত আর কেউ নেই। হেডসেটে কথাটা জানিয়ে দিল জ্যাক রিচি। রানাকে বলল, 'রওনা হয়ে গেছেন অনুপম মঙ্গেলকার ও তাঁর স্ত্রী।' দরজা দিয়ে দেখা গেল, উপত্যকার দূর থেকে আসছে লাল-সাদা হেলিকপ্টার।

'শকুনীর মত মেয়েলোকটার সঙ্গে আবার দেখা হবে, ভাবতে খারাপ লাগছে,' বিড়বিড় করল লাবনী। আশপাশে পড়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত পুরোহিতদের লাশ। মেঝেতে জমে যাচ্ছে চটচটে রক্ত। পরিবেশটা খুব বিষণ্ন। বুক দমে গেছে ওর। রানা কিছুই করতে পারবে না। মরতেই হবে ওদের সবাইকে।

লাবনীর মতই চুপ রানা, কিন্তু কী যেন খুঁজছে ওর চোখ

মৃতদেহগুলোর কাছে। বেশিরভাগ তলোয়ার আওতার বাইরে। কিন্তু পাথরের র‍্যাম্পের দু'ফুট দূরেই আছে হাতলওয়ালা বড় এক ছোরা। কোনও সুযোগ করে নেয়া গেলে তুলে নিতে পারবে ওটা। মার্সেনারিদের কাউকে আহত করে হয়তো পাবে আগ্নেয়াস্ত্র।

রানা টের পেল, মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখছেন রঞ্জন মিত্র। ওর চোখ অনুসরণ করে ছোরার ওপর স্থির হলো তাঁর চোখ। রানা বুঝল, ধার্মিক মানুষটা বুঝে গেছেন, পাল্টা হামলার পরিকল্পনা করছে ও। ঘুরে অন্য দিকে দেখল রানা। চোখের কোণে দেখছে ওই ছোরা।

বিশাল চওড়া দরজা দিয়ে দমকা হাওয়ার সঙ্গে এল একরাশ তুষারকণা। মার্সেনারিদের মত র‍্যাপেল না করে আকাশে ভাসমান হেলিকপ্টারের উইঞ্চ থেকে হার্নেসে করে নিচে নামছে চাঞ্চাল আধিকারী। জ্যাক রিচির নির্দেশে দুই মার্সেনারি গিয়ে তাকে কিনারার এদিকে টেনে আনল। হার্নেস খুলে দিতেই ওপরের দিকে টেনে নেয়া হলো উইঞ্চ কেইবল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরল ওটা। এবার হার্নেসে ভর করে হাজির হলো জিভহীন দাড়িওয়ালা দানব, নরেশ শর্মা। মনিবরা নেমে আসবে বলে অপেক্ষায় থাকল অনুপম মঙ্গেলকারের দুই গার্ড।

এবার নেমে এল অনুপম মঙ্গেলকার।

চট্ করে তাকে হার্নেস থেকে ছুটিয়ে নিল দুই প্রহরী। দু'হাতে কোট ঝেড়ে নিয়ে গুহায় ঢুকল বিলিয়নেয়ার। বিজয়ীর ভঙ্গিতে গটমট করে হাঁটছে। কিন্তু লাবনীকে দেখে থমকে গিয়ে নিস্পৃহ সুরে বলল, 'ডক্টর আলম আর মিস্টার রানা। আমার পরিকল্পনার ছেঁড়া দুটো সুতো।' বিস্মিত হয়েছে সে।

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা অনেক কাজে আসে কমপিউটারের চেয়ে,' বলল লাবনী। 'বড় দেরি

করে ফেলেছেন। এরই ভেতর নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে শিবের বেদ। কিছুক্ষণ আগে আইএইচএ-র হেলিকপ্টার চলে গেল।'

ভোঁতা চেহারায় চতুর হাসি ফুটল অনুপম মঙ্গেলকারের। 'আমার তা মনে হয় না। কিছুক্ষণ আগেও ওয়েদারকাস্ট শুনেছি। এদিকের অবস্থা খুব খারাপ। অনেক ঝুঁকি নিয়ে এসেছি। আমার তিন হেলিকপ্টার ছাড়া অন্য কোনও আকাশযান এই এলাকায় আসেনি। প্রভুর বেদ কোথায়?' জবাব দিল না কেউ। 'বেশ, নিজেই খুঁজে নেব।' বিশাল গুহায় চোখ বুলিয়ে বিস্ফারিত হলো তার দু'চোখ। 'হ্যাঁ... এখানে সত্যিই আছে এই গুহা...'

'কথা শুনে মনে হচ্ছে সন্দেহ ছিল তোমার মনে!' বলল রানা।

'কৈলাস পর্বতে ব্যর্থ হওয়ার পর, হ্যাঁ, মনে দ্বিধা ছিল।'

'তা এলে কী মনে করে?'

আবারও হাসল বিলিয়নেয়ার। তার চোখ লাবনীর ওপর। 'এসেছি এই মেয়ের জন্যে। বা বলতে পারো মিস্টার রায়ের ভুলে।' তর্জনী তাক করে ইন্টারপোল এজেন্টকে দেখাল। 'সব বলে দিয়েছে তার সেল ফোন। আমার কোম্পানির লোক জেনে যায় তোমরা দিল্লি ছেড়ে কোথাও যাচ্ছ। তাতে কৌতূহলী হয়ে উঠি। আসলে কোথায় যাবে তোমরা? কাজেই আমার টেলিকম কোম্পানির মাধ্যমে ট্র্যাক করলাম অঙ্কুর রায়ের ফোন। জেনেও গেলাম পৌঁছে গেছ গৌরিকুণ্ডে। ওখানে কেন? তার মানে, ভাবছ এদিকেই কোথাও প্রাচীন গুহা পাবে। এরপর যখন দ্য কোয়েশ্চেনে নতুন তথ্য দিলাম, সব হয়ে গেল পানির মত সহজ। অবাক হলাম। অপমান লাগল। কেদারনাথের কথা আগে কেন ভাবিনি?'

'কপালের জোরে হাজির হলে এখানে,' বলল রানা।

'কপাল নয়, টেকনোলজির জোরে। নইলে পেতাম না এই গুহা।' দরজা দিয়ে আবারও এল ঝোড়ো হাওয়া ও তুষারকণা। ঘুরে দেখল অনুপম মঙ্গেলকার। উইঞ্চে করে নেমে এসেছে মাধুরী। টেনে আনা হলো চওড়া তাকে। নরেশ শর্মা ও চাঞ্চাল অধিকারী হার্নেস থেকে মহিলাকে ছাড়িয়ে নিল। 'যাক, মাধুরী পৌঁছে গেছে।'

'ভেরি গুড, এবার পার্টি শুরু হোক,' নিচু স্বরে বলল বিরক্ত রানা।

স্ত্রীর হয়ে কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল মঙ্গেলকার। প্রথমবারের মত তার চোখ পড়েছে রঞ্জন মিত্রের ওপর। এক যুবক পুরোহিতের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ। আনন্দ নিয়ে বলল বিলিয়নেয়ার, 'আপনি কি পশুপতি যোগী?'

'রঞ্জন মিত্র, আপনার চিরকালের সেবক,' গভীর ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ। মন্ত্র পড়তে লাগলেন গুনগুন করে। ছেলের আড়াল থেকে বেরিয়ে নাচতে নাচতে এলেন মঙ্গেলকারের দিকে। তাঁর দিকে অস্ত্র তাক করল জ্যাক রিচি এবং তার দলের লোক। কিন্তু হাতের ইশারায় তাদেরকে মানা করল বিলিয়নেয়ার। 'ও, তা হলে আপনিই শ্রী মঙ্গেলকার? কমপিউটার বিশেষজ্ঞ?'

'হ্যাঁ। আমিই।'

'ছিহ্!' লাঠির ওপর ভর দিলেন বৃদ্ধ। অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখলেন মোটা লোকটাকে। 'তুমি বড়ই খারাপ লোক!'

রানা-লাবনী খেয়াল করল, যোগীর কথার তীরে ভীষণ খোঁচা খেয়েছে ব্যবসায়ী। 'জী-না, আমিও আপনার মতই প্রভু শিবের বিশ্বস্ত ভৃত্য। তাঁর ইচ্ছেতেই সব কাজ করছি।'

'আর তুমি বলছ, এসব প্রভুর ইচ্ছে?' জানতে চাইলেন

যোগী। হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন পুরোহিতদের লাশ। 'প্রভুর কোনও অনুগত ভৃত্য কখনওই প্রভুর অন্য কোনও সেবককে খুন করে, এটা বলতে চাও?'

'প্রভুর সত্যিকারের সেবক ভাল করেই জানে, মৃত্যু কখনও খারাপ কিছু নয়,' জোর গলায় বলল মাধুরী মঙ্গেলকার। এইমাত্র নরেশ ও চাঞ্চালের মাঝে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছে স্বামীর পাশে। দামি শীতের বস্ত্র পরেও যেন শীত লাগছে তার। চেহারায় অস্বস্তি। একবারও মস্তবড় গুহার ভেতর চোখ বোলায়নি। 'বিশেষ করে প্রভুর ইচ্ছেয় যখন কলি যুগ শেষ করছি আমরা। ...এবার জরুরি কথায় আসা যাক, কোথায় রাখা হয়েছে প্রভুর বেদ?' বরফের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে লাবনীকে দেখল সে। 'ধরে নিতে পারি, এই মেয়ে সব জানে।'

'এখানেই কোথাও আছে, মাধুরী,' বলল মঙ্গেলকার।

'কোথাও আছে এটা কোনও কথা হলো? খুঁজে বের করতে হবে না? দেরি না করে খোঁজার নির্দেশ দাও।'

রঞ্জন মিত্রের দিকে ফিরল অনুপম মঙ্গেলকার। 'পবিত্র মানুষের সঙ্গে তর্কে যাব না। আপনি কি জানেন কোথায় আছে শিবের বেদ? যদি বলেন, ছেড়ে দেব, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন।'

'আর আমার বন্ধুরা?' জানতে চাইলেন যোগী। 'ওদেরকে ছেড়ে দেবেন?'

'দুঃখিত। তা সম্ভব হবে না।'

'ছিহ্!' নাক দিয়ে আওয়াজ তুললেন বৃদ্ধ। 'তুমি সত্যিই একদম পচে যাওয়া নরকের কীট!' হাতের ইশারায় মানা করে দিলেন তিনি। 'তোমার সঙ্গে শিবের কোনও সম্পর্ক নেই। নরকে যেতে পারো।' অস্ত্র পাত্তা না দিয়ে মার্সেনারিদের পাশ কাটিয়ে র‍্যাম্পের দিকে চললেন বৃদ্ধ। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন

ঙ্গেলকারের দিক থেকে।

-চোখে প্রশ্ন নিয়ে মনিবের দিকে তাকাল জ্যাক রিচি।

যোগীর অভিযোগ শুনে সত্যিই হতবাক হয়েছে অনুপম ঙ্গেলকার। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা নাড়ল। 'গুহা সার্চ করে খুন। এখানেই থাকবে। পেলেই নিয়ে আসবেন আমার াছে।'

'জিনিসটা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল জ্যাক রিচি।

'আটলান্টিয়ান লেখা অনুযায়ী, ওগুলো পাথরের ট্যাবলেট, াতে থাকবে সংস্কৃত বেদ। কোনও বাক্স বা সিন্দুকের ভেতর াছে।'

রানাদেরকে পাহারা দেয়ার জন্যে দু'জন মার্সেনারিকে রেখে হার ভেতর ছড়িয়ে পড়ল জ্যাক রিচি ও তার দলের লোক।

'কখনও খুঁজে পাবে না!' পেছন থেকে বলল লাবনী।

অধৈর্য হয়ে পায়চারি শুরু করেছে মাধুরী মঙ্গেলকার। তার ামী মুগ্ধ হয়ে দেখছে র‍্যাম্পের ওপর ভিমানা বা বিমান।

'মস্তবড় গুহা, যে-কোথাও থাকতে পারে,' বলল মাধুরী।

'পেয়ে গেছি,' র‍্যাম্পের পাশে সিন্দুকের সামনে থেকে বলল ্যাক রিচি।

'মর্, হারামজাদা!' বিড়বিড় করল লাবনী।

আরেক মার্সেনারির সাহায্য নিয়ে ভারী সিন্দুক নিয়ে এল চি। মঙ্গেলকারদের সামনে রেখে ডালা খুলল। 'এই জিনিসই া?'

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে মোটা ব্যবসায়ীর দু'হাত। ব সাবধানে তুলে নিল একটা ট্যাবলেট। পড়তে লাগল প্রাচীন ংস্কৃত বেদ। কয়েক সেকেণ্ড পর বড় করে দম নিল। 'হ্যাঁ, টাই। প্রভু শিবের বেদ! স্রষ্টার লিখিত বক্তব্য।' স্ত্রীর দিকে াকাল সে। এক শ' ওয়াটের বাতির মত আলো জ্বলছে চোখে।

'পেয়ে গেছি! এবার দুনিয়ার সব দুর্নীতি দূর করে শেষ করব কলি যুগ। আসবে নতুন যুগ। আর আমরাই হব ওটা সৃষ্টির স্রষ্টা।' সাবধানে র‍্যাকে ট্যাবলেট রেখে বন্ধ করল ডালা। 'চাঞ্চাল, নরেশ! ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা করো!'

মনিবদের সামনে হাজির হলো দুই বডিগার্ড। একই সময়ে ফিরল মার্সেনারিরা। দাড়িওয়ালা নরেশের পিঠের ব্যাগ থেকে বেরোল মজবুত প্লাস্টিকের নেটিং ও এক বাণ্ডিল হার্নেস স্ট্র্যাপ। ভালভাবে সিন্দুক মুড়িয়ে নিতে লাগল চাঞ্চাল এবং নরশে মিলে। উইঞ্চে করে তুলে নেয়া হবে জিনিসটা।

'এদের ব্যাপারে কী ভাবছ?' হাত তুলে বন্দিদের দেখিয়ে অধৈর্য সুরে বলল মাধুরী, 'আমার ধারণা, এরই মধ্যে বহু বছর বেঁচে নিয়েছে এরা।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' সায় দিল অনুপম মঙ্গেলকার।

'তা হলে দেরি কীসের, মেরে ফেলো!' গরম চোখে জ্যাক রিচিকে দেখল ফর্সা ডাইনী। 'কাজ শেষ করুন!'

মাথা দোলাল রিচি। এবার নির্দেশ দেবে। কিন্তু এমন সময়ে রক্তহিম ভয়ঙ্কর এক চিৎকার ছেড়ে অনুপম মঙ্গেলকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল প্রধান পুরোহিত নারায়ণ মিত্র।

এমপিফাইভকে ঘুরিয়েই ওটার বাঁট দিয়ে যুবক পুরোহিতের মুখে মারাত্মক গুঁতো দিল জ্যাক রিচি। র‍্যাম্পের পায়ের কাছে ছিটকে পড়ল বেচারা। তার বুকে কষে লাথি মারল আরেক মার্সেনারি। পরক্ষণে অস্ত্র তাক করল পতিত শত্রুর মাথায়।

কিন্তু তখনই ছোরা তুলে নিয়েই ওই মার্সেনারির গলায় ফলা গেঁথে দিলেন বৃদ্ধ যোগী রঞ্জন মিত্র।

অচিন্তনীয়, অভূতপূর্ব হামলায় ঝট্ করে ঘুরেছে মার্সেনারিরা, চোখের সামনে দেখল পড়ন্ত সঙ্গীর গলা থেকে খোলা কলের পানির মত বেরোচ্ছে রক্ত। ঘুরেই বৃদ্ধ যোগীর দিকে গুলি পাঠাল

জ্যাক রিচি। একরাশ গুলি ছিঁড়েখুঁড়ে দিল রঞ্জন মিত্রের বুক ও পেট। ধুপ করে মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি।

ওই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে নড়ল রানা, সবচেয়ে কাছের মার্সেনারির অস্ত্র ধরে ওটার মাযল ঘুরিয়ে দিল আরেক দিকে। লোকটার তর্জনীর ওপর চেপে বসল ওর তর্জনী। কাজে এল না বডি আর্মার, পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি খেল একটু দূরের মার্সেনারি। বুকের মাংস খুবলে তুলেছে কয়েকটা গুলি। ঘুরেই আরও দুই মার্সেনারির ওপর পড়ল লোকটা। পরক্ষণে মেঝেতে ধরাশায়ী হলো তারা তিনজন।

অস্ত্রধারী মার্সেনারির চোয়ালে শক্তিশালী আপারকাট বসাল রানা। শুনল মট্ শব্দে তিনটে দাঁত ভাঙল লোকটার। ওর হাত থেকে এমপিফাইভকে কেড়ে নিতে চাইল রানা। দাঁত ভাঙা ও নার্ভ ছেঁড়া অবস্থাতেও অস্ত্র ছাড়তে রাজি না লোকটা। টানাহেঁচড়া চলছে, এমনি সময় পাশ থেকে রানার স্টারনামে কনুই চালাল আরেক মার্সেনারি। তীব্র ব্যথায় পিছিয়ে অঙ্কুর রায়ের আহত পায়ে হোঁচট খেল রানা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করে উঠলেন ইন্টারপোল এজেন্ট। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল রানা।

মার্সেনারিরা অস্ত্র তাক করল ওর বুক-পেট লক্ষ্য করে। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল। কিন্তু গুলি করার আগেই ওর বুকে বুট চাপিয়ে নিজের অস্ত্রের মাযল রানার মুখে ঠেকাল জ্যাক রিচি। বেসুরো, কর্কশ স্বরে বলল, 'খবরদার! নড়বে না!'

প্রায় সবার চোখ এখন জ্যাক রিচি ও রানার ওপর।

ওদিকে খেয়াল নেই লাবনীর। তুমুল গোলমালের ভেতর সুযোগ পেয়ে সরে গেছে। দৌড়ে পেরোল র‍্যাম্প। ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কয়েকজন মার্সেনারি। অস্ত্র তাক করেই গুলি পাঠাল, কিন্তু মাঝখানে পাহাড়ের মত বাধা হয়ে

আছে পাথরের র‍্যাম্প। শুধু পাথরের কিছু কুচি লাগল ওর দেহে।

'খুন করো ওকে! খুন করো!' চিলকণ্ঠে চিৎকার জুড়ল মাধুরী মঙ্গেলকার। র‍্যাম্পের দিকে দৌড়ে গেল মার্সেনারিরা। কয়েকজন গুলি পাঠাল সরু প্যাসেজে। কিন্তু ততক্ষণে শিবের গুহার গভীরে হারিয়ে গেছে লাবনী।

ছাব্বিশ

'যাও, ওকে ধরে আনো!' নির্দেশ দিল জ্যাক রিচি।

বাঙালি প্রত্নতাত্ত্বিকের পিছনে ছুট দিল দুই মার্সেনারি।

ঘুরে স্বামীকে বলল মাধুরী মঙ্গেলকার, 'এক্ষুণি হেলিকপ্টার আসতে বলো!'

'বয়ে নেয়ার জন্যে এখনও তৈরি নয় সিন্দুক,' বলল অনুপম মঙ্গেলকার। গোলাগুলি শুরু হলেই মনিবদেরকে আগলে রাখতে গিয়ে সিন্দুকের কাছ থেকে সরে গেছে নরেশ ও চাঞ্চাল।

'সিন্দুকের কথা বলছি না! আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই!'

'ওই মেয়ে কোথাও পালাতে পারবে না,' আশ্বাস দিল জ্যাক রিচি।

'তাই বলে ঝুঁকি নেব না,' বলল মাধুরী, 'একবার কপ্টারে আমি উঠলে পরেও সিন্দুক তুলতে পারবে ওরা।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সে। সম্রাজ্ঞীর মত হাতের ইশারা করল, যাতে

পেছনে যায় দুই বডিগার্ড।

মালিক পক্ষের দু'জনের ভেতর দুই নীতি দেখে অনুপম মঙ্গেলকারের নির্দেশের জন্যেই অপেক্ষা করল নরেশ ও চাঞ্চাল। 'চাঞ্চাল, তুমি বরং ওর সঙ্গে যাও,' হাল ছেড়ে দেয়া সুরে বলল ব্যবসায়ী। 'নরেশ, তুমি যাও ডক্টর আলমের পেছনে। রিচি, বেদ সরিয়ে নেয়ার জন্যে যা করার, সেসব করতে হবে। আমি চাই সিন্দুক বাইরের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হোক।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ বের করে লাবনীকে খুঁজতে রওনা হলো দানব। মাধুরী মঙ্গেলকারের পেছনে চলল চাঞ্চাল আধিকারী। এদিকে নিজের দুই লোককে রিচি বলল, ঠিকভাবে বেঁধে বাইরে নিয়ে যেতে হবে সিন্দুক।

বন্দিদের ঘিরে রেখেছে কয়েকজন মার্সেনারি। বুক-পেটের বুলেটের ক্ষত দু'হাতে চেপে রেখেছেন রঞ্জন মিত্র। লাল রক্তে ভিজে গেছে তাঁর ছেঁড়াখোঁড়া কমলা আঙরাখা। মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে এখনও ঘোরের ভেতর আছে শীর্ষেন্দু। তবে টলতে টলতে উঠে বসল। তখনই ওর চোখে পড়ল আহত বাবার ওপর। কেঁদে ফেলে স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলল, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল বাবার দিকে। কিন্তু তার বুক-পেটে লাথি দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল দুই মার্সেনারি।

'ওই আহত বুড়ো মানুষটা ওর বাবা,' প্রতিবাদের সুরে বলল রানা। রাগে ফুলে গেছে চোয়ালের পেশি।

কথাটা শুনে কোনও আবেগ কাজ করল না মঙ্গেলকারের মনে। একবার নীরবে মাথা দোলাল জ্যাক রিচি, চোখে সামান্য অপরাধের ছাপ। শীর্ষেন্দু থেকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল তার অনুগত মার্সেনারিরা। রানার বুক থেকে বুট সরাল মার্সেনারি দলনেতা। অবশ্য তাক করে রেখেছে অস্ত্রের মাযল।

প্রায় ক্রল করে বাবার কাছে গেল নারায়ণ মিত্র। দরদর করে

চোখ থেকে পড়ছে অশ্রু। ফুঁপিয়ে উঠল, 'বাবা!' বৃদ্ধ যোগীর বুকে হাত রেখে ঠেকাতে চাইল রক্তের ক্ষরণ।

ছেলের স্পর্শে মৃদু গুঙিয়ে উঠলেন রঞ্জন মিত্র। ফিসফিস করে বললেন, 'নারায়ণ?' ঠোঁটের কোণে রক্তের বুদ্বুদ।

বাবার হাত আঁকড়ে ধরল যুবক। 'আমি আছি, বাবা। আমি আছি।'

'বাবা, নারায়ণ... বাপ আমার... কী করে ফেললাম? নিয়ে নিলাম কারও জীবন... কী জবাব দেব প্রভুর কাছে?'

'প্রভু শিবও তো যোদ্ধা,' কান্না চেপে বলল নারায়ণ, 'অনেক যুদ্ধে দৈত্য, পিশাচ, রাক্ষস আর খারাপ মানুষকে খুন করেছেন। কাউকে রক্ষা করতে গিয়ে খুন করা বা লড়াই করা দোষের নয়, বাবা।' গলা ভেঙে গেল ওর। 'যাকে ভালবাসা যায়, তাকে রক্ষা করতে হয়...'

চোখ বুজলেন বৃদ্ধ। চোখের কোণে অশ্রু। 'আমি যে তোর মাকে বাঁচাতে পারিনি, রে বাপ! এবার ওকে খুঁজে বের করব। মাফ চাইব ওর কাছে। ওকে বলব, আমি মাফ... যদি মাফ করে...' দম ফুরিয়ে গেছে মানুষটার।

অঝোরে কাঁদছে কঠোর মনের নারায়ণ মিত্র, ধরে রেখেছে বাবার শীর্ণ হাত। 'উনি মাফ করে দেবেন, বাবা। দেবেন। আমি জানি। বাবা... আপনি কোনও দোষ করেননি। শপথ করে বলতে পারি... বাবা... আপনি...'

'ভাল থাকিস, বাপ... আমার...' ছোট্ট কাশি দিলেন বৃদ্ধ যোগী। ভেসে গেল চিবুক রক্তে। একবার সামান্য ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল ওর চোখদুটো।

চুপ করে দেখছে রানা। পলকের জন্যে ওর মনে হলো, রঞ্জন মিত্রের বুক থেকে নরম এক নীল আলো বেরিয়ে মিলিয়ে গেল কোথায় যেন। গলার কাছে শক্ত কী যেন টের পেল ও, কষ্ট হলো

ঢোক গিলতে।

আস্তে করে বাবার হাত নামিয়ে রাখল নারায়ণ। অপরিসীম দুঃখেও চোখে প্রচণ্ড রাগ। সরাসরি দেখল অনুপম মঙ্গেলকারকে। তারপর তাকাল রিচির দিকে। কোনও বিকার নেই ব্যবসায়ীর। মার্সেনারি দলনেতাকে বিব্রত মনে হলো, যেন বুঝতে পেরেছে কী ধরনের অপরাধ করেছে।

বাইরে হার্নেসে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে মাধুরী মঙ্গেলকারকে। উইঞ্চে করে তুলে নেবে হেলিকপ্টারে। আলাদা স্ট্র্যাপে বেঁধে দেয়া হচ্ছে সিন্দুক।

'অনুপম!' রোটরের শব্দের ওপর দিয়ে চিৎকার করল শকুনী, 'কীসের জন্যে অপেক্ষা করছ? খুন করো ওদেরকে!'

জ্যাক রিচির দিকে মৃদু মাথা দোলাল অনুপম মঙ্গেলকার। 'আমার স্ত্রীর কথা মত কাজ শেষ করুন।'

'তোমরা অস্ত্র তৈরি রাখো!' মার্সেনারিদের নির্দেশ দিল জ্যাক রিচি। সতর্ক হয়েছে তার অনুগতরা। রানা, অঙ্কুর রায় ও শীর্ষেন্দুর দিকে তাক করা হলো এমপিফাইভকে।

একই সময়ে গুহার গভীর থেকে এল সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠের মত তীক্ষ্ণ কিন্তু মিষ্টি এক নারীকণ্ঠ: 'রানা! সাবধান! পাথর এল!'

জোরালো ভুম্ আওয়াজ শুনল রানা। খটাং-খটাং শব্দের পর কী যেন হচ্ছে! প্রচণ্ড গতিতে কীসব যেন আসছে, গতি প্রচণ্ড।

কী হয়েছে বুঝে গেছে রানা। শীর্ষেন্দুর বাহু ধরেই বলল, 'মেঝেতে পড়ে থাকো!' অন্যহাতে চেপে রাখল অঙ্কুর রায়কে।

র‍্যাম্পের পাশে শুয়ে আছে ওরা, এক সেকেণ্ড পর তুমুল ঝড়ের মত এল ভয়ঙ্কর প্রস্তর-বৃষ্টি!

মস্ত গুহার গভীরে ছোটার সময় লাবনী বুঝে গেছে, পেছনে

নানান জিনিস এলোমেলো করে এলেও, শেষে ঠিকই ওর কাছে পৌঁছুবে হামলাকারীরা। চাইলেও এড়াতে পারবে না তাদেরকে। কাজেই ওর উচিত উল্টে হামলা করা।

মাত্র এসেছে মনে চিন্তাটা, খেয়াল করল ও আছে বিশাল এক চাকার পাশে— সর্বতোভদ্র বা পাথর ছোঁড়ার মেশিন। প্রাচীন আর সব যুদ্ধাস্ত্রের মতই এটাও ব্যবহারের জন্যে তৈরি।

মেকানিযম রিলিয করার আগে চিৎকার করল লাবনী, 'রানা! সাবধান! পাথর এল!'

নিচে ঘুরতে শুরু করে ভুম্, ক্রিঁচ-ক্রিঁচ শব্দ তুলল ভারী চাকা, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে খটাং-খটাং ঘুরছে চেইন। ঝোড়ো গতি তুলছে সর্বতোভদ্রের চাকা, সঙ্গে ঘুরছে শত শত পাথর ভরা চামড়ার থলি! গতি আরও বাড়লে যন্ত্রের স্লট থেকে সামনে বাড়ল ধাতুর পুরু পাত— ট্রিগার। সাপোর্ট ফ্রেমের ওপরে আরেকটা। সর্বতোভদ্রের চাকা পূর্ণগতি পেতেই ঠং শব্দে আটকে গেল দুই ট্রিগার। ছেড়ে দিল গুলতির ফিতের মত চেইন, কয়েক ডিগ্রি খাড়া হলো চাকা, চামড়ার থলি থেকে গুহার সামনে ছিটকে গেল নরকরোটির সমান সব পাথর।

র‍্যাম্পে বিমানের সামান্য ওপর দিয়ে গিয়ে দরজার দিকে শুরু হলো ভয়ঙ্কর প্রস্তর-বর্ষণ!

ওপর থেকে মাথার সমান সব পাথর নামছে দেখে অনুপম মঙ্গেলকারকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়েছে জ্যাক রিচি। ব্যবসায়ী যেখানে ছিল, ওখানে বিস্ফোরিত হলো বড় এক পাথর।

অন্য দুই মার্সেনারির কপাল মন্দ। একজনের মুখে লাগল একটা পাথর, খটাক্ শব্দে চুরমার হলো মুখের সব হাড়। অন্য মার্সেনারির লাগল বুকে। বুলেটপ্রুফ বডি আর্মার কোনও কাজেই এল না। ভীষণ আঘাতে চুরচুর হলো পাঁজরের সব হাড়, ফলে

ফুটো হলো হৃৎপিণ্ড। অন্যরা হন্যে হলো কাভার পেতে।

উইঞ্চ অপারেটরের দিকে ঘাড় কাত করে কর্কশ চিৎকার জুড়েছে মাধুরী মঙ্গেলকর। দরজার এপাশের কিনারায় পড়েই নানান দিকে ছিটকে যাচ্ছে দশ-পনেরো কেজির সব পাথর। সেসবের কয়েকটাকে মেঝেতে ড্রপ খেয়ে উঠতে দেখে মহিলা মনিবের কথা ভুলে নিজ জান বাঁচাতে একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল চাঞ্চাল আধিকারী। একটা পাথর জোরালো খটাক্ আওয়াজ তুলে উল্টো দিকে ভাঙল সিন্দুক বহনকারী এক মার্সেনারির হাঁটু। তাল সামলাতে না পেরে কিনারা থেকে অনেক নিচে গিয়ে পড়ল সে। ভারতের তৈরি হেলিকপ্টার ধ্রুব, তাড়াহুড়ো করে উঠে যাওয়ার সময় কিনারা থেকে টেনে নিল মাধুরী মঙ্গেলকারকে।

কিনারার কাছে পড়ে আছে শিবের সিন্দুক, আশপাশ দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে মস্ত সব পাথর।

গুহার গভীরে আঙুল তাক করল রানা। 'ওদিকে চলো!'

টান দিয়ে অঙ্কুর রায়কে কোলে তুলে নিয়েছে ও, দেহ পিছলে র‍্যাম্পের নিচু অংশ পেরিয়ে ছুটল কালী দেবীর প্যাসেজের দিকে।

ওর পেছনে না এসে দৌড়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নারায়ণ মিত্র।

'লাবনীকে খুঁজে বের করতে হবে!' অঙ্কুর রায়কে বলল রানা। ছুটে চলেছে সরু পথে। সামনের প্রথম লণ্ঠনের ওদিকে গাদা করে রাখা কালো রকেট। আপাতত পিছু নেয়নি কেউ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সতর্ক হবে মার্সেনারিরা, তখন ভুল করবে না ধাওয়া করতে। এখন আর কেউ নেই যে নতুন করে রিলোড করবে সর্বতোভদ্র।

সাধের যুদ্ধাস্ত্র ফেলে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে লাবনী। উপায়ই বা কী, পাথর মারার মেশিন ক্ষতি করেনি পেছনের তিন শত্রুর। গুহার আরও গভীরে লুকিয়ে পড়তে হবে ওকে।

খোলা দরজা পেরিয়ে পুরুষ চিতার গতি তুলে ছুটছে শীর্ষেন্দু। পেছন থেকে গুলি করল এক মার্সেনারি। কিন্তু আগেই সরে গেছে প্রধান পুরোহিত। বিধ্বস্ত সিঁড়ির ওপরের উঠানে দেখল সিন্দুক, কিন্তু আপাতত কিছুই করার নেই। ওটা পাশ কাটিয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

কানের পাশে শুনল হাওয়ার শোঁ-শোঁ আওয়াজ। পেরিয়ে যাচ্ছে দুই কিনারার মাঝের শূন্যতা। উড়ে চলেছে ওপারের গুহামুখের দিকে। সত্তর ফুট নিচে জমিন।

শীর্ষেন্দুর ডান পা নামল কিনারায়, এতই জোরে লাফ দিয়েছে যে, থামতে পারল না। একটু দূরের দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেয়ে পা পিছলে পড়ল তুষার ভরা মেঝেতে। লাফিয়ে উঠেই আবার দৌড় দিল খিলানযুক্ত এক দরজার দিকে।

উপত্যকা জুড়ে গর্জন তুলছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড কপ্টারের ইঞ্জিন। এক পাশ থেকে তেড়ে এল উড়ন্ত যন্ত্রদানব।

ডাইভ দিয়ে খিলানযুক্ত দরজা পেরোল শীর্ষেন্দু। মেশিন গানের গুলিতে চুরমার হলো পেছনের খোদাই করা প্রাচীন সব মূর্তি। থামল বুলেট-বর্ষণ। কিন্তু রয়ে গেল রোটরের ডুব-ডুব আওয়াজ। আবারও প্রধান পুরোহিত বেরোবে, সে আশায় অপেক্ষা করছে গানশিপের গানার। তার ধারণা, ওই ঘর দিয়ে দ্বিতীয় কোনও ঘরে যেতে পারবে না লোকটা।

সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অন্ধকারে দৌড়ে চলেছে শীর্ষেন্দু। চোখের সামনে দেখছে বাবার যন্ত্রণায় কুঁচকে যাওয়া মুখ। গনগনে রাগে গরম হয়ে উঠছে তার মগজ।

প্রতিশোধ!

প্রতিশোধ নিতেই হবে!

প্রভু শিবের গুহার প্রহরীরা যে যার কাজ করবে। ওদের জান থাকতে প্রভুর বেদ চুরি করতে পারবে না কেউ।

থেমে গেছে পাথর-বর্ষণের শব্দ। মস্ত এক মূর্তির আড়াল থেকে উঁকি দিল অনুপম মঙ্গেলকার। তাকে ওখানেই ঠুসে দিয়েছিল জ্যাক রিচি। ব্যস্ত হয়ে সিধে করে নিল চশমা। সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেছে তিন বন্দি। পরিষ্কার দেখল, বাইরে পড়ে আছে শিবের সিন্দুক। আবারও ফিরেছে ধ্রুব হেলিকপ্টার। ওটার খালি হার্নেস দুলছে জীবন্ত সাপের মত।

'ইয়ে... মনে হয়... এবার হেলিকপ্টারে আমার ওঠাই উচিত,' জ্যাক রিচিকে বলল অনুপম মঙ্গেলকার, 'কিন্তু আমি উঠে গেলেই দেরি না করে ওপরে পাঠিয়ে দেবেন সিন্দুক।'

'আপনার যা ইচ্ছে,' বলল রিচি। রেগে গেছে নিয়োগকর্তার আতঙ্কিত আচরণে। 'সিন্দুক তুলে দেয়ার পর আমরাও কি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব?'

'হ্যাঁ,' পলায়নরত ইঁদুরের মত দরজার দিকে ছুটল অনুপম মঙ্গেলকার।

পেছন পেছন হেঁটে জানতে চাইল রিচি, 'লাবনী আলম আর মাসুদ রানার কী হবে?'

ওই দুই নাম শুনে রেগে গেল বিলিয়নেয়ার। 'ওদের খুঁজে বের করে খুন করবেন!' নিজেকে শান্ত করতে চাইল। কয়েক সেকেণ্ড পর অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলল, 'হেলিকপ্টারে সিন্দুক তুলে দেয়ার পরেও যদি দেখা যায় বেঁচে আছে ওরা, সেক্ষেত্রে রকেট মেরে পাথর ধসিয়ে গুহার দরজা বুজিয়ে দেব আমরা।' সিন্দুক আর চাঞ্চাল আধিকারীর পাশে পৌঁছে গেল সে। মার্শাল

আর্ট বিশেষজ্ঞকে বলল, 'ভেতরে যাও, আমি চাই ডক্টর আলম আর মাসুদ রানাকে খুন করবে তুমি।'

মৃদু মাথা দুলিয়ে হাসল চাঞ্চাল আধিকারী। 'খুবই খুশি হব কাজটা করতে পারলে।' এক দৌড়ে গুহার ভেতর ঢুকল সে।

দলের মার্সেনারিদের হাতের ইশারা করল জ্যাক রিচি। তারাও যোগ দেবে মানুষ শিকারে। গুহার ভেতর সবাই ছড়িয়ে পড়ছে দেখে অনুপম মঙ্গেলকারকে স্ট্র্যাপ দিয়ে হার্নেসে আটকে দেয়ার কাজে নামল মার্সেনারি নেতা।

অঙ্কুর রায়কে সাহায্য করছে রানা, যতটা পারা যায় দ্রুত গুহার পেছন দিকে চলেছে ওরা। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে গুঙিয়ে উঠছেন ইণ্টারপোল এজেণ্ট। আরও ক' পা যাওয়ার পর বললেন, 'আর পারছি না, রেখে যাও। খুঁজে বের করো লাবনীকে।'

'একদল হায়েনা শেষ করবে, জেনেবুঝেও তোমাকে ফেলে যাব?' বলল রানা, 'তা হয় না, আমরা একবার...'

'আগে আমার কথা শোনো, রানা!' অনুরোধ করলেন অঙ্কুর রায়, 'জেদ কোরো না, প্রতি পদে দেরি করিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা বিষয় জানো না, ওদিকটা দেখো।' হাত তুলে বেলুনসহ প্রাসাদের গণ্ডোলা দেখালেন। 'ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারব।'

'কেউ খুঁজে বের করলে বাঁচার সুযোগই পাবে না,' প্রতিবাদ করল রানা।

'লক্ষ্মী ভাই, দেরি কোরো না,' ব্যথা সহ্য করেও হাসলেন অঙ্কুর রায়, 'বিপদ এড়াতে পুলিশ থেকে ট্রেইনিং দিয়েছে। চলো, পৌঁছে দাও ওখানে।'

ধরে ধরে মানুষটাকে প্রাসাদের কাছে নিল রানা, মন তিক্ত।

র‍্যাক থেকে একটা তলোয়ার নিয়ে গণ্ডোলার কোণে শুয়ে পড়লেন অঙ্কুর রায়। 'ঠিক আছে, রানা, এবার রওনা হও।'

'তোমার কাছ থেকে ওদেরকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করব,' বলল রানা। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্ত শুনল হেলিকপ্টারের আওয়াজ, তারপর ওর কানে এল কাছেই পায়ের শব্দ। বেলুন থেকে সরে থামল ও এক মূর্তির আড়ালে। কোনা থেকে উঁকি দিয়ে দেখল এদিকেই আসছে চার মার্সেনারি। অঙ্কুর রায়ের কাছ থেকে সরাতে হবে তাদেরকে। সাহসী বন্ধু বা খাঁটি মানুষের মতই অন্যের ভালর জন্যে ভেবেছে ইণ্টারপোল এজেণ্ট, কিন্তু নিজে মাত্র একটা তলোয়ার হাতে কিছুই করতে পারবে না আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে।

গুহার আরও গভীরে চোখ বোলাল রানা। প্রাচীন লণ্ঠনের কাঁপা হলদে-লাল আলোয় দেখল গুহায় থরে-থরে রাখা সম্পদ। ওদিকে কী আছে আগেই জেনেছে। সরু রাস্তার পর চওড়া হয়েছে প্যাসেজ।

বেলুনের কাছে পৌঁছে গেছে মার্সেনারিরা। রত্নখচিত একটা বজ্র তুলে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে ছুঁড়ল রানা। ওটা জোরালো খটাং শব্দে পড়তেই এদিকে মনোযোগ দিল মার্সেনারিরা।

যা ভেবেছে রানা, তাই হলো, ছুটে আসছে তারা।

কিন্তু আসছে তিনজন। অন্যজন দ্বিধা কাটিয়ে এমপিফাইভকে উঁচিয়ে সাবধানে চলল গণ্ডোলার দিকে।

নীরবে গাল বকল রানা। তিন মার্সেনারিকে গুলির সুযোগ না দিয়ে, সামনের কোণ ঘুরে চলল গুহার গভীরে।

কিন্তু গুহার পেছনে গর্জে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র।

নরেশ শর্মা আর মার্সেনারিরা বাগে পেয়ে গেছে লাবনীকে!

কাঁধের একটু ওপরে খোদাই করা কাঠের নকশায় বুলেট

বিঁধতেই ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠল লাবনী। চুলে লেগেছে একরাশ কাঠের কুচি। এক লাফে মস্ত এক গরুর মূর্তির পেছনে সরল। নিরেট পাথরের মূর্তি আড়াল দিয়েছে ওকে। থেমে গেল গুলি। কিন্তু এই নিরাপত্তার বোধ মাত্র ক'সেকেণ্ডের জন্যে। অন্য দিক থেকে এসে ওকে ফাঁদে ফেলবে লোকগুলো।

সামনেই প্রাচীর বা কেল্লা ভাঙার চোখা ধাতুর দণ্ড ভরা বুক নিয়ে উদ্ঘাতিম বা রোলার। পালাতে চাইলে বেরোতে পারবে ওটার দু'দিক দিয়ে। যন্ত্রটার একদিকের প্যাসেজ সরু, কারণ নিচে নেমে এসেছে ছাতে খোদাই করা কালো কাঠের কারুকাজ। অন্যদিকের প্যাসেজ বেশ চওড়া। ওদিক দিয়ে পৌঁছুতে পারবে আরও বড় এক পাথরের ষাঁড়ের কাছে। ওই ষাঁড় দেয়ালের মত বসে আছে পা ভাঁজ করে। জান হাতে নিয়ে ওদিকে ছুটল লাবনী। একবার ওখানে গিয়ে ঠিক করবে কোন্ দিকে...

কিন্তু ষাঁড় পেরিয়েই প্যাসেজ থেমেছে আরেক উদ্ঘাতিমে। এদিকেও নেমেছে কারুকাজ করা নিচু ছাত। খোদাই অংশে পা রেখে উঠতে পারবে লাবনী, কিন্তু পুরোপুরি ওঠার আগেই ধরে ফেলবে লোকগুলো। আসলে সহজ টার্গেট হয়ে গেছে ও।

ভীষণ ভয় লাগল লাবনীর, ঘুরেই ছুটবে সরু প্যাসেজে। কিন্তু ওদিকেও বেরোবার বা লুকাবার জায়গা নেই। বড় একটা লিভার আছে উদ্ঘাতিমের, ওটা টানলেই হাজার হাজার বছর পর চালু হবে মেকানিযম...

সবচেয়ে আগে বাঁকের এদিকে এল নরেশ শর্মা। কাটাছেঁড়া ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। ধীর পায়ে আসছে লাবনীকে ধরতে। ওই একই সময়ে আরেক কোণ ঘুরল দুই মার্সেনারি। উদ্ঘাতিম ঘুরে এগোবার পথ আটকে দিয়েছে তারা।

ফাঁদে পড়েছে লাবনী।

কিন্তু...

খপ্ করে লিভার ধরে প্রাণপণে টান দিল লাবনী।

ব্যাঙের মত কর্কশ ঘ্যাক-ঘ্যাক শব্দ তুলল লিভার। বহু কাল আটকে ছিল, ঝটকা খেয়ে কাজ শুরু করল ওটা। ভয়ঙ্কর ওজন ছেড়ে দেয়ায় বনবন করে ঘুরল চেইন।

বিশাল পাইথনের মত গা মুচড়ে রওনা হলো উদ্ঘাতিম। যেন মাতাল কোনও দোতলা স্টেটবাস। ভেতরের ছোট সব চাকা গড়িয়ে নিল রোলার। পাথরের ভয়ঙ্কর ওজনের যন্ত্রটাকে থামিয়ে রাখা পুরু ধাতব দণ্ড থেকে ছিটকে বেরোল প্রচুর ধুলো। থমকে গিয়ে দু'হাতে চোখ আড়াল করল নরেশ শর্মা।

বরফের মূর্তি হয়ে গেছে দুই মার্সেনারি। বাসের চেয়েও বড় নিরোধ অস্ত্র নড়ছে দেখে বুঝতে চাইল এবার কী ঘটবে। আসলে দেরি করে ফেলেছে, লোহার একটা দণ্ড তাদের একজনের বাহুর ওপর নেমে গুঁড়ো করে দিল হাড়। বিশ্রী খটাৎ শব্দ তুলল ভাঙা কবজি। আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়েই পিছাতে চাইল অন্যজন। কিন্তু তারা আটকা পড়েছে উদ্ঘাতিম ও ষাঁড়ের মাঝের জায়গায়। ওই সামান্য দূরত্ব পেরোতে সময় নিল না রোলার।

মাত্র দু' সেকেণ্ডে থামল ওদের চিৎকার, সে জায়গায় শোনা গেল ভেজা কাপড় আছড়ে ফেলার ধপাস্-ধপাস্ আওয়াজ। এগিয়ে চলল রোলার, ওটার গা আর এদিকের মেঝেতে লাল সব ছোপ। গুড়-গুড় শব্দে গড়িয়ে 'ধুম!' করে ষাঁড়ের মূর্তিতে বাড়ি দিল উদ্ঘাতিম। ধাতুর চোখা দণ্ড খুবলে তুলল পাথরের গা। ভাঙল ষাঁড়ের মস্ত এক শিং, ভেঙে পড়ল নিচু ছাতের কারুকাজ।

লাবনী দেখল, সামনেই খুলে গেছে সরু পথ, ওপাশে জ্বলন্ত তেলের নালা। ওই পথে ছুট দিল ও। এবড়োখেবড়ো কাঠের টুকরো খামচে ধরছে কোট। পেছনে বোবার বিকট হুঙ্কার।

আসছে দানব নরেশ শর্মা!

দু'হাতে কাঠের কারুকাজ ছিঁড়ে চওড়া করছে নিজের পথ।

দু'হাতে তলোয়ারের বাঁট ধরে অপেক্ষা করছেন অঙ্কুর রায়। কে যেন আসছে এদিকে। একটু দূরের লণ্ঠনের আভায় চকচক করছে গণ্ডোলা, প্রাসাদের দরজা। পাশ কাটিয়ে গেল একটা ছায়া। দূরে সরে যেতে শুরু করেছে পদশব্দ...

গতি কমল হাঁটার। থেমে গেল।

ফিরছে লোকটা।

আবারও দেখা দিল ছায়া। শ্বাস আটকে ফেলেছেন অঙ্কুর রায়। সুস্থ পায়ে ভর করে উঠে বসলেন। খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মার্সেনারি। ছোট্ট, নকল প্রাসাদ হতে পারে যে-কারও লুকিয়ে পড়ার আদর্শ জায়গা।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল এমপিফাইভকে-র নল। ছোট অস্ত্রটার দ্বিতীয় গ্রিপ মাযলের নিচে, ওটা শক্ত করে ধরেছে কারও কালো গ্লাভ্‌স্ পরা বামহাত। ভেতরের সবকিছুর দিকে ঘুরছে নল। এবার সার্চ করে দেখবে মার্সেনারি...

লোকটার হাতের পিঠে ঘ্যাচ করে তলোয়ারের ডগা গাঁথলেন অঙ্কুর রায়। ওটা ত্বক ও মাংস ভেদ করে গিয়ে ঠেকল হাড়ে। মাংসের ভেতর নব্বুই ডিগ্রি ডগা ঘুরিয়ে দেয়ায় খট্ করে আলাদা হলো সব হাড়, ফিনকি দিয়ে বেরোল রক্ত। হায়েনার মত বিশ্রী আর্তনাদ ছাড়ল মার্সেনারি।

কিন্তু ব্যথা পাত্তা না দিয়ে এক লাফে ঢুকল খুদে প্রাসাদের ভেতর, ডানহাতে এখনও এমপিফাইভকে। অস্ত্রের ট্রিগার টিপে দেয়ার আগেই তলোয়ারের বাড়িতে ওটাকে মেঝেতে ফেলতে চাইলেন ব্যস্ত অঙ্কুর।

ঠোকাঠুকি হলো প্রাচীন অস্ত্র ও আধুনিক অস্ত্রের। একই সময়ে ট্রিগার টিপল মার্সেনারি। প্রথম বুলেট একপাশ থেকে

অঙ্কুর রায়ের বুক স্পর্শ করে বিঁধল সোনার দেয়ালে। পরের সব বুলেট গাঁথল দেয়ালের কারুকাজ করা কাঠে। শুকনো কাঠ ও তেল ভেজা কাপড়ে ভরা মাঝের বড় লণ্ঠনের কাছে আগুন ঝরা আগ্নেয়াস্ত্রের মাযল।

খেপা সিংহের মত মার্সেনারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অঙ্কুর রায়। হুড়মুড় করে এক কোণে পড়ল দু'জন। মার্সেনারির হাত থেকে ছুটে গেছে অস্ত্র। হ্যাঁচকা টানে কমব্যাট ছোরা বের করল, এবার হাত পিছিয়ে নিয়েই ফুটো করতে চাইল আহত লোকটার বুক...

কিন্তু আগেই আঘাত হানলেন অঙ্কুর রায়। আর্মার ভেদ করে পড়পড় করে ঢুকল তলোয়ারের ডগা মার্সেনারির পেটে। গড়গড়া করার মত আওয়াজ তুলে টলে পড়ে গেল লোকটা অঙ্কুর রায়েরই ওপর। বিক্ষত পায়ের ভয়ঙ্কর ব্যথায় প্রায় অচেতন হয়ে গেলেন তিনি।

এদিকে ছোট সব প্যাকেট করা গান পাউডার আগুন জ্বেলে দিয়েছে লণ্ঠনে। দাউ-দাউ জ্বলতে লাগল শিখা। কাপড়ের নিচে গোল করে কাটা অংশ দিয়ে ঢুকতে লাগল গরম বাতাস। কড়-মড় আওয়াজে ফুলে উঠতে লাগল হাজার বছর আগের মস্তবড় বেলুন!

বিশাল দুই ধাতব দেবতার মাঝখানে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা, পেছনে নানান দিকে ঠুং-ঠাং শব্দে লাগল একরাশ গুলি। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র ও অঢেল ধনরত্নের ভেতর ভুল বাঁক নিয়ে এক কানাগলিতে হাজির হয়েছে ও। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর ফিরতি পথও ধরেছে। কিন্তু ততক্ষণে হাজির হয়ে গেছে অনুসরণকারী তিন মার্সেনারি। ওকে দেখেও ফেলেছে তারা। এখন অস্ত্র হাতে আসছে খতম করতে।

মেঝে ছেড়ে উঠে কানাগলি থেকে বেরোতে ছুট দিল রানা। টিমটিম করে জ্বলন্ত এক তেলের নালা পেরোল মস্ত এক লাফে। একপাশে দেখল দাউদাউ করে জ্বলা এক লণ্ঠন, আরেক দিকে এক উদ্ঘাতিম। প্রাচীর ভাঙার মেশিনের ওদিকে গুহার দরজার একটু দূরে একইরকম আরেকটা উদ্ঘাতিম। বাঁচতে হলে হয়তো ওটা কাজে আসবে ওর।

অবশ্য, ওই পর্যন্ত যেতে পারলে। আরেকটা বিষয়: ওই জিনিস যদি কাজ করে, তবেই।

কাঠের গ্রিডের দিকে দৌড় দিতেই ওর পেছনে সরু প্যাসেজে তেড়ে এল মার্সেনারিরা।

জ্বলন্ত লণ্ঠন পেরিয়ে ছুটে চলেছে রানা প্রকাণ্ড উদ্ঘাতিমের দিকে...

পেছনে 'ওই যে, শালা!' বলে উঠল কে যেন।

দেরি না করে সামনের মেঝেতে রানা ঝাঁপ দিতেই পেছনে শুনল কর্কশ কড়-কড় শব্দ তুলেছে এমপিফাইভকে। গুলি খেয়ে মরেনি দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেই টেনে নামাল এক যুদ্ধাস্ত্রের লিভার।

ওটা শরযন্ত্র— তীর ছোঁড়ার মেশিন।

ফ্রেমওঅর্ক থেকে এল থক্থক্ শব্দ। মেকানিযম রওনা করিয়ে দিতেই দিগন্ত লক্ষ্য করে শিস তুলে প্যাসেজ ধরে গেল ধাতুর তৈরি তীর— টিংটাং শব্দে ছিটকে পড়ল ধাতু বা পাথরে লেগে। কিন্তু মানবদেহে বিঁধতেই শোনা গেল আর্তনাদ। থেমে গেল গুলি। সে জায়গা নিল দু'এক জনের করুণ কাতর ধ্বনি।

উঠে দাঁড়াল রানা। এখনও প্রাচীন মেশিন থেকে ছুটে যায়নি সব তীর, তবে ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয়ে পারল না ও। একটু দূরে মেঝেতে পড়ে কাতলা মাছের মত আছাড়ি-পিছাড়ি করছে তিন লোক। সারাদেহে এতই তীর বিঁধেছে, দেখতে লাগল সজারুর

মত। 'বুড়ো দাদু ভীষ্মের মত নতুন মৌসুম এলেই নির্ঘাৎ স্বর্গ,' বিড়বিড় করে বলেই দৌড় শুরু করল রানা। লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আগে চট্ করে তুলে নিল একটা এমপিফাইভকে সাবমেশিন গান।

এখন আধুনিক অস্ত্র আছে ওর। প্রথম কাজ হওয়া উচিত লাবনী আর অঙ্কুর রায়কে খুঁজে বের করা। খুব সাবধান হতে হবে। গুহার ভেতর রয়ে গেছে আরও কয়েকজন মার্সেনারি। গলা খুলে লাবনী বা অঙ্কুর রায়কে ডাকলে তারা জানবে কোথায় আছে ও। গুহার পেছনের দিকে না গিয়ে দরজার দিকে চলল রানা।

কালো সব ছায়ার আড়াল নিয়ে ছুটে চলেছে লাবনী, ফিরবে রানার কাছে। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলেছে ধনরত্নে ঠাসা গুহায়। ও জানে না, একপাশে দেয়াল রেখে ছুটে চলেছে কালী দেবীর প্যাসেজের দিকে।

আরও জানে না, দ্রুতপায়ে পেছন পেছন আসছে জিভ-ছেঁড়া পালোয়ান নরেশ শর্মা।

দরজার দশ গজ দূরে পৌঁছে রানা দেখল, এইমাত্র গুহা ছেড়ে দৌড়ে বেরোতে ছুট দিয়েছে দুই মার্সেনারি। এত কাছ থেকে তাক করায় বুলেট মাথায় নিয়ে লাশ হয়ে মেঝেতে পড়ল তারা। সামনেই দেখল রানা র‍্যাম্প, আরেকটু দূরে খোলা দরজা... কিনারা থেকে উইঞ্চে করে তুলে নেয়া হচ্ছে মঙ্গেলকারকে হেলিকপ্টারে।

বাইরে থেকে গুলি আসতেই র‍্যাম্পের পাশে থেমে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল রানা। কাভার নেয়ার জন্যে ছুট দিল জ্যাক রিচি। কিন্তু খোলা জায়গায় আটকা পড়েছে তার সঙ্গী। দূরের টার্গেটের

কথা মাথায় রেখে লিথাল হেড শট বাদ দিয়ে লোকটার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রানা। একরাশ গুলি লাগল মার্সেনারির বুক-পেটে। আর্মার আছে দেহে, কিন্তু বুলেটের আঘাতে পিছাতে হলো তাকে। তুষারে পিছলে গেল পা, ফলে পড়ল কিনারা থেকে, করুণ আর্তনাদ ছেড়ে বহু নিচে গিয়ে থামল তার জাগতিক সব কষ্ট।

দরজার দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা, আগেই দেখেছে কিনারায় সিন্দুক। যে-কোনও সময়ে হেলিকপ্টারে তুলে নেয়া হবে। রানা ভাবল, গুলি করে শিবের বেদ চুরমার করবে, অথবা কিনারা থেকে ঠেলে ফেলে দেবে কি না— সেক্ষেত্রে বাধা পড়বে অনুপম মঙ্গেলকারের পরিকল্পনায়। কিন্তু খেপে গিয়ে শেষে হয়তো হার্ট অ্যাটাক করেই মরবে লাবনী!

কথাটা মাত্র ভেবেছে ছুটন্ত রানা, এমন সময় ওর পিঠে ধুম্ করে লাগল বুট পরা পায়ের ভয়ানক এক লাথি।

র‍্যাম্পের পেছনে লুকিয়ে ছিল চাঞ্চাল আধিকারী। উঁচু জায়গায় উঠে ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে রানার পিঠে। সরে যাওয়ার সুযোগই ছিল না বিসিআই এজেন্টের। তবে এ কথাও ঠিক, দাঁড়িয়ে থাকলে ওই আঘাতে ভাঙত ওর মেরুদণ্ড। প্রচণ্ড লাথি খেয়ে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ল রানা।

কয়েক গড়ান দিয়ে উঠেই অস্ত্র তাক করতে চাইল শত্রুর বুকে। কিন্তু আরেক লাথি লাগতেই হাত থেকে শূন্যে উড়াল দিল ওর অস্ত্র। কেউটের মত আবারও হামলা করেছে চাঞ্চাল আধিকারী।

এবার রানার গাল ঘেঁষে গেল তার বুটের সোল। ঠিক সময়ে পিছিয়ে না গেলে ওই লাথিতে ঘাড় মটকে মরত রানা।

খপ্ করে চাঞ্চাল আধিকারীর গোড়ালি ধরেছে ও, জোর এক মোচড় মেরে ফেলতে চাইল তাকে মেঝেতে। কিন্তু নিখুঁত উল্টো

ডিগবাজি মেরে রানার হাত থেকে পা ছুটিয়ে নিল সে। সোজা হয়েই পরক্ষণে সামনে বেড়ে কিক বসাতে চাইল রানার বুকে। হুড়মুড় করে পিছাতে গিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে উঠানে চলে এসেছে রানা। পুরো তিন সেকেণ্ড লাগল সামলে নিতে।

ওর দিকে এমপিফাইভকে তাক করেছে জ্যাক রিচি। কিন্তু লাইন অভ ফায়ারে হাজির হলো ইণ্ডিয়ান মার্শাল আর্টিস্ট। সামনে বেড়ে ছোবলের মত রানার বুকের প্রেশার পয়েণ্টে হামলা করল সে। বামহাতে শত্রুর ডানহাত সরিয়েই নিজের ডানহাতের প্রচণ্ড চপ মারল রানা শত্রুর ঘাড়ে। কিন্তু মোক্ষম মারটা ঠেকিয়ে দিল চাণ্ডাল আধিকারী। পিছিয়ে এক পাক ঘুরেই হাই কিক মারল রানার মাথা লক্ষ্য করে।

পিছনে সরে হামলা এড়াল রানা। ওর মাথা লক্ষ্য করে অস্ত্র তাক করেছে জ্যাক রিচি, কিন্তু ভাবছে, দু'জনের প্রতিটি মুভ মাপা, সে তুলনায় অনেক অদক্ষ সে। এদের ভেতর কে জিতবে দেখতে পেলে মন্দ হয় না!

দু'জনের ভেতর সেরা কে?

নিয়োগকারীর বডিগার্ড না মাসুদ রানা?

লাফিয়ে এসে রানার কোমর লক্ষ্য করে কিক ছুঁড়ল চাণ্ডাল আধিকারী। সরে গিয়ে ঊরুর বাইরের দিকে আঘাতটা নিল রানা। একই সময়ে চেপে ধরেছে শত্রুর পা, নিজে প্রায় পড়তে শুরু করেও দু'হাতে বেদম মুচড়ে দিল বাগে পাওয়া পায়ের গোড়ালি।

'আঁই, সালা!' চমকে গেছে ভারতীয় মার্শাল আর্টিস্ট। আগে এই মানের শত্রু তার চোখে পড়েনি।

এদিকে বসে নেই রানা, তাকে মেঝেতে না ফেলে টানল কাছে, পরক্ষণে পা ছেড়ে প্রচণ্ড ঘুষি মারল শত্রুর নাক ও ঠোঁটে।

সঠিক সময়ে ঘুষিটা ব্লক করতে পারেনি বলে চাণ্ডালের ফাটা

নাক-মুখ থেকে ছিটকে বেরোল রক্ত। কিন্তু কিছুই পাত্তা না দিয়ে রানার চোখ লক্ষ্য করে ছোবলের মত এল তার ডানহাতের আঙুলের ডগা।

ঝট্ করে মাথা সরিয়ে দ্বিতীয়বারের মত ঘুষি মেরে চ্যাপটা করতে চাইল রানা তার নাক। এবার সহজেই হামলা এড়াল চাণ্ডাল আধিকারী। সামনে বেড়ে পাঞ্চ বসাতে চাইল ওর বুকে।

সরতে গিয়ে পিছাল রানা। কিন্তু টলমল করে উঠেই টের পেল ভুল হয়ে গেছে!

অসমাপ্ত বিধ্বস্ত সিঁড়ির ওপরের ধাপ থেকে ফস্কে গেছে পা!

গড়িয়ে পড়বে এখন নিচের শূন্যতায়!

সত্তর ফুট নিচে কঠিন জমিন!

সাতাশ

পড়তে শুরু করে চোখের কোণে রানা দেখল, ওপরে গেল সিঁড়ি! উঠে এল পঞ্চমতলা! কানের পাশে শোঁ-শোঁ হাওয়া!

ধবধবে সাদা কী যেন উঠে আসছে! বেয়ে ওঠা-নামার জন্যে পুরোহিতদের রাখা কোনও দড়ি ধরতে মরিয়া হয়ে থাবা মারল রানা। ডানহাতে কী যেন বাধতেই আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। এক সেকেণ্ড পর ভীষণ ঝাঁকি খেল। মনে হলো, যে-কোনও সময়ে খসে পড়বে ডান কাঁধ। বেদম দুলতে দুলতে দেখল, অনেক নিচে উপত্যকার সাদা মেঝে।

একহাতে ধরা দড়ি রানাকে নিয়ে বাড়ি মারল দেয়ালে। কাঁধ ও বুকের পাঁজরের ব্যথায় ওর মনে হলো খুন হয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ব্যথা কমতেই তাকাল ওপরে। সিঁড়ির ধাপ থেকে হাসিমুখে উঁকি দিয়েছে চাঞ্চাল আধিকারী। কিন্তু ওকে ঝুলতে দেখেই ভুরু কুঁচকে ফেলল সে। অবিশ্বাসের বদলে চোখে ফুটল রাগ। চিৎকার করে কী যেন বলল জ্যাক রিচিকে।

সিটিং ডাক হয়েছে, বুঝতে দেরি হয়নি রানার। জ্যাক রিচি গুলি করার আগেই নামতে হবে কোথাও। তখনই কড়াৎ করে শব্দ হলো!

নতুন করে পড়তে লাগল রানা।

এক সেকেণ্ড আগেও টারজানের মত ঝুলছিল, কিন্তু ওপর থেকে গুলি করে দড়িটা কেটে দিয়েছে রিচি!

দাঁতে দাঁত চেপে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হলো রানা, ভাল করেই বুঝে গেছে, বাঁচার উপায় নেই!

আবারও কানে শুরু হয়েছে শোঁ-শোঁ আওয়াজ। তখনই নতুন করে আরেক ঝাঁকি খেয়ে সামনের দেয়াল লক্ষ্য করে রওনা হলো ও। চতুর্থতলার নিচের দিকের খোদাই করা দেয়ালে গিয়ে গুঁতো মারবে!

কিন্তু ওখানে দেয়ালের বদলে খাপ পেতে আছে কালো এক অন্ধকার...

পাঁচতলায় খোদাই করা এক মূর্তির ঘাড় ও দেয়ালের ফাঁকে আটকে গেছে রানার দড়ির ওপরের অংশ।

আবারও টারজানের মত দুলতে দুলতে চলেছে রানা, উড়ে ঢুকে পড়ল চওড়া এক দরজা দিয়ে বড় এক ঘরে। প্রাণরক্ষাকারী দড়ির ওপরের অংশ দরজার উঁচু চৌকাঠে বেধে যেতেই হাত ছুটে গেল রানার, উড়ন্ত পাখির মত ছাতের দিকে উঠতে গিয়েও পড়তে লাগল মেঝে লক্ষ্য করে...

জোরালো এক ধুপ আওয়াজ তুলে নরম কীসের ভেতর পড়ল রানা। নানান দিকে ছিটকে গেল ধুলোর মত কিছু।

নাক-মুখ ভরে গেল ওর। কয়েক সেকেণ্ড ভাবল, দম আটকে মরবে, তারপর প্রাণপণে থুহ্-থুহ্ করে মুখ থেকে ফেলল ভুসির মত কী যেন।

উঁচু করে রাখা চালের একগাদা বস্তার ওপর পতিত বিমানের মত ল্যাণ্ড করেছে ও। কেদারনাথের আশপাশের গ্রাম থেকে বস্তা ভরা চাল আনে পুরোহিতরা। ওর কপাল ভাল, খালি বস্তার বদলে চাল ভরা বস্তার ওপর পড়লে স্রেফ খুন হতো।

'সাধু-সাধু, বাবা সাধুরা!' বিড়বিড় করল রানা। বুকের দিকে চেয়ে দেখল সাদা হয়ে গেছে চালের ভুসিতে। বস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এবার নতুন করে পথ খুঁজে আবারও উঠতে হবে শিবের গুহায়। লাবনী আর অঙ্কুরের সাহায্য লাগবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে তাকাল রানা। গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। বড় বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে! ওপরের ওই সিঁড়ির ধাপে ওর দিকে অস্ত্র তাক করে অপেক্ষা করছে কয়েকজন মার্সেনারি! সূর্যমুখী ফুলের মত মাযল ফ্ল্যাশ দেখল রানা। পরক্ষণে ঘুরেই এক লাফে এসে ঢুকল ঘরে। খিলানযুক্ত দরজা থেকে ছিটকে এল পাথরের কুচি।

যাহ্, ভাবল রানা, আটকা পড়েছে ও। ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। এদিকে যুদ্ধে যোগ দিতে হাজির হয়েছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড গানশিপ। ওর উপায় নেই যে আবার হাজির হবে ওপরের গুহায়।

নতুন করে এল গুলি। কিন্তু সেই গুলি ওর দিকে নয়। ওই আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ অন্যরকম!

বুম! বুম! বুম! আওয়াজ ছাপিয়ে করুণ আর্তচিৎকার শুনল রানা। পাতলা অ্যালিউমিনিয়ামের পাতে লাগছে সীসার বুলেট।

তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠতে লাগল এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড।

কয়েক সেকেণ্ড পর গুলির শব্দ থেকে রানা বুঝল, ওগুলো বহু পুরনো মার্টিনি-হেনরি রাইফেল। উনিশ শ' শতাব্দীর ব্রিটিশ অভিযাত্রীদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল। জং ধরেনি, যত্নে রাখা জিনিস।

সাধারণ যে-কোনও হেলিকপ্টারের ফিউজেলাজ ফুটো করার ক্ষমতা রাখে .৫৭৭/৪৫০ ক্যালিবারের অ্যামিউনিউশন। গানশিপের কাজ করছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড, কিন্তু বাস্তবে ওটার কাজ বেসামরিক এয়ারক্রাফটের। কোনও আর্মার নেই। দক্ষ স্নাইপার খুন করতে পারবে পাইলটকে। অথবা গুলি লাগতে পারে হাইড্রলিক লাইনে, বা ফুটো হবে ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। নিজের দৌড় বুঝে জান হাতে নিয়ে ভাগছে পাইলট।

কিন্তু চিনুক হেলিকপ্টার অন্য জিনিস। আগে ওটা ব্যবহার করা হয়েছে মিলিটারি কাজে। ওটার আছে আর্মার।

আরেকটা আর্তনাদ শুনে ঝুঁকি নিয়ে দরজার পাশ থেকে ওপরে তাকাল রানা। সিঁড়ির ওপর থেকে কয়েক ডিগবাজি দিয়ে উপত্যকার মেঝের দিকে রওনা হয়েছে এক মার্সেনারি। অন্যরা নতুন করে লক্ষ্যস্থির করছে অন্যদিকে। কিন্তু তারা আছে সমস্যার ভেতর। অস্ত্রটা গোপনে রাখতে খাটো করা হয়েছে এমপিফাইভকে-র নল, ফলে কমেছে রেঞ্জ এবং ক্ষমতা। অন্য দিকে মার্টিনি-হেনরির সুখ্যাতি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবখানে। যেমন রেঞ্জ, তেমনি প্রেসিশন ও ভয়ঙ্কর জোর। পুরোহিতদেরকে দেখতে পাচ্ছে না রানা, কিন্তু তাদের গুলির বিকট আওয়াজ বলে দিল, তারা আছে ওপরে আবার নিচের দিকেও। গুহার পঞ্চাশ গজের ভেতর তাদের উপস্থিতি বলছে, এমপিফাইভকে-র অন্তত দ্বিগুণ নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে তারা।

রানার মতই একই চিন্তা এসেছে জ্যাক রিচির মনে। চিৎকার

করে নির্দেশ দিল। দেরি না করে পিছিয়ে গেল মার্সেনারিরা। এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড থেকে গুলি শুরু করল এম২৪৯। গুহা বা ঘরের ভেতর পুরোহিতদেরকে আটকে রাখতে চাইছে।

এই সুযোগে দৌড়ে কিনারায় বেরোল রানা, ব্যস্ত চোখে দেখল কোন্ পথে আবারও উঠবে।

গুহার পেছন দিকে পৌঁছে গেছে লাবনী। আগুনের আভায় কটমট করে ওর দিকে চেয়ে জিভ বের করেছেন কালী দেবী।

খুবই কাছে চলে এসেছে নরেশ শর্মা। দুই মার্সেনারির কপালে যা ঘটেছে, এরপর কোনওভাবেই অন্য কোনও উদ্ঘাতিমের ফাঁদে ওই দানবকে ফেলতে পারবে না, বুঝে গেছে লাবনী। কোনও উপায় না দেখে সংক্ষিপ্ত প্যাসেজে ঢুকল। মূর্তির পায়ের তলা দিয়ে পেরিয়ে ঢুকবে শিবের বেদ রাখার ঘরে। ঢোকার সময় টের পেল, বারবার থরথর করে কাঁপছে মূর্তির ভয়ানক পায়ের নিচের টাইল। ওটাই ট্রিগার করে মূর্তির পায়ের ফাঁদ।

পায়ের তলা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল লাবনী। তার আগে দেখেছে, প্যাসেজে ঢুকেছে দানবীয় লোকটা। ছোট ঘরে কোনও আলো নেই। স্মৃতি হাতড়ে কাজে নামতে হবে...

দেয়ালের কাছে পৌঁছে হাত বোলাল সামনে। পেয়েও গেল মূর্তির মেশিনারি আটকে রাখা ধাতুর দণ্ড।

ওটা ধরে টান দিল লাবনী। দণ্ড আটকে আছে দুটো চাকার দাঁতের মাঝে। নরেশ শর্মার দেহ মেঝেতে চাপ দিতেই নড়তে চাইল চাকা। 'ওরে বাবা, মেরে ফেলবে শয়তানটা!' বিড়বিড় করল লাবনী। গায়ের জোরে ধাতুর দণ্ড ধরে টান দিল। খুলছে না ওটা! দানবটা পেরোচ্ছে কালী-মূর্তির পায়ের তলা দিয়ে...

খট্ শব্দ তুলে খুলল দণ্ড। দেরি না করে কাজে নামল কালী

দেবীর মূর্তি।

নেমে আসছে মস্ত ভারী পাথুরে পা। বিপদটা বুঝে ভয়ের চোটে আগের চেয়ে দ্রুত এগোতে চাইল নরেশ শর্মা...

মস্তবড় ভুল করেছে। বোকার জন্যে আরও নিষ্ঠুর ওই ফাঁদ। পাথরের দেয়ালের মত নামল প্রকাণ্ড পা শর্মার পিঠে... মুড়কি চিবিয়ে খাওয়ার মত কুড়মুড় শব্দ তুলে ভাঙল মেরুদণ্ডের সব হাড়। মেঝেতে ছিটকে নানান দিকে গেল ফেনায়িত রক্ত। মাত্র একবার বিদঘুটে 'ওগগ্' আওয়াজ বেরোল নরেশ শর্মার মুখ থেকে, তারপর স্থির হয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর রক্তে ভেজা পা ধীরে ধীরে উঠতে লাগল ওপরে। মেকানিযম থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লাবনী, তারপর সাবধানে দুই চাকার দাঁতের মাঝে আবারও আটকে দিল ধাতুর দণ্ড। বিড়বিড় করল, 'বাপরে!' দূরের লণ্ঠনের আবছা আলোয় দরজার সামনে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে শিউরে উঠল ভয়ে। কেমন যেন মাথা ঘুরছে ওর। গায়ের জোরে সরিয়ে দিল নরেশ শর্মার দেহের ওপরের অংশ। তিক্ত মনে রক্তাক্ত মূর্তির তলা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল প্যাসেজের শুরুতে।

পঞ্চমতলায় পৌঁছে একটা খিলানের আড়ালে সরল রানা, ভাবছে কীভাবে উঠবে ওপরে। যেদিক দিয়ে উঠেছিল ভাঙা কিনারায়, সেদিকে যাওয়ার উপায় নেই। বাধ্য হলে খোদাই করা মূর্তি বেয়ে উঠতে হবে ষষ্ঠতলায়।

পুরোহিতদের গুলির মুখে সরে গেছে মার্সেনারিরা। কিন্তু প্রায় খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে গেলে যে-কোনও সময়ে গুলি করে ফেলে দেবে ওকে।

কিন্তু ঝুঁকি না নিয়েও উপায় নেই।

আট ফুটি দানব হলে দু'কিনারার মাঝের শূন্যতা পেরোত

মস্ত লাফে, কিন্তু বাকি জীবনেও আধ ইঞ্চি আর বাড়বে না উচ্চতা।

পুরোহিতরা আড়ালে যেতেই থামল গানশিপের গুলিবর্ষণ। শিব মূর্তির কাছের কিনারায় কোনও মার্সেনারি নেই। অবশ্য, সিন্দুক তুলে নিতে অনেক নেমেছে মঙ্গেলকারের হেলিকপ্টার।

একবার সিন্দুক পেলে বিদায় হবে তারা। তবে তার আগে ধ্বংস করবে শিবের গুহা। মনস্থির করল রানা: ঝুঁকি নিয়ে পাথুরে মূর্তির খোদাই ধরেই উঠবে ওপরের কিনারায়।

কিন্তু ওর কাঁধে হাত রাখল কে যেন!

চরকির মত ঘুরল রানা। ডানহাত তুলেছে ঘুষি মারার জন্যে। থমকে গেল শীর্ষেন্দুকে দেখে। একটু চমকে গেছে যুবক। 'তুমি কোত্থেকে?' চাপা স্বরে বলল রানা।

'পড়তে দেখেছি,' বলল প্রধান পুরোহিত। একহাতে মার্টিনি-হেনরি রাইফেল, অন্যহাতে অ্যামিউনিশনের থলি। 'তাই এলাম খুঁজে বের করতে।'

'লাবনী আর অঙ্কুর কোথায়? ওরা ঠিক আছে?'

'গুহার পেছনের দিকে ছিল, কী হয়েছে জানি না,' বলল শীর্ষেন্দু।

ওপরের কিনারার দিকে তাকাল রানা। আকাশ থেকে ঝুলন্ত হার্নেস কিনারায় টেনে নিয়েছে কেউ। 'ওপরে উঠতে হবে।'

'সেজন্যেই এসেছি।' আঁধার এক ঘর দেখাল শীর্ষেন্দু। 'ওদিকে সুড়ঙ্গ আছে। ছয়তলায় পৌঁছুতে পারব। সহজেই চলে যাবেন শিবের গুহার কাছে। মাঝের ফাঁক পেরোবার সময় গুলি করে কাভার দেব আমরা।'

'তার মানে তোমরা আমাদেরকে বিশ্বাস করছ?'

'আমার বাবা বিশ্বাস করেছিলেন। ঠিকই বলেন তিনি। মঙ্গেলকাররা শিবের শত্রু। ওদেরকে ঠেকাতে হবে। আসুন, পথ

দেখাচ্ছি।'

আড়ালে নিচু হয়ে বসে সিন্দুকে উইঞ্চ কেইবল বাঁধছে জ্যাক রিচি। এখনও একটু পর পর কিনারার দিকে গুলি করছে পুরোহিতরা, কিন্তু তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড হেলিকপ্টারের মেশিন গান। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে পারবে, তার নিশ্চয়তা নেই। আকাশপথে তাদের অমূল্য সম্পদ সরিয়ে নেয়া হচ্ছে টের পেলেই মরিয়া হবে পুরোহিতরা। ব্যস্ত হয়ে শেষ ক্ল্যাম্প আটকে দিচ্ছে রিচি। হেডসেট-এ বলল, 'এবার তুলে নাও!'

টানটান হলো কেইবল, কিনারা থেকে ভেসে উঠল সিন্দুক। নেটিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সামান্য ওপরে উঠতেই পাহাড়ের গা-র কাছ থেকে সরল ধ্রুব হেলিকপ্টার। দেরি না করে উইঞ্চ চালু করে দ্রুত তুলে নিতে লাগল সিন্দুক।

দৌড়ে আবারও গুহার দরজার আড়ালে গেল জ্যাক রিচি। ভাবছে অন্য এক হেলিকপ্টারের কথা। হেডসেট-এ নির্দেশ দিল, 'রিকভারি পযিশনে আসুক, চিনুক! আমরা সরে যাচ্ছি! তৈরি রাখো রকেট লঞ্চার!'

জখম হওয়া পায়ের ওপর থেকে মার্সেনারির লাশ সরাতে চাইলেন অঙ্কুর রায়। তাতে ব্যথা যা লাগল, প্রায় অচেতন হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবারও নামলেন কাজে। কিন্তু বহু কষ্ট করেও পায়ের ওপর থেকে সরাতে পারলেন না মৃতদেহ। লাশের পেটে গেঁথে থাকা তলোয়ারের ডগা আটকে আছে দেয়ালের কোণে। এবার লাশের তলা থেকে সরতে চাইলেন। কিন্তু দুলে উঠল মেঝে।

প্রথমে ভাবলেন শুরু হয়েছে ভূমিকম্প। কিন্তু তখনই

শুনলেন মেঝের নিচে ধাতব ঘষার আওয়াজ। বুঝে গেলেন, আসলে নড়ছে এই খুদে প্রাসাদই!

মুখ তুলে দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে অবাক হলেন। বড় লণ্ঠনের আগুনের কারণে ফুলে উঠেছে বিশাল বেলুনের একাংশ। এখন আর বিছিয়ে রাখা কাপড়ের মত নেই। ফুলে গুহার ছাতে গিয়ে ঠেকেছে মস্ত বেলুন।

আবারও ঝাঁকি খেল গণ্ডোলা। আগের চেয়ে জোরে। পায়ের ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেললেন অঙ্কুর রায়। বিশাল এ গুহার চেয়েও বড় ওই বেলুন। বাইরে কোথাও নিয়ে ফোলানো হতো। আটকা পড়েছে পাথুরে ছাত ও দেয়ালের সংকীর্ণ এলাকায়। গরম বাতাস পেটে পুরে আরও ফুলে উঠছে। লণ্ঠনের স্ফুলিঙ্গ, কাঠের অঙ্গার ও ছাই ওপরে উঠে পোড়াচ্ছে কাপড়।

সুস্থ পায়ে লাশের গায়ে লাথি দিলেন অঙ্কুর রায়। ক'বার চেষ্টার পর সরাতে পারলেন মৃতদেহ। দু'হাতে দেয়াল ও দরজা ধরে উঠে দাঁড়ালেন। পরক্ষণে পড়ে গেলেন মেঝেতে। মেঝে ছেড়ে ভেসে উঠেছে বেলুন, নিচে ঝুলছে উড়ন্ত প্রাসাদ!

সাবধানে গুহার দরজার কাছে পৌঁছে ছায়ার ভেতর লুকিয়ে আছে লাবনী। হঠাৎ শুনল এক পাশে জোরালো আওয়াজ।

কেউ কি চালু করল কোনও প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র?

মার্সেনারিদের কোনও কারণ নেই ওসব করার।

হয়তো বেঁচে আছেন অঙ্কুর রায়।

একটা মূর্তির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখতে চাইল লাবনী। ছাতে নাক গুঁজে রাখা বিশাল বেলুন দেখে চমকে গেল। ছোট্ট প্রাসাদের ভেতর দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন। ওখানে পড়ে আছেন অঙ্কুর রায়।

লণ্ঠনের শিখা ছড়িয়ে পড়ছে বেলুন জুড়ে। সিল্কের আবরণের

বাইরের দিকেও লেগে গেছে ধিকিধিকি আগুন। আরও বড় হয়ে উঠছে শিখা।

ওই মস্তবড় বেলুন ফাটলে জ্বলন্ত সিল্কের কাপড় পড়বে সোজা প্রাসাদের ওপর। আগুনে পুড়ে মরবেন অঙ্কুর রায়।

লুকিয়ে না থেকে মানুষটাকে বাঁচাতে গুহার ভেতরের দিকে দৌড়ে গেল লাবনী।

প্রায় খাড়া, সরু সুড়ঙ্গের শেষাংশে রানাকে পৌঁছে দিল শীর্ষেন্দু। একটা খিলানের ওদিকে উপত্যকার অন্য অংশ। রানা দেখল, দুই কিনারার মাঝে কাত হয়ে আছে দড়ির সেতু। তার চেয়েও খারাপ কথা, লাল-সাদা হেলিকপ্টারের কেউ কেবিনে তুলে নিচ্ছে শিবের সিন্দুক। 'সিন্দুক তুলে নিয়েছে!'

সুদর্শন শীর্ষেন্দু রাগী গলায় বলল, 'এ জন্যে শাস্তি পেতে হবে ওদেরকে।' এক রাউণ্ড গুলি ব্রিচে ভরে ধ্রুব কপ্টারের দিকে তাক করল পুরনো রাইফেল। কিন্তু তুষারকণা ও গুঁড়ো পাথরের ঝড়ের তোড়ে পিছাতে হলো ওদেরকে। ওপর থেকে নেমে এসেছে চিনুক। শিবের মূর্তির দিকে তাক করে খুলে দেয়া হয়েছে পেছনের র‍্যাম্প। ওখান থেকে নিচে ঝুলছে দড়ি।

চিনুকের দিকে গুলি পাঠাল শীর্ষেন্দু। বদ্ধ জায়গায় বিকট আওয়াজ তুলল পুরনো রাইফেল। কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজে এল না ওটা। চিনুকের আর্মারে লেগে ঠুং শব্দ করে ছিটকে গেল বুলেট। প্রকাণ্ড হেলিকপ্টারকে উপত্যকায় জায়গা দিতে সরে গেছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড। কিন্তু ওটার গানার এখনও দেখছে রাইফেলের গুলির ধূসর ধোঁয়া। তার তরফ থেকে এল মেশিন গানের কর্কশ হুঙ্কার। রানাদের ওদিকের খিলানে লেগে নানাদিকে ভাঙা পাথর ছিটিয়ে দিল বুলেট।

'তুমি ব্যস্ত রাখবে ওই গানশিপকে,' বলল রানা, 'সেতু

পেরোবার সময় ওটা হামলা করলে বেঘোরে মরব।'

'আরেকটা সুড়ঙ্গ ধরে যেতে পারব অন্যদের কাছে, ওদেরকে জানাব, আপনি সেতু পেরোবার সময় যেন কাভার দেয় ওরা।'

'কতক্ষণ লাগবে ওখানে যেতে?'

'দু' মিনিট।'

ওদিকের কিনারা দেখল রানা। থেমে ভাসছে চিনুক। অনুপম মঙ্গেলকারের কপ্টারের চেয়েও নেমে এসেছে। রিয়ার রোটর পাহাড়ের কাঁধের নিচে। মাত্র দশফুট দূরেই শিবের মূর্তি। কিনারার খুব কাছে রিয়ার র‍্যাম্প নিচ্ছে দুই পাইলট। তাতে দড়ি না বেয়ে লাফিয়ে হেলিকপ্টারে উঠতে পারবে মার্সেনারিরা।

'না, ওই দুই মিনিট দিতে পারব না।'

সুড়ঙ্গে ধরে রওনা হওয়ার আগে বলল শীর্ষেন্দু, 'আপনি কী করবেন?'

সেতুর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল রানা, 'আমি পাড়ি দেব নরকের পথ!'

চিনুকের রোটরের তুমুল হাওয়া ঢুকছে গুহার ভেতর। হাজার বছরের ধুলোবালি তৈরি করেছে অন্ধ করে দেয়া ঝড়। চোখ সরু করে দূরে দেখতে চাইছে লাবনী, কাঁটার মত কাঁকর বিঁধছে গায়ে।

ঝোড়ো হাওয়া মাতিয়ে দিল মস্তবড় বেলুনকে। ওটার নিচে পেণ্ডুলামের মত দুলছে রাজকীয় গণ্ডোলা। লাবনী ভেবেছিল গুহার ভেতরে সরবে ওটা। কিন্তু প্রাসাদের চক্রগতি ও হেলিকপ্টারের দমকা হাওয়ায় বদ্ধ গুহায় তৈরি হলো ঘূর্ণিঝড়—পাগলাটে হাওয়া উল্টে ফিরল দরজার দিকে।

বেলুনের আবরণের ভেতর থেকে ছিটকে বেরোল আগুনের ফুলকি। প্রাসাদের বড় লণ্ঠনের তাপ দেয়ায় কোনও খুঁত ছিল,

অথবা ছাতে খোঁচা খেয়ে ছিঁড়ে গেছে সিল্ক— ঘটনা যাই হোক, হঠাৎ করেই ভুশ শব্দে বাতাস বেরোতেই গোটা গুহা জুড়ে ছড়িয়ে গেল জ্বলন্ত অঙ্গার— যেন শুরু হয়েছে লালচে, অদ্ভুত, গরম তুষারপাত! চারপাশে আগুনের কণা পড়ছে দেখে ভয় পেয়ে চট্ করে পার্কার হুড টেনে নিল লাবনী।

দ্রুত উচ্চতা হারিয়ে লঞ্চ র‍্যাম্পের কাছে এক উদ্ঘাতিমের ওপর নামল উড়ন্ত প্রাসাদ। লাবনী দেখল, গণ্ডোলার দরজা দিয়ে বেরোলেন অঙ্কুর রায়, অথবা ছিটকে পড়েছেন— নিশ্চিত হতে পারল না ও। মেঝেতে পড়ে রানার আগুন দেয়া প্রথম লণ্ঠনটাকে কাত করে ফেলল সাধের সোনার প্রাসাদ।

সিল্কের কাপড়, ফলে তুমুল বেগে পুড়ছে বেলুন। দেখতে না দেখতে ছাই হলো বেশিরভাগ অংশ। পাগলাটে আগুন রয়ে গেল নানান দিকে। গুহার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে ধোঁয়া। কাশতে কাশতে কয়লা ফুলকির মাঝ দিয়ে চলল লাবনী, আশা করছে আগুনে পুড়ে ছাই হননি অঙ্কুর রায়।

খিলানের এপাশ থেকে চিনুক দেখল রানা। অস্বাভাবিকভাবে উড়ছে হেলিকপ্টার। রিয়ার র‍্যাম্প প্রায় স্পর্শ করছে নিচের পাথুরে উঠান। দলের লোকদের হেলিকপ্টারে উঠতে ইশারা করছে জ্যাক রিচি, উবু হয়েছে ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে।

কাভারিং ফায়ার পাবে বলে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, বুঝে গেল রানা। যে-কোনও সময়ে রওনা হবে মার্সেনারিরা, তার আগে রকেট মেরে বা বোমা বসিয়ে ধ্বংস করবে শিবের গুহা।

আরেক অর্থে, খুন হবে লাবনী ও অঙ্কুর।

তীরের বেগে দড়ির সেতুর দিকে ছুটল রানা।

কাত সব তক্তার ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে দু'হাত। একেকবারে পেরোচ্ছে দুটো-তিনটে তক্তা।

মার্টিনি-হেনরি রাইফেলের ‘বুম! বুম!’ গর্জন নেই।

দৌড়ের মাঝে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেডের দিকে তাকাল রানা।

ওপর থেকে দেখেছে গানার, ঘুরল হেলিকপ্টারটা। ওর দিকে তাক করা হচ্ছে এম২৪৯।

লেসারের মত লালচে রঙের প্রথম সারি ট্রেসার বুলেট পাশ কাটাল ছুটন্ত রানাকে।

বিকট কর্কশ শব্দে উপত্যকার নিচে চেয়ে জ্যাক রিচি দেখল, দড়ির সেতু ধরে ছুটন্ত এক লোকের দিকে গুলি করা হচ্ছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড হেলিকপ্টার থেকে।

‘আবারও সেই মাসুদ রানা!’ বিড়বিড় করল রিচি। যেন মৃত্যু নেই ওই লোকের! বিরক্তির বদলে প্রশংসা এল মার্সেনারির মনে। সাহসী লোক, কিন্তু শেষ হয়ে এসেছে ওর সৌভাগ্য। এবার অনায়াসে তার দেহে এক ঝাঁক ট্রেসার বুলেট গাঁথবে গানশিপ। অথবা গুলির তোড়ে উড়বে দড়ির সেতু। ঘটনা যাই হোক, এবার আর বাঁচার উপায় নেই রানার।

ওর মৃত্যুদৃশ্য দেখার সময় রিচির নেই। শেষ পাঁচ মার্সেনারি এইমাত্র লাফিয়ে উঠেছে র‍্যাম্পে। তাদেরকে হোল্ডে টেনে নিল অন্যরা। পেছনে রয়ে গেছে চাঞ্চাল আধিকারী, হেলিকপ্টারে উঠল না সে। ‘র‍্যাম্পে ওঠো!’ ধমক দিল রিচি।

‘নরেশের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে,’ জোর দিয়ে বলল চাঞ্চাল আধিকারী।

‘সময় হাতে নেই। এবার বেরিয়ে যেতে হবে এখা..’

দু’ধরনের জোর আওয়াজে চুপ হয়ে গেল রিচি। পুরোহিত দলের গুলি লাগছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড কপ্টারের গায়ে। দ্বিতীয় আওয়াজটা বিস্ফোরণের, এসেছে গুহার ভেতর থেকে।

মাত্র বিশ সেকেণ্ড আগে অঙ্কুর রায়কে খুঁজে পেয়েছে লাবনী। পায়ের ব্যথায় কুঁকড়ে পড়ে আছেন ইন্টারপোল এজেন্ট। জ্বলন্ত সিল্কের কাছ থেকে তাঁকে টেনে সরাল লাবনী। কিন্তু তখনই ছিটকে পড়ে গেল ওরা শক্তিশালী এক বিস্ফোরণের ধাক্কায়।

শিবের রকেট!

গ্লাইডারের র‍্যাম্পের পাশে প্রাসাদের বড় লণ্ঠনের আগুন জ্বেলে দিয়েছে কোনও রকেট।

ডেটোনেট করল দ্বিতীয় রকেট। তৃতীয়টা গিয়ে লাগল ছাতে, সঙ্গে সঙ্গে ফাটল বোমার মত।

'হায়, আল্লা,' মুখে হাত চাপা দিয়ে ওদিকটা দেখল লাবনী, পরক্ষণে টানতে শুরু করে বড় এক মূর্তির আড়ালে সরিয়ে নিল অঙ্কুর রায়কে। ওপর থেকে ঝরঝর করে ঝরছে আগুনের ফুলকি। পাশ দিয়ে ছিটকে বেরোল আরেকটা রকেট, মরিচাবাতির মত লালচে ফুলকি ছড়িয়ে গিয়ে লাগল গুহার পেছনে।

কী হচ্ছে পরিষ্কার জানে না রানা, শুধু আঁচ করে নিল শিবের গুহায় ফাটছে বোমা। এ-ও বুঝে গেছে, ওকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে শিবের পুরোহিতরা, নইলে এতক্ষণে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড হেলিকপ্টারের মেশিন গান ছিঁড়ে ফেলত ওকে। অন্তত চারটে গুলি লেগেছে গানশিপে। ভয় পেয়ে এখন ওপরে উঠছে পাইলট।

গুলিতে ঝাঁঝরা তক্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে রানা, পৌঁছে গেছে সেতুর মাঝে। ওটা পেরিয়ে উঠবে আরও দুইতলা।

খপ্ করে চাঞ্চাল আধিকারীর বাহু চেপে ধরল জ্যাক রিচি। চিনুকের র‍্যাম্পের দিকে এগোতে শুরু করে বলল, 'আর দেরি

করা সম্ভব নয়! জলদি ওঠো!'

তখনই গুহা থেকে কালো কী যেন ছুটে এল তাদের দিকে। জিনিসটার লেজে দাউ-দাউ আগুন!

প্রথম রকেট বিস্ফোরিত হতেই নানান দিকে ছিটকে পড়েছে অন্যগুলো। একটা পড়েছে পাশাপাশি দুই উঁচু লঞ্চ র‍্যাম্পের মাঝে। সরু জায়গাটা ঢালু হয়ে উঠেছে দরজার দিকে। রকেটের নাক তাক করা ওই দরজার দিকেই। 'ফিয্-ফিয্য্' আওয়াজ তুলে ফুলকি ছড়াচ্ছে সলতে।

আগুন পৌঁছে গেল রকেটের লেজে...

দু'দিকের দেয়ালের কারণে এদিক ওদিক যাওয়ার উপায় নেই বলেই জোরালো এক হুইইইশ্ শব্দ তুলে রওনা হয়ে গেল রকেট দরজার দিকে। মুহূর্তে জ্যাক রিচি ও চাঞ্চাল আধিকারীকে পাশ কাটিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল চিনুক হেলিকপ্টারের হোল্ডে। পাশ কাটাবার সময় আগুনের লাল হলকা জ্বেলে দিল এক মার্সেনারির পোশাক। মাথার পেছনে রকেট লাগতেই মুহূর্তে খুন হলো আরেকজন। শক্ত মাথায় লেগে ওপরে উঠে ছাতে লাগল রকেট, পরক্ষণে দিক পাল্টে গিয়ে ঢুকল ককপিটে।

সরাসরি সেণ্ট্রাল ইন্সট্রুমেণ্ট কন্সোলে লাগল ওটা, নানান দিকে ছুটতে গিয়ে পুড়িয়ে কালো করে দিল দুই পাইলটের মুখ। লোকদুটোর করুণ চিৎকারে ভরে উঠল ককপিট, আগেই হাত সরিয়ে নিয়েছে কণ্ট্রোল থেকে।

মারাত্মকভাবে কাত হয়ে কিনারা থেকে সরে গেল চিনুক, রিয়ার হ্যাচ দিয়ে পড়ল জ্বলন্ত মার্সেনারি, অন্যরা ধুমধাম করে বাড়ি খেল ধাতব দেয়ালে। ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখে কিনারার মেঝেতে শুয়ে পড়েছে জ্যাক রিচি ও চাঞ্চাল আধিকারী, ওদের মাথার ওপর দিয়ে সাঁই করে ঘুরে গেল রোটর।

দমকা হাওয়ায় সিল্ক পরা দেহে দপ্ করে আগুন জ্বলতেই বিস্ফোরিত হলো রকেট, উড়িয়ে দিল ককপিটের জানালা। আগেই খুন হয়েছে দুই পাইলট, পুড়ে গেছে বিধ্বস্ত কণ্ট্রোল, নাক তাক করে সোজা রানার সেতুর দিকে তুমুল বেগে নামল চিনুক হেলিকপ্টার!

সেতুর চার ভাগের তিন ভাগ পেরিয়েছে রানা, পৌঁছে গেছে আগের সেই ভাঙা তক্তার কাছে, এমনসময় শুনল আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ, কিন্তু ওটা অনেকটা চাপা। ওই আওয়াজ কোথা থেকে এল জানতে ঘুরে তাকাল রানা, বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখ। 'যাহ্!'

ভাঙা ককপিট দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সোজা ওর দিকে নেমে আসছে চিনুক!

তক্তা ওজন নেবে কি না দেখতে গেল না রানা, লেজে আগুন ধরা পায়রার চেয়েও বেশি গতি তুলতে চাইছে। পালাতে হবে কপ্টারের সামনের রোটরের খপ্পর থেকে! বিশাল বৃত্তাকার ঘুরন্ত করাত সরাসরি আসছে ওর দিকেই!

পরের দু'লাফে সেতুর শেষাংশে পৌঁছে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। একফুট পেছনে সেতু কাটল রোটর। ছিঁড়তেই চাবুকের মত নানান দিকে চাপড় মারল টানটান দড়ি। সগর্জনে পাশ কাটিয়ে গেল চিনুক, সঙ্গে নিল রোটরের আকর্ষণে আলগা তুষার। ঝড়ের ভেতর পড়েছে প্রায় অন্ধ রানা, একহাতে তক্তা পেয়ে ওটাকে আটকে নিল কনুইয়ের ভাঁজে। বিধ্বস্ত সেতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়ছে। ঘুরন্ত তুষারের ঝড়ের মাঝে একদিকের দেয়াল ছুটে এল ওর দিকে।

বামহাতে পেল ওপর থেকে ঝুলন্ত এক দড়ি। আরেক দিকের দেয়ালে ঠাস্ করে বাড়ি খেল ছেঁড়া সেতু। আশা নিয়ে যে

তক্তা ধরেছে, মড়াৎ করে ভাঙল ওটা। অবলম্বন হারিয়ে বামহাতের দড়ি চেপে ধরে ঝুলতে লাগল রানা— যেন সুতোর শেষে খেলার পুতুল। ওকে পাশ কাটিয়ে নিচে গিয়ে পড়ল বেশ কয়েকটা ভাঙা তক্তা।

উপত্যকার পাথুরে দেয়ালে গুঁতো মেরে মেঝেতে পড়েই ভয়ঙ্করভাবে বিস্ফোরিত হলো চিনুক, থরথর করে কাঁপল চারপাশ। পাহাড়ের গা থেকে পড়ে বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের ওপর চেপে বসল বড় কয়েকটা বোল্ডার। চারদিক আঁধার হলো ধুলো ও কালো ধোঁয়ায়।

ডানহাতে নতুন করে কিছু ধরতে চাইল রানা। একটু কসরত করতেই ওপরের দিকে পেল আস্ত এক তক্তা। কুঁচকে গেল ওর চোখ। বুড়ো আঙুলে বিঁধেছে ফাটা তক্তার চল্টা। নিজেকে ওপরে টেনে তুলল ও। দড়ির সেতুর শেষ অংশ হয়ে গেছে বিপজ্জনক মই। কিছু তক্তা ফাটল ধরা, অন্যগুলো আগেই উধাও। তবে দড়ি রয়ে গেছে বলে উঠে যেতে পারবে পাঁচতলায়।

শক্ত করে দড়ি ধরে দাঁত দিয়ে টেনে বের করল বুড়ো আঙুলে গেঁথে থাকা চল্টা। কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে থেকে নতুন উদ্যমে উঠতে লাগল ওপরে।

ধ্রুব হেলিকপ্টারে বসে হতবাক হয়ে বিধ্বস্ত, জ্বলন্ত চিনুক গানশিপ দেখছে অনুপম মঙ্গেলকার। সামলে নিয়ে হেডসেট-এ জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী হলো? কী ঘটল, রিচি?'

সামান্য বিরতি নিয়ে জবাব দিল জ্যাক রিচি, 'একটা রকেট! বুঝলাম না কোত্থেকে এল! আমার সব লোক খুন হয়ে গেছে!'

'চাঞ্চাল আর নরেশ?'

'আপনার চাঞ্চাল আধিকারী আমার সঙ্গে আছে। অন্যজন...' গুহার ভেতরের আরেক বিস্ফোরণের আওয়াজে চুপ হয়ে গেল

রিচি। 'অন্যজনের খবর জানি না। বোধহয় মরে গেছে।'

'অনুপম, বেদ এখন আমাদের কাছে,' সিন্দুকের ডালায় টোকা দিল মাধুরী মঙ্গেলকার। 'চলো, রওনা হয়ে যাই।'

'চাঞ্চাল নিচে রয়ে গেছে— নিশ্চিত হতে চাই খুন হয়েছে ডক্টর লাবনী আলম আর মাসুদ রানা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বিলিয়নেয়ার। 'পাইলট, আবারও গুহার কাছে চলো, আমাদেরকে যেন কাভার দেয় গানশিপ।'

ঘুরে শিবের গুহা দিকে এগোল ধ্রুব হেলিকপ্টার।

আধখেঁচড়া মই বেয়ে চাতালে উঠে রানা দেখল, মেঝেতে জমা তুষারের বুকে অসংখ্য পায়ের ছাপ। নতুন করে উড়ছে তুষারকণা। ওর মাথার ওপর দিয়ে গেল অনুপমের হেলিকপ্টার, গুহার কাছে গিয়ে ভেতরটা দেখবে।

প্রকাণ্ড মূর্তির পেছন থেকে উঁকি মেরে গ্লাইডারের র‍্যাম্পের দিকে তাকাল লাবনী। বেশিরভাগ রকেট পুড়ে গেছে বা বিস্ফোরিত হয়েছে। নষ্ট বেশিরভাগের গান পাউডার। আস্ত রকেট খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে এক-আধটা।

তাই বলে বিপদ কেটেছে, তা নয়, বিস্ফোরণ থেমে গেলেও এখনও জ্বলছে আগুন। মস্ত গুহা ভরে উঠছে ধোঁয়ায়। বেশিরভাগ সম্পদ ঠিকই থাকবে, কিন্তু কাউকে দেখাতে হলে আগে মুছে নিতে হবে তার কালিঝুলি। এখনও যথেষ্ট পরিমাণের কাঠ ও কাপড় রয়ে যাওয়ায় অন্তত দু'চার ঘণ্টা জ্বলবে আগুন। 'আপনি হাঁটতে পারবেন?' অঙ্কুর রায়কে জিজ্ঞেস করল লাবনী।

'আর উপায় কী, বলুন?' বললেন ইন্টারপোল এজেন্ট। ধূসর ধোঁয়ার ভেতর কেশে উঠলেন খুক-খুক করে।

তাঁকে হাঁটতে সাহায্য করল লাবনী। ধীর পায়ে আগুন

এড়িয়ে দরজার দিকে চলল ওরা। র‍্যাম্পের পেছনের দিক এড়িয়ে গেল। কে জানে, আবারও হয়তো ফাটবে রকেট। দরজার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল লাবনীর। বিড়বিড় করে বলল, 'সর্বনাশ!' বাইরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে চাণ্ডাল আধিকারী। অঙ্কুর রায়কে বলল, 'বেরোতে পারব না। দেখলেই খুন করবে।' কোনও অস্ত্রের জন্যে চারপাশ দেখল। উল্টে পড়া গণ্ডোলার কাছে একটা অস্ত্র দেখে পছন্দ হলো। 'একমিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ফিরব,' বড় এক মূর্তির গায়ে অঙ্কুর রায়কে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ও।

মুখ তুলে রিচি দেখল, ওপর থেকে নামছে ধ্রুব হেলিকপ্টারের উইঞ্চ হার্নেস।

'আগে আপনি উঠুন,' বলল চাণ্ডাল আধিকারী, 'নরেশ চলে আসতে পারে। হয়তো এখনও বেঁচে আছে অঙ্কুর রায় বা ডক্টর আলম, সেক্ষেত্রে তাদেরকে খতম করে হেলিকপ্টারে উঠব।'

মাথা দুলিয়ে হার্নেস নামতে দেখল রিচি। চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে তাকাল একতলা নিচে। প্রায় হেসে ফেলল। 'মাসুদ রানা! ওই যে আসছে! ওর বোধহয় মরণ নেই!'

তিক্ত হাসল চাণ্ডাল আধিকারী। 'ভুল বললেন। ওর কপাল মন্দ। আপনার অস্ত্রটা দিন।'

কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ খুলে ভারতীয় মার্শাল আর্টিস্টের হাতে এমপিফাইভকে ধরিয়ে দিল জ্যাক রিচি। 'মনে রাখবেন, ও কাছে এলে তারপর নিশ্চিত হয়ে গুলি করবেন।' হার্নেসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

ষষ্ঠতলায় পৌঁছে পরের তলায় যেতে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা। ওদিকের অসমাপ্ত ভাঙা সিঁড়ির ওপরের চাতালে দেখল

দু'জনকে। চিনতে দেরি হলো না: জ্যাক রিচি ও চাঞ্চাল আধিকারী। তৈরি তারা উইঞ্চ হার্নেসে চেপে হেলিকপ্টারে উঠতে।

না, ভুল, ওর দিকেই এমপিফাইভকে তাক করছে চাঞ্চাল আধিকারী...

কাছের খিলান পেছনে রেখে এসেছে রানা, তুষারের ভেতর ব্রেক কষল। ঘুরেই দৌড় দেবে আড়াল নেয়ার জন্যে...

চাঞ্চাল আধিকারীর হাতে গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র।

হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে সামলে নিল রানা। এমপিফাইভকে-র রেঞ্জ কম হলেও এত কাছ থেকে ফস্কাবে না গুলি। রানার কানের পাশ দিয়ে গেল আরও একঝাঁক বুলেট।

একই সময়ে কর্কশ হুঙ্কার ছেড়েছে আরেক এমপিফাইভকে...

ওটার গুলি এসেছে গুহার ভেতর থেকে। দুটো গুলি পাশ কাটিয়ে গেছে চাঞ্চাল আধিকারীকে, কিন্তু তৃতীয় বুলেট তার বাহু থেকে তুলে নিল এক খাবলা মাংস। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে মুখ বিকৃত করল সে, হাত থেকে পড়ে গেছে সাবমেশিন গান। সিঁড়ি থেকে উপত্যকার মেঝের দিকে রওনা হলো ওটা।

এইমাত্র হার্নেসে নিজেকে বেঁধে নিয়েছে রিচি, চরকির মত ঘুরে দেখল, গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে লাবনী আলম, হাতে মৃত এক মার্সেনারির আগ্নেয়াস্ত্র। ওই লোককে খুন করেছিলেন অঙ্কুর রায়। খুব কাছ থেকেও ভারতীয় লোকটাকে খুন করতে পারেনি মেয়েটা। এ থেকে রিচি বুঝল, এর চেয়ে আনাড়ি আর হয় না। এ তো মাসুদ রানা নয় যে যমের দূত হবে, কাজেই ঝুঁকি নেয়া উচিত। হেডসেট-এ চিৎকার করল রিচি, 'তুলে নাও! আমাকে জাপ্টে ধরো, আধিকারী!'

গুলির জখম কাবু করলেও যথেষ্ট দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল

চাঞ্চাল আধিকারী। হেলিকপ্টার রিচিকে টেনে তুলতেই এক লাফে মার্সেনারির কোমর জড়িয়ে ঝুলে পড়ল। চট্ করে ফাঁকা জায়গায় সরে গেল হেলিকপ্টার, হার্নেস তুলে নেয়া হচ্ছে।

দৌড়ে এসে কিনারায় থেমে আকাশে ঝুলন্ত লোকদু'জনের দিকে এমপিফাইভকে তাক করল লাবনী। ভাল করেই জানে, রানা হলে ঠিকই গুলি করত। কিন্তু আবারও গুলি করবে, সেই মানসিকতা ওর নেই। ওই লোকদুটো নিরস্ত্র, একজন আহত, তা ছাড়া এদেরকে খুন করে কোনওভাবেই ভেস্তে দিতে পারবে না অনুপম মঙ্গেলকারের প্ল্যান। 'শয়তানের বাচ্চারা!' আকাশে মুখ তুলে চিৎকার করল লাবনী।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে গুহা থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছেন অঙ্কুর রায়।

হেলিকপ্টারের নিচে ঝুলতে ঝুলতে উপত্যকার দূরে গিয়ে থামল চাঞ্চাল আধিকারী ও জ্যাক রিচি।

মার্শাল আর্টিস্ট কার দিকে গুলি করছিল দেখতে নিচে তাকাল লাবনী। কেউ তো নেই! একটু দূরে ওদিকের উঠানও ফাঁকা। তারপর এক খিলানের ওদিক থেকে শুনল পরিচিত কণ্ঠ। খুশিতে কেঁদে ফেলল লাবনী, 'রানা! রানা!'

'তোমার হাতের ভয়ঙ্কর অস্ত্রের মুখটা সরালে সাহস করে বেরোতে পারি,' মুচকি হেসে বেরিয়ে এল রানা। দৌড় শুরু করে লাফিয়ে পেরোল মাঝের গভীর শূন্যতা। ভাঙা সিঁড়ির ওপর পা ফেলে প্রায় দৌড়ে উঠে এল এদিকের কিনারায়।

'অস্ত্রটা ভয়ঙ্কর তাই না?' চোখ বড় বড় করে এমপিফাইভকে দেখছে লাবনী।

'তোমার হাতে ভয়ঙ্কর, যখন-তখন যে কেউ খুন হবে!' হাসি চওড়া হলো রানার।

'তাই?' হাসি-কান্না চেপে রানাকে হঠাৎ করেই জাপ্টে ধরল

লাবনী। ঠনাৎ করে মেঝেতে সাবমেশিন গান পড়তেই কড়াৎ শব্দে বেরোল একটা বুলেট।

'ওরেব্বাপ্‌রে,' লেংচে কয়েক পা পিছিয়ে আবারও গুহায় ঢুকে গেলেন অঙ্কুর রায়। বিড়বিড় করে বললেন, 'রানা ঠিকই বলেছে! খুবই ডেঞ্জারাস মেয়ে!'

ওদিকে লাবনীর থুতনি ধরে ওপরে তুলেছে রানা। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের। মেয়েটার চোখে কীসের এক অদ্ভুত আকুতি। যা কখনও করবে না ঠিক করেছিল, ঠিক তাই করল রানা। ওর নিষ্ঠুর ঠোঁট নামল লাবনীর লোভনীয় ভেজা অধরে।

বুজে গেল লাজুক মেয়ের বিশাল ও গভীর চোখের পল্লব। একটু একটু কাঁপছে ঠোঁট।

কয়েক সেকেণ্ড পর আস্তে করে এক পা পিছিয়ে গেল রানা।

লজ্জায় লাল দু'গাল, চোখ বুজে আছে লাবনী, আস্তে করে বলল, 'ভেবেছিলাম তুমি মরেই গেছ!'

'হয়তো মরতাম, যদি না শীর্ষেন্দু ওর দলের পুরোহিতদের নিয়ে কাভারিং ফায়ার দিত,' গুহার দিকে তাকাল রানা। 'অঙ্কুর কোথায়?'

'ভেতরে। কিন্তু সরিয়ে আনতে হবে। গুহা ভরে উঠছে বিষাক্ত ধোঁয়ায়।' চোখ মেলে রানাকে দেখেই লজ্জায় আরও লাল হলো লাবনীর সুন্দর মুখ।

'তাই তো দেখছি।' গুহার দরজা দিয়ে ভকভক করে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। 'চলো, ওকে নিয়ে...'

পরিচিত এক আওয়াজ বাড়ছে দেখে ঘুরে তাকাল ওরা। উপত্যকার দূর থেকে তেড়ে আসছে গানশিপ। এখন দরজা থেকে টেনে নেয়া হয়েছে এমঽ৪৯, সে জায়গায় অন্য অস্ত্র...

আরপিজি-৭ রকেট লঞ্চার!

ধ্রুব হেলিকপ্টারের উইঞ্চ অপারেটর টেনে কেবিনে তুলল চাঞ্চাল আধিকারীকে। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠল জ্যাক রিচি। খুলে দেয়া হলো হার্নেস। ধুপ্ করে বন্ধ হলো হ্যাচ। 'রানা আর লাবনী এখনও বেঁচে আছে,' রিপোর্ট দিল মার্সেনারি।

'বেশিক্ষণ বাঁচবে না,' নাক সিটকে বলল মাধুরী মঙ্গেলকার। হেডসেট-এ জানাল, 'গানশিপ! গুহা ধ্বংস করে দাও! কেউ যেন বাঁচতে না পারে!'

হাতে হাত ধরে দৌড়ে গুহায় ঢুকেছে রানা ও লাবনী। দরজার একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন অঙ্কুর রায়। 'এবার কী, রানা?'

'আমাদের খুন করতে আসছে গানশিপ!' বলল রানা। কাঁধ থেকে স্লিং খুলে হাতে নিল এমপিফাইভকে। অন্যহাতে অঙ্কুর রায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে সরিয়ে নিল পাথরের প্রকাণ্ড কবাটের আড়ালে।

গুহার দরজার দিকে নাক তাক করে ভাসছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড হেলিকপ্টার। দরজা খুলে ঝুঁকে বেরিয়ে এসেছে গানার। কাঁধের ওপর টিউবের মত রাশান অস্ত্র। ওটার পেছনের আগুন বেরোবে কপ্টারের দেহের পাশ দিয়ে, নইলে রকেট ফায়ার করলে ওটার আগুন পুড়িয়ে বারোটা বাজাত ককপিটের।

রেঞ্জ কম বলে হাতের অস্ত্রের নল ওপরে তুলে গুলি ছুঁড়ল রানা। ধনুকের মত বাঁকা পথে হেলিকপ্টারের ক্যানোপিতে গিয়ে লাগল এক সারি বুলেট। কয়েক জায়গায় ফুটো হলো প্লেক্সিগ্লাস। কিন্তু গুলির এত জোর নেই যে বড় ধরনের ক্ষতি করবে।

অপর পক্ষের অস্ত্র অন্য জিনিস। আরপিজি-৭ লঞ্চার থেকে ছিটকে পেছনে গেল ধোঁয়া ও আগুন। ছোট, কালো একটা বিন্দুর মত রওনা হয়ে গুহার দরজার দিকে এল রকেট।

প্রকাণ্ড কবাটের ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা। একই সময়ে বিস্ফোরিত হলো রকেট। ওর আশপাশ দিয়ে ছিটকে গেল খণ্ড খণ্ড ভাঙা পাথর। রকেট ছোঁড়ার আগে বুলেটের হামলায় একপাশে হেলিকপ্টার সরিয়ে নিয়েছে ভীত পাইলট। ফলে গুহার দরজার আগে মেঝেতে লেগে বিস্ফোরিত হয়েছে ওয়ারহেড।

তাতেও অনেক ক্ষতি হয়েছে বাইরের আঙিনার। জোরালো কড়াৎ আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়েছে সিঁড়ি, সঙ্গে গেছে আঙিনার বড় একটা অংশ।

দরজার আড়াল থেকে বাইরে তাকাল রানা। উপত্যকার নিচ থেকে পাথর ধসের গম্ভীর আওয়াজ শুনল ওরা। ওই সিঁড়ি আর নেই, চাইলেও ওদিকের কিনারায় যেতে পারবে না ওরা। দুই কিনারার মাঝে এখন কমপক্ষে ত্রিশ ফুট ফাঁক।

একটু পিছিয়ে গেছে হেলিকপ্টার। নতুন করে রকেট ভরতে লঞ্চার ভেতরে নিয়েছে গানার। তখনই তাদের দিকে শক্তিশালী মার্টিনি-হেনরি রাইফেল থেকে গুলি শুরু করল পুরোহিতরা। নিজের অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখল রানা। আছে মাত্র তিনটে গুলি। জোর কপাল না হলে কপ্টারের ভেতরের কাউকে আহত করতে পারবে না। পুরোহিতদের গুলির তোড় দেখে, ভয় পেয়ে ঘুরে চার শ' গজ দূরে পাহাড়ের প্রাচীরের ওদিকে গিয়ে ভাসতে লাগল গানশিপ। রানা বুঝল, পরেরবার নিরাপদ দূরত্ব থেকে ছুঁড়বে রকেট। এক মাইলের তিন ভাগের এক ভাগ রেঞ্জ ওই অস্ত্রের। 'এদিক দিয়ে নেমে যাওয়ার কোনও পথ পেয়েছ তোমরা?' জানতে চাইল রানা।

'না, নেই,' বললেন অঙ্কুর। 'তা ছাড়া, আমি কিন্তু হাঁটতে পারব না।'

অখুশি মুখে মাথা নাড়ল লাবনী। 'দড়িটড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারব না?'

'তাতে অনেক সময় লাগবে। দ্রুত কোনও পথ চাই।' রানার চোখ লঞ্চ র‍্যাম্পের ওপর।

ওর চোখ অনুসরণ করে ওদিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে গেল লাবনীর। 'হায়, আল্লা!' র‍্যাম্পের ওপর প্রাচীন বিমান। 'না-না! এসব কী ভাবছ তুমি, রানা?'

'ঠিক তাই ভাবছি!' উঠে দাঁড়িয়ে অঙ্কুর রায়কে টেনে তুলল রানা। 'আমরা জানি, ওই জিনিস কাজ করে। তুমিই তো বলেছ, আটলান্টিয়ান স্টাডা লোকটার আমলে সাধুরা পাহাড় পেরোত ওই জিনিসে চেপে।' আহত বন্ধুকে ধরে র‍্যাম্পের দিকে পা বাড়াল।

পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করে আপত্তি তুলল লাবনী, 'কিন্তু সে তো এগারো হাজার বছর আগের কথা!'

'হতে পারে, কিন্তু এটার বয়স অত বেশি না।'

'তাও এত, যে ঝুরঝুর করে... তা ছাড়া, তুমি ওটা চালাতে জানো না।'

'আগেও গ্লাইডার চালিয়েছি,' র‍্যাম্পে উঠে অঙ্কুর রায়কে তুলে আনল রানা। হাত বাড়িয়ে দিল লাবনীর দিকে। 'এসো। সহজ কাজ। গুহা থেকে না বেরোলে জানে বাঁচব না কেউ। অঙ্কুর? উঠবে তো শিবের বিমানে?'

'তুমি পাগল হলে?' প্রতি পদে ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলছেন ইন্টারপোল এজেন্ট। 'আমি লাবনীর সঙ্গে একমত। এটা নিরাপদ নয়।'

'আরপিজি লাগলে নিরাপদে স্বর্গেও পৌঁছুবে না,' বলল রানা।

'তুমি পাগল,' বিড়বিড় করতে করতে র‍্যাম্পের আরেক পাশ দিয়ে ওপরে উঠল লাবনী। 'মানুষ খুন করবে এই লোক!'

'তুমি না গ্লাইডারটা মুগ্ধ হয়ে দেখছিলে,' বিমানের পাশে

পৌঁছুল রানা। ডানার নিচের প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে দিল অঙ্কুর রায়কে। চট্ করে পরীক্ষা করল পেছনের রকেট। কী মনে করে দৌড়ে নেমে গেল র‍্যাম্প থেকে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পর আবারও হাজির হলো দু'হাতের ভাঁজে মোটা দুটো রকেট নিয়ে। তুলে দিল প্ল্যাটফর্মে। ওগুলোর পাশে মুখ গোমড়া করে বসল লাবনী। ভরসা দিল রানা, 'দুর্দান্ত ব্যাপার, দরকার হলে শিবের জিনিস ব্যবহার করব। তোমার অবাক বা ভাল লাগছে না?'

'মর্, ব্যাটা!' বিড়বিড় করল লাবনী। 'বিয়ে করলেও বউয়ের হাড় জ্বালিয়ে খাবে!'

'ইয়ে... রানা... গুহার অন্য যন্ত্রগুলো দিয়ে ঠেকানো যায় না ওদেরকে?' করুণ সুরে বললেন অঙ্কুর রায়।

শেষ অস্ত্র হিসেবে বলল লাবনী, 'তোমার কাছে ম্যাচ আছে? আগুন দেবে কী করে রকেটে? বাদ দাও!'

'এই যে ম্যাচ,' প্যান্টের পকেট থেকে ম্যাচবক্স বের করে রকেটের সলতে মুচড়ে নিল রানা। 'এবার মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।'

ওড়ার সময় দেহ বেঁধে নেয়ার জন্যে ডানার ছোট সব দাঁড়ের মত দণ্ড থেকে ঝুলছে চামড়ার ফিতা। কবজির সঙ্গে পেঁচিয়ে নিল লাবনী ও অঙ্কুর রায়। পা ঠেকিয়ে রেখেছে কাঠের ফ্রেমওঅর্কে। দু'জনই নিচে চেয়ে ভাবছে, স্কি জাম্পের মতই খুব সংক্ষিপ্ত লঞ্চ র‍্যাম্প। মাত্র এটুকু দৌড়ে উড়বে না বুড়ো বিমান। 'না, আমরা অ্যাক্সিডেন্ট করে হাড়গোড় ভেঙে মরব,' মতামত দিল লাবনী।

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ফিউজে আগুন দিল রানা। হিসহিস শব্দে ফুলকি ছড়াল সলতে। লাবনী ও অঙ্কুর রায়ের মাঝে শুয়ে পড়ে বলল রানা, 'ঠিক আছে, আমরা রওনা হচ্ছি!' পরক্ষণে পুরু ফিতেয় হ্যাঁচকা টান মেরে বিমানের রানারের কাঠের গোঁজ

সরিয়ে দিল।

মসৃণ পাথরের বুকে কর্কশ আওয়াজ তুলল প্রাচীন রানার, র‍্যাম্প বেয়ে দু'এক ইঞ্চি নামল বুড়ো বিমান, তারপর থেমে গেল।

'যাক, কপাল ভাল, এভাবে মরতে হবে না,' বলল লাবনী।

যে-দুটোকে কন্ট্রোল রড মনে হয়েছে, সেগুলোর দিকে গম্ভীর চেহারায় দেখল রানা। আবার তাকাল সলতের দিকে। প্রায় পুড়ে রকেটের কাছে পৌঁছে গেছে সলতের আগুন। 'বিমান চালু করতে হলে ঝাঁকি দিতে হবে। এসো, ফ্রেম ধরে ঝাঁকাও!'

তিনজন মিলে কাঠের ফ্রেম ধরে আগুপিছু করতে চাইল। কিঁচ-কিঁচ আওয়াজ তুলল রানার। নড়ল সামান্যই। 'আরও জোরে! একসঙ্গে মারো ধাক্কা! হেঁইয়ো!'

একইসঙ্গে ফ্রেমওঅর্ক ধরে ঝাঁকি দিল ওরা, ওই একই সময়ে জ্বলে উঠল রকেট। হোঁচট খেয়ে র‍্যাম্প বেয়ে নিচে চলল কাঠের বিমান।

ক্ষয় হওয়া রানার থেকে নানাদিকে পড়ছে ছোট সব টুকরো, কিন্তু বিমানের নেমে যাওয়ার গতি বেড়ে যেতেই পাথরের র‍্যাম্প থেকে উঠল আগুনের ফুলকি। বুঝতে না বুঝতে র‍্যাম্পের শেষ মাথায় পৌঁছুল বিমান। জি-ফোর্সের কারণে প্ল্যাটফর্মে সেঁটে গেল ওরা, পরের সেকেণ্ডে ভেসে উঠল আকাশে।

গুহার দরজা দিয়ে সাঁই করে শিবের বিমান বেরোতেই ভয়ে চিৎকার করে উঠল রানার দুই সহযাত্রী। একটু নিচে দেখা গেল বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে উঠানের মত কিনারা। চিৎকার বেড়ে গেল নিচে আরেকটা জিনিস দেখে— নতুন আরপিজি রাউণ্ড। গুহায় ঢুকে র‍্যাম্পে লেগে বিস্ফোরিত হলো ওটা। নানান দিকে ছিটে গেল পাথরের বৃষ্টি। একেবারে ধসে পড়ল বিশাল র‍্যাম্পের একদিক, চিঁড়ে-চ্যাপটা করল পার্ক করা কয়েকটা গ্লাইডারকে।

নিজেদের বিমানের দিকে মনোযোগ দিল ওরা। রকেটের ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে চলেছে গ্লাইডার। কিন্তু নতুন করে বাড়ছে না উচ্চতা। প্যারাবোলিক ট্র্যাজেক্টরির সেরা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, এবার যে-কোনও সময়ে নাক নিচু করে নামতে শুরু করবে। খট-মট-মড়-মড় আওয়াজ তুলছে কাঠের ডানা। সামনের খাড়া দুটো দণ্ড সামনে ঠেলে দিল রানা। ওর মনে হয়েছে হ্যাং গ্লাইডারের মতই সাড়া দেবে বিমান। কিন্তু নিচে নাক তাক করতে চাইছে ওটা।

নিচে শীর্ষেন্দু এবং ওর দলের কয়েকজনকে দেখল ওরা। উড়ন্ত বিমানের দিকে চেয়ে আছে তারা। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে পেছনে পড়ল সবাই। সপ্তমতলার উচ্চতা থেকেও নেমে গেল বিমান। 'বাপু, ওপরে ওঠ্!' বিড়বিড় করল লাবনী, 'ওঠো! ওঠো!'

কাঠের দুই দণ্ড সামনে ঠেললে নিচে নামবে গ্লাইডার, তো ওগুলো টেনে নেয়া দরকার পেছনে— এই যুক্তি খাটিয়ে কাজে নামল রানা। একদণ্ড দেরি করল না নিজের দিকে দুই দণ্ড টানতে। তাতে ডানা থেকে এল কর্কশ খড়-মড় আওয়াজ। ওটাকে ঢেকে রাখা সিল্কের কাপড় ফটাৎ-ফটাৎ শব্দে আছাড়ি-পিছাড়ি করছে, কিন্তু মনে হলো কাজ হচ্ছে, আবারও ওপরে নাক তুলছে বিমান।

'রানা!' আঁৎকে উঠলেন অঙ্কুর রায়। সরাসরি সামনে পাহাড়-প্রাচীরের ওদিকে ভাসছে এমডি ফাইভ হাণ্ড্রেড হেলিকপ্টার। এদিকেই নাক তাক করেছে, পরের রকেট আসবে ওদের দিকেই।

'আরেহ্!' চমকে গিয়ে বেঁটে ও পুরু দুই দণ্ড ধরে একপাশে সরাতে চাইল রানা। আশা করছে, তাতে একদিকে কাত হবে গ্লাইডার। হলো, বাম দিকে বাঁক নিল বিমান।

কিন্তু এখন চলেছে উপত্যকা ঘিরে রাখা তিন শ' ফুটি পাহাড়-প্রাচীরের দিকে! ওটার হাঁটুর কাছে যেসব খোদাই করা মূর্তি, সেগুলোর গায়ে নড়বড়ে ডানা লাগলে...

উল্টো দিকে কন্ট্রোল স্টিক সরাল রানা। নতুন করে উচ্চতা পেতে হবে। গানশিপ ঘুরছে ওদের দিকে। তখনই এল জোরালো দমকা হাওয়া। এখনও রকেট জ্বলছে বলে চালিয়ে নিয়ে চলেছে গ্লাইডার, ক্রমেই বাড়ছে গতিবেগ।

কিন্তু দূরে দেখা গেল আবারও পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর।

ওখানে বিধ্বস্ত হয়েছে চিনুক হেলিকপ্টার। নিচ থেকে উঠছে তেলতেলে কালো ধোঁয়া। তার ভেতর দিয়েও পরিষ্কার দেখা গেল ধূসর পাথুরে পাহাড়।

'সত্যি যদি বিমান চালাতে পারো, তো এখনই সময় ওপরে ওঠার!' কাঁপা গলায় রানাকে বলল লাবনী।

দুই জয়স্টিক প্রাণপণে পেছনে টানল রানা। চাপের মুখে পড়ে কাঠ থেকে এল কট-কট-মট-মট-খড়-মড় আওয়াজ। কয়েক শ' গজ দূরে তুষারে ছাওয়া খাড়া পাহাড়ের ওপরের অংশ। রকেট ও হাওয়ার তোড়ে উচ্চতা বাড়ছে গ্লাইডারের, কিন্তু ওই একই কারণে কমছে গতি। মনে হলো না রকেটের জোরে প্রাচীর পেরোতে পারবে। বুঝে গেছে ওরা, এসব বিমান তৈরি হয়েছিল বড়জোর দু'জন যাত্রীকে বহনের জন্যে।

'খবরদার! তুই না উঠলে কিন্তু আমরা খুন হব!' মনে মনে শিবের বিমানকে ধমক দিল রানা। না, যে গতি তুলে চলেছে, সরাসরি পাহাড়ের নাকে গুঁতো মারবে ওরা। 'ওপরে ওঠ্!'

বিশ্রী খট-মট শব্দ তুলছে ডানা, যখন-তখন ছিঁড়বে সিল্কের আবরণ। না, ওরা বিধ্বস্ত হবে...

ওপরের জোরালো বাতাসে গতি বাড়ল বিমানের। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর পাহাড়ের মাথা থেকে রানার দিয়ে খামচে

তুলল এক ফুট তুষার, বেরিয়ে এল সংকীর্ণ উপত্যকা থেকে। তখনই সামান্য দূরে নিচে দেখা গেল গানশিপ। বেশ দূরে সরে গেছে অনুপম মঙ্গেলকারের হেলিকপ্টার। গানশিপ রকেট মারবে বলে নিরাপদ জায়গায় সরে অপেক্ষা করছে তারা।

পরস্পরকে দেখল লাবনী ও অঙ্কুর রায়। পরক্ষণে তাকাল রানার দিকে। আগেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা। দু'হাতে তুলে নিয়েছে শিবের পেটমোটা, কালো এক রকেট। সময় নেই যে আগুন দেবে, ত্রিশ ফুট ওপর দিয়ে যেতে যেতে গানশিপ লক্ষ্য করে রকেট ফেলল রানা।

মাত্র দু'সেকেণ্ড পর ওরা দেখল, ঘুরন্ত রোটরে পড়ে বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হলো প্রাচীন রকেট। কয়েক টুকরো হয়ে নানান দিকে ছিটকে গেল ব্লেড। তবুও পুরো দুই সেকেণ্ড থম মেরে আকাশেই থাকল যান্ত্রিক ফড়িং, তারপর পাথরখণ্ডের মত সাঁই করে নেমে গেল তিন শ' ফুট নিচে পাহাড়ের হাঁটুর কাছে। ভাঙা হেলিকপ্টারে আরেকটা বিস্ফোরণ হতেই চুরমার হলো ফিউজেলাজ। জ্বলন্ত ছোট ছোট সব টুকরো ছড়িয়ে পড়ল অনেকটা জায়গা জুড়ে।

চট্ করে একবার অঙ্কুর রায় আর লাবনীকে দেখল রানা। ওর দিকেই চেয়ে আছে তারা।

জোরালো হাওয়া ওপরে নিয়ে চলেছে গ্লাইডারটাকে। নিচে ও দূরে ছোট-বড় চূড়া নিয়ে বিছিয়ে আছে বিশাল কেদারনাথ পর্বত। গত দু'দিনের তুলনায় আজ আবহাওয়া ভাল, দূরে নিচে সমতল জমিও দেখল ওরা।

'আল্লা আমাদেরকে রক্ষা করেছেন,' বিড়বিড় করল লাবনী। 'ভাবতেও পারিনি ওই উপত্যকা থেকে জান নিয়ে বেরোতে পারব!'

'আমরা কিন্তু এখনও বাড়ি পৌঁছাইনি,' চারপাশ দেখছেন

অঙ্কুর রায়। 'এই জিনিস নিয়ে নামব কী করে?'

'তাই তো?' রাগত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল লাবনী।

'সমতল জমি পেলে আশা করি নামতে পারব,' বলল রানা মোটা-বেঁটে-খাটো-কালো দুই দণ্ড নেড়ে দক্ষিণে গ্লাইডার নিয়ে চলল ও।

ফুয-ফুয শব্দে নিভে গেল রকেট। কোথাও আগুন রয়ে গেল কি না বুঝতে আশপাশ দেখে নিল রানা। তখনই বুঝল, উপত্যকার সব বিপদ পেছনে ফেলে আসতে পারেনি।

লাবনীও দেখেছে। কাঁপা স্বরে বলল, 'মঙ্গেলকারের হেলিকপ্টার, রানা! ওটা আমাদের পেছনে তেড়ে আসছে!'

অনুপম মঙ্গেলকার প্রথমে ভেবেছিল, পাহাড়ে গুঁতো খেয়ে ধ্বংস হবে গ্লাইডার। কিন্তু পরে শিকার ভেগে যাচ্ছে দেখে ঘুরে ধাওয়া করেছে ধ্রুব হেলিকপ্টার নিয়ে। দরজা খুলে বাইরে ঝুঁকে এসেছে জ্যাক রিচি, হাতে এম২৪৯।

'এরা বেদ নিয়ে অনায়াসে সরে যেতে পারত!' বললেন অঙ্কুর রায়, 'প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খুন করতে আসছে কেন?'

'পাইলট বোধহয় খুবই অনুগত,' বলল লাবনী।

'আসল কথা, আমাদেরকে বাঁচতে হবে,' বলল গম্ভীর রানা।

কিন্তু বাঁচবে কী করে?

ভুরু কুঁচকে দূরে তাকাল রানা।

জবাব পেল দূরেই।

বিমান নিয়ে বাঁক নিল, চলেছে আকাশ ছোঁয়া পর্বতের দিকে।

'কী করবে, রানা?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইল লাবনী। দেখছে কাছে আসতে আসতে বড় হচ্ছে বিশাল এক চূড়া।

'নতুন প্ল্যান।'

'ভাল কিছু, না...'

'সম্ভবত খারাপই, কিন্তু ওটা ছাড়া আর কোনও প্ল্যান নেই।' পেছনে তাকাল রানা। মাত্র আধ মিনিটে ওদের পাঁচ শ' গজ দূরে পৌঁছেছে ধ্রুব হেলিকপ্টার, আরও কমিয়ে আনছে দূরত্ব। 'লাবনী, অঙ্কুর, জ্যাক রিচি অস্ত্র তাক করলেই জানাবে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চোখ রাখল অন্য দু'জন। ছুটে আসছে ওদের দিকে আকাশ ফুটো করে দেয়া বিশাল পর্বত, বেশিরভাগ অংশ পরিষ্কার, কিন্তু বরাবরের মতই কেদারনাথের চূড়ায় কালো, ঘন মেঘ। বিশেষ ওই মেঘের একাংশের দিকে বিমান নিয়ে চলেছে রানা।

ওপরে তুলে দেয়া হাওয়ায় থরথর কাঁপছে গ্লাইডারের ডানা। ক্রমেই আরও উঠছে, কিন্তু গায়ের কাছে চলে এসেছে পাহাড়ের খাড়া গা।

'রানা! গুলি করবে!' চিৎকার করে সতর্ক করল লাবনী।

বেঁটে দুই দণ্ড নেড়ে বিমান নিয়ে বামে সরল রানা। ওদের ডানপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রেসার বুলেট। আবারও আগের গতিপথে সরল। পরের গুলির তোড় আসতেই সরল ডানদিকে। এবারের গুলি বামপাশে হলেও খুব কাছ দিয়ে গেছে।

জয়স্টিক টেনে উচ্চতা চাইল রানা। পাহাড়ের গায়ে ঘনভাবে মেখে থাকা মেঘে ঢুকবে। আবারও চেঁচাল লাবনী। ওই একই সময়ে ডানে সরল রানা। কাছ দিয়ে পেরোল একঝাঁক বুলেট। যে দক্ষতায় ট্র্যাক করছে জ্যাক রিচি, তেমনি হেলিকপ্টার অনেক কাছে নিয়ে এসেছে পাইলট...

ঠক-ঠক শব্দে বিমানের কাঠের ডানা ফুটো করছে বুলেট। ভীতিকর কড়াৎ শব্দে ভাঙল একটা সাপোর্ট স্পার। হোঁচট খেল বিমান। ওদিকের ওজন রাখতে না পেরে কাত হলো বামদিকে। কন্ট্রোল লিভার বা কাঠের দণ্ড শক্ত করে টেনে বিমানকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইল রানা। ওরা পৌঁছে গেছে নির্দিষ্ট মেঘের ঠিক নিচে,

ওখানেই পাহাড়ের গা বেয়ে ধূসর এক দানবীয় মেঘ উঠেছে আরও ওপরে...

সেদিনের মতই ফ্ল্যাগ ক্লাউড— ঝড়ের অগ্রদূত।

সরাসরি ওটার দিকে ছুটে চলেছে রানাদের গ্লাইডার।

আটাশ

'টিকে থাক্, বাপ্!' বিড়বিড় করে কাতর অনুরোধ জানাল রানা। জোরেশোরে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলছে প্রাচীন বিমানের ক্ষতিগ্রস্ত ডানা।

'ওরা গুলি করছে!' প্রায় কেঁদে ফেলল লাবনী। আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে ট্রেসার বুলেট, ঠাস্‌ঠাস্ লাগছে গ্লাইডারের সরাসরি সামনের পাহাড়ে।

হঠাৎ করেই প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়া খপ্ করে ধরল ওদের বিমান, মারাত্মক জোরে ঠেলে দিল পাহাড়ের মাথার ওপরে। ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে চলেছে আরও ওপরে। বরাবরের মতই নাযি স্যালিউট দিল পাগলা মেঘ, একটানে বুকে নিল ওদেরকে।

মাত্র তিন ইঞ্চি দূরেও কিছুই দেখছে না ওরা। শুধু শোঁ-শোঁ আওয়াজে গর্জন ছাড়ছে ভয়ঙ্কর হাওয়া। মারছে প্রচণ্ড সব চাপড়। রানা প্রাণপণে বেঁটে দুই দণ্ড নিজের দিকে টেনে রেখেছে। আশা, এতেই পাহাড়ে আছড়ে পড়া থেকে রক্ষা পাবে

গ্লাইডার।

ঝোড়ো হাওয়ার হুই-হুই আওয়াজের ভেতর টের পেল, মট্ করে ভাঙল বিমানের আরেকটা স্পার। দমকা হাওয়ায় খসে পড়ছে ওদের সাধের আকাশযানের অংশ...

আরেকটা ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে বের করে দেয়া হলো ফ্ল্যাগ ক্লাউড থেকে। এতই কাছে, ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে পাহাড় স্পর্শ করতে পারবে ওরা। চোখের পলকে ঝড়ের বেগে উঁচু পাহাড়ি অংশ পেরোল বিমান। জোর খাটিয়ে পাহাড়ের গায়ের কাছ থেকে ওটাকে সরিয়ে নিল রানা। বাতাসের ঝাপটা কমতেই গতিহ্রাস হলো। টলমল করছে বিমান, যে-কোনও সময়ে নাক নিচু করে ডাইভ দেবে...

ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ও রোটরের ধুব-ধুব আওয়াজ শুনল ওরা। শিবের বিমানের মতই বাতাসের ঝাপটা খেয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে এসেছে মঙ্গেলকারের ধ্রুব হেলিকপ্টার। বিমানের ডানা পাশ কাটিয়ে গেছে খাড়া পাহাড়ি গা, কিন্তু এবড়োখেবড়ো পাথরের খুব কাছ দিয়ে যেতে পারবে না শত্রুদের যান্ত্রিক ফড়িং...

হেলিকপ্টার পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খাওয়ার মুহূর্তে এত শব্দের ভেতরেও মহিলাকণ্ঠের কর্কশ চিৎকার শুনল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হলো কপ্টারের রোটর। ওজন নেয়ার কিছু নেই বলেই ফিউজেলাজ আছড়ে পড়ল পাহাড়ের বুকে। শিকারকে গুলি করতে দরজা দিয়ে অনেকটা বেরিয়ে ছিল জ্যাক রিচি, পাথরের গায়ে তার দেহের অবশিষ্ট বলতে থাকল লাল এক বিশ্রী ভেজা দাগ। কয়েক আছাড় খেয়ে হাজার টুকরো হলো কপ্টার। নিচের ঝড়ের মেঘে ঝরঝর করে নামল জ্বলন্ত তেল।

মস্তবড় বিপদ থেকে বেঁচেছে ওরা, কিন্তু পড়েছে অন্য আরেক ঝামেলায়। জোরালো, রাগী হাওয়া ছিঁড়ে নিতে চাইছে

বিমানের কাঠের দুর্বল গা। ঝোড়ো বেগের বাতাস নিয়ে চলল ওদেরকে নিচে।

ভীষণ ভয় চেপে রানার কাছে জানতে চাইল লাবনী, 'আশা করি বিমান ভেঙে পড়বে না, পাইলট সাহেব?' বিপদে পড়লে রানাকে বকতে ইচ্ছে করে। নিজেই ভেবে বের করেছে, মানুষটাকে খুব কাছে কখনও পাবে না জেনেই কষ্ট দিতে চায়। বরাবরের মতই এখনও লজ্জা পেল।

মেঘ পেরোতেই বহু দূরে উপত্যকার শেষে গ্রাম দেখলেন অঙ্কুর রায়। 'বলো তো, রানা, ওই গ্রাম কতটা দূরে?'

'আন্দাজ পাঁচ মাইল,' জানাল রানা। 'কিন্তু আগেই সমতল জায়গা পেলে...' ঝুঁপ্ করে নিচে নামল বিমান। বেরিয়ে এসেছে ওপরের টানা বাতাস ছেড়ে।

'নামার বুদ্ধি বের করো,' বলল লাবনী।

নিচে পাথুরে এলাকা। কোথাও তুষার আবার কোথাও কালো বড় বড় পাথর।

'শিবের রেদ?' বেসুরো সুরে বললেন অঙ্কুর রায়।

'পৃথিবীর সেরা আর দামি আর্কিওলজিকাল সম্পদ হারিয়ে গেছে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লাবনী।

'শিবের জিনিস শিবের কাছে গেছে,' আনমনে বললেন অঙ্কুর রায়। 'উনি নিশ্চয়ই আমাদের দোষ দেবেন না...'

নতুন করে কাঠের লিভার টানাটানি শুরু করল রানা। 'এখন চাই এয়ার কারেন্ট, একটু ওপরে উঠতে পারলে ঠিকই পৌঁছব উপত্যকায়।'

'যেখানে আছে পাথর আর নদী! আমরা খুন হব!' আরও রেগে গিয়ে রানাকে দেখল লাবনী।

'আমার মনে হয়, এখনই নেমে পড়া ভাল,' বললেন অঙ্কুর রায়।

'তারপর এক পায়ে হাঁটবে কতক্ষণ?' জানতে চাইল রানা।

'মরার চেয়ে তো ভাল।'

'কিন্তু খাড়া পাহাড়ে নামলে বাঁচবেই তো না,' বলল রানা।

জবাব দিল না কেউ।

আবারও জোরালো হাওয়ায় পড়েছে বিমান। মাত্র দু'মিনিটে পেছনে চলে গেল কেদারনাথের গ্রাম।

'কমপক্ষে আরও আট মাইল গেলে গৌরিকুণ্ড,' বলল লাবনী, 'যদি নামতে পারি আর কী!'

বাতাসের স্রোত নিয়ে চলেছে নিচে। একটু পর বেড়ে গেল নামার গতি।

'অনেক জোরে নেমে যাচ্ছি,' আপত্তির সুরে বলল লাবনী।

'উপত্যকা পেরোতে পারব না, আগেই নেমে যেতে হবে,' বলল রানা।

'আর আমি ভেবেছিলাম তুমি দক্ষ পাইলট!' খোঁচা দিতে চাইল লাবনী।

'ভয় পেয়ো না,' শান্ত স্বরে বলল রানা। কয়েক শ' ফুট নিচে তুষার ঢাকা পাথুরে উপত্যকা। দুলতে দুলতে চলেছে ওরা। ডানা সোজা করে নিল রানা। তবুও নামছে বিমান। ফিসফিস করা এক আওয়াজ শুনল ওরা। ছিঁড়ে পড়ছে ক্ষতিগ্রস্ত ডানার কাপড়। একটু কাত হয়ে চলল প্রাচীন আকাশযান। সোজা করতে গিয়ে আগের চেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহার করছে রানা। 'এবার বোধহয় সত্যিই নেমে পড়তে হবে।'

রানওয়ের মত মসৃণ জায়গা খুঁজছে লাবনীর চোখ। তেমন কিছুই নেই। দূরে কাটা দাগের মত গভীর এক খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। 'আর কতক্ষণ টিকব আমরা, রানা?'

'আর বড়জোর দু'মাইল। যদি কপাল ভাল থাকে।'

'নদীর দিক থেকে দূরে থেকো,' আতঙ্ক নিয়ে বলল লাবনী।

দূরে চেয়ে আছে রানা। ওদিকে ঝোপঝাড়। একবার ওখানে নামতে পারলে হয়তো বাঁচবে। কিন্তু আপাতত চলেছে অনেক জোরে। সোজা ওসব ঝোপ পেরিয়ে পড়বে গিয়ে নদীর গভীর খাতে। 'ঠিক আছে, তোমরা তৈরি হয়ে নাও,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

উপত্যকার নিচের দিকে চলেছে বিমান।

এদিকের পাথুরে জায়গা পেরোলে শুরু হবে নষ্ট হয়ে যাওয়া তুলির মত খোঁচা-খোঁচা ঝোপের রাজ্য। এক জায়গায় ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপ। চোখ দিয়ে ওদিকের দূরত্ব মাপল রানা। আরও কমাতে লাগল গতি। কাজটা শেষে ঠিক করে নিল কোর্স। 'ব্যস্, এবার রওনা হয়ে গেলাম আমরা। ল্যাণ্ডিং!'

খুব অখুশি চেহারায় ঝোপঝাড় দেখলেন অঙ্কুর রায়। 'ওগুলো যদি থামাতে না পারে আমাদেরকে, রানা?'

'অনেক নিচের নদীর পানিতে পড়ব, ওখানে থাকবে অসংখ্য পাথর,' বলল রানা।

'তার মানে...' মাথা নাড়ল লাবনী। চুপ হয়ে গেছে।

'ওপারে গিয়ে জানতে পারবে কোন্ ধর্ম আসলে ঠিক, রেডি হও,' বলল রানা। কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল, তারপর সামনে ঠেলে দিল দুই কাঠের জয়স্টিক। কাঠের গোঙানি ছেড়ে প্রায় থেমে গেল বিমান, পরক্ষণে ভারী পাথরের মত আকাশ থেকে খসে পড়তে লাগল। পতনের গতি কমাতে পেছনে লিভার টানল রানা। তখনই মট্ করে ভাঙল বামদিকের ডানা। প্রাণপণে দুই জয়স্টিক টেনে বিমান সোজা করতে চাইল রানা। কিন্তু ডানা ভাঙা পাখির মত কাত হয়ে সোজা গিয়ে ঝোপে নাক গুঁজল ঐতিহাসিক বিমান। কানের কাছে লাবনীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনল রানা। চারপাশ থেকে ডালপালা আর তুষার এসে ঝাপটা মারছে ওদের চোখে-মুখে।

কমল না গতি। ঝোপে পড়ে ছিঁড়ে যেতে গিয়েও নতুন করে ভেসে উঠতে চাইল বিমান। বড় আরেকটা লাফে নামল আরেক ঝোপে। জোরালো মড়াৎ শব্দে ছিঁড়ল অবশিষ্ট ডানা। দাঁড়ের মত ছোট লাঠি মটামট্ ভাঙছে, পেছনে রয়ে গেল সিল্কের কাপড়। ঠাস্ ঠাস্ আওয়াজে খসে পড়ল দুই রানার।

গতি তুমুল। ওদের বিমান হয়ে গেছে স্লেজের মত। ঢালু উপত্যকায় বেগ না কমে যেন বাড়ছে। কেঁদে ফেলে কবজি থেকে চামড়ার ফিতে খুলল লাবনী। 'ওই যে নদী!'

'সবাই লাফিয়ে পড়ো!' নির্দেশ দিল রানা।

গভীর খাদ সামনে বুঝে বড় বড় হয়েছে অঙ্কুর রায়ের চোখ। 'এবার কী করব?' মনে হলো প্ল্যাটফর্ম থেকে নামতে দ্বিধা করছেন।

'আরে, লাফ দাও!' খপ্ করে তার বাহু ধরে একপাশে ঝাঁপ দিল রানা। ওকে দেখে একই কাজ করেছে লাবনী। তুষারের ভেতর লাঙলের মত পিঠ দিয়ে চাষ দিতে দিতে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে চলেছে ওরা। কয়েক লাফে ওদেরকে পেরোল প্ল্যাটফর্ম। রানার হাত ছুটে গেল অঙ্কুর রায়ের বাহু থেকে। চিত হয়ে আলাদা পথে রওনা হয়েছে ওরা। একেকজন যেন স্কিড করা স্লেড।

ওজন সবচেয়ে কম বলে সবার আগে থামল লাবনী। চোখ মেলে দেখল পায়ের সামনে তৈরি হয়েছে তুষারের বড় এক স্তূপ। ঠিকভাবে মাথা কাজ করছে না। দেখতে পেল গভীর খাদে গিয়ে পড়ল বিধ্বস্ত বিমান। 'রানা!' ডুকরে কেঁদে ফেলল ও। ধরেই নিয়েছে, রাগী-জেদি ভাল মানুষটা ওই পাথুরে গভীর খাদে পড়ে খুন হয়ে গেছে।

১

রানাও দেখেছে গ্লাইডার নদীর দিকে গেছে। চিত হয়ে চার হাত-

পা ছড়িয়ে জুতোর হিল ব্যবহার করে গতি কমাতে চাইছে। টের পেল, সোল-এ লেগে নানাদিকে ছিটকে যাচ্ছে ছোট সব পাথর।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, থেমে গেছে। মুখের ওপর থেকে তুষার ফেলল রানা। খুব আস্তে করে উঠে বসল। ওর দুই পা ঝুলছে গভীর নদীর পাড়ে। পানির তোড়ে দূর থেকে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে শিবের ভাঙা বিমান।

তুষার ঢাকা শক্ত জমিতে উঠে এল রানা। ঢালু জমি পেরিয়ে টলতে টলতে এদিকেই আসছে লাবনী। একটু দূরে কাত হয়ে শুয়ে আছেন অঙ্কুর রায়। নদীর ওই খাদ মাত্র তিন ফুট সামনে।

'সবাই সুস্থ তো?' জানতে চাইল রানা।

বাম কবজি ধরে রেখেছেন অঙ্কুর রায়। 'হাতটা বোধহয় ভেঙেই গেছে।'

পরীক্ষা করে দেখল রানা। মচকে গেছে বাহু, ফাটলও ধরে থাকতে পারে হাড়ে। বেল্ট খুলে স্লিং তৈরি করে দিল।

কাছে এসে বসে পড়ল লাবনী। তিক্ত সুরে বলল, 'এখনও অন্তত তিন মাইল দূরে গৌরিকুণ্ড।'

'এত পথ হাঁটতে হলে খুন হব,' মাথা নাড়লেন অঙ্কুর রায়। 'স্যাটেলাইট ফোনটা ভেঙে গেছে শিবের গুহায়। চাইলেও হেলিকপ্টার ডাকতে পারব না।'

'দেখি মোবাইল ফোনের সিগনাল আছে কি না,' প্যান্টের পকেট থেকে নিজের মোবাইল ফোনটা বের করল রানা। সিগনাল আছে। কয়েক সেকেণ্ড ভেবে লিস্ট থেকে নির্দিষ্ট একটা নম্বর বের করবে, এমন সময় বেজে উঠল যন্ত্রটা।

একবার স্ক্রিন দেখে কল রিসিভ করল রানা। 'হ্যালো, অনিল, হাজার বছর ধরে বেঁচে থাক্, বেটা।'

'অত দিন বাঁচার ইচ্ছে নেই, আপাতত এক শ' বছরেই খুশি,' হাসল ভারতীয় ইণ্টেলিজেন্সের নামকরা এজেণ্ট। 'তবে

বলেছিস বলে তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'তোর কারণে আজ মুখরক্ষা হলো ভারত সরকারের। কীভাবে ধন্যবাদ দেবে আমাদের বড়কর্তারা, তাই নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছে।'

'তাই নাকি? আমি আবার কী করলাম!'

'ওই যে, মুখরক্ষা করেছিস ভারতের? একটু আগে জি-২০ সম্মেলন কক্ষ থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু বোমা সরিয়ে নিয়েছি আমরা। ওগুলো ফাটলে বিশটা দেশের প্রধানরা তো মরতেনই, আমরাও শেষ হয়ে যেতাম। পুরো পৃথিবী জুড়ে শুরু হতো মহাযুদ্ধ। কিন্তু তোর দেয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে ফাঁদ পেতে সব রক্ষা হয়েছে। এরই ভেতর অনুপম মঙ্গেলকারের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজন বড় সরকারী অফিসার ধরা পড়েছে। তাদের পেট থেকে বেরোচ্ছে জরুরি তথ্য। তোকে অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের কোনও সম্মাননা দেয়া যায় কি না, তা নিয়ে ভাবছে ভারত সরকার। আমি অবশ্য আগেই বলে দিয়েছি, তুই কোনও পুরস্কার নিবি না। সেটা অ্যালাও করবে না বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্স। যাক গে, এবার অনুপম মঙ্গেলকার আর তার স্ত্রীকে বাগে পাব আমরা।'

'সে উপায় নেই,' বলল রানা, 'পরে শুনিস। শুধু এটুকু জেনে রাখ, স্বয়ং শিবের বেদ চুরচুর করে দিয়ে পাহাড়ে গুঁতো মেরে নরকে গেছে তারা।'

'তুই এখন কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল অনিল।

'শিবের গুহা থেকে বেরিয়ে গৌরিকুণ্ডের কয়েক মাইল দূরে শিবের গ্লাইডার বিধ্বস্ত হতে আপাতত আটকা পড়েছি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে এইচআইএ-র ডিরেক্টর ডক্টর লাবনী আলম আর তোদের ভারত পুলিশের বড় এক অফিসার। আপাতত কাজ

করছেন ইন্টারপোল এজেন্ট হিসেবে, আহত বলে হাঁটতে পারবেন না।'

'ওখানেই চুপ করে বসে থাক্,' বলল অনিল, 'একঘণ্টার ভেতর হেলিকপ্টার নিয়ে আসছি। আর কোনও সমস্যা নেই তো?'

'না, নেই।'

'তা হলে ধরে নে আমি রওনা হয়ে গেছি।'

কল কেটে দেয়া হয়েছে।

লাবনী শুয়ে পড়েছে তুষারের মাঝে। একটু দূরে বসে আছেন অঙ্কুর রায়। দু'জনের চোখে কৌতূহল।

লাবনীর পাশে বসল রানা। 'হেলিকপ্টার আসছে। আর হাঁটতে হবে না।'

'বাঁচলাম!' খুশি হয়ে উঠলেন অঙ্কুর রায়।

'এবার আমার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে ফিরবে, রানা?' জানতে চাইল লাবনী।

মাথা নাড়ল রানা। 'না, নিশ্চয়ই এরই ভেতর অনেক কাজ জমে গেছে দেশে। সোজা ঢাকা।' ওর দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে লাবনী। কী ভাবছে আঁচ করতে চাইল রানা। মগজে কিছু খেলল না বলে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? অত হাসি কীসের?'

'তুমি জানো না, মন্দিরে ঘুমিয়ে ছিলে, তোমাকে মাঝরাতে ঠিক ছোট্ট বাচ্চার মত দেখাচ্ছিল!'

'তাই?' একটু বিব্রত হলো রানা।

'হ্যাঁ, জেদি বাচ্চা! ঠোঁট ফুলিয়ে...'

'তুমি কি আমাকে রাগাতে চাইছ?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল লাবনী। 'তুমি আসলেই বাচ্চার মত। জেদিও!'

'আচ্ছা?'

লাবনীর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

সত্যিই দুষ্টুমি চাপল রানার, ঝুঁকে ঠোঁট নামাল সুন্দরীর গোলাপি নরম অধরে। অবাক হয়ে টের পেল, ওর চুমুর জন্যে তৈরিই ছিল লাবনী!

অঙ্কুর রায়ের উপস্থিতি ভুলে গেল ওরা দু'জন।

কিছুক্ষণ পর খুক-খুক করে কাশলেন ইণ্টারপোল এজেন্ট। মাথা নাড়লেন, 'যা দেখছি, তাতে বুঝে গেছি, মা'র কথা এবার রাখা উচিত। কলকাতায় ফিরেই জানিয়ে দেব, খুঁজতে শুরু করো পাত্রী!'

জবাব দিল না কেউ।

খাঁটি মধু আহরণে খুবই ব্যস্ত ওরা!

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

আনিস-উজ-জামান, মোবা: ০১৭৭২-৬৮৬২০২
১৭০ মেরাদিয়া মেইন রোড, ঢাকা ১২১৯।

কাজীদা, সেবার কিছু বই পড়লাম। নরকের কীট, জাপানি টাইকুন, টাইম বম, লাইম লাইট, পাতকিনী, সেই কুয়াশা, নরপিশাচ, তুষার যাত্রা, হাইজ্যাক, অন্ধকারে চিতা (মাসুদ রানা), নাড়া দ্য লিলি, শেষ যাত্রা, দ্য লায়ন'স স্কিন, ট্রেজার অভ দ্য লেক, মেন এগেইনস্ট দ্য সি, দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি (অনুবাদ) ও হরর কাহিনি ভ্যাম্পায়ার ভার্সাস ওয়্যারউলফ, রিটার্ন অভ ড্রাকুলা পড়লাম। মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো অসাধারণ। উপরে উল্লিখিত মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলো পড়ে শিখতে পারলাম কীভাবে সীমাহীন কষ্ট ও নানা প্রতিকূলতার মাঝে থেকেও দেশের, মানবতার, বন্ধুর জন্য কাজ করার জোরাল মানসিকতা অর্জন করা যায়। এ ছাড়া শত কঠিন পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা করে, মনের শক্তি দিয়ে কীভাবে অসম্ভব কাজকে সম্ভব করা যায়।

❋ আমাদের বই আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুব ভাল লাগল। চিঠি দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ফরহাদ
রামপুরা, ঢাকা।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা,

সালাম নেবেন। কেমন আছেন? অনেক ব্যস্ত থাকায় অনেকদিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আবার ফিরে এলাম। গত এক বছরে রানার

অনেকগুলো চমৎকার বই পেয়েছি। কাজীদা, আপনার কাছ থেকে দূরে ছিলাম, রানার কাছ থেকে নয়। চমৎকার বইগুলোর জন্য আপনাকে এবং আপনার সহযোগীদের শুভেচ্ছা। আপনাদের বর্তমান পলিসিতে আমি বেশ সন্তুষ্ট। একখণ্ডের মধ্যেই গল্প শেষ করা–এর ফলে বেশ ঢাউস আকারের বই পাচ্ছি, যদিও দামটা একটু... যা হোক, কাজীদা, চালিয়ে যান। আর রানার ৪৫০তম বইটা আশা করি অনেক অ্যাকশনপূর্ণ হবে। এটাকে স্মরণীয় করে রাখুন। কাজীদা, সুস্থ ও সুন্দর থাকুন জীবনের বাকিটা সময়।

❋ ধন্যবাদ।

পারভেজ

মতিঝিল, ঢাকা।

শুভেচ্ছা নেবেন। বিবিসি থেকে নাকি মাসুদ রানা সিরিজ নিয়ে অনুষ্ঠান হয়েছে। এতে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

❋ ভাল লেগেছে।

সাকিব জয়

চড়পাড়া, ময়মনসিংহ।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু...

কী ভাবছেন? কবিতা কেন দিলাম?

ছোট থেকেই ঘরকুনো স্বভাবের মানুষ আমি। ঘরের বাইরে যাওয়া হয়নি তেমন একটা। কিন্তু তবুও বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিল, টেমস নদীর তীরের বাতাস, অ্যান্টার্কটিকার শীতল হাওয়া, সাহারা মরুভূমির বালুর ঝড়, এগুলো বড়ই আপন মনে হয়। আপন মনে হয় গিলটি মিয়াকে যে কিনা সব অসাধ্য সাধন করতে পারলেও কুঁকড়ে যায় পুলিশের সামনে এসে।

রানা আমার কাছে একটা চেতনা। আমি রানার কাছে ঋণী। জানেন, কেন? ও আমার মানুষ চেনা, মানুষকে জানা, মানুষকে সম্মান দেয়ার দৃষ্টিই পালটে দিয়েছে। বন্ধুত্বের সংজ্ঞার সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। নারীকে সম্মান দিতে শিখিয়েছে। রানাকে নিয়ে কী আর কথার শেষ আছে, স্যর, বলুন? আমার শেষ ইচ্ছে কী জানেন? মরার সময় যেন 'দংশন' আর 'মুক্ত বিহঙ্গ' বইদুটো আমার হাতের কাছে থাকে। ভাল থাকবেন সহস্র পাঠকের স্বপ্নদ্রষ্টা। বেঁচে থাকুক রানা সহস্র বছর পাঠকের বুকে।

❋ ধন্যবাদ।